ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

রত্নাবলী / ৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৬৪

প্রকাশক
এস. চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
স্টার এন্টারপ্রাইজ
৫৯ এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পিতৃপ্রতিম শিক্ষাগুরু

ড. হরিপদ চক্রবর্তী

শ্রীচরণেষু—

নিবেদন

পরিব্রাজক নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত পরিক্রমায়। কোথায় গিয়েছিলেন আর কোথায় যাননি তা নিয়ে পণ্ডিতদের বিবাদ এখনও ঘোচেনি। 'গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা—প্রামাণিকতা বিচার'—গ্রন্থে ওই বাদ-প্রতিবাদের ভিতরকার প্রকৃত 'সম্বাদ'টি জানতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। তখনই এই দিব্য মানুষটিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আরও নিবিড় করে জানার সাধ জেগেছিল। 'পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ও 'বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে তার কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের রূপরেখা নির্ণয় করতে গিয়ে মনে হয়েছে এই দিব্য মানুষটিকে জানা আমার ফুরোবে না—ভারতের পথে প্রান্তরে আরও কত ইতিহাস কত কিংবদন্তী কত লোকপ্রথা তাঁর দিব্য প্রেরণাকে অম্লান করে রেখেছে কে জানে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা অনেক সময় আপন আপন পাণ্ডিত্যের বদ্ধ জলাশয়ে গা ভাসিয়ে দেন এবং সাগর সংগম অভিলাষী নবকুমারদের সেই ডোবার জলেই স্নান সারতে বলেন। ঈশ্বর এঁদের সুমতি দিন।

ভারত পর্যটন কালে মহাপ্রভু যে সব প্রদেশের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সেই প্রাদেশিক সাহিত্যে তাঁর প্রভাব আদৌ পড়েছিল কিনা, অথবা কিভাবে কতটা পড়েছিল—এবার তা-ই ছিল আমার অনুসন্ধানের বিষয়।

'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' রচনা কালে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের দিকেই লক্ষ্য রেখেছি। 'সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' বিষয়টি ইচ্ছা করেই এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করি নি—কেননা সে এক বিশাল বারিধি—পৃথক একটি গ্রন্থের বিষয়ীভূত করলে তবেই তার প্রতি সুবিচার সম্ভব হতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপারেও বিস্তৃত আলোচনায় যাইনি একই কারণে।

তথ্যানুসন্ধান পর্বে আমার ভাগ্য দেবতা পথের বাঁকে বাঁকে অনেক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় আর আনন্দ জমিয়ে রেখেছিলেন। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্রজভাষায় রচিত গৌরপদাবলী, পরম সুললিত হিন্দীতে 'রামচরিত মানসে'র আধারে রচিত সত্তর বছরের পুরানো পূর্ণাঙ্গ চরিতকাব্য 'শ্রীগৌরাঙ্গচরিতমানস'—এ আমার পথের দেবতার পরম আশীর্বাদ। সেই পরম আনন্দের পরমান্ন যাঁর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি, যিনি এই গ্রন্থরচনার পর্বে আমার পরাণসখা বন্ধু হয়ে দেখা দিয়েছেন, অনুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে আমার মন্থরতায় গতি সঞ্চার করেছেন, তিনি আমার অনুজপ্রতিম ড. সুভাষ শাসমল। এ গ্রন্থের প্রতি, আমার মত তাঁরও অপত্যস্নেহ আছে, কেননা আমরা সম্ভাবনার শকুন্তলাকে যুগল কণ্বের মত বহুকাল সযত্নে লালন করেছি।

আর যাঁকে পেয়েছি একান্ত সুহৃদরূপে, তিনি এ গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুনীল ভট্টাচার্য। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বে তাঁর উৎসাহের উনপঞ্চাশ পবন আমার পালে হাওয়া লাগিয়েছে। নানা ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন পূজনীয়

শিক্ষক ড. হরিপদ চক্রবর্তী, ড. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, অগ্রজা-প্রতিম ড. উমা রায়। বন্ধুজনোচিত পরামর্শ দিয়েছেন ড. সত্য গিরি ও ড. সত্যবতী গিরি।

গ্রন্থের অনুলিখনে সাহায্য করেছে আমার স্নেহাস্পদা ছাত্রী শম্পা ভাদুড়ী ও কন্যা মৌসুমী গুপ্ত।

মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের হৃষীকেশ মহারাজ, অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ও অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী, বরানগর পাঠবাড়ীর শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী, প্রেমানন্দ দাস ও আহীরী দিদির প্রসন্ন মধুর আতিথেয়তা রইল অবিস্মরণীয় হয়ে।

নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

সূচীপত্র

श्री श्री गौरांगविधुर्जयति

व्रजभाषा में

प्रियादास जी की ग्रंथावली

रसिकमोहिनी, अनन्यमोदिनी, चाहवेली, भक्तसुमिरिणी

अर्थ सहायक—गौरनिष्ठ, श्रीमान् व्रजमोहनलालजी श्रीवास्तव, एम०ए०, न्याय-मंत्री (ग्वालियर)।

प्रकाशक—
बाबा कृष्णदास,
कुसुमसरोवर (गोवर्द्धन) मथुरा

सर्वाधिकार सुरक्षित है।

प्रथमावृत्ति १००० }
संवत् २००० }

न्यौछावर ।=)

Shree Chaitanya Bhagabata

ISWAR DAS

Compiler

RAI BAHADUR ARTABALLABHA MOHANTY, M.A.

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ

ଈଶ୍ୱରଦାସ

ରାୟ ବାହାଦୁର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଏମ୍.ଏ.

ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

ପ୍ରକାଶକ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ମୂଲ୍ୟ ୫ ଟ (ମୂଳ [illegible])

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব

সর্বভারত পর্যটন করে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরেক পর্যটক শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, "The influence of Shri Chaitanya is all over India. Wherever the Bhakti-Marga is known, there is he appreciated, studied, and worshipped.· most of his so-called disciples in (Bengal do not know how his power is still working all over India".)

অর্থাৎ—'শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে সারা ভারত জুড়ে। যেখানেই আছে ভক্তিমার্গ, সেখানেই তাঁর অর্চনা, চর্চা ও উপলব্ধি। বঙ্গদেশে তাঁর তথাকথিত শিষ্যদের অধিকাংশই জানেন না, সারা ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব আজও কিভাবে কাজ করে চলেছে।'

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ সম্বর্ধনার উত্তরে স্বামীজী এ কথা বলার পর গঙ্গা-গোদাবরী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দূর হয়েছে এ কথা বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ মাত্র একটি—ড. বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান'। মজুমদার মহাশয় তাঁর এই দিগ্‌দর্শিনী গ্রন্থে আসাম, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মুলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্য প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। শঙ্করদেবের দুই শিষ্য - দামোদর ও মাধবদেব। ব্রাহ্মণ দামোদরের শিষ্যরা বামুনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় এবং কায়স্থ মাধবদেবের শিষ্যরা মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। আসামে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে বার হয়ে যখন পুরীতে ছিলেন, তখন ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়। দামোদরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রামকান্ত দ্বিজ তাঁর 'গুরুলীলা' গ্রন্থে শঙ্কর-চৈতন্যের মিলনের কথা লিখেছেন। দামোদরের আরেক শিষ্য কৃষ্ণভারতী 'সন্তনির্ণয়' নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থে শঙ্কর-চৈতন্যের মিলন বৃত্তান্ত আছে ; এই তিনখানি গ্রন্থ রামচরণ ঠাকুর (শঙ্কর শিষ্য রামদাসের পুত্র) কৃত শঙ্করচরিত, রামচরণের পুত্র দৈত্যারি ঠাকুরকৃত শঙ্করচরিত এবং ভূষণ দ্বিজকবি (শঙ্করশিষ্য চক্রপাণির পৌত্র) কৃত শঙ্করচরিত। ভট্টদেবের 'সংসম্প্রদায় কথা'য় এবং কৃষ্ণ আচার্যের 'সন্তবংশাবলী'তে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়। আধুনিক অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্রদেব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ড. অজয়কুমার চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত *Literature in Kamata Kochbihar Raj-Darbar* গ্রন্থটিও নানা মূল্যবান তথ্যের আকর।

শঙ্করদেব প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে চৈতন্যপন্থার নানা সাদৃশ্য আছে। শঙ্করদেব ও

চৈতন্য উভয়ে ভক্তিবাদী, ভাগবতপ্রেমিক, জাতিভেদ বিরোধী এবং লোকশিক্ষার মনোযোগী। সাধারণতঃ ধরা হয় শঙ্করদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও দাস্যরস আশ্রয় করে-ছিলেন এবং চৈতন্য রাগানুগা ভক্তি, পরকীয়া ভাব ও মধুররসের সমর্থক ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করা হয় যে, শঙ্করদেবের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নি। শঙ্করদেবের রচনার সঙ্গে পরিচিত হলে দেখা যাবে, শঙ্করদেব রাগভক্তি এবং মধুররসাশ্রিত পদও রচনা করেছেন এবং উপরি উক্ত সিদ্ধান্তটি ভ্রমাত্মক।

পাঞ্জাব, মুলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থে আছে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন পরিভ্রমণ কালে পাঞ্জাবী কৃষ্ণদাস তাঁকে দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে নিজের গলার গুঞ্জামালা দান করেন এবং কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী —

প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥
চৈতন্য ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে॥

মুলতান থেকে গুজরাতে গিয়ে কৃষ্ণদাস "শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ তথায় প্রকাশ করিল"। গুজরাত থেকে পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধু দেশে গিয়ে

হিন্দু ত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত বৈলা॥
তারপরে পাঞ্জাব মুলতান গুজরাত।
সুরত আদি দেশে প্রভু চৈতন্য ভকত॥

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে চৈতন্য পার্ষদ বক্রেশ্বরও চৈতন্য ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বরানগর পাঠবাড়ী গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ও গোপালগুরু রচিত 'বক্রেশ্বরাষ্টক' স্তোত্রে আছে—

কর্ণাট-লাট-মরহট্ট-কলিঙ্গ-রাষ্ট্র
সৌরাষ্ট্র-কোচ-মলয়ালয়-গুর্জরেষু।
যস্য প্রভবিবিভবো বিতনোতু ভক্তিং
বক্রেশ্বরং তমিহ মৎপ্রবরং নমামি॥

বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য নিজে গিয়ে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন। মহাপ্রভুর শিষ্যরাই বৃন্দাবনে সর্বপ্রথম মন্দির গড়েন। 'ছয় গোস্বামী' ছাড়া মহাপ্রভুর অন্যান্য যেসব পার্ষদ এখানে ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থাদিরচনায় কালাতিপাত করেন, তাঁদের মধ্যে প্রবোধানন্দ ('চৈতন্যচন্দ্রামৃত' রচয়িতা), শ্রীনাথ ('চৈতন্যমতমঞ্জুষা' নামক ভাগবত-ভাষ্য রচয়িতা) এবং স্বনামধন্য কবিকর্ণপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রজমণ্ডলে রামানন্দী সম্প্রদায়ের নাভাদাসজী হিন্দী ভক্তমাল রচনা করে বৃন্দাবন-বাসী প্রিয়াদাসজীকে ওই গ্রন্থের টীকা লিখতে বলেন। প্রিয়াদাসজী ১৭৬৯ সংবতে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ওই টীকা সমাপ্ত করেন। নাভাজীর মূল গ্রন্থে বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ গুসাঁই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছপ্পয় আছে। নাভাজী লিখেছেন—

'অবতার বিদিত পূরব মহী উভে মহত দেহী ধরী।
নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তরী ॥

প্রিয়াদাস বলেছেন, প্রবোধানন্দের গ্রন্থ শুনে "কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো"।

বৃন্দাবনের বিষ্ণুস্বামী বা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের বল্লভাচার্য ছিলেন চৈতন্যের প্রিয়জন। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়েরই শাখা—'I have every reason to believe that the whole of the Vallabhacharya recension is only a branch of the sect founded by Shri Chaitanya.' 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং বল্লভ সম্প্রদায় রচিত গ্রন্থে (M. C. Parekh : Sri Vallabhacharya) চৈতন্য-বল্লভাচার্য (বল্লভভট্ট) সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত আছে। বল্লভের পুত্র বিঠঠলনাথের (১৫১৮-১৫৮৮ খ্রীঃ) উপর চৈতন্য প্রভাব সুস্পষ্ট। বিঠ্ঠল নবদ্বীপে ন্যায় পড়েছিলেন। রাধার বন্দনাসূচক 'স্বামিনী অষ্টক', 'স্বামিনী স্তোত্র' এবং অন্যান্য স্তোত্র রচনা করেছিলেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী' রচয়িতা রঘুনন্দন গোস্বামী বলেছেন -

দুর্লভ পাদাম্বুজযুগ সুবশিত
বল্লভনামাবনিসুর বর সুত। ধীর ॥ ৬১ শ্লোক

'হে ধীর! যোগি-জ্ঞানিগণের সুদুর্লভ চরণযুগল দ্বারা তুমি বল্লভভট্ট নামক বিপ্রের উত্তম সন্তান বিঠ্ঠলেশ্বরকে বশীভূত করিয়াছ'। 'ভক্তিরত্নাকর' পঞ্চম উল্লাসে আছে 'বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ'।

বৃন্দাবনে সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক ব্রজভাষা বা 'ব্রজভাখা'তেও চৈতন্য প্রভাব লক্ষণীয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমাধুরীজী ব্রজভাষায় পদাবলী রচনা করেন। এগুলি সাতটি ভাগে বা মাধুরীতে বিন্যস্ত। প্রত্যেক মাধুরীর পূর্বে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা আছে। এই পদাবলীর রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ।

শ্রীশুক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীসরসমাধুরীজী 'সরস সাগর' নামক গ্রন্থে প্রায় তিন হাজার পদ রচনা করেছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপুতানার স্থানে স্থানে বর্তমান। 'সরস সাগর' গ্রন্থে তৃতীয় ভাগে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজীকো জন্মবধাই' শীর্ষক ৫৫টি পদ আছে।

গৌড়ীয় গোস্বামীদের প্রভাব উদয়পুরের রানী মীরাবাঈয়ের উপরও পড়েছিল। গিরিধারীর আকর্ষণে তিনি ব্রজে আসেন। এই স্বনামধন্যা সাধিকাও ব্রজভাষায় একটি গৌরপদ রচনা করেছেন।

পাঞ্জাবের গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ) শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। ঈশ্বরদাসের ওড়িয়া চৈতন্যভাগবতে আছে, পুরীতে চৈতন্যসেবকদের মধ্যে ছিলেন নানক-সেবক উদাত্ত। ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "নানকের সেবক উদাত্তের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নানকের একজন সেবক শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ একেবারে নূতন।" (চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ৫০০)

ঈশ্বরদাসের মতে নানক স্বয়ং পুরীতে চৈতন্যমণ্ডলীর মধ্যে কীর্তন ও নৃত্য করেছিলেন।—'শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর। কীর্তন মধ্যে বিহার ॥

নানক সারঙ্গ এ দুই। রূপ সনাতন দুই ভাই ॥
জগাই মাধাই একত্র। কীর্তন করন্তি এ নৃত্য ॥' ৬১ অধ্যায়

অন্যত্র, 'নানক সহিতে গহন। গোপাল গুরু সঙ্গতেন ॥
সঙ্গে ত মত্ত বলরাম। বিহার নীলগিরি ধাম ॥' ৬৪ অধ্যায়

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "নানকের সহিত চৈতন্যের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর দাসের বর্ণনা কতদূর সত্য বলা কঠিন।"
(চৈ. চ. উ. পৃ. ৫০০

পক্ষান্তরে হরিদাস দাস লিখেছেন—"তালবন্দী—শ্রীগুরু নানকের জন্মস্থান। ইনি শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন বলিয়া 'গ্রন্থসাহেব' শেষখণ্ডে নাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে জানা যায়।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ. ১৮৮০)

এ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ও গুরু নানক—মধ্যযুগের এই দুই বিখ্যাত সন্তের চিন্তাধারা ও ধর্মমতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা এবং গুরু নানকের উপর চৈতন্যপ্রভাবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। উভয়ের চিন্তাসাদৃশ্য লক্ষ্য করার পক্ষে Dr. Gopal Singh, M. A., Ph. D. প্রণীত Guru Nanak গ্রন্থ এবং উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত Thus Spake Nanak খুবই সহায়ক হবে।

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সাহিত্যে ও দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম অঙ্কে দেখা যায় বিজয়নগর বা কর্ণাটের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের অমাত্য মল্লভট্ট ওড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট এসে কৃষ্ণদেব রায়ের কুশল জানিয়ে বলছেন, 'সম্প্রতি তাঁর অধিক কুশল। এখান থেকে যে কনকদ্যুতি যতিশ্রেষ্ঠ দক্ষিণদেশে গমন করেছেন, তাঁর অলৌকিক চরিতকথা জেনে তিনি ভবদহন-জ্বালা বিস্মৃত হয়েছেন।'

বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রীব্যাসরায় এবং শ্রীচৈতন্য উভয়েই ছিলেন মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। উভয়ের প্রভাবেই সম্ভবতঃ কৃষ্ণদেব রায় ও ওড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র—দুই বৈষ্ণব সম্রাট আত্মীয়তা ও শান্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও ব্যাসরায়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস নীরব। তবে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে ষোড়শ শতকের 'হরিদাস' গায়কদের উপর একই সঙ্গে শ্রীব্যাস রায় ও শ্রীচৈতন্যের যুগ্ম প্রভাবের কথা যেভাবে ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাতে মনে হয় উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী ষোড়শ শতকের কন্নড় সাহিত্যে মধ্বাচার্য, ব্যাসরায় ও চৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—

"Popular songs in ragale metre by Dasas (mendicant singers) was another form of Vaishnava Literature in Kannada in this period. These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya, and the visit of Chaitanya to the South in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song."

[*A History of South India*, p. 393]

অর্থাৎ 'এ যুগের কন্নড় বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দাসগায়কদের রচিত জনপ্রিয় ত্রিপদী গীতগুলি ('some is in three lined tripadi or ragale' p. 13)। মধ্বাচার্য ব্যাসরায়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এই গায়কেরা। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণ এই জনপ্রিয় গীতধারাকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছিল।'

কন্নড় ভাষায় রচিত এই সব ভক্তিগীতি 'দাসর পদগলু' নামে পরিচিত। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে Rev. Dr. Moegling এই ধরনের ১৭৪টি পদ ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশ করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য Charles E. Gover 'The Folk-Songs of Southern India' গ্রন্থে দাসগায়কদের রচিত কিছু পদ এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কিছু লোকগীতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর ভূমিকা লেখেন গোভার নিজেই। মাদ্রাজের *The South India Saiva Siddhanta Works* থেকে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে। এর পরিচায়িকা লেখেন মাদ্রাজের ত্যাগরায় কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক M. K. Shanmugam, M. A. L. T.। এই গ্রন্থে প্রকাশিত পদগুলি থেকে দাসগায়ক ও লোকগীতিকারদের উপর চৈতন্য প্রভাবের একটা হদিশ পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ ভারতীয় সমাজেও চৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের অন্যতম কারণ ছিল চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তির প্লাবন। A History of Kanarese Literature গ্রন্থে E. P. Rice জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের অন্যান্য কারণের উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন—"And finally in the sixteenth century, a wave of Vaishnava enthusiasm inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishna Bhakti, swept over the Peninsula, and completed the alienation of the people from the austere teaching of the Jainas" (p. 21)। অর্থাৎ—"এবং সর্বশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য-প্রচারিত কৃষ্ণভক্তিবাদের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধর্মের কৃচ্ছ্রতা থেকে জনচিত্তকে সরিয়ে আনল সম্পূর্ণভাবে।"

চৈতন্য প্রভাবে তীব্র জাতিভেদ অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের 'দাস' গায়কেরা সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের ভক্তির পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। The Folk-Songs of Southern India গ্রন্থে Charles E. Gover সম্পাদকীয় ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'No questions of caste entered into the matter. None dared to despise the 'Slave of God' [Introduction, pages XIII-XV]

দক্ষিণ ভারতের মহীশূর-কুর্গ অঞ্চলের 'সাতানি' সম্প্রদায়ের ইতিহাসও চৈতন্য

প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। 'সাতানি' (চৈতন্য>সাতানি?)-রা এ অঞ্চলের ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয়। এঁরা হোলিয় ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের পৌরোহিত্য করেন। এঁরা বিষ্ণুকে কৃষ্ণমূর্তিতে উপাসনা করেন এবং এঁরা চৈতন্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা নিজেদের 'বাংলার বৈষ্ণব' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। "The Satani are the next most numerous sect. They are regarded as priests by the Holeya and other inferior castes.·· They are votaries of Vishnu especially in the form of Krishna, and are followers of Chaitanya.···They call themselves Vaishnavas, the Baisnabs of Bengal".

[*Imperial Gazetteer of India*—Mysore & Coorg (1908), p. 48]

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের District Gazetteer গুলিতে চোখ বুলোলেও বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত কেমন জীবন্ত—'how his power is still working all over India'। চতুর্দশ শতকের মারাঠী সাহিত্যে ভক্তিস্তোত্র অভঙ্গ রচয়িত্রী জনাবাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন বঙ্গীয় সন্ত চৈতন্যের ভাবোল্লাসকে—"Janabai is a unique personality······in the whole panorama of Marathi literature. ···She always, as she says in her abhangas, felt the presence of her God.···This simple and innocent maid-servant lived always in that ecstacy. Do we not find this very same ecstacy in Chaitanya, the Saint of Bengal ?" [Maharastra State Gazetteer, p. 20-21]

মহারাষ্ট্রের 'নাসিক' নগরে "চার সম্প্রদায় কী আখড়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ বিগ্রহ সেবিত হয়েন। দোলপূর্ণিমায় মহাপ্রভুর উৎসব হয় (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—১৯০৩ পৃ.)।"

শ্রীচৈতন্যের ৪৮ বছরের জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সবটাই কেটেছে ওড়িষ্যায়। স্বভাবতঃ ওড়িষ্যার জেলা গেজেটিয়ারগুলিতে চৈতন্য প্রসঙ্গের উল্লেখ সবচেয়ে বেশী। ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে জানানো হয়েছে—"During the rule of Prataprudra-Deva, the grandson of Kapileswara Deva, Sri Chaitanya came to Orissa in 1510 A. D. The Kadacha of Govindadas reveals that Sri Chaitanya on his way to Puri visited Hariharpura where he influenced the people by his devotional love." (p. 67)। এই গ্রন্থে 'কাঠুয়া অমরদা' গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে—"According to tradition the villagers of Amarda, instead of supplying articles of food, entertained Chaitanya and his followers on their way to Puri with firewood and for this reason the village is called Kathua (wooden) Amarda even to the present day" (p. 457-8)। শ্রীচৈতন্য তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পুরী যাবার পথে এখানকার লোকেরা তাঁদের খাদ্যবস্তুর বদলে জ্বালানী কাঠ দিয়ে আপ্যায়ন করে, এইজন্য আজ পর্যন্ত লোকে বলে 'কাঠুয়া অমরদা'। এই একই গ্রন্থে

'প্রতাপপুর' গ্রাম সম্পর্কে জানানো হয়েছে—এ গ্রামে একটি কুটিরে জগন্নাথ, দধিবামন ও মহাপ্রভু চৈতন্যের মূর্তি পুজো করা হয়। দোলপূর্ণিমায় চৈতন্যজন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে শত শত তীর্থযাত্রী মিলিত হন। এই উপলক্ষে অহোরাত্র নামকীর্তন হয়। "There is a small hut in which the images of Jagannath, Dadhibaman and Mahaprabhu Chaitanya are worshipped Hundreds of pilgrims assemble here to celebrate the birth anniversary of Chaitanya on Dol Purnima. On this occasion, they sing the name of Hari day and night without stop." (p. 483)।

পুরীর পথে, মেদিনীপুরের দক্ষিণে একটি গ্রামে মহাপ্রভু নিমডাল দিয়ে দাঁতন করেছিলেন। সেই গ্রামটির নাম হয়ে গেল 'দাঁতন'। এ প্রসঙ্গে Bengal District Gezetteer-Midnapore গ্রন্থে L. S. S. O' Malley ১৯১১-য় লিখেছেন" Dantan a village in the south of the Midnapore subdivision, situated 40 miles south of Midnapore. According to local tradition, Chaitanya on his way to Jagannath, about 200 years ago, brushed his teeth here, and from this circumstance the village got the name of Dantan (tooth-brush . [P. 177-8]

ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণ পথে মহাপ্রভু এখানকার মৎস্যতীর্থ (মচকুণ্ড) দেখে যান এবং এ অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যের নব-বৈষ্ণবধর্ম খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। —"The neo-Vaishnavism cult of Shri Chaitanya became very popular in this region and it is held that Lord Chaitanya visited Matsya Tirtha (Machkund) in the course of his pilgrimage in the South". [P. 359]

ওড়িষ্যার জনজীবনে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে Hunter তাঁর 'ওড়িষ্যা' গ্রন্থে (১৮৭২ খ্রীঃ) লিখেছেন—"সমগ্র ওড়িষ্যার চৈতন্য-অর্চনা বলতে গেলে পারিবারিক পুজোয় পরিণত হয়েছে। পুরীতে তাঁর নামে একটি মন্দির এবং সমগ্র প্রদেশে ছোট ছোট নানা মন্দির তাঁর পুজোর জন্য গড়ে উঠেছে। সাধারণতঃ তাঁকে বিষ্ণুর সঙ্গে একসঙ্গে পুজো করা হয়—এরকম বিষ্ণু-গৌরাঙ্গ অর্চনার মন্দির বর্তমানে পুরী শহরে আছে ৩০০টি এবং সব জেলা মিলিয়ে আছে ৫০০টি। এই মুহূর্তে চৈতন্য ওড়িষ্যার সাধারণ মানুষের কাছে এক মহান পথিকৃৎ।" "The adoration of Chaitanya has become a sort of family-worship throughout Orissa. In Puri, there is a temple specially dedicated to his name and many little shrines are scattered over the country. But he is generally adored in connection with Vishnu and of such joint temples there are at present 300 in the town of Puri and 500 in districts. At this moment Chaitanya is the apostle of the common people in Orissa."

ওড়িষ্যার 'পঞ্চসখা'—বলরাম, জগন্নাথ, অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ। অচ্যুতানন্দ পঞ্চসখার সঙ্গে চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার কথা লিখেছেন—

বৈষ্ণব মণ্ডলী খোল করতাল বজাই বোলন্তি হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ড কমণ্ডলুধারী॥
অনন্ত অচ্যুত যেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত॥

[শূন্যসংহিতা, ১ম অধ্যায়]

এই পঞ্চসখাকে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপরিকর বলে অভিহিত করে কটক রেভেনশা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গীয় আর্তবল্লভ মহান্তি লিখেছেন—"ভক্ত হৃদয়ের দুঃখ নিবারণ, পাপের উচ্ছেদসাধন ও সাধুর পরিত্রাণ ছলে ভগবান হরি 'নিজলীলা' আস্বাদনের জন্য শুদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে মানববিগ্রহ ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিজলীলা আস্বাদনে স্বীয় পরিকরবর্গের উপস্থিতি অপরিত্যাজ্য—সেই পরিকরবর্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পুণ্যভূমি উৎকলখণ্ডে যে মধুর প্রেমলীলার হিল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরবর্গ। সেই পরিকরবর্গ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা—বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা"।

বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের ভাগবত এবং অচ্যুতানন্দের হরিবংশ এবং বলরাম-জগন্নাথের গীতা অনুবাদ তৎকালীন কথ্য ওড়িআ ভাষার নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। (Balarama Das : Sahitya Akademi 1982, p. 85)।

পঞ্চসখার এই উদ্দীপিত ভূমিকার অন্তরালে আছেন শ্রীচৈতন্য। ওড়িআ চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা ঈশ্বরদাস স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছেন, চৈতন্যপ্রেরণাতেই পঞ্চসখা এইসব রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।—

'জণ জণরে শাড়ী দেই। কহন্তি চৈতন্য গোঁসাই।
পুরাণ গীতরস কর। যাহা লেখিব শাস্ত্রসার।
অবতারিক যেতে কথা। লিখন কর শাস্ত্রপোথা'।
'পঞ্চশাখা এ নীলগিরি। সেবা করন্তি দেবহরি।
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গীত প্রকাশ'।

[ঈশ্বরদাস : চৈ. ভা. ৫৪ অধ্যায়]

জগন্নাথ দাসের ওড়িআ ভাগবত পড়ার আগ্রহে নিরক্ষর মানুষ পড়াশুনা শিখেছিল। বঙ্গীয় সমালোচক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন "উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সে-ও শুনিয়া শুনিয়া ভাগবত শিখিয়াছে (ওড়িয়া সাহিত্য, পৃ. ২১)।"

অচ্যুতানন্দ সম্পর্কে ড. মায়াধর মানসিংহ লিখেছেন—"পঞ্চসখাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ এই সখা ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক। সম্ভ্রান্ত করণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি আজ কৈবর্ত ও গোপাল (গোয়ালা)-দের গোষ্ঠীগুরু ও গোষ্ঠীদেবতারূপে উড়িষ্যার সর্বত্র পূজিত। তিনি নিজের জন্মগত জাতি-অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নশ্রেনীর সেই লোকজনের মধ্যে একত্র বাস করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায়গুলিকে সে পর্যন্ত অলভ্য মন্ত্র ও শাস্ত্র অযাচিতভাবে সেই প্রথম পরিবেশন করিয়াছিলেন। সে পর্যন্ত এসব কেবল ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অচ্যুতানন্দ কৈবর্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'কৈবর্তগীতা' ও গোপালদের সামাজিক শিক্ষার নিমিত্ত 'গোপালঙ্ক ওগাল' লিখিলেন। সেকালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা ছিল অত্যন্ত বিরল।" [ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস, পৃ.১৬১]

এইভাবে পঞ্চসখার রচনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ওড়িষী সমাজে ও সাহিত্যে এল নব জাগরণ। এই জাগরণের মূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এ সম্পর্কে পঞ্চ সখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি।

শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত।
তাঙ্ক সঙ্গে চারি সখা হোইলু যে ভাত॥
[অচ্যুতানন্দঃ গুরুভক্তি গীতা, প্রথম খণ্ড ঃ৩২ ছান্দ ৩৬]

শিশু যে অচ্যুত যশোবন্ত বলরাম।
শূদ্রকুল উদ্ধারিবু আম্ভে চারিজন॥ [তদেব, ৩৩ ছান্দ ১২৮]

অচ্যুতানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন সেই করুণা ভরা প্রেরণার কথা—

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য খোলনুতা করে। শ্রীচৈতন্য লীলা কবে পদে পদে ফেরে॥
চৈতন্য করুণা, যে তুম্ভঙ্কু ছন্তি করে। বারগোপ রাহাসরে অট তুম্ভ সরে॥
[তদেব, ২য় খণ্ড, ৯ম পটল]

পঞ্চ সখা রচিত নানাগ্রন্থে চৈতন্যবন্দনা, চৈতন্যপ্রচারিত প্রেমভক্তিবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। ওড়িআ ভাষায় রচিত এই গ্রন্থগুলি—বলরাম দাসের 'বেদান্তসার গুপ্ত গীতা', 'জ্ঞান উজ্জ্বল মণি', 'জগমোহন রামায়ণ', জগন্নাথ দাসের ভাগবত, পদ্মপাদ সুধানিধি, নীলগিরিধ্যান, নিত্যনীলাদ্রিবিলাস, নিত্য গুপ্তচূড়ামনি, সুধাত্রয়ম্, বৈষ্ণব আচরণ, গুরু প্রণালী, বলধাম দাসঙ্ক গুরুপরম্পরা ও সাধনা; যশোবন্ত দাসের প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা, স্বরোদয়; অনন্তের পদ্মবনরাস, ঠুল-শূন্যরাস; এবং অচ্যুতানন্দের গুরু ভক্তি গীতা, শূন্যসংহিতা, অনাকার সংহিতা, নিত্য রাহাস, গোপালঙ্ক ওগাল ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ওড়িষ্যার সাহিত্যে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্যচরিত মোট ৫টি—১. কাহ্নাই খুন্টিআর 'মহাভাবপ্রকাশ', ২. মাধব রথের 'চৈতন্যবিলাস,' ৩. ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবত', ৪. দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' (প্রথম সাত অধ্যায়) —এগুলি ওড়িআ ভাষায় রচিত, ৫, গোবিন্দ কবির 'গৌরকৃষ্ণোদয়' কাব্য— এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

চৈতন্য প্রভাব বিদগ্ধজনের উপর যেমন পড়েছে, তেমনি পড়েছে লোকজীবনেও। নানা প্রদেশের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে, অরণ্যচারী আদিবাসী ও পাহাড়িয়া গোষ্ঠী গুলির মধ্যে পর্যন্ত তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ ভারতের 'সাতানি' সম্প্রদায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। মনীষী রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, 'আমি কানপুর প্রভৃতি দেশে চৈতন্য মতাবলম্বী হিন্দুস্থানী দেখিয়াছি' (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৭৮ খ্রীঃ)। শিশির কুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাইচরিতে' আছে, ইলোরায় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম নিয়ে খোল করতাল সহযোগে কীর্তন হতে শুনেছেন বাঙালী পর্যটক রামযাদব বাগচী। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—

"Outside the Hindu communion, Mahaprabhu's message proselytised entire non-Hindu clans by initiating them in the name of the Lord. We thus find the whole clan of Manipuria in north-eastern India becoming Vaishnavas of the school of Shree Chaitanya Mahaprabhu.

[Bengal Vaishnavism, p. 103]

নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসু জানিয়েছেন —"মহানদীর উত্তর ভাগে ঢেঙ্কানাল, পাল লহড়া এবং কেওনঝর নামে তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই তিন রাজ্যে জুয়াঙ্গ নামে এক জাতি বাস করে। পাল লহড়াতে এখন পর্যন্ত জুয়াঙ্গদের মধ্যে একটি বিচিত্র ব্রত প্রচলিত আছে। বৎসরের মধ্যে কোনো একদিন জুয়াঙ্গগণ পাতার ঠোঙায় কিছু ফল সাজাইয়া বনের মধ্যে রাখিয়া আসে। মহাপ্রভু নাকি এক সময়ে ইহাদের নিকটে ফল ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; সেই প্রাচীন ঘটনার স্মৃতি আজও জুয়াঙ্গ জাতি এইভাবে বহন করিয়া আসিতেছে" ['হিন্দু সমাজের গড়ন' প্রথম অধ্যায় ঃ পৃ. ৬]।

পরিশেষে উদ্ধার করি একালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ সান্যাল মহাশয়ের দণ্ডকারণ্য ভ্রমণকালে পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর উপর চৈতন্য প্রভাব আবিষ্কার-কাহিনী—

"শীলবংশী রাজাদের রাজধানী নন্দপুর ছিল শীলানদীর ধারে। নন্দপুর আজও আছে। জয়পুর থেকে বাসে করে যাওয়া যায়। যাঁরা দণ্ডকারণ্য দেখতে আসেন তাঁরা অবশ্য কেউই নন্দপুরে যাননা।—আজ সেখানে কিছুই নেই। কিন্তু মৎস্যতীর্থে আজও যায় যাত্রিদল। তীর্থযাত্রী নয়, এক্সকাস নের মোহে পড়া পর্যটক। জয়পুরের প'য়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন কালের মৎস্যকুণ্ডে গড়ে উঠেছে এক জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা। মৎস্যকুণ্ড নয়, 'মাচকুন্দ হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট'। বিজলীবাতির শতনরী গলায় আধুনিকা 'মাচকুন্দ' ড্যাম দেখতে আসে সুবেশ তরুণ-তরুণীর দল। তারা জানে না যেখানে শতরঞ্জি বিছিয়ে দু দণ্ড হই হল্লা করে গেল, হয়তো ঠিক সেইখানেই একদিন নাম সংকীর্তনের আসর জমিয়ে বসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব!

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চলেছেন নীলাচলম্ তীর্থ থেকে বৃন্দাবনের দিকে। পথে গোদাবরী তীরে বিদ্যাপুর। সেখানকার শাসনকর্তা রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে চরিতামৃতে। নীলাচলম্ থেকে বিদ্যাপুরে যাবার পথে পড়ে গভীর এক অরণ্যপর্বত। তখন তার নাম ছিল মল্লিকা-মর্দন গিরি। সুগযুগান্তরের

উচ্চারণ বিকৃতিতে আজ যা নাকি মালকানগিরি। সুতরাং হয়তো মহাপ্রভুকে এই দুর্ভেদ্য অরণ্যপর্বতের পথেই যেতে হয়েছিল বৃন্দাবনে এ কথা মনে করার বিশেষ কারণ আছে। ভ্রমণের এই পর্যায়ে মহাপ্রভুর মৎস্যকুণ্ড দর্শনের কথা আছে। অবশ্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন— এই মৎস্যকুণ্ড ছিল অধুনা ফরাসী কবলমুক্ত মাহেতে। অর্থাৎ মালাবার উপকূলে। দুপক্ষই অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন যে, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের তীর্থগুলি যে পর্যায়ক্রমে দর্শন করেন সেই পর্যায়ক্রমে তিনি ভ্রমণকাহিনী লিখতে পারেন নি। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের মতো শ্রীচৈতন্যের পদরজোধন্য কিনা এ আরণ্যকভূমি, সেটা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

আমার কেমন যেন মনে হয় মহাপ্রভু দণ্ডকারণ্যের এই দক্ষিণাঞ্চল দিয়েই গিয়েছিলেন বৃন্দাবনের পথে! আমার অনুমানের সপক্ষে একটিমাত্র যুক্তি আমি দাখিল করছি। ভাষাবিদেরা হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

মালকানগিরি অঞ্চলে দুর্গম পাহাড়ের মাথায় বাস করে অদ্ভুত এক আদিবাসী জাত। তাদের নাম বোণ্ডো। সমস্ত দণ্ডকারণ্যে যতগুলি আদিবাসী জাত আছে তার মধ্যে তিনটির প্রকৃতি একেবারে আদিম। সভ্যজগতের সঙ্গে এই তিনটি জাতির সংস্পর্শ সবচেয়ে কম। আবুজমাড় পাহাড়ের মাথায় বাস করে আবুজমাড়িয়া; গঞ্জাম জেলার কাছাকাছি থাকে শবর, আর মালকানগিরি অঞ্চলে আছে বোণ্ডোরা। মুরিয়া, পরজা, ভাত্রা, কয়া, ভোরলাদের তুলনায় এই তিনটি জাত অনেক বেশী অসভ্য। জয়পুর থেকে মালকানগিরি যাওয়ার পথে পড়ে একটা গণ্ডগ্রাম— গোবিন্দ-পল্লী। সেখান থেকে একটা বন্য সড়ক চলে গেছে দক্ষিণমুখো। এ পথে পড়বে একটি ছোট্ট গ্রাম মুণ্ডাগুডা। বোণ্ডোদের যদি দেখতে চান তাহ'লে এই মুণ্ডাগুডা থেকে আপনাকে পাহাড়ে চড়তে হবে। দুর্গম পাহাড় পেরিয়ে আপনি পৌঁছবেন বোণ্ডোগ্রামে। খাদ্যপানীয় কিছুই সেখানে আশা করবেন না- আপনাকে তাই হাতে করে নিয়ে যেতে হবে টিফিন-ক্যারিয়ার, জলের বোতল আর প্রাণ। যে কোন মুহূর্তে ওরা তীর ছুঁড়ে বসতে পারে। অতি অল্পেতেই ওরা চটে যায়। ওদের মেয়েরা মাথার চুল কামিয়ে ফেলে। ঊর্ধাঙ্গে কোন আবরণ দেয় না। অগুণীত হার, বালা, চুড়িতে প্রত্যেকটি মেয়ে যেন জুয়েলারী দোকানের চলমান শো-কেস। পুরুষেরা নেংটিসার। যে শিব আর শক্তি সারা ভারতে নাক গলিয়ে ঢুকে পড়েছেন, তাঁরাও চড়তে পারেননি ঐ পাহাড়ের মাথায়। ওদের যে লিখিত বর্ণমালা নেই সে কথা বলাই বাহুল্য—ওদের কথ্যভাষাও সম্পূর্ণ অবোধ্য। তার মধ্যে তামিল-তেলেগু অথবা সংস্কৃত তৎসম বা তৎভব শব্দের ছিটেফোঁটাও নাই। ওদের বিবাহ হয়, পিতৃকুল সমাজ। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর 'কুনয়', স্বামী হচ্ছে 'আম্পর'। ছেলের প্রতিশব্দ 'অন', দাদা—'মাণ্ড, ; এমন কি সম্পর্ক 'মা'—যার অভিধা প্রায় সারা বিশ্বে 'ম' অক্ষর যুক্ত তাকে বলে 'য়ুং'। এহেন বোণ্ডো ভাষাতে দুটি শব্দের সন্ধান পেয়েছি যা আমাকে নিঃসন্দেহে বিচলিত করেছে।

ঈশ্বর বা ভগবানের একটা ধারণা ওরা করতে পেরেছে। যদিচ তাঁর সত্তার যে

ধারণা ওরা করেছে তার সঙ্গে ব্রহ্মা, আল্লা বা গডের কোন সাদৃশ্য নেই—তবু তিনিই ওদের অধিদেবতা। সেই অজানা জগৎনিয়ন্তাকে ওরা যে শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছে সে শব্দটা হল 'মহাপ্রভু'। আশ্চর্য নয়?

এ ছাড়া ওদের সামাজিক রীতিতে পাতানো বন্ধুত্বের মূল্য খুব বেশী। আমাদের দেশে ছোট মেয়েরা যেমন সই পাতায়। ওদের দেশে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তেমনি সই পাতায়। এই বন্ধুত্ববরণ একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আমাদের ধর্মে পোষ্যপুত্র নেবার মতো। প্রতিজ্ঞাবন্ধ বন্ধুর সঙ্গে আপন ভাইয়ের বিবাদ হলে ওরা বন্ধুর পক্ষ নিয়ে লড়ে। সই পাতালে একটু নামকরণ করতে হয়। একজন অপরজনের গঙ্গাজল, চোখের বালি কিংবা মহেন্দ্রের ভাগায় চুরুটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি জাতীয় একটা কিছু হয়। ছেলেবেলায় পড়েছি ত্রৈলোক্যনাথের মশা কঙ্কাবতীর সঙ্গে 'পচাজল'ও পাতিয়েছিল। বোণ্ডারা এই ধরনের আমৃত্যু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে একজন হয় আর একজনের 'মহাপ্রসাদ'।

আমি অবাক হয়ে ভেবেছি যারা দিদিকে ডাকে 'মিঙ', বোনকে ডাকে 'কু', জ্যেঠা যাদের 'বুমান', শ্বশুর 'আঙকুই'—তারা জগৎনিয়ন্তাকে 'মহাপ্রভু' নামে ডাকে কেমন করে? কে তাদের শিখিয়েছে ঈশ্বরের এ অভিধা! আর যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের মর্যাদা আমৃত্যু মাথায় করে রাখতে হয় তাকেই বা কেন বলে 'মহাপ্রসাদ'? বলা বাহুল্য, 'প্রসাদ' আর 'প্রভু' শব্দ দুটির ব্যবহার ওদের ভাষায় নেই; আর 'মহা' কোন উপসর্গই নয় ওদের কথ্য ভাষায়।

তাই আমার বিশ্বাস করতে মন চেয়েছে যে, শুধু শ্রীরামচন্দ্রই নন, প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিও পড়েছিল এই দণ্ডকারণ্যের প্রত্যন্ত দেশে।"

[দণ্ডক-শবরী (প্রথম পর্ব): নারায়ণ সান্যাল পৃ. ২৫-২৭ প্রথম সংস্করণ ১৯৬২]
ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলার এই মৎস্যতীর্থে বা মাচকুন্দে যে মহাপ্রভু এসেছিলেন সে বিষয়ে কোরাপুট জেলা গেজেটিয়ারের সাক্ষ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সমগ্র ভারত ব্যাপী চৈতন্য প্রভাবের এই রূপরেখায় লক্ষ্য করা যায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাহিত্যরচনায় বিদগ্ধ রসিকজনদের যেমন তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সমাজক্ষেত্রে তেমনই তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাকে দেখেছিলেন তাঁদের মুক্তি-দাতারূপে নববৈষ্ণব ধর্মে ও সমাজে বর্ণাশ্রমী ব্যভিচার না থাকায় স্বাধীন ধর্মজীবন যাপন করতে পেরে মানবিক মূল্যবোধে তাঁরা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন; প্রেমভক্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদ রইল না বাংলায় প্রবাদ 'জাত হারিয়ে বোষ্টুম', ওড়িষ্যায় বলে, 'ছয় জাতি ছত্রিশ গোলা, বৈষ্ণব হেলা ত সবু গলা'); অসবর্ণবিবাহে বিধবা বিবাহে কোন বাধা রইল না, হিন্দু বিবাহের ব্যয়বাহুল্য বর্জিত হল 'কণ্ঠিবদলে,' 'শূদ্র' গুরুর 'ব্রাহ্মণ' শিষ্য হল এবং মাতৃভাষায় ভক্তিগ্রন্থ পাঠের সুযোগের ফলে নিরক্ষরতা দূর হল, ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুদের ও পুরোহিতদের প্রাধান্য খর্ব হল।

ফলতঃ রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে চৈতন্যপন্থীদের সংঘাত ছিল অনিবার্য।

চৈতন্যোত্তর ওড়িষ্যায় এই সংঘাত ও তার পরিণতি সম্পর্কে প্রভাত মুখোপাধ্যায় উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক) লিখেছেন—

"শ্যামানন্দের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত শূদ্র সমাজে চৈতন্য ধর্ম প্রসারিত হলো ও ব্রাহ্মণের গুরু শূদ্র হলেন। গোঁড়া ওড়িয়া ব্রাহ্মণেরা চৈতন্য সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর জেলার বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য পূজিত হন। ব্রাহ্মণেরা রাধাকৃষ্ণ পূজা করেন কিন্তু প্রত্যেক জাতের অব্রাহ্মণ পুরোহিত চৈতন্য পূজা করে থাকেন। তাঁদের 'অধিকারী' বলা হয়। নিম্নবর্ণ কণ্ড্রাদেরও অধিকারী আছেন। কণ্ড্রা বৈষ্ণবদের বালেশ্বর জেলায় 'শালন্দী' বৈষ্ণব বলা হয়। কটক জেলার আরেক, 'নিম্নবর্ণ' 'পানো' দের মধ্যে চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা যায়"।

[ওড়িষ্যায় চৈতন্য ধর্মের প্রসার ঃ শ্রীচৈতন্যাষ্টক, পৃ.৮৭]

দক্ষিণ ভারতে চৈতন্যপন্থী 'সাতানিরাও পরবর্তীকালে হয়েছেন 'অব্রাহ্মণ' বৈষ্ণবদের কুলপুরোহিত এবং কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের গুরু। —"The 'Satanis' are family priests to non-Brahman Vaishnavas, gurus to several of the cultivating castes "

[Madras District Gazetteers : Vizagapatanam 1907, Chap III.]

নব বৈষ্ণব সমাজে পরবর্তীকালে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, 'ব্রাহ্মণ' বৈষ্ণবেরা 'শূদ্র' বৈষ্ণবদের থেকে আবার পূজো আদায় করেছেন, হিন্দু সমাজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার ভূত বৈষ্ণব সমাজকে পেয়ে বসেছে। এই অবক্ষয়ের দিনে চৈতন্য প্রেরণা এখনও কাজ করে চলেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে—পূর্বভারতের মণিপুরীরা, দক্ষিণ ভারতের সাতানি ও দাসারিরা দাস গায়ক) ওড়িষ্যার বোণ্ডোকণ্ড্রাপানো তাঁতি পাল লহড়ার জুয়াঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষেরা- এঁরা সেই সাধারণ মানুষ। চৈতন্য প্রেরণার পরিনির্বাণ এঁদের মানবিক মূল্যবোধে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্য সন্ন্যাসের পরবর্তী ভারতীয় প্রেক্ষাপট

শ্রীচৈতন্য জীবনের এক পর্ব শেষ হল গয়া থেকে ফিরে এসে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর, বাংলা পৌষ মাসের সমাপ্তি পর্যন্ত কীর্তন-নর্তনে। আরেক পর্বের সূচনা হল ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ১৫১০ থেকে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ—এই হল তাঁর জীবন পরার্ধের ব্যাপ্তিকাল। এই সময়কার সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা থাকলে শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কালনির্ণয় ও অন্যান্য দিকগুলি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কোন্ ঘটনা সম্ভব, কোন্ ঘটনা অসম্ভব—সে বিচার ঐতিহাসিক পটভূমি জানা না থাকলে করা সম্ভব নয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা চৈতন্য সমকালীন (সন্ন্যাসোত্তর কালে) ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারাটি বুঝে নেবার চেষ্টা করব। ১৫১০ থেকে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত কাল-সীমায় বাংলা, আসাম, ওড়িষ্যা, বিজয়নগর, পর্তুগীজ অধিকৃত এলাকা এবং দিল্লীর রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

বাংলা বা গৌড়

এই পর্বে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫৩২ খ্রীঃ)। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ)। বিশ্বভারতীর রীডার শ্রীযুক্ত N. B. Roy লিখেছেন,—"আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকাল মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। একটানা ছাব্বিশ বছরের রাজত্বকালে হুসেন শাহ তাঁর উদারনীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা ও সামরিক অভিযানের দৌলতে রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হন। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, দেশের পূর্ব সীমানার মোঙ্গোলীয়দের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িষ্যার গজপতি রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান—রাজ্যের মানুষের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করল; সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

সিংহাসনারোহণের পর হুসেন শাহ দিল্লীর সুলতান ও জৌনপুরের সুলতানের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। এই সব যুদ্ধের ফলে জৌনপুরের শর্কী সুলতান কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং একমাত্র বিহারে তাঁর প্রভুত্ব বজায় থাকে। এই অবস্থায় ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী শর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করলে শর্কী সুলতান বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন হুসেন শাহ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিকন্দর লোদীর আফগান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সেনাদল প্রেরণ করলেন। পাটনার প্রায় ৩০ মাইল পূর্বে 'বড়্'-এর রণক্ষেত্রে দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হল। সুলতান সিকন্দর লোদীর বাহিনী বাংলার সেনাবাহিনীর প্রতিরোধে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হল এবং সিকন্দর লোদী

উভয় পক্ষের স্থিতাবস্থা বজায় রেখে বন্ধুত্বপূর্ণ শান্তি ও অনাক্রমণ চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। এই চুক্তি অনুসারে 'বড়'-এর পশ্চিমের এলাকা সুলতান সিকন্দরের দখলে চলে গেল এবং মুঙ্গের ও, দক্ষিণ বিহার সমেত 'বড়'-এর পূবের এলাকা সুলতান আলাউদ্দীন হুসেনের দখলে রয়ে গেল।······বিহারের একটা বড় অংশে আধিপত্য বিস্তার এবং শর্কী রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের সেনারা দলে দলে চলে আসার ফলে বাংলার সুলতানিতে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হল। পূব সীমান্তে কামতা-কামরূপ রাজ্য এবার সুলতান হুসেন শাহের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল। কামতারাজ নীলাম্বরের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীর মতান্তর হলে মন্ত্রী মশাই গৌড় দরবারে চলে আসেন এবং সুলতানকে তাঁর প্রাক্তন প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। হুসেন শাহ রাজী হয়ে গেলেন। জনপ্রবাদ অনুসারে হুসেন শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজী এই যুদ্ধে কামতা রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েন। রাজধানী সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু মুসলমান বাহিনী সুকৌশলে রাজধানীতে প্রবেশ করলে রাজা নীলাম্বর বন্দী হন। বিজয়ী বাহিনী লুণ্ঠন শুরু করে। এরপর মুসলমান বাহিনী আরও ভিতরে অগ্রসর হয় এবং কামরূপ জেলার হাজো পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য স্থায়ীভাবে দখল করে নেয় (the whole kingdom as far as Hajo in the Kamrup district was permanently annexed)। সমগ্র অভিযানটি চলেছিল মোটামুটি ১৪৯৯ থেকে ১৫০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়েই মালদার উৎকীর্ণ লিপিতে সুলতান হুসেন শাহের এই বিরাট ভূখণ্ড জয়ের সংবাদ জানানো হয় (The whole operation lasted presumably from A.D. 1499 to 1502 when the conquest of this large stretch of territory was publicly recorded by Sultan Hussain in an inscription at Malada)।[১]

"কামতা কামরূপ অভিযানের পর সুলতান দৃষ্টি ফেরালেন জাজনগর ওড়িশ্যার দিকে। তখন ওড়িষ্যায় সীমান্ত প্রসারিত ছিল সরস্বতী নদী পর্যন্ত—সমগ্র মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ ওড়িষ্যার অন্তর্গত। গজপতি কপিলেন্দ্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারী প্রতাপরুদ্র উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। এঁদের সেনাবাহিনী ছিল শত্রুপক্ষের ভয়ের কারণ। সরস্বতী নদী বরাবর দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে (এখন মজে গেলেও তখনকার দিনে সরস্বতী ছিল পূর্ণসলিলা) তাদের উপদ্রব লেগেই থাকত। জগন্নাথ মন্দিরের নথি মাদলাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৮-৯ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ ইসমাইল গাজী

---

১. এই অভিযানের কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর *Moghaul Northern East Forntier Policy* গ্রন্থে লিখেছেন : "The Khens ruled for seventy five years and their last representative Nilambara was overthrown and his Kingdom was destroyed by Sultan Alauddin Hussain Saha at about the end of the fifteenth century" (p. 51). ধ্রুবজ্যোতির ড. অজয়কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন,—"In the silver coins of Hussain Saha, we find about the victory of Kamata, Kamarup etc. in 899-919 Hizri Era equivalent tc 1493 A.D. This event was also inscribed in the mosque of KATADUAR in the district of Rangpur." (*Literature in Kamata-Koch-Raj-Darbar*. p. 23).

আরামবাগ জেলার গড় মন্দারণ থেকে বেরিয়ে জাজপুর-কটক জয় করে ঝড়ের বেগে পুরীতে পৌঁছে যান এবং প্রচুর হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। জাজনগর-ওড়িষ্যার নামে মুদ্রা নির্মাণ করে এই বিজয় উৎসব পালিত হয়। মুসলমান বাহিনীর এই আকস্মিক আক্রমণের খবর পেয়ে গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর দক্ষিণ অভিযান থেকে ফিরে মুসলমান বাহিনীকে আরামবাগের নিকট মন্দারণ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে এলেন। ওড়িষ্যা বাহিনী মন্দারণ দুর্গ অবরোধ করল কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় তারা দুর্গ দখল করতে পারল না। সুলতান হুসেনের সেনাবাহিনী অবশ্য দ্রুত ওড়িষ্যা থেকে সরে আসে। বর্ধিত শক্তি ও সম্পদ নিয়েও বাংলা-ওড়িষ্যা সীমান্তে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখা সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৫০৯ সালে শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ থেকে ওড়িষ্যায় যাবার পর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় বাংলা-ওড়িষ্যা সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ সব সময় লেগেই থাকত। হুসেন শাহের রাজত্বকালে এ বিবাদ শেষ হয় নি। চার বছর পরে পুরী থেকে ফেরার পথেও শ্রীচৈতন্য দেখেছিলেন সীমান্তে আগের মত অশান্তি লেগে আছে।[১] মনে হয়, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন হুসেন শাহ।

১৫১৩ খ্রীস্টাব্দের সোনার গাঁও লিপিতে খবস খানকে ত্রিপুরার সর্-ই-লস্কর (সেনাপতি) এবং মুয়াজ্জমাবাদের উজীর রূপে উল্লেখ করায় অনেকে মনে করেন, হুসেন শাহের সেনাবাহিনী ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করে নিয়েছিল এবং ত্রিপুরাস্থিত মুসলমান সেনার অধিনায়ক হিসাবেই খবস খান ঐ খেতাব লাভ করেন।

হুসেন শাহ আরাকানের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। আরাকানীরা নিজেদের স্বার্থেই সুলতান হুসেনের সঙ্গে ত্রিপুরার এই যুদ্ধের শেষ পর্বে ত্রিপুরার রাজা ধন্য মানিক্যের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁরা বাঙালী রাজপুরুষদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। এইভাবে ত্রিপুরাযুদ্ধের সঙ্গে

---

১. ড. বিমান বিহারী মজুমদার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে (চৈতন্য চরিতের উপাদান, ২০পৃ:) অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। সুতরাং ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্য পুরী যাত্রা করেন। কবি কর্ণপুর তাঁর 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে এই পথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, গৌড়াধিপতি যবন রাজা ও প্রতাপরুদ্রের উভয় পক্ষীয় ভয়ঙ্কর সৈন্যদের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু গমন করেছেন, কখনও রাজপথ উল্লঙ্ঘন করে বনপথে প্রস্থান করেছেন—'হন্ত ইদানীং গৌড়াধিপতের্যবন ভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ত্ততে কথময়ং চতুর্ভিরেব পরিজনৈঃ সহ গচ্ছতি।...দৈবাজ্জ্যোস্মিন্ পথি বিকটয়োঃ সেনয়োরেব মধ্যে নিষ্পত্যাহ, কস্য চারিতো বন্ধুভিঃ পঞ্চষৈঃ সঃ।।' (অঙ্ক ৬)

কর্ণপুর তাঁর নাটকের নবম অঙ্কে জানিয়েছেন—সে সময় ওড়িষ্যা থেকে গৌড়রাষ্ট্রে প্রবেশের তিনটি পথ ছিল—দুটি স্থলপথ, একটি জলপথ। নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর গৌড়ে প্রত্যাবর্তন কালে স্থলপথ দুটি রুদ্ধ ছিল—'গৌড় সীম্নি প্রবেষ্টুং ত্রয়ঃ পন্থানঃ, দ্বয়ং রুদ্ধং একস্তু জলদুর্গঃ।' অগত্যা মহাপ্রভুকে জলপথেই উড়িষ্যা থেকে গৌড়ে ফিরতে হয়েছিল। তার জন্য উভয় সামরিক বীর মধ্যে কথাবার্তা চালাতে হয়েছিল। যবন সামরিক বা নতুন নৌকার ব্যবস্থা করে জলদস্যুদের উৎপাত প্রতিহত করার জন্য নিজে আরেকখানি নৌকায় আগে আগে গিয়ে মন্ত্রেশ্বর নদীর পারে পিচ্ছলদা (বর্তমান পিছল্দা) গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন—'জলচরদস্যুভয় নিবারণ য স্বয়মগ্রেসরো ভূত্বা মন্ত্রেশ্বর মুত্তীর্য পিচ্ছলদাগ্রাম পর্যন্তমাগতবান্।' মহাপ্রভুর এই প্রত্যাবর্তন হয় ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে (চৈ. চ. উ ২০ পৃঃ)।

আরাকান যুদ্ধ একযোগে চালাতে হয়। এই যুদ্ধের ভার দেওয়া হয় পরাগল খাঁকে। পরাগল ফেনী নদীর তীরে তাঁর শিবির থেকে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধ চলে মোটামুটি ১৫১৩ থেকে ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। পরাগলের পর তাঁর পুত্র ছুটি খান আরকানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আরকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেন।

আরাকান অভিযানই সম্ভবতঃ হুসেন শাহের রাজত্বকালে শেষ সামরিক অভিযান, কেননা ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে হুসেন শাহ মারা যান।

সুলতান হুসেনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ)। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি পূর্ব সীমান্তে লড়াই চালালেন এবং ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহোমরাজ্য আক্রমণ করলেন। অবশ্য এই যুদ্ধে অহোমরা সর্বত্র তাঁকে পরাজিত করেন, মুসলমান ফৌজকে তাঁরা বুরাই নদী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। অহোম বুরঞ্জী অনুসারে ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে অহোমগণ পাল্টা আক্রমণ করেন এবং ব্রহ্মপুত্র বরাবর মুসলমানদের প্রধান শিবির হাজোর দিকে অগ্রসর হন। তেমোনির (ত্রিমোহনীর) নৌযুদ্ধে বাঙালী সেনারা প্রথম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, কিন্তু সে ধাক্কা সামলে উঠে তারা বিৎ মালিকের নেতৃত্বে সিঙ্গিরিতে অহোম ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে বিৎ মালিক পরাজিত ও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে আত্মীয়ের হাতে নসরৎ শাহের মৃত্যু হলে সামরিক অভিযানের দায়িত্ব নিয়ে তুরবক্ সিঙ্গিরি ও সালায় অহোমদের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। কিন্তু অহোমগণ শিবসাগর জেলায় ডিকরাই নদীর তীরে এবং তেজপুর জেলার ভরালি নদীর তীরে দুটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তুরবককে হারিয়ে দেন। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর গৌড়ে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার ফলে আসাম ও কামতার উপর সুলতানী দখল নষ্ট হয় এবং পরবর্তী প্রায় দেড়শ বছর গৌড়ের দিক থেকে এই দুটি রাজ্যের শান্তি আর ব্যাহত হয় নি।

কামতা কোচ রাজ্য

ড অজয়কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন "তবাকত্-ই-নাসিরি থেকে জানা যায় ১২০৫ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী অভিযানের সময় এই অঞ্চলে কোচ-মেক-থারু গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করত। কোচ সর্দারেরা ভরলি নদী থেকে তিস্তা করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় রাজত্ব করত। দিনাজপুর জেলাও তাদের অধিকারে ছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকেই খেন বংশীয় নীলধ্বজ কামতাপুরে রাজ্য গড়ে তোলেন। খেন বংশের পর কোচবংশীয় বিশ্বসিংহ গোয়ালপাড়ার উত্তর-পূর্ব এলাকায় শক্তি বৃদ্ধি করে কামতার অধিপতি হন এবং 'কামতেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। বিশ্বসিংহের পর তাঁর পুত্র নরসিংহ রাজা হন। নরসিংহকে সরিয়ে তাঁর অনুজ নরনারায়ণ রাজা হন এবং কনিষ্ঠ চিলা রায় (শুক্লধ্বজ)-এর রণকুশলতার সাহায্যে বিরাট রাজ্যের মালিক হন। ১৫৩৩ থেকে ১৫৮৭খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নরনারায়ণ রাজত্ব করেন।"[১]

[Literature in Kamata-Koch-Raj Darbar, pp 16-17]

---

১. আসামের গুণাভিরাম বড়ুয়া এবং আসামের ইতিহাস রচয়িতা রবিন্সনের মতে নরনারায়ণ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসমীয়া সাহিত্যে বলা হয়েছে নরনারায়ণের রাজত্ব-কালের সূচনায় 'চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূটে আসিলা'। হেমচন্দ্র দেবগোস্বামী

উড়িষ্যা

গজপতি প্রতাপরুদ্র ১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। উড়িষ্যার উত্তর সীমান্তে হুসেন শাহের ফৌজ যখন শাহ ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে আক্রমণ চালায়, সেই ১৫০৮-৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন। ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন—প্রতাপরুদ্র ১৪৯৬ থেকে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন (*A History of South India*, p. 261)। তিনি লিখেছেন—"At the time of Krishnadeva's succession (1509), Prataprudra was openly hostile and aggressive" (*Ibid.*, p. 268). অশোককুমার মজুমদার লিখেছেন —"However after the accession of Krishnadevaraya of Vijaynagar (A. D. 1509) Prataprudra again proceeded to the South, presumably to adopt defensive measures, and stayed there at best up to October, 1510." [*The Delhi Sultanate*, p. 368]

১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় গজপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দেড় বছর অবরোধের পর তিনি উদয়গিরি দুর্গ জয় করেন ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে। [নীলকান্ত শাস্ত্রী, পৃ. ২৭০ ; *Delhi Sultanate*, পৃ. ৩৬৮]

মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখের প্রথমে) ভারততীর্থ পরিক্রমায় বার হন পুরী থেকে। 'দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল'—(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য / ১৬ পরিচ্ছেদ / ৮৪)। মহাপ্রভু পুরীতে ফিরে আসেন ৩রা মাঘ ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ (১৪৩৩ শকাব্দ)—'মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়' [গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পৃ. ২১৯, ১ম সংস্করণ]।

সুতরাং ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী (মাঘ) থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাস সময়ের মধ্যে প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন।

এ সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্য কবি ডিণ্ডিম বিরচিত 'ভক্তিভাগবত মহাকাব্যম্'-এর প্রশস্তি অংশে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০১-০৬ খ্রীস্টাব্দের 'সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সন্ধান সংক্রান্ত রিপোর্টে'র ১৪-১৬ পৃষ্ঠায় এই প্রশস্তির ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত হল :—

(26) Purusottama at the end being addicted to the enjoyments

জানিয়েছেন, কামরূপের "হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এক জনশ্রুতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২২, সংখ্যা ৪)।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক N. B. Roy লিখেছেন, সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজীর নেতৃত্বে গৌড়ের সেনাবাহিনী কামতা রাজ্য আক্রমণ করে এবং 'the whole Kingdom as far as Hajo in the Kamrup district was permanently annexed'। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। সুতরাং ১৫২৮-২৯ সালে চৈতন্যের হাজো আসা অসম্ভব। গৌড় সুলতানের অধিকৃত এলাকায় তাঁর আসার কোন বাধাই ছিল না।

in Heaven, his son Rudra became a Kalpataru. He was then seventeen years of age, his beauty was like that of god of love, and he became the worthy husband of the earth.

(27) While his hair was still wet with the bath of coronation he defeated the Sultan of Gauda, a conqueror in many battles,…

(28) The king with long arms weakened his enemies and increased his dominions, purified his inner souls by the theory of of non-duality, but spread the dual doctrine at the incarnation of Krisna (Caitanya).

(29 His spiritual guide was Jivadeva Kavidindima…

(30) When that king engaged in the conquest of Karnata, was living at Venkatadri, the ready poet Jivadeva composed this poem full of devotion to the 'hero of the world'.

(31) In the seventeenth year of the king's reign, when the poet was just entering his 35th year, living on the banks of Godavari, he composed this great poem in the month of Magha.

জীবদেব এ কথাগুলি লিখেছেন প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে অর্থাৎ (১৪৯৬ খ্রীঃ + ১৭ বছর) ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে।

জীবদেব ২৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে লিখেছেন, 'রাজা অদ্বৈতবাদে তাঁর অন্তরাত্মাকে পবিত্র করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ (চৈতন্য) অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করলেন'।

আগেই দেখেছি ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথমেই কর্ণাটেশ্বর কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এখানে জীবদেবও বলছেন ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে প্রতাপরুদ্র কর্ণাট অভিযানে রত এবং বেঙ্কটাদ্রিতে রয়েছেন। এর আগেই তা হলে প্রতাপরুদ্র 'কৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বৈতবাদ প্রচার করেন'।

এতে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই সমর্থিত হল। অর্থাৎ ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে নভেম্বরের মধ্যে 'প্রতাপরুদ্র সংত্রাণ' সমাধা হয়। করচার তথ্য অনুসারে শ্রীচৈতন্য পুরী প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর আশ্রয় নেন।

১৫১৩ থেকে যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে থাকে। কলিঙ্গ যুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে উদয়গিরি দখল করলেন এবং ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে জয় করলেন গুন্টুর জেলার কোণ্ডবীডু। তিনি প্রতাপরুদ্র-তনয় বীরভদ্রকে বন্দী করলেন এবং সীমহাচলম্ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। প্রতাপরুদ্র সন্ধি প্রার্থনা করে কৃষ্ণদেবকে নিজের কন্যা দান করলেন (১৫১৬ খ্রীঃ)। কৃষ্ণদেব সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করে কৃষ্ণানদীর উত্তরে অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল প্রতাপরুদ্রকে ফিরিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের একটি লিপিতে দেখা যায় গজপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্র ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রের যৌথ নির্দেশে কৃষ্ণদেবের প্রাপ্য বিবাহের যৌতুকাদি তাঁর লিঙ্গদহলিস্থিত প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন—

… ."Dravila Mandaleshvara Gajapati Pratapa Rudra Maha-

raya's son Virabhadra Maharaya who in 1516 (the year of the record), on being directed by Krishna Raya and Pratapa Rudra Maharaya, remitted the marriage dues payable to his palace in the lingadhalli country". (*Mysore State Gazetteer*, Chitradurga District, p. 50-51)

১৫১৬-র পর থেকে ১৫২৯-এ কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় ছিল। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের একটি লিপিতে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রদেব যুগ্মদাতারূপে উল্লেখিত হয়েছেন। রাও সাহেব হরেকৃষ্ণ শাস্ত্রী *Madras Epigraphical Report* (1192-13)-এর ৫৮ অনুচ্ছেদে লিখেছেন—"In my report for 1908-09, p. 118, paragraph 70, reference was made to an inscription of Saka 1448 from Undavilli in which Krishnaraya and Virarudra Pratapadeva Gajapati appeared as donors, simultaneously."

ড. বিমানবিহারী মজুমদার হিসাব করে দেখিয়েছেন (চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ২০) ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০-১২ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভু পুরী থেকে ভারত পর্যটনে বার হয়ে আবার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরও কি তিনি দক্ষিণে গিয়েছিলেন?

গোদাবরী বা কূর্মক্ষেত্রে মহাপ্রভু যে একাধিকবার গিয়েছিলেন চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থেই তার প্রমাণ আছে। কবিকর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, দ্বিতীয় ক্ষণ প্রত্যাগত চৈতন্যদেব স্নানযাত্রার সময় (স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রার মধ্যবর্তী সময়ে জগন্নাথ গূঢ়ভাবে থাকেন) জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে 'বভূব দুঃখা কৃতবাষ্প মোক্ষঃ' (১৩/৫৭) এবং তিনি পুনরায় গোদাবরী তীরে গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন।

'প্রভুস্তথা তেন পথৈব গোদাবরীং বরীয়ান্ প্রযযৌ কৃপালুঃ।
তেনৈব সার্ধং প্রিয় ভাষণেন নিনায় মাসাংশ্চতুরোহপরাংশ্চ ॥ ৬০
হেমন্ত কালেহথ তথৈব তেন সমং সমন্তাৎ করুণাং বিতন্বন্।
সমাযযৌ ক্ষেত্রবরং কয়ান্ জানাতু বক্তৃমীশ্বরং চরিতং' ॥ ৬১/ত্রয়োদশ সর্গ।

"প্রভুবর গৌরচন্দ্র এদিকে সেই পথেই গোদাবরীতে গমন করিয়া সেই রামানন্দের সহিত প্রিয়কথায় চারিমাস এবং আরও কয়েকমাস যাপন করিলেন। ৬০ অনন্তর হেমন্ত কালে প্রভুবর করুণা-বিস্তার করিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বিচিত্র চরিত্র জানিতে সক্ষম হইতে পারে?" ৬১

[রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত]

এ প্রসঙ্গে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"কবিকর্ণপুরের পরবর্তী অন্যান্য লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয়বার রামানন্দ-মিলনের জন্য যাতায়াতের কথা না লিখিলেও এ সম্বন্ধে শিবানন্দ সেনের পুত্রের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না"।

(শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ১৮-১৯)

কিন্তু এরপরও চৈতন্যদেব দক্ষিণে গিয়েছিলেন কিনা, তাও বিবেচ্য। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (তীর্থ-২) আছে—

দবির খাশে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র। মথুরা দেখিআ তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥ ২৬
শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি মধ্যে মহারণ্য। দ্রাবিড় ডাহিনে থুঞা চলিলা চৈতন্য ॥ ২৭

১৫১৫-র সেপ্টেম্বরে ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাত্রা, ১৫১৬-র মে মাসে নীলাচল প্রত্যাবর্তন (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ২০)—এরপর কোন একবারের দক্ষিণ-যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের তথ্যের প্রামাণিকতা অনেকে স্বীকার করেন না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণও আছে। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের ৭ম অঙ্কের দৃশ্যে দেখা যায় কর্ণাটপতির অমাত্য মল্লভট্ট প্রতাপরুদ্রের কাছে এসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন—আপনার মত সুহৃদ যার, তাঁর সতত কুশল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর অধিক কুশল—'কিন্তু সাম্প্রতমধিকমপি'।

রাজা বলেছেন, 'সে কি রকম ?'

মল্লভট্ট বলেছেন—

'এতস্মাজ্জনপদাৎ স তীর্থযাত্রাব্যাজেন দ্রুত কনকদ্যুতির্যতীন্দ্রঃ।
কোহপ্যেকা যদবধি হন্ত হন্ত দক্ষিণাশাং সংপ্রাপ্তস্তদবধি সোহপি নির্বৃতাত্মা ॥

এবং লোকমুখে সেই 'কনকদ্যুতি যতীন্দ্রে'র কথা শুনে কর্ণাটপতি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের পাঠিয়েছিলেন তাঁর চরিত্র অবগত হতে ('চরিতমবগন্তুং'); সেতুবন্ধ থেকে তারা ফিরে আসার পর তাদের মুখে তাঁর অলৌকিক চরিতকথা জেনে তিনি ভবদহন-জ্বালা বিস্মৃত হয়েছেন—'তস্যালৌকিক চরিতচমৎকার তত্তন্মুখাদনুভবন্ ভবদহন-জ্বালামেব বিস্মৃতবান্' ॥ ২৩

কর্ণাটপতি কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রদেবের মধ্যে যে সৌহার্দ্য-মূলক সম্পর্ক এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কালবিচারে তা ১৫১৬-র আগে হওয়া সম্ভব নয়।

১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ উড়িষ্যা রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা হয় গোদাবরী। উত্তরে রূপনারায়ণ নদীর পারে 'পিচ্ছলদা' পর্যন্ত সীমানা সম্প্রসারিত হয়। গোদাবরী থেকে রূপনারায়ণ পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের আর কোন অংশ শত্রুপক্ষ দখল করতে পারে নি। স্পষ্টতঃ বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজকীয় কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হয়।

বিজয়নগর (কর্ণাট)

নীলকান্ত শাস্ত্রী 'A History of South India' গ্রন্থে লিখেছেন—১৪৯৬ খ্রীস্টাব্দে পিতা পুরুষোত্তমের মৃত্যুর পর প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে বসে আনুমানিক ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরাধিপতি নরস নায়কের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে নরস নায়ক মারা যান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর নরসিংহ নামে ১৫০৫-১৫০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বীর নরসিংহের বৈমাত্রেয় ভাই কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতা পান। তাঁর প্রথম ক্ষোদিত লিপির তারিখ ২৬শে জুলাই, ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দ (**The earliest inscription of Krisnadeva is dated 26 July 1509**,-পৃ. ২৬৬-৭)।

তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগীজ অধিনায়ক আলবুকার্ক ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের শেষে বিজাপুর বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে গোয়া (উপকূলস্থিত) দখল করেন। আলবুকার্ক

প্রস্তাব পাঠান, কালিকট (উপকূলস্থিত)-এর জামোরিনের বিরুদ্ধে বিজয়নগর তাঁকে সাহায্য করলে, তিনিও বিজয়নগরকে সাহায্য করবেন—আরবী ও পারসী ঘোড়া বিজাপুরকে একটিও না দিয়ে সব দেবেন বিজয়নগরকে। পর্তুগীজ প্রতিনিধিদল এল বিজয়নগরে, কৃষ্ণদেবের কাছে অনুমতি চাইল ভাটকলে দুর্গ গড়ার—এবার তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হল (*A History of South India*, Nilakanta Sastri, pp. 267-269)।

সুতরাং ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর মহাপ্রভু যখন কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবাঙ্কুর বা কেরলের দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিম উপকূলে কালিকট থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্তুগীজদের সামরিক প্রভুত্ব মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে। ভাটকলে তারা দুর্গস্থাপনে তৎপর হয়েছে। এর আগেই তারা কোচিনে দুর্গ গড়েছে এবং জাহাজ মেরামতের ও নির্মাণের কারখানা তৈরি করেছে। এখানে তারা লিসবনীয় দক্ষতায় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণ করত ('repaired their ships and built new ones in as great perfection as on the Lisbon strand')। এ ছাড়া, Cannanore-এ পর্তুগীজদের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল—এখানেই তাদের আমদানি করা আরবী-পারসী ঘোড়া-বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়ত (*A History of South India*, Nilkanta Sastri, p. 325)।

সুতরাং কোচিনের নিকটবর্তী উপকূলভাগ এবং কালিকট থেকে ভাটকল-গোয়া পর্যন্ত প্রসারিত উপকূলভাগ ১৫১০-১১ খ্রীস্টাব্দে তীর্থযাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না বলেই মনে হয়। অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের নির্দেশ মত তাঁরা ওই উপকূলভাগ এড়িয়ে চলবেন—এটাই স্বাভাবিক। উপকূলভাগের মত ভিতরের ভূভাগেও যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল, কিন্তু ১৫১০-১১ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের আধিপত্য এ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে বাহমনী সুলতানের বাহিনীকে বিদারে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণদেব সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়েছেন। বিজাপুরের ইয়সুফ আদিল খান কোবিলকোণ্ডার যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ইয়ুসুফ আদিলখানের নাবালক পুত্র ইসমাইল আদিল শাহ্ নামেমাত্র বিজাপুরের সুলতান হলেন, প্রকৃত ক্ষমতা রইল সুলতানের অভিভাবক কামাল খানের হাতে। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব বিজাপুর ও বাহমনী সুলতানদের অন্তর্বিবাদের সুযোগ নিয়ে রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করে রায়চুর দুর্গ দখল করেন। কামাল খান কৃষ্ণদেবের সঙ্গে পর্তুগীজদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ রেখে তেমন কোন বাধা দিলেন না। ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কামাল খান ইসমাইলের মায়ের নিযুক্ত আততায়ীর হাতে মারা গেলেন। বিজাপুরের অভ্যন্তরেই গোলমাল পাকিয়ে তুলল কামালখানের বন্ধু স্থানীয় পারসীক ও খোরাসানী আমীর-ওমরাহরা। কৃষ্ণদেব রায়চুর দখল করে গুলবর্গা আক্রমণ করলেন, আমির বারিদকে পরাজিত করে শহর দখল করলেন। গুলবর্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণদেব বিদার জয় করলেন। দ্বিতীয় মাহমুদকে মুক্তি দিয়ে 'যবন রাজ্য সংস্থাপক' উপাধি গ্রহণ করলেন [*A History of South India*, Nilkanta Sastri, p. 269]।

একমাত্র Ummattur-এর বিদ্রোহী নায়ক গঙ্গরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ

চলেছিল ১৫১০ সালের আগস্ট থেকে ১৫১২ সালের শেষ পর্যন্ত (*A History of South India*, p. 270)।

অর্থাৎ ১৫১১ সালের ফেব্রুয়ারীর পর মহাপ্রভু যখন উত্তরে যাত্রা শুরু করলেন তখন Ummattur-এ যুদ্ধ চলছে। কন্যাকুমারী থেকে Ummattur-এর সমতলিক দূরত্ব ৩০০ মাইলের কিছু বেশি। কন্যাকুমারীতে ফেব্রুয়ারীতে এসে থাকলে এখানে আসতে দেরী করে হলেও মার্চ মাসের বেশী লাগবার কথা নয়। এ সময় এখানে যুদ্ধ চলছে। কাজেই পশ্চিম উপকূলভাগে না গিয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূব দিয়ে আবার উম্মত্তুরকে পূবে রেখে কুর্গের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে মহাপ্রভুকে যেতে হয়েছে।

ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষাপট থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে এলাকা (রায়চুর দোয়াব) সাময়িকভাবে জয় করেছিলেন, মহাপ্রভু সেই এলাকার উপর দিয়েই পুনায় বা পূর্ণনগরে আসেন।

উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তিচুক্তির পিছনে প্রতাপরুদ্র-পূজিত শ্রীচৈতন্য ও কৃষ্ণদেবের গুরু শ্রীব্যাসরায়ের বিশেষ ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীব্যাসরায় ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই ছিলেন মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীব্যাসরায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়েছিল, না হলে ব্যাসরায়ের অনুগত 'হরিদাস' গায়কেরা ও ভক্তিগীতি রচয়িতারা শ্রীচৈতন্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হন কি করে? নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন—"These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya, and the visit of Chaitanya to the South in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song." (*A History of South India*, pg. 393)।

১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অচ্যুতদেব রায় সিংহাসনে বসেন। অচ্যুতদেবের রাজত্বকালে যোগীকোট শিলাশাসনে চৈতন্যদেবকে দু'খানি গ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে।

দিল্লী

"দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদীর রাজত্বকাল ১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ। সিকন্দর ছিলেন হিন্দুমায়ের সন্তান (মায়ের নাম ছিল জীবা, তিনি ছিলেন সিরহিন্দের এক স্বর্ণকারের মেয়ে)। সিকন্দরের ইসলামপ্রীতি যেমন ছিল অসাধারণ, অন্য ধর্মের প্রতি ছিল তেমনই অপরিসীম অসহিষ্ণুতা। অনেক হিন্দু মন্দির ধূলিসাৎ করে দিয়ে সে জায়গায় তিনি মসজিদ বা সরকারী ইমারত তৈরি করতেন। মথুরার ঘাটে হিন্দুদের স্নান ও ক্ষৌরকর্ম তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। নগরকোট থেকে আনীত হিন্দু দেবদেবী-মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলি ওজন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তিনি কসাইদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, 'বোধন' নামে এক ব্রাহ্মণকে—যিনি তাঁর নিজের ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সত্যতায়ও আস্থা প্রকাশ করেছিলেন—উলেমাদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।"—Sikandar, deeply devoted to Islam, was intolerant of other faiths. Sikandar, as a king, frequently razed temples to the ground and erected mosques and

public utility buildings in their place....At Mathura he prevented the Hindus from bathing at their sacred ghats or having themselves shaved. The stones of broken images of Hindu idols brought from Nagarkot were given away to butchers to be used as weights. On the top of all, a Brahmana named Bodhan..., who had endorsed the truth of Islam as well as of his own faith, was put to death after the question had been discussed at length by the ulema' ('The Lodis' by Hameed-ud-din : *The Delhi Sultanate*, p.g 146-147).

Cambridge History of India গ্রন্থে এই শেষোক্ত কাহিনীটি সবিস্তারে উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—'এ বাঙালি ব্রাহ্মণটি যে কে জানি নে। কিন্তু তাঁর সমকালবর্তী কবীরের মতও ঐ, চৈতন্যেরও তাই'। ['পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ']

সেই কারণেই কি গৌড় সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন ১৫১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভু গৌড় থেকে বৃন্দাবন যেতে চাইলে 'লোক সংঘটে'র অছিলায় তাঁকে নিষেধ করেন? রাজমন্ত্রী হিসাবে মথুরা-বৃন্দাবন এলাকার খবর সনাতন নিশ্চয় রাখতেন; তাঁর কথার মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল :

'তথাপি যবন জাতি না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥' চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১/২২৩-৪

এবং—'সেই রাত্রে তাহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, বলে সনাতন॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভঙ্গে॥' তদেব, মধ্য ১/২২৮-৯

১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে ঝারিখণ্ডের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন গেলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল 'একাকী যাইব, কাহোঁ সঙ্গে না লইব'। কিন্তু স্বরূপ দামোদরের একান্ত অনুরোধে দুজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে তিনি বৃন্দাবন এলেন। তখনও সেখানে দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসলীলা চলেছে। গোপাল বিগ্রহের বিবরণ দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন॥

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলি গ্রামে থুইল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥'

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৮/২৬-৩১

এরপর আরেকবার বৃন্দাবনে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য। প্রথমবার বৃন্দাবন থেকে পুরীতে ফিরে তিনি গৌড় থেকে আগত রূপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, বৃন্দাবনে গিয়ে—

'কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার। আমিহ দেখিতে তাহাঁ যাইমু একবার'। চৈ. চ. অন্ত্য ১/২১৯ ১৫২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে[1] জগদানন্দ যখন বৃন্দাবনে চলেছেন, তখনও তিনি জগদানন্দকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন—

'আমিহ আসিতেছি, কহিহ সনাতনে।
আমার তরে একস্থান করে বৃন্দাবনে॥' তদেব, অন্ত্য ১৩/৪০

যাঁরা মনে করেন, শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ বারো বছর কোন বাহ্য চেতনাই ছিল না, তাঁরা চৈতন্য তিরোধানের মাত্র কয়েক বছর আগে প্রেমভক্তি প্রচারে এই আগ্রহের দিকটা দেখেও দেখতে চান না। কেউ আবার বলেন, মহাপ্রভুর এই বৃন্দাবন গমন প্রকট লীলায় নয়, অপ্রকটে বা সূক্ষ্মশরীরে। এরকম ভাষ্যের পথ মেরে রেখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কেননা, তাঁর পরিবেশিত তথ্যে আছে, জগদানন্দ—

—'মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে। 'আমিহ আসিতেছি রহিতে, করিহ একস্থানে॥' এবং সনাতন—

'প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা।
দ্বাদশাদিত্য টিলায় এক 'মঠ' পাইলা॥
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া॥ তদেব, অন্ত্য ১৩/৭০

প্রভুর সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভাবের জন্য 'চালি' বা চালাঘর বেঁধে রাখার প্রয়োজন হয় কি করে?

---

১. ১৫৪২ খৃস্টাব্দে কবিকর্ণপূর তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাকাব্যের পুথির (পুথি নং ২৩৮৯) লিপিকার বিষ্ণুদাস লিখেছেন কর্ণপুর ১৬ বছর বয়সে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। এ তথ্য দিয়েছেন ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে (পৃ. ৯৭)। এ হিসাবে ১৫২৬ খৃস্টাব্দে (মতান্তরে ১৫২০ খৃঃ) কর্ণপূরের জন্ম। চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ১২) আছে, শিবানন্দ সেই সন্তানকে যখন মহাপ্রভুর নিকট পুরীতে নিয়ে এলেন, তখন 'মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা। সাধারণতঃ বছর খানেকের শিশুই যা পায় সব মুখে দেয়। এদিক থেকে ঘটনাটি ১৫২৬ সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে। এই অন্ত্য ১২ পরিচ্ছেদেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—'পূর্ববর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে প্রভু আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়ানগরে।' অর্থাৎ এ ১৫২৫ সালের কথা। এ বছরই শিবানন্দ প্রেরিত চন্দন তেল প্রভুর জন্য পুরীতে নিয়ে আসেন জগদানন্দ। শ্রীচৈতন্য তা প্রত্যাখ্যান করেন, এর অনতিবিলম্বে জগদানন্দ বৃন্দাবন যাবার অনুমতি চাইলে, মহাপ্রভু বলেন, 'মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি। অন্ত্য ১৩/২৩। সুতরাং জগদানন্দের বৃন্দাবনগমন ১৫২৫-২৬ এর কথা।

১৫১৫ সালের শেষে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন যাত্রার পর আরেকবার বৃন্দাবন যাত্রার উল্লেখ আছে কবিকর্ণপুরের 'কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যেও।

কর্ণপুর লিখেছেন, চৈতন্যবিরহ সহ্য করতে না পেরে চৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের পর রামানন্দ দেহত্যাগ করেন।—

"স্থিত্বা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ কিঞ্চিৎ কালং তেন ভূয়োহধ্বনৈব।
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে বিচ্ছেদার্ত্তাংস্তত্র তাংস্তান্ বিধায়॥
রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়াক্ষীণস্তত্যজেহসূন্ মহাত্মা।
বিচ্ছেদে স্যাদ্ যোগ্যমেতচ্চরিত্রং প্রেম্নস্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনং॥"

২০ সর্গ / ৩৫-৩৬

অর্থাৎ—"শোভাময় গৌরচন্দ্র সেই স্থানে (নীলাচলে) কিছুকাল অবস্থান করতঃ পুনর্বার তত্রত্য লোক সকলকে বিচ্ছেদার্ত করিয়া সেই পথেই কালিন্দীতীরে প্রস্থান করিলেন। ৩৫॥ অতঃপর মহাত্মা রামানন্দ রায় গৌরাঙ্গ বিয়োগজনিত মনঃপীড়ায় অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ হওত প্রাণত্যাগ করিলেন। আহা! তাদৃশ অলৌকিক এই প্রেমবিচ্ছেদের ইহাই চরিত্র, নিশ্চয় ইহাই উপযুক্ত হয়"। ৩৬ [রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত]

প্রথমবারের বৃন্দাবনযাত্রা এ নয়। কেননা, প্রথমবার মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর রামানন্দ জীবিত; শ্রীচৈতন্য রথযাত্রার সময় সনাতনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন রামানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবদের সঙ্গে।—

'বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজ ভক্তগণে।
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে॥ ১০৭...
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর॥ ১০৯
কাশীশ্বর; গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সনে সনাতনের করাইলা মিলন॥ ১১০

[চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৪]

এই বৃন্দাবন যাত্রা কোন সময় হয়েছিল?

আমরা আগেই জেনেছি, প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে বলা হয়েছে, কামতা-কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালের সূচনায় শ্রীচৈতন্য কামরূপের হাজোতে এসেছিলেন। আমরা আরও জেনেছি, আসামের ইতিহাস লেখক রবিনসন্ সাহেব ও গুণাভিরাম বড়ুয়ার মতে নরনারায়ণ ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমরা এ-ও জেনেছি যে, হুসেন শাহের বাহিনী পঞ্চদশ শতকের শেষে কামরূপ জেলার হাজো পর্যন্ত অগ্রসর হয়, the whole kingdom as far as Hajo in the Kamrup district was permanently annexed এবং অহোম বুরঞ্জী অনুসারে ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে অহোমগণ পাল্টা আক্রমণ করেন এবং ব্রহ্মপুত্র বরাবর মুসলমান বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি হাজোর দিকে অগ্রসর হন।

এই সব তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বলা চলে ১৫২৬-২৭-এ মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন করেন। সেখান থেকে ১৫২৮-এ তিনি কামরূপের হাজোতে যান। হাজো তখন হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) অধিকারে।

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে আরও দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন থেকে কামরূপে মাধব দর্শন করতে আসেন ('সন্তনির্ণয়') ; চৈতন্যদেব হাজোতে মাধব মন্দিরের কাছে একটি গোফা বা গহ্বরে ছিলেন এবং সেখানে রত্নেশ্বর বিপ্রকে ভাগবত পাঠে নিযুক্ত করেন এবং মাগুরী গ্রামের কণ্ঠহার কন্দলী, কবীন্দ্র দ্বিজ, কবিশেখর প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম দান করেন। এইভাবে সেখানে যাত্রা মহোৎসব সংকীর্তন ধর্ম প্রবর্তন করে সেখান থেকে উড়িষ্যায় প্রস্থান করেন।

ভাগবত পাঠক রত্নেশ্বর বিপ্রকে মহাপ্রভু 'রত্নপাঠক' উপাধি দিয়েছিলেন। সেই রত্নপাঠকের কাছেই আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রথম ভাগবত পাঠ শোনেন এবং শ্রীচৈতন্য গোসাঞি এই শাস্ত্র প্রচার করেছেন শুনে তাঁর খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায়ে তীর্থযাত্রা করেন এবং পুরীতে এসে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের সময় শঙ্করদেব পুরীতে ছিলেন।

স্পষ্টতঃ উপরিউক্ত ঘটনাগুলি ১৫২৮ থেকে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ঘটেছে।

খ্রীস্টাব্দ	কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী
১৫১০	জানুয়ারী (২রা মাঘ)—কাটোয়ায় নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ। শ্রীচৈতন্যের ভারত পর্যটনের সূচনা।
১৫১২	জানুয়ারী (৩রা মাঘ) - শ্রীচৈতন্যের পুরী প্রত্যাবর্তন। নভেম্বরের মধ্যে—প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য কৃপা লাভ।
১৫১৩	প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ ঘোষণা। হুসেন শাহী ফৌজের কামরূপ জয়।
১৫১৪	শ্রীচৈতন্যের গৌড়যাত্রা ও পুরীতে প্রত্যাবর্তন।
১৫১৫	শ্রীচৈতন্যের ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্তন।
১৫১৬	প্রতাপরুদ্র ও কৃষ্ণদেব রায়ের শান্তিচুক্তি।
১৫১৭	সিকন্দর লোদীর মৃত্যু।
১৫১৯	হুসেন শাহের মৃত্যু।
১৫২৫-২৬	জগদানন্দের বৃন্দাবন গমন। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের অভিলাষ জ্ঞাপন।
১৫২৬-২৭(আঃ)	মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন।
১৫২৮	কামতা-কোচ রাজ্যে রাজা নরনারায়ণের সিংহাসনারোহণ। মহাপ্রভুর কামরূপ (হাজো) গমন ও ভক্তিধর্ম প্রচার।
১৫২৯	মহাপ্রভুর পুরী প্রত্যাবর্তন (আঃ) ; কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যু, অচ্যুতদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরের অন্তর্গত দুটি গ্রাম চৈতন্যদেবের নামে দান। আসামের শঙ্করদেবের তীর্থযাত্রা।
১৫৩৩	পুরীতে শ্রীচৈতন্য-শঙ্করদেব সাক্ষাৎকার।
১৫৩৩ আষাঢ়,	শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব।

তৃতীয় অধ্যায়

আসামে শ্রীচৈতন্য

আসামের জনশ্রুতিতে ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ, ভাগবত প্রচার, শঙ্করদেব ও শঙ্কর-শিষ্য দামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে শ্রীহেমচন্দ্র দেবগোস্বামী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী শাখার অধিবেশনে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩২২ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় 'আসামে শ্রীচৈতন্য' নামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য এই প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল:

"...এই দেশের বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা, দামোদরী, মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা এই দেশবাসী লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্যপন্থীরা কখন কিরূপে আসিলেন তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রুতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ডের অবস্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে 'চৈতন্য ঘোপা' বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। যেখানে চৈতন্যদেব বসিয়া ছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দণ্ডকমণ্ডলু রাখিয়াছিলেন, তাহাও সেখানকার লোকেরা আজ পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহা একটি জনশ্রুতি মাত্র। হাজো অঞ্চলে আবালবৃদ্ধবনিতার এই জনশ্রুতি জানা থাকিলেও, কেবল এক জন-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না।...

অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লম্বনুরাম চৌধুরী মহাশয় 'সৎ সম্প্রদায় কথা' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য-দেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্য্যন্তই আসিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি আরও কতকদিন হাজোর ঘোপাতে থাকিয়া উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সম্বন্ধে ভটুদেব তাঁহার বিরচিত 'সৎ সম্প্রদায় কথা'তে এইরূপ লিখিয়াছেন, "পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেখন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেখনে চৈতন্য-ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূটে আসিলা। বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্ন পাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত পরিবে দিলা। আর যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন কর্মকো মাধবর দ্বারা প্রবর্তাইলা, পাচে মহাপ্রভু পরশুকুঠারে যাই নামর নির্ণয় লিখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোঁফাতে রহিলা। পাচে মাগুরির কণ্ঠভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্ঠহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীনা ধরি গাই নারদর

শ্রেষ্ঠ দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকূটে যাই তাঙ্ক দেখি দুর্লভ লাভ ভৈলা বুলি প্রণাম করি বোলে, হে মহাপ্রভু, মঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ। চৈতন্য বোলে, কেন মতে তুমি দ্রিদ্র ভৈলা। দামোদরে বোলে, স্বদেশে পরা নামি তাহান্ত তাঁতীমরাত নৌকা বুরি সর্বস্ব উটিল। তিনটি প্রাণী ঝাঁজিত ধরি দিগম্বরে তরিলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনখানি পরিধান করাই নিকটে রাখিছে। পাচে চৈতন্য বোলে, হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ ন করা। তুমি ঈশ্বরের পার্ষদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুন তান কবে তিনি পীঠত পূজ্য হুই নিজ ঐশ্বর্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা।"

[সৎ সম্প্রদায় কথা, পৃ. ৩০]

[এই বিবরণটি উদ্ধৃত করে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "এই বিবরণে বিশ্বাস না করিবার প্রধান কারণ এই যে গেট্ সাহেবের মতে ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে ও গুণাভিরাম এবং রাবিনসনের মতে ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। গেট্ সাহেব বলেন যে, নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিরোধান করেন। সুতরাং নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের পূর্বে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ করা অসম্ভব হয়" ('চৈতন্য চরিতের উপাদান', ৫১৯ পৃ.। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেবগোস্বামীর প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে) ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে এই সংশয় দূর হয়।]

'সৎ সম্প্রদায় কথা' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। প্রথম, চৈতন্যদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন শিববংশীয় মহারাজ নরনারায়ণ সবে মাত্র রাজপাটে বসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব দেবালয়ে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত দেব দামোদরের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটির ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করিব।

নরনারায়ণ রাজার রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিস্টার গেইট তাঁহার **Koch Kings of Kamrup** প্রবন্ধে [**Vide Journal, Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, Part I, No. 4. 1893**] নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ স্থির করিয়াছেন। তিনি এ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

Three different dates are assigned for the time when he (Naranarayan) ascended the throne in succession to his father Visva Singha viz. 1528 A.D. by Gunabhiram, 1534 in Prasiddhanarayan's Vamsabali and 1555 by Ram Chandra Ghosh. His death is said to have occurred in 1584 A.D. and Prasiddhanarayan's Vamsavali and Gunabhiram's Assam Buranji agree in fixing 1581 as the date of Raghu's accesion to power in the Eastern part of the old Koch Kingdom, while the inscription in the Hayagriva temple at Hajo, which was built during his reign and bears the date 1 63

A.D. helps to confirm this as the date of the division of the Kingdom.

"মিস্টার গেইট নরনারায়ণের সময় ১৫৩৪-১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ স্থির করিতে গিয়া নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের শেষকাল যে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ ছিল। মিস্টার গেইট সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু রাজত্বের আরম্ভকাল স্থিরীকরণ সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, **It is less easy to come to a definite conclusion regarding the date of his accession**। বাস্তবিক কথাও তাই। আমরা নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অনুবর্তী হইয়া ১৫৮৪ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহার রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দ বলিয়া মনে করি; কেননা স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর এবং আসামের ইতিহাস লেখক মিষ্টার রবিনসন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল বলিয়া তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্যদেবের কালের সঙ্গেও গরমিল হয় না। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিত পুস্তকের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রথমে যশোড়া গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল।...তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব আর একবার শ্রীহট্টে আগমন করেন। প্রথমতঃ বুরুঙ্গায় গমন করিয়া পরে ঢাকা দক্ষিণে পিতামহীসদনে উপস্থিত হন।...ঢাকা দক্ষিণ হইতে চলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্যের গোফা বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়া থাকে।" ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে জনশ্রুতির কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্ট অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ বাবুর মতেও "এই সকল স্থান দর্শনান্তে তিনি পুনঃ শান্তিপুরে উপস্থিত হন এবং সেই মুহূর্তেই নীলাচলে যাইতে প্রস্তুত হন।"

...সৎ সম্প্রদায় কথা অনুসারে, তিনি, যবে নরনারায়ণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কামরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর এবং মিষ্টার রবিন্সনের নির্দ্ধারিত ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়।...চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমন ঘটনা হইতে নরনারায়ণের প্রকৃত রাজত্বকাল যে ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দ ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা কতকটা ঐতিহাসিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম।

এখন আমরা চৈতন্যদেবের হাজো বাস এবং তথায় দামোদর দেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ বিষয়ে আলোচনা করিব। ভট্টদেব তাঁহার 'সৎসম্প্রদায় কথা' তিনখানা পুঁথি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্টা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃতমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্ ॥

তিনি এখানে কোন্ চৈতন্যসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণভারতীর সংগ্রহ এবং নৃসিংহকৃত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানিই অসমীয়া ভাষায় লিখিত পুথি। প্রথমখানা অসমীয়া গদ্য ভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা পদ্যময়। ভট্টদেব এই দুইখানা পুথির উল্লেখ করাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইখানা পুথি ভট্টদেবের পূর্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এখনও কিছুই জানিতে পারি নাই।...কৃষ্ণভারতী তাঁহার পুথিতে লিখিয়াছেন,—

"পাচে প্রভু মাধবক দরশন করাহকুণ্ডর উপরে গোফাত বহিয়া রত্নেশ্বরক শরণ করায়া মাধব দ্বারত ভাগবত কহিবাক দিল। পাচে তান নাম রত্নপাঠক হৈল। আরো মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক দীক্ষাশিক্ষা দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ্ঞা দিলা। আরো কণ্ঠাহার কন্দলীকো কৃপা করি, আরো কবিশেখর ব্রাহ্মণক নাম ধর্ম দিলা। পাচে মহাপ্রভু জগন্নাথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বসি কাহাকো দেখা নে দিলা।"

ইহা হইতেও দেখা যায়, চৈতন্যদেব মাধব মন্দিরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং তথায় এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি হাজো হইতে নীলাচলে চলিয়া যান।

নৃসিংহকৃত্য এই ঘটনাকে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

'তথা হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মাণকূট গীর পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোফাত
চৈতন্য প্রভু রহিলা॥
রত্নপাঠকক শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা॥ ৯৪
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক
কণ্ঠাহার কন্দলীক।
কবীন্দ্র দ্বিজক কবিশেখরক
চৈতন্যে নাম দিলেক॥
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন ধর্ম
মণিকূটে প্রবর্তাই।
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা
ওড়েষা নগর পাই'॥ ৯৫

এই পুথি দুইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে, ভট্টদেব কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।

এইখানে নৃসিংহকৃত্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, আমরা নৃসিংহের কৃত মূল পুথিখানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ আচার্য নামক একজন এই দেশীয় কবি 'সন্তবংশাবলী' নাম দিয়া নৃসিংহের কৃত পুথিকে অসমীয়া পদ্যভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সন্তবংশাবলী যে নৃসিংহের

পুথির পদ্যসংস্করণ সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার পুথির এক যায়গায় এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

'শুনা নরনারী ইতো সন্তবংশাবলী।
জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি ॥
নৃসিংহর কথা ইতো সম্ভবে সে পদ।
ইহার শ্রবণে করে পাতক উচ্ছেদ ॥' ৫৩

…এই দুইখানা পুথিতে…তাঁহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে পাইলেন? ভট্টদেব দামোদর দেবের সর্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বোধ হয়, দামোদর দেবের নিজমুখ হইতেই তিনি এই কথা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর কাহারও হয়ত এই কথা বিদিত ছিল না। চৈতন্যদেবের সংগে যে দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা দামোদরদেবের চরিত্র পুথিও স্বীকার করে এবং দামোদর সম্প্রদায়ের সকল লোকই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। নীলকণ্ঠ দাসের 'দামোদর চরিত্রে' এই বিষয় এইরূপভাবে উল্লিখিত আছে—

"দামোদর পাছে কামরূপক আসিলা ॥
বক্রেশ্বর গ্রামে বহোদিন আছিলন্ত।
তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকূটে যান্ত ॥ ৮২
আসিলন্ত চৈতন্য নাবদবেশ ধরি।
দামোদরে আরাধিলা ভক্তি ভাব করি ॥
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপে ঋষিয়ে দেখিলা।
জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দিলা ॥ ৮৩
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হন্তে চৈতন্য যে ওড়েষাক গৈলা ॥"

এই প্রবন্ধে যে কয়খানা পুথির উল্লেখ করা হইল, তাহার ভিতর 'সৎসম্প্রদায় কথা ছাড়া একখানি পুথিও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সব পুথি প্রকাশিত হইলে বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাইবে।…

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে, চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ড যাত্রা। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণভারতী কিম্বা নৃসিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই; কেবল ভট্টদেব তাঁহার সৎসম্প্রদায় কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথা হইয়াছে, আমরা একমাত্র ভট্টদেবের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই চৈতন্যদেবের পরশুরামকুণ্ডযাত্রাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কিনা? আমরা বলি—পারি; কেননা, ভট্টদেব একজন যে-সে লোক ছিলেন না।…ভট্টদেব দামোদরদেবের সর্বপ্রধান শিষ্য। তিনি দামোদরদেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ। ভট্টদেব সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে অসমীয়া গদ্যভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সৎসম্প্রদায় কথা লিখিয়া

গিয়াছেন।...তাঁহাকে অসমীয়া ভাষায় গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'ভগদ্ভক্তিবিবেক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আসামে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।...তাঁহার উপাধি কবিরত্ন ছিল এবং তিনি 'কবিরত্ন' নামেই আসামে সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। দামোদর দেব যখন তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, তখন তাঁহাকে এইভাবে বলিয়াছিলেন—

"শুনা কবিরত্ন তুমি ব্যাস সমসর। তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর॥...
আরু এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধরা। কথাবন্ধে একখণ্ড ভাগবত করা॥"

[রামরায় দাস]

ঈদৃশ একজন মহৎব্যক্তি যে বিশেষরূপে না জানিয়া শুনিয়া চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটা অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়।...বিশেষতঃ পরশুরাম কুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।...তিনি কামরূপে কেদারমাধব পর্যন্ত আসিয়া পরশুরামকুণ্ডে না গিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়।... উপসংহারে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতন্যদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই কথাকে ঐতিহাসিক সত্য নয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নয়।"...

শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব

ড. বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—'আসামের মহাপুরুষ শংকরদেব শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। শংকরদেবের ধর্মমতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও নবধাভক্তির সাধন দেখা যায়। শংকরদেব ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই কীর্তনের দ্বারা ধর্মপ্রচার করেন, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন।...

ভক্তিরত্নাকরে এক শংকরের কথা আছে ; যথা—

অদ্বৈতাচার্যের শাখা শংকর নামেতে।
জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে॥
অদ্বৈত শংকর প্রতি কহে বারে বারে।
মনোরথ সিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা।
তেহোঁ না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥
মহাধর্মবহির্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ॥ —দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ৮৪৫

...কাল বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অদ্বৈত ও শংকর উভয়ে সমসাময়িক এবং দুই জনই আসামের লোক।...অনিরুদ্ধ 'শংকরচরিত' পুঁথিতে লিখিয়াছেন যে, শংকর "বান

বায়ু নয়ন চন্দ্রমা শক চারি," অর্থাৎ ১৩৮৫ শকে, ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন ও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।··

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বিশ্বম্ভরের বয়স যখন তেইশ বৎসর তখন তিনি অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ-প্রচারের জন্য দণ্ড দিতে শান্তিপুরে গমন করেন। বৃন্দাবন দাসের মতে সেই সময়ে অদ্বৈত পত্নী সীতা বলিয়াছেন—

বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥

শংকর যদি ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেন ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বৎরের বড় হয়েন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনার সময় শংকরের বয়স ৪৬ বৎসর হয়। তখন অদ্বৈতের বয়স ৪৬ অপেক্ষা বেশী ছিল, তাহা না হইলে সীতাদেবী অদ্বৈতকে বুঢ়াবিপ্র বলিতেন না।

বেজবরুয়া (লক্ষ্মীনাথ) মহাশয় অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে শংকর ৩২ বৎসর বয়সের পূর্বে তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন নাই। শংকর প্রথমবারের দ্বাদশ বৎসর তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। তাহা হইলে, শংকরের জন্ম ১৪৬৩ খ্রী.+৩২ বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণ আরম্ভ+১২ বৎসর ভ্রমণ =১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে অদ্বৈতের সহিত শংকরের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ আরম্ভ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে।···

এইসব যুক্তিবলে আমি আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে অদ্বৈতের নিকট শংকরের জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তির উপদেশ পাওয়ার কাহিনী ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শংকরকে মাধুর্য্য রসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই। সেইজন্য অদ্বৈতশাখায় শংকরের নাম পাওয়া যায় না।'

[শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৫০৭-১০]

ড বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩১৮ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪)-র তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন—"শংকরের শিষ্যদের মধ্যে মাধব ও দামোদর প্রধান ছিলেন। কায়স্থ মাধবদেবের অনুগত দল মহাপুরুষীয়া ও ব্রাহ্মণ দামোদরের শিষ্যরা বামুনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। মহাপুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না। শংকর ও মাধব রচিত ধর্মগ্রন্থে, কীর্তনে ও ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই। কিন্তু দামোদরীয়াগণ চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। [চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১০-১১]

ড. মজুমদার পরে নিজেই বলেছেন, "মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন বইয়েতেই আছে যে শংকর যখন দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে যান, তখন পুরীতে তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয় নাই।"

[চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১২]

শংকরদেবের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব আছে কিনা তা আমরা পরে দেখব। আপাতত মাধব রচিত 'নামঘোষা'য় শ্রীচৈতন্যের 'নামগন্ধ' আছে কিনা তা দেখা যাক। মাধবদেবের নামঘোষার বহুপদে চৈতন্যশিক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। কয়েকটি পদের বিষয়বস্তু ও পদসংখ্যা এখানে দেওয়া হল--

মুক্তি নয়, ভক্তি—১, ৭৭ ; কৃষ্ণে ভক্তি না হলে বেদপাঠ বৃথা-২৯০ ; কলিযুগে কীর্তনই ধর্ম-৩৯৯, ৪০১ ; কলিযুগে কীর্তন কলুষনাশী-৩৮২ ; নামকীর্তনে দেশকাল পাত্র ভেদ নাই ; আচণ্ডালে নামদান-২১ ; ভক্তিমার্গে স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র সকলের অধিকার ৬০৭, হরিনামে বর্ণাশ্রম লঙ্ঘন-১১৮, ১১৯ ; নামধনে আমায় কিনে দাস কর-৫৪১ ; গোপীনাথ-৭৬৫, ৭৭৭, ৮২৯, ৮৪৯ ; গোপিনীর ধন-১৭২ ; তর্কব্যাঘ্রী-৪৩, ৪৪ ; বিশ্ব হরির বিনোদরূপ—মায়ায় গড়া-৭৩ ; কৃষ্ণচৈতন্য-৮, চৈতন্যশরণ-৩০৫, চৈতন্য ঈশ্বর-৩৫৫ চৈতন্য আদিত্য-৩৯০, চৈতন্য সনাতন-৬৫৮, চৈতন্য-৫৮৭ ।

চৈতন্যবিষয়ক ঘোষাগুলিতে শ্রীচৈতন্য নয়, নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যের মহিমা কীর্তিত হয়েছে—এ তর্ক করা চলতে পারে ; কিন্তু একটি ঘোষায় শংকরশিষ্য মাধব শ্রীচৈতন্য-রচিত একটি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ঘোষাটি হল—

> "নোহো জানা আমি চারি জাতি
> চারিও আশ্রমী নোহো আমি
> নোহো ধর্মশীল দান ব্রত তীর্থগামী ।
> কিন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্রর গোপীভর্তাপদকমলর
> দাসর দাস তান দাস ভৈলোঁ আমি ॥" (৬৬৯)

মাধবদেব (১৪৮৯-১৫৯৬খ্রীঃ) এখানে শ্রীচৈতন্যরচিত যে শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন, সেটি হল—

> "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে
> গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ ॥
>
> – পদ্যাবলী ৭৪/৬৩ অধ্যায়

ড. বিমানবিহারী মজুমদার এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এই শ্লোকটি পদ্যাবলীর ইণ্ডিয়া অফিসের পুথিতে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত দুইখানি পুথিতে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫২৮ সংখ্যক পুথিতে শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ড. সুশীল কুমার দে মহাশয় উহার রচয়িতা অজ্ঞাত বলিয়াছেন (ড. দে, পদ্যাবলী, ৭৪ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার পাদটিকা) । জয়ানন্দ, ৮৫ পৃ., উহা শ্রীচৈতন্য কর্তৃক কথিত বলিয়াছেন । প্রাচীন অসমীয়া গ্রন্থেও উহা শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া পাওয়া যাইতেছে । সেইজন্য এটিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিক্ষাষ্টকের মধ্যে না ধরিলেও শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া অনুমান করি ।" [চৈ. চ, উ., পৃ. ৫২৩, পাদটীকা]

জয়ানন্দের কাব্যে (সন্ন্যাস-১) ছাড়া কর্ণপুর কাব্যে (১৬/৪) এবং চৈতন্য-চরিতামৃতেও (মধ্য/১৩/৮০) উক্ত শ্লোকটি চৈতন্য উক্তিরূপে উদ্ধৃত হয়েছে ।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার মাধবের নামঘোষায় ৬৬৯ সংখ্যক উদ্ধৃত ঘোষাটি দেখতে পান নি । তাই লিখেছেন 'ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই' । কথাটি যে ঠিক নয়, তা বোঝা গেল । এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মহাপুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না' —ড. মজুমদারের এই উক্তিটিরও সার্থকতা থাকে না । স্বয়ং মাধবদেব যখন তাঁর ঘোষায়

চৈতন্য উক্তি অনুবাদ করে দিয়েছেন, তখন মাধবদেবের অনুগত মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যকে মানেন না, এ কথা কি করে গ্রহণ করা যায় ?

ড. মজুমদার মাধবের নামঘোষায় না পেলেও রামচরণ ঠাকুর রচিত 'শংকরচরিতে' শ্রীচৈতন্য প্রণীত উক্ত শ্লোকটির অনুবাদের সন্ধান পেয়েছেন। রামচরণ ঠাকুর লিখেছেন. কবিরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলে শ্রীচৈতন্য এসে ওই শব কাঁধে করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন। সে কথা শুনে যবন সুলতান চৈতন্যকে বললেন; 'কবিরের শব তুমি বহন করলে কি করে ?' ব্রাহ্মণ হয়ে যবনের দেহ স্পর্শ করলেন--এই নিয়েই সুলতানের প্রশ্ন। তখন 'চৈতন্য মহাবীর' 'কিছু ভাগবত কথা' শোনালেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় আমি নহোঁ চারি জাতি।
দশো দিশে গৈল দেখা আমার খিয়াতি ॥
চারিয়ো আশ্রমি দেখা নুহি কোহোঁ আমি।
নোহো ধর্মশীল দান ব্রত তীর্থগামী ॥
দৈবকীর পুত্র যিটো গোপীভর্তা স্বামী।
তাহার দাসর দাস দাস ভৈলোঁ আমি ॥-৩২৪৪-৪৮ পয়ার

রামচরণ ঠাকুর মাধব দেবের ভাগিনেয় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭/৩, পৃ.৭৬)। হলিরাম মহান্ রামচরণের 'শঙ্কর চরিতের' ভূমিকায় লিখেছেন যে, রামচরণ মাধবদেবের ভাগিনেয় এবং শংকরদেবের প্রায় সমসাময়িক ("মাধবদেব পুরুসর ভাগিন আরু রামদাস আতৈর পুত্র। এওঁ শ্রীশ্রী শংকরদেবতকৈ প্রায় ৪০ বছর মানে সরু। এনে স্থূলত প্রায় সমসাময়িক বুলিলেও অত্যুক্তি করা ন হব")। রামচরণ ছিলেন শংকরের শিষ্য গয়াপাণি বা রামদাসের পুত্র এবং মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের অনুগত লেখক।

রামচরণ ঠাকুর, তাঁর পুত্র দৈত্যারি ঠাকুর এবং ভূষণ দ্বিজকবি (শংকর শিষ্য চক্রপাণির পৌত্র) —তিন জনেই মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তিনজনেই স্বতন্ত্রভাবে তিনখানি শংকরচরিত রচনা করেছেন। তিনজনেই পুরীতে শংকর-চৈতন্য-মিলনকথা লিখেছেন। তিনজনেই বলেছেন শংকরচৈতন্য উভয়ে ছিলেন নির্বাব, কিন্তু সে নীরবতা ছিল ভাবময় প্রেমময়।

রামচরণ লিখেছেন, শংকরদেব ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন করতে করতে মনের আনন্দে তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন। তখন চৈতন্যগোঁসাই যে গ্রামে ছিলেন, সেখানে এসে তাঁকে দেখলেন।

চৈতন্য গোঁসাই গ্রামে স্থান করিলন্ত। সেই পথে আসিয়া তাহাঙক দেখিলন্ত ॥
দুইকো দুই মুহূর্তেক চাহি আছিলন্ত। সম্ভাষণ ন করিয়া চলিয়া গৈলন্ত ॥
৩১৩৯-৪০ পয়ার

দৈত্যারি ঠাকুর লিখেছেন—

প্রভাতে উঠিয়া নৃত্যো গমন করন্ত। কৃষ্ণ-চৈতন্যর গৌয়া থানক পাইলন্ত ॥
পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক। ন করিবা কেহোঁ নমস্কার চৈতন্যক ॥

যিটো জনে নমস্কার করে চৈতন্যক। উলটায়া তেঁহো প্রণামন্ত সিজনক ॥
মনে নমস্কার তাংক করিবা এতেকে। এহি বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে ॥

[শংকর চৈতন্যকে যে পরম শ্রদ্ধা করতেন, এ তার প্রমাণ। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রণাম করতে হয়; কিন্তু যে প্রণাম করে, চৈতন্য যে ফের তাকে প্রণাম করেন—প্রণম্য জনের প্রণাম নিলে যে মহা অপরাধ হবে। তাই শঙ্কর তাঁর শিষ্যদের মনে মনে চৈতন্যকে নমস্কার করতে বলছেন। শ্রীচৈতন্য যে এরকমই করতেন, তার প্রমাণ আছে জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে' (বিজয় ২/১২-১৪)। নীলাচল থেকে ফিরে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য্য। তখন—

'প্রভুর কুশল জিজ্ঞাসিল হরিদাস। আচার্য্য গোসাঞি বলেন বড় সুপ্রকাশ ॥
কি মায়া করিয়াছেন বুঝিতে না পারি। চৈতন্য জগন্নাথে ভেদ নাঞি করি ॥
কে বুঝে সে সব মায়া কিবা আচরণ। জে নমস্করে তারে দণ্ডবৎ হন' ॥

জয়ানন্দের এই বর্ণনা 'জে নমস্করে তারে দণ্ডবৎ হন' এবং দৈত্যারি ঠাকুরের বর্ণনা—'যিটোজনে নমস্কার করে চৈতন্যক। উলটায়া তেঁহো প্রণামন্ত সিজনক' ॥ বঙ্গীয় কবি ও অসমীয়া কবির বর্ণনার এই মিল শ্রীচৈতন্যের এই অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত আচরণটির প্রামাণিকতাই নির্দেশ করে না, পুরীতে চৈতন্য-শংকরদেব সাক্ষাৎকার এবং উভয়ের অন্তরঙ্গতার সূচকও হয়ে ওঠে।]

কৃষ্ণ-চৈতন্য আছা মঠর ভিতর। ব্রহ্মচারী কহিলন্ত আসিছা শংকর ॥
শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্ণচৈতন্যর। মিলিল আনন্দ বাজ (বার ?) ভৈলন্ত মঠর ॥
দুবার মুখতরাহি আছিলন্ত চাই। দুয়ো নয়নব নীর ধীরে বহি যাই ॥
শংকররো নয়নর নীর বহে ধারা। পথ হন্তে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে ॥
কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে। পশিলা মঠত গৈয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ॥
না মাতিলা দুইকো দুই নিদিলা উত্তর। পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্কর ॥

দু'জনার চোখে জলের ধারা, সপ্রেম দৃষ্টিতে পরস্পরের তাকিয়ে থাকা, পরম হৃষ্ট মনে শংকরের চলে যাওয়া—দুই মহাভাবুকের মিলনের এ এক অপূর্ব ভাবময় চিত্র—কথাতীত, মিস্টিক।

ভূষণ দ্বিজকবি লিখেছেন—

বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আসিলন্ত। জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বঞ্চিলন্ত ॥
চৈতন্য গোঁসাঞি তথা ভৈলা দরিশন। দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সম্ভাষণ ॥
মুহূর্তেক মান দুই চাহি আছিলন্ত। নিবর্ত্তিয়া আসি বাসাঘরে আসিলন্ত ॥
—শংকরদেব, ৫৭৮-৭৯ পয়ার

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের এই তিনজন কবির শংকরচরিতে চৈতন্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং মাধবদেবের নামঘোষায় ও রামচরণ ঠাকুরের শংকরচরিতে শ্রীচৈতন্য প্রণীত শ্লোক-অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যে ভক্তিমান নন বা চৈতন্যকে মানেন না—একথা আর বলা চলে না। এক্ষেত্রে আমরা প্রচলিত মতের বিরোধিতা করতে বাধ্য।

দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের দ্বিজরাম রায় (দামোদরের শিষ্য) তাঁর 'গুরুলীলা'য় লিখেছেন—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শংকর।
কৃষ্ণচৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্বত।
ব্রহ্ম হরিদাসে পাছ কৈলা শংকরত॥
সেই কথা সুমরি শংকর মৌন ভৈলা।
রামনাম গুরুনামে উচর চাপিলা॥
অবনত হুয়া দুই নামিলা সাক্ষাৎ।
পূর্বপর পুছিলন্ত কথা যত যত॥
শংকর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি॥
শংকরেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে।
এক যে শরণ ধর্ম চৈতন্যর স্থানে॥

[রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃ. ৬৩]

যাঁরা শংকরকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রকোষ্ঠে এবং চৈতন্যকে প্রেমভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির আলাদা প্রকোষ্ঠে বন্দী করতে চান, তাঁদের দেখবার বিষয় এই যে, অসমীয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যকে বলা হয়েছে 'মহাজ্ঞানী' এবং শংকর চৈতন্যের স্থানে 'একশরণ' ধর্মের ইঙ্গিত পেলেন—এ কথাও বলা হয়েছে। যাঁরা শংকরদেবকে স্বতন্ত্র মহিমায় চিত্রিত করতে চান, তাঁরা প্রাচীন অসমীয়া চরিতকারদের সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন—এ সাক্ষাৎকার কল্পনা প্রসূত। "কোনো কোনো জীবনীকার মনে করেন যাত্রা পথে নবদ্বীপে অথবা পুরীতে তাঁর (শঙ্করদেবের) সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এটা অবশ্য সাধুকল্পনা প্রসূত"।

['শংকরদেব' : মহেশ্বর নেওগ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া (১৯৬৯)]

প্রাচীন অসমীয়া কাব্যে পুরীতে শংকর-চৈতন্য সাক্ষাতের আগে চৈতন্যের আসাম ভ্রমণ এবং চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য শংকরের আগ্রহের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

কৃষ্ণ ভারতী (দামোদরের শিষ্য) তাঁর 'সন্তনির্ণয়' গ্রন্থে বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন থেকে কামরূপে মাধব দর্শন করতে আসেন। শংকর গোমস্তা (শিরোমণি ভূঁইএ্যা) কোচবিহার-রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে কামরূপে এসে মাধব মন্দিরে ভাগবত পাঠরত রত্নপাঠককে দেখতে পেলেন (আগেই বলা হয়েছে রত্নেশ্বর বিপ্রকে উদ্ধার করে ভাগবত পড়িয়ে শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'রত্নপাঠক' নাম দেন এবং মাধব মন্দিরে ভাগবত পাঠের নির্দেশ দেন)। শংকর রত্নপাঠকের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে বললেন, 'হে গুরু, কোন শাস্ত্র পড়ছ?' রত্নপাঠক বললেন, 'এ তো শ্রীভাগবত, আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্য গোসাঞি এ শাস্ত্র প্রচার করেছেন'। একথা শুনে শংকর গোমস্তা বললেন, 'গুরু, চৈতন্য গোসাঞি কোন্ ঠাঁই থাকেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব'। রত্নপাঠক বললেন, 'চৈতন্য গোসাঞি এই মণিকুটের গোফায় ছিলেন। এখন জগন্নাথে গেছেন'। এই কথা শুনে শংকর গোমস্তা বললেন, 'চল,

গঙ্গা স্নান করে জগন্নাথ দর্শনে যাই; সেখানে চৈতন্য গোসাঞির দেখা পাব'।—"ইতি কামরূপ দেশত যেমত চৈতন্য গোসাই প্রবর্ত্তনি সম্প্রদায় ঈশ্বর ভক্তি পিণ্ড, শরণ, ভজন, হরিনাম, ভাগবত, গীতা, জাত্রা, মহোৎসব প্রবর্ত্তিলা তাহাংক সুনা। এহি কামরূপদেশ প্রায় জঙ্গল আছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জন ন ছিল। পাছে নরনারায়ণ চিলা রায় দু ভাই কামরূপর রাজা হইল। মাধবর থানর মঠ বান্ধিল। পাছে কামরূপ উক্ত দেখিরই তাতে মণিরামপুর কৈল্যাণপুর বণিয়া ব্রহ্মপুর বেদর বরদয়া এই সকল দেশর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুলীন ভাতি মগি সকলক বসাইলেক। সেই বেলা রাম দামোদর, শংকর, মাধব, হরিদেব কামরূপক আসিলা, দেব দামোদরের সত্রে তাতি মারাং নায় চুরি, সর্বস্ব নষ্ঠ হইল, চারি প্রাণী মাত্র ঝাজিত ধরি রহিল। পাছে শংকর রাম রাম গুরু মাধব দরশন করিবাক আসিল। তাতে রত্নপাঠকর মুখে ভগবত শুনি রত্নপাঠকত সুধিলা। হে গুরু কোন শাস্ত্র পড়া। পাছে রত্নপাঠকে কহিলেক বোলে এই তো শ্রীভাগবত আমারই দেশত শ্রীচৈতন্য গোসাঞি প্রচারিল। আমাক কৃপা করি মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক আজ্ঞা করিল। এতেকো আমি পড়ো। এহি কথা শুনি পুনু শংকরে গোমস্তারে সোধে বোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞি কোন ঠায় থাকে আমি তঞেক দেখা পাঞো। এহি শুনি রত্নপাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞি এই মাধবর মণিকুটর গোফাতে আছিল। এখন জগন্নাথক গৈল। এহি কথা শুন শংকর গোমস্তা রাম রাম গুরু দুই জনে আলচি বোলে গুরু চলা গঙ্গা স্নান করি জগন্নাথ দরশন করি চৈতন্য গোসাঞিক সেহি থানতে লগে পাইব।"

ড. বিমানবিহারী মজুমদার ভট্টদেবের 'সৎসম্প্রদায় কথা'য় প্রদত্ত বিবৃতিকে অপ্রামাণিক বলে মনে করেছেন, কেননা "গেটসাহেব বলেন যে নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। সুতরাং নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের পরে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ করা অসম্ভব হয়।" [চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১৯]।

ড. মজুমদার কৃষ্ণভারতীর বিবৃতিকেও অপ্রামাণিক বলে মনে করেন কেননা জনৈক সোনারাম চৌধুরী "কামরূপত কোচ রাজার কীর্ত্তিচিন্" প্রবন্ধে লিখেছেন যে 'রাজা নরনারায়ণ মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘরটি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করাইয়াছেন'।

[চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১৯ পাদটীকা]

ড. মজুমদার লিখেছেন, "মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘর যদি রাজা নরনারায়ণ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করিয়া থাকেন ও তাহার পর শংকরের সহিত রত্নপাঠকের কথাবার্তা হয়, তাহা হইলে এই সময়েরও পরে শংকর কি করিয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইবেন? শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করিয়াছেন।"

[চৈ. চ. উ. পৃ. ৫২০]

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য—

১. নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের সঙ্গে মহাপ্রভুর হাজো-গমনের যোগ কোথায়?

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, নরনারায়ণের রাজত্বের সূচনায় (১৫২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে) হাজো ছিল গৌড় সুলতান নসরৎ সাহের অধীনে।

২. নরনারায়ণের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। গেইট বলেন নরনারায়ণের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু গেইট সাহেবই বলেছেন এই কালনির্ণয় সন্দেহাতীত নয়—'It is less easy to come to a definite conclusion regarding the date of his accession'.

৩. গুণাভিরাম বড়ুয়া এবং আসামের ইতিহাসলেখক রবিনসন সাহেব উভয়েই বলেছেন নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দ।

৪. শংকরদেবের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। 'তাঁর কোন প্রামাণিক জীবনচরিতে তাঁর জন্মসাল দেওয়া নেই; জন্মদিন ও জন্মমাস সম্পর্কেও বহু মতান্তর। শংকরদেবের মৃত্যু হয়েছিল ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন; কিন্তু জন্ম ১৪৪৯, ১৪৬১ অথবা ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিচারে তাঁর জন্ম বছর ১৪৮৬ ধরলে বোধহয় সত্যের কাছাকাছি আসা যায়'।—একথা বলেছেন রাজমোহন নাথ বি. ই., তত্ত্বভূষণ, আসাম P.W.D-র ভূতপূর্ব সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার। "None of the authentic biographies of Sankara Deva mentions the year of his birth, and even with regard to the month and the day they are not unanimous. Sankara Deva died in A. D. 1568. Tradition ascribes to him a long life, but whether his date of birth can be pushed back to A. D. 1463 or 1461 or even 1449 is doubtful; contemporary historical events suggest A. D. 1486 as probably nearer the mark." [Sankara Deva and the Vaisnava Movement in Assam : *The Cultural Heritage of India*, Vol. IV (1969), p. 201]

৫. 'মাধবর থানর মঠ বান্ধিল'—মাধবের থানে মঠ বেঁধে দেওয়া একটি ঘটনা। মন্দিরের সম্মুখের ঘরটি নির্মাণ করা ভিন্ন ঘটনা। দুটি ঘটনা আলাদা সময়ে ঘটতেই পারে। মাধবের থান যে বহু প্রাচীন তার উল্লেখ করেছেন ড. অজয় চক্রবর্তী। "The Vishnu temple of Hayagrivanarayana at Hajo was restored by Naranarayana"·· [*Literature in Kam to Koch Raj-Darbar* p. 21] লক্ষ্য করতে হবে, ড. চক্রবর্তী 'built' বলেন নি, বলেছেন 'restored'।

৬. শংকরদেবের আবির্ভাবকাল একেক রকম ধরে তাঁর জীবনের ঘটনাকালও বিভিন্ন রকমের হবে। এ ক্ষেত্রে চৈতন্য জীবনের ঘটনাক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে শংকরের জীবনের ঘটনাগুলির কালনির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত। সে ক্ষেত্রে ঘটনার কালানুক্রম হবে এই রকম—

ক. ১৫২৮ খ্রীঃ কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের সিংহাসনারোহণ। বৃন্দাবন থেকে শ্রীচৈতন্যের কামরূপে মাধবদর্শনে আগমন, রত্নেশ্বর পাঠককে 'রত্নপাঠক' উপাধি দান এবং ভাগবত প্রচার। এর অব্যবহিত পরে শংকর কামরূপে আসেন এবং রত্ন পাঠকের নিকট চৈতন্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দেখা

পেতে জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে যাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেন।

খ. আষাঢ় ১৫৩৩ খ্রী: পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎলাভ এবং চৈতন্যের নিকট 'একশরণ' ধর্মের ভাবদীক্ষালাভ। "আসামে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শংকরদেব যখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে পুরীতে ছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়।" [চৈ. চ. উ. ৫০৯ পৃ.]

১৫৩৩ খ্রী: (আষাঢ়-পরবর্তী কাল) চৈতন্য তিরোভাবের পর শংকর বৃন্দাবনে যান। রূপ গোস্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়। রূপগোস্বামী সংকলিত 'পদ্যাবলী'র ৭৪ সংখ্যক শ্লোকটি সম্ভবতঃ এই সময় তাঁর হস্তগত হয়। পরে এই শ্লোকটি তাঁর শিষ্য মাধবদেবের নামঘোষায় (অনুবাদে) স্থান পায়। এই সময় শংকর রূপগোস্বামীকে 'বিদগ্ধমাধব' নাটক রচনায় উৎসাহিত করেন। এ সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন —"শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে তিরোহিত হয়েন; তাহার কয়েক মাস পরেই এই গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত সূত্রধারের উক্তি হইতে পাওয়া যায়; যথা—"তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দ বিশ্লেষোদ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কমপি তস্যৈব কেলিসুধাকল্লোলিনীমুল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা।"

শ্রীচৈতন্যের সহিত কৃষ্ণের অভিন্নত্ব সকল ভক্তই স্বীকার করিতেন; শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ভক্তগণের মুকুন্দ বিচ্ছেদের উদ্দীপনা হইয়াছিল; তাই শ্রীকৃষ্ণলীলা শুনাইয়া তাহাদিগের আনন্দ-বিধানের জন্য শ্রীরূপগোস্বামী এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকীয় বাক্যভঙ্গির দ্বারা শ্রীগোস্বামী এখানে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবে ক্লিষ্ট ভক্তগণের অবস্থার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়।"

[চৈ. চ. উ পৃ. ৩৮৬]

রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলছেন, "অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশংকরদেবেন।"—ভক্তাবতার শংকরদেব স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন মুকুন্দের লীলাকাহিনী বর্ণনা করে মুকুন্দ-বিচ্ছেদের উদ্দীপনার দ্বারা মুমূর্ষু ভক্তদের প্রাণরক্ষা করতে। এ প্রসঙ্গে ড. মজুমদার বলেছেন— "'ভক্তাবতার শঙ্করদেব' বাক্য দেখিয়া মনে হয়। এখানে আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেবকেই বুঝি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"শ্রীশংকরদেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বর নাম্না।" বিদগ্ধমাধবে মাধুর্য্যরস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; শংকরদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেষ্টা, দাস্যভক্তির উপাসক; তিনি যে এইরূপ নাটক লিখিতে আদেশ দিবেন সে সম্ভাবনা অল্প।" [চৈ. চ. উ. পৃ. ৫২৬]

আমরা আগেই বলেছি, শঙ্করদেব জ্ঞানমিশ্রা ও দাস্যভক্তির উপদেষ্টা হলেও গোপীভাবের মধুর রসাশ্রিত পদও রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যও লোকশিক্ষায় দাস্যভক্তির কথাই বলতেন, নিজেকে বলতেন 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'। এজন্য মধুররসাশ্রিত বৈষ্ণব পদ আস্বাদনে কোন বাধা হয়নি। শঙ্করদেবের পক্ষেও তাই মধুর রসপ্রধান কৃষ্ণলীলা রচনায় আদেশ ও উৎসাহ দানে কোন বাধা থাকতে পারে না।

তথ্য বিশ্লেষণ করতে করতে ড. মজুমদার এখানে টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উপর বরাত দিয়েছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীশংকরদেবের' অর্থ করেছেন ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে অবস্থিত গোপীশ্বর বা গোপীনাথ। বিশ্বনাথের উপর নির্ভর করতে গিয়ে ড. মজুমদার এখানে 'ভগবতা শ্রীশংকরদেবেন' কথাটির আগে 'ভক্তাবতারেণ' বিশেষণটিকে লক্ষ্য করেন নি বা অগ্রাহ্য করেছেন। 'গোপীশ্বর' ত ভগবান স্বয়ং, ভক্তাবতার' শব্দে তিনি উদ্দিষ্ট হবেন কি করে? এখানে আসামের শংকরদেবই উদ্দিষ্ট, তিনিই ভক্তাবতার। বৃন্দাবনে আসার আগে শংকরদেব পুরীতে শ্রীচৈতন্যের স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং তাঁর মহিমা রূপের অগোচর থাকার কথা নয়। ঘটনার কালক্রমও এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৫৩৩-এ চৈতন্য-তিরোভাবের পর শংকরদেব বৃন্দাবনে এসেছেন। ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দেই রচিত হয় বিদগ্ধমাধব। সর্বোপরি রয়েছে নাটকের সূত্রধারের ওই উক্তি। সূত্রধারই এখানে ঐতিহাসিক ঘটনারও সূত্র ধারণ করে আছেন।

ড. মহেশ্বর নেওগ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এটা একটু অদ্ভুত শোনালেও রূপ-গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের নান্দীতে কিন্তু এই কথাগুলি দেখতে পাচ্ছি : 'ভক্তরূপে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীশংকরদেব স্বপ্নাদেশ করেছেন যেন এই নাটক লিখি'। (শংকরদেব, পৃ. ১৯) তাঁর নিজস্ব কালনির্ণয় অন্য ধরনের হওয়ায় এ ঘটনাকে কালানুক্রমে সাজাতে পারেন নি বলে এটি তাঁর কাছে 'অদ্ভুত' বলে মনে হয়েছে। শংকরদেবের মহিমাজ্ঞাপক বলে এ ঘটনাকে তিনি 'অদ্ভুত' হলেও বর্জন করেন নি। কিন্তু প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে শংকরদেবকে যেখানে চৈতন্যের ভক্ত-অনুরাগী রূপে এমন কি অনুগত রূপে দেখানো হয়েছে, সেখানে নিজ সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয় নি বলে তিনি আমূল বর্জন করেছেন। তাঁর মতে "নিগুর' (গুরুহীন) সাধক কবীরের মতন শংকর-দেবেরও কোনো ধর্মগুরু ছিলেন না।" (শংকরদেব পৃ. ৩৩)। প্রাচীন শংকর চরিতে রাজপুরুষ শংকর গোমস্তার চৈতন্য গোসাঞির সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলতা, পুরীতে চৈতন্যের নিকট 'একশরণ' ধর্মে ভাব-দীক্ষা গ্রহণের কথা থাকলেও তিনি সেসব 'সাধুকল্পনা প্রসূত' বলে বর্জন করেছেন। মাধবদেবের 'নামঘোষা'য় চৈতন্যের যে সংস্কৃত পদটির অনুবাদ দেওয়া আছে—সেটিকেও কি কল্পনা প্রসূত বলা যাবে?

ড. মহেশ্বর নেওগ তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র (পৃ. ২০) বলেছেন, "এই সময় (শংকরদেব পুরী ও অন্যান্য তীর্থ থেকে ঘুরে আসার পর) তিরহুতের অধিবাসী জগদীশ মিশ্র নামক এক সজ্জন পুরী থেকে ভাবার্থ-দীপিকা ভাষ্যসমেত ভাগবত পুরাণের একখানি প্রতিলিপি নিয়ে উপস্থিত হলেন। ইনি ছিলেন ভাগবত-ভক্তিরত্নাকরের সংকলয়িতা বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীর উপশিষ্য। প্রভু জগন্নাথের আদেশে ইনি আগমন করেন বলে

কিংবদন্তী আছে।...জগদীশ শংকরদেবের সঙ্গে বরদোয়াতে থাকা কালে বছরখানেক ধরে শ্রীধর ব্যাখ্যাত এই পুরাণ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। সাধক (শংকর) এবার পুরাণের বিষ্ণু কৃষ্ণভক্তির একশরণপন্থার অনিবার্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেন।"

ড. নেওগের 'অদ্ভুত' মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর এই তথ্য-বিবৃতিও প্রমাণ করে শংকরদেবের চারিত্রিক বিবর্তনে শ্রীচৈতন্যের ও চৈতন্যপার্ষদের প্রভাব। পুরী থেকে জগদীশ মিশ্র যে শ্রীধরভাষ্য নিয়ে এলেন, তা জগন্নাথের আদেশে আনা হয়েছে বলা হলেও মনে হয় আদেশটি দিয়েছেন 'মহাপ্রভু'। 'মহাপ্রভু' অভিধায় শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ উভয়ে উদ্দিষ্ট হতেন, এই কারণে এখানে অর্থবোধে বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক। শ্রীধরভাষ্য সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের অপরিসীম শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা বল্লভ ভট্ট মানেন না বলায় শ্রীচৈতন্য তাঁকে কঠিন তিরস্কার করেছিলেন (প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন' ॥)। চৈ. চ. অন্ত্য ৭

'শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা'য় চৈতন্যপার্ষদ শ্রীনাথ চক্রবর্তী (কবিকর্ণপুরের গুরু) গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীধর ভাষ্যের জয়ঘোষণা করে বলেছেন—'জীয়াদ্ ভাবার্থ দীপিকা।'।

চরিতামৃতের জগদীশ মিশ্রকে বলা হয়েছে 'ভাগবত-ভক্তিরত্নাকরের সংকলয়িতা বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীর উপশিষ্য'। গ্রন্থটি আসলে 'ভক্তিরত্নাবলী'। রচয়িতা বিষ্ণুপুরী চৈতন্য-পার্ষদ। হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজী লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর পত্র পেয়ে বিষ্ণুপুরী ভক্তিরত্নাবলী সংকলন করে পাঠান।—

> জগন্নাথ ক্ষেত্র এ মাঝ বৈঠে মহাপ্রভুজু বে
> চহুঁ ঘোর ভক্তভূপ ভীর অতি ছাই হৈ।
> বোলে বিষ্ণুপুরী পুরী কাশী মধ্য রহৈ
> জাতে জানিয়ত মোক্ষ চাহনীকী মন আই হৈ ॥
> লিখী প্রভু চিটী আপু মণিগণ মালা এক দিজিএ পঠাই
> মোহি লাগতা সুহাই হৈ।
> জানি লই বাত, নিধি ভাগবতরত্নাদাম দই পঠৈ
> আদি ভুক্তি খোদিকৈ বহাই হৈ ॥

[চৈ. চ. উ. পৃ. ৫৩০]

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'প্রিয়াদাসের টিপ্পনীকার সীতারামশরণ রূপকলাজী মহাপ্রভু অর্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুঝিয়াছেন। লালদাস মহাপ্রভু অর্থে জগন্নাথ বুঝিয়াছেন'। [চৈ. চ. উ. পৃ. ৫৩০.] আমাদের মনে হয় ড. মহেশ্বর নেওগ এই একই ভুল করেছেন।

'অসমীয়া ভাষায় লিখিত দৈত্যারি পন্ডিতের শংকরচরিতে আছে যে শংকরদেব কণ্ঠভূষণের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী পাইয়াছিলেন। যথা,

> রত্নাবলী গ্রন্থ বারাণসী হন্তে আনি।
> শংকর দেবক দিয়া বুলিলন্ত বানী ॥
> বিষ্ণুপুরী নামে এক সন্ন্যাসী আছিল।
> ইতো গ্রন্থখানি বাপু তেঁহো বিরচিল'॥ [চৈ. চ. উ. পৃ. ৬৮৯]

এই কণ্ঠভূষণের মুখেই শংকর চৈতন্য অবতারের কথা শুনেছিলেন—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর।
কৃষ্ণ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥ 'গুরুলীলা', দ্বিজরাম রায় (দামোদর শিষ্য)
[রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃ. ৬৩]

আসাম ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য অন্যান্যদের সঙ্গে এই কণ্ঠভূষণকেও নাম দান করেন।

ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, "কৃষ্ণ আচার্য্য 'সন্তবংশাবলী'তে নৃসিংহকৃত্য নামে একখানি বইয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত পদ লিখিয়াছেন।

তেব হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মণিকূট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত
চৈতন্য প্রভু রহিলা।
রত্ন পাঠকক শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা ॥
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠ ভূষণক
কণ্ঠহার কন্দলীক।
কবিচন্দ্র দ্বিজক কবি শেখরক
চৈতন্য নাম দিলেক ॥
যাঞা মনোসের সংকীর্তন ধর্ম
মণিকূটে প্রবর্তাই।
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা
ওড়েষা নগর পাই ॥

কৃষ্ণ আচার্য্যের উক্তির সহিত সন্তনির্ণয়ের বর্ণনার মিল আছে। উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় যে, শ্রীচৈতন্য বরাহকুণ্ডের উপর রত্নেশবরকে 'শরণ' দেন, কণ্ঠভূষণকে ভাগবত পাঠের উপদেশ দেন ও কণ্ঠহার কন্দলিকে কৃপা করেন। তারপর কবিশেখর ব্রহ্মাকে নামধর্ম দান করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যায় গমন করেন।" [চৈ. চ. উ. পৃ. ৫২০-২১]

তা হলে দাঁড়াল এই যে, শ্রীচৈতন্য আসামে যাঁদের নামপ্রেম দিয়েছিলেন, তাঁরাই আসামে চৈতন্য প্রবর্তিত ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন ধর্মের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাঁদেরই কাছে শঙ্কর পেয়েছেন চৈতন্য গোসাঞির সন্ধান, পুরীতে গিয়ে শংকর চৈতন্যের নিকট একশরণ ধর্ম উপলব্ধির পর সেই অনুগামীদের মাধ্যমেই শ্রীচৈতন্য শংকরদেবকে পাঠিয়েছেন শ্রীধরভাষ্য 'ভাবার্থ দীপিকা' ও বিষ্ণুপুরী সংকলিত 'ভক্তিরত্নাবলী'। এইভাবে শংকর তাঁর পথের দিশা পেয়েছেন চৈতন্যের ও চৈতন্য পার্ষদদের নিকট। এ সবের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য থেকেই। প্রাচীন সাহিত্য প্রাচীন কালের অন্যতম ঐতিহাসিক উপাদান—এ কথা ভুললে চলবে না। এই সাহিত্য-উপাদানকে নির্বিচারে নস্যাৎ করা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

শংকরশিষ্য মাধবদেব তাঁর নামঘোষায় কৃষ্ণভক্ত হরিকীর্তন পরায়ণ পূর্বসূরী মহাজনদের বন্দনা করে বলেছেন—

হরি কীর্তনর মহা আনন্দ সুখক আশে
কতো কতো সব মহাজনে।
মুকুতি সুখক তেজি মহন্ত জনর সঙ্গ
খোজে অতি কৃষ্ণর চরণে ॥৭৭

এই মহাজনদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের একটি পদের অনুবাদ ৬৬৯ সংখ্যক ঘোষায় দেওয়া হয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন বলছি নামঘোষার একেবারে প্রথম পদটির কথা। এতে মুক্তিনিস্পৃহ রসময়ী ভক্তির মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে স্বয়ং যদুপতি এই ধরনের ভক্তদের বশীভূত হন।—

মুক্তিতো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকতক নমো
রসময়ী মাগোঁহো ভকতি।
সমস্ত মস্তক মণি নিজ ভকতর বশ্য
ভজো হেন দেব যদুপতি ॥

এই ঘোষাটি বিষ্ণুপুরী রচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ—

যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ প্রতিপদপ্রোন্মীলদানন্দদাং,
যামাস্থায় সমস্ত মস্তকমণিং কুর্বন্তি স্বৈবশে।
তান্ ভক্তানপি তাঞ্চ ভক্তমপি তং ভক্তপ্রিয়ং শ্রীহরিং।
বন্দে সন্তমর্থয়েহনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥

'ভক্তি-রত্নাবলী'র কান্তিমালা টীকায় এই শ্লোকটি সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরীর রচনা রূপে উল্লেখিত হয়েছে।

এই বিষ্ণুপুরীও ছিলেন চৈতন্যপার্ষদ। ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন "বিষ্ণুপুরী যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন তাহার চারিটি প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ (১) চরিতামৃতে তাঁহাকে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলা হইয়াছে। (২) হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর পত্র পাইয়া বিষ্ণুপুরী ভক্তিরত্নাবলী সঙ্কলন করিয়া পাঠান। (৩) বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণিয়ায় শুনিয়াছিলেন যে, তিনশত বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরী নামে এক বিদ্বান্ সন্ন্যাসী ছিলেন—তিনি পরে বিবাহ করেন (পূর্ণিয়া রিপোর্ট, পৃ. ২৭৫)। ১৮০৯-এর তিনশত বৎসর পূর্বে মানে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে, শ্রীচৈতন্যের তখন ২৩ বৎসর বয়স। রামচরণ ঠাকুর অসমীয়া ভাষায় শংকরচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বিষ্ণুপুরী "শৃঙ্গার সুখক তেবে ভার্য্যাক খুজিল" (৩২৯৬ পয়ার)। (৪) জয়ানন্দ (পৃ. ১২৬) ও লোচন (পৃ, ২) বিষ্ণুপুরীকে শ্রীচৈতন্যের গণমধ্যে গণনা করিয়াছেন [চৈ. চ. উ. পৃ. ৬৯০]।"

সুতরাং উপরিলিখিত তথ্যাদি ও আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়ে পড়ে যে, শংকরদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গ চৈতন্য অনুগত ও চৈতন্যপার্ষদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁদের অনুল্লেখ বা স্বল্প উল্লেখ এ সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। কেননা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে, শ্রীচৈতন্য প্রেরণায় ওড়িষ্যার সমাজে ও সাহিত্যে যে রেনেসাঁস

বা নবজাগরণ এসেছিল, সে সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। উড়িষ্যার মত অসমীয়া সমাজে ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছিল তার পিছনেও চৈতন্য প্রেরণা যে সক্রিয় ছিল তাতেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অসমীয়া ভাষায় রচিত শংকর চরিতগুলি, শংকর শিষ্য মাধবদেব রচিত 'নামঘোষা' তার যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। শংকরদেবের রচনাতেও চৈতন্য প্রভাব যে দুর্লক্ষ্য নয়, এবার আমরা তা দেখব।

শঙ্করদেবের জীবন ও বাণী

কামতা-কুচবিহার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হয়, তাকে এক কথায় বলা যায় শঙ্করীয় যুগের ফসল। শঙ্করদেব ছিলেন মহারাজ নরনারায়ণের সভাকবি।

শংকরদেবের আবির্ভাবকালে সমগ্র কামতা রাজ্যে নাথ ধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। "শ্রীশঙ্করদেবের চরিতকার বলেন যে, শঙ্করদেবের আবির্ভাবের সময় সারা কামরূপ বিকৃত তন্ত্রাচার ও ধর্মের নামে ব্যভিচার-অনাচার-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। কামরূপ-অনুসন্ধান সমিতি 'রাতিখোয়া' দলের কাহিনী শুনাইয়াছেন। এইসব লোকেরা দেবীর নিকট নিজেদের আত্মবলি দিবার সংকল্প করিত; এবং এক বৎসর তাহারা যথেচ্ছা ভোগ করিবার অধিকার পাইত। যোগিনীসাধন, চারিচন্দ্রসাধন, দূতীযাগ, লতাসাধন, আগমনিগমযামলের পবিত্র শিবোক্ত নির্বাণধর্ম বিকৃত পশ্বাচারে পরিণত।" [বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৯ ঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০২]।

'অসমীয়া সাহিত্যের তিন যুগের তিন দিকপাল' শীর্ষক এই প্রবন্ধে লেখক আরো জানিয়েছেন, "আলিপুখরীতে শিরোমণি ভুঁইয়া চণ্ডীবরের বংশে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি সাধারণ গৃহস্থেরই জীবন যাপন করিতেন। পরে তিনি বৎসরের পর বৎসর ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করেন। তিনি মূর্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে 'নামঘর' ও 'নামঘোষা'র প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তিনি গণতান্ত্রিক বোধের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তখনকার বিকৃত সমাজকে নূতন প্রেরণা দিলেন, সমাজব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িলেন [তদেব, পৃ. ২৩২]।"

রাজমোহন নাথ, বি.ই., তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখেছেন, "১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কনৌজের এক কায়স্থ সর্দার চণ্ডদেব সপরিবারে এসে বর্তমান রঙ্গপুর জেলার একটি গ্রামে বাস করতে থাকেন। গ্রামটির নাম হয় কনৌজপুর। চণ্ডদেব ছিলেন শাক্ত এবং শিবদুর্গার উপাসক। তাঁর পুত্র চণ্ডীবর ওরফে দেবীদাস বর্তমান গৌহাটি সাবডিভিসনের পূবে লেঙ্গা-মাগুরীতে এসে বাস করেন। চণ্ডীবর ভুটিয়াদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে লেঙ্গা-মাগুরী থেকে চলে আসেন বর্তমান নওগাঁ জেলার আলিপুখরি গ্রামে। তাঁর প্রপৌত্র কুসুমবরের পুত্রই হলেন শংকরদেব।

শংকরদেব তাঁর জন্মের পক্ষকাল পরেই মাকে হারান, তাঁর সাতবছর বয়সে তাঁর পিতার দেহাবসান হয়। তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমাই তাঁকে বড় করেন। সংস্কৃত টোলে পড়াশুনা করে তিনি হয়ে ওঠেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, ও চিত্রশিল্পী। উনিশ বছর

বয়সে তিনি তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে বর্তমান নওগাঁ শহরের উত্তরে বরদোয়া গ্রামে চলে আসেন। একুশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এবং পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর একটি কন্যা সন্তান হয়—সন্তানের জন্মের পরই তাঁর স্ত্রী মারা যান।

শংকরদেব ৩৩ বছর বয়সে তীর্থযাত্রায় বার হন এবং ১২ বছর ধরে তীর্থ পর্যটন করেন। এই সময় তিনি গয়া, কাশী, পুরী, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, উপ-বদরিকাশ্রম, বরাহক্ষেত্র, পুষ্কর, দ্বারকা, রামেশ্বর ইত্যাদি ক্ষেত্র ভ্রমণ করেন। তিনি দেখলেন, সর্বত্র বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য—এই ভক্তিবাদী আন্দোলনের ঢেউ সর্বমানবের এক মিলনক্ষেত্র রচনা করেছে, সম্মিলিত উপাসনায় সুষ্ঠুপ্রয়োগ হয়েছে সঙ্গীতের; বৃন্দাবন জয়দেব-বিদ্যাপতির সঙ্গীতে মুখর। পুরীতে রথযাত্রা উৎসবের সময় শংকরদেব দিব্যভাবের আবেশে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পেলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোন আলোচনা হল না। উড়িষ্যায় চৈতন্যের সম্মাননার বিষয়ে অবশ্য শংকরদেব অবহিত হলেন। এইভাবে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে শংকরদেব ঘরে ফিরলেন (Thus impressed and imbued with new ideas, Sankara Deva returned to his native home'.)।

নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনের চাপে শংকরদেব দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। মনে মনে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় জগদীশ মিশ্র নামে এক বিদ্বান পণ্ডিত ও পরিব্রাজক প্রচারক বরদোয়ায় ভাগবত পুরাণ প্রচার করতে এলেন। তিনি শংকরদেবের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

শংকরদেব তাঁর ঘরে এই পণ্ডিতের অবস্থানকে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ বলে মনে করলেন। পুরুষানুক্রমিক শাক্ত ঐতিহ্য ত্যাগ করে শংকরদেব এবার কামরূপীতে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুবাদ করতে লাগলেন—শ্রীকৃষ্ণলীলা আশ্রয় করে রচিত পদে সুরারোপ করে বন্ধুদের নিয়ে 'কীর্তন' আরম্ভ করলেন। কীর্তনের সুর মূর্চ্ছনায়, প্রেমভাবনায় ও করুণরসে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা আসতে লাগল তাঁর কাছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম ছিল হিন্দুধর্ম, কিন্তু তাদের আচার অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব ছিল খুব বেশি। এই বৌদ্ধপ্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বৌদ্ধ ত্রিনীতি ধর্ম-শরণ, বুদ্ধ-শরণ, এবং সঙ্ঘ-স্মরণ-এর অনুরূপ নিজস্ব ত্রিনীতি গড়ে তোলেন—নাম-শরণ, গুরু-শরণ এবং ভক্ত-শরণ। অনেক লোক তাঁর অনুগত হল। কায়স্থ রামদাস ওরফে গয়াপাণি হলেন তাঁর পন্থার ভাষ্যকার। নামকরা শাক্ত শতানন্দ কায়স্থ হল তাঁর অনুগত বৈষ্ণব। রামদাসের শ্যালক, যুবক বণিক মাধবদেব শংকরদেবের আশ্রয় নিয়ে তাঁর বাণীপ্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন।

সবই ভাল চলছিল, হঠাৎ এল দুর্যোগ। আহোমরাজের হাতিশিকারে সঙ্গী হিসাবে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন—এই অভিযোগে শংকরদেব ও তাঁর অনুগামী ভক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হলে শংকরদেব পালিয়ে গেলেন। কিন্তু মাধবদেব এবং হরি (শংকরের জামাতা) অন্যান্যদের সঙ্গে বন্দী হলেন। মাধবদেব মুক্তি পেলেন কিন্তু হরি ও অন্যান্যদের শিরশ্ছেদ করা হল। শংকরদেব তাঁর পরিবার

ও অনুগত ভক্তদের নিয়ে নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে বরপেটায় এসে বসবাস করতে লাগলেন।

শংকরদেব ভাগবত অনুবাদে এবং গীত নাটক খণ্ডকাব্য রচনায় আবার আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর রচনার সারল্যে, সুরমাধুর্যে এবং সহজবোধ্য দার্শনিকতায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক এসে তাঁর আশ্রয় নিতে লাগল। মুসলমান, গারো, ভুটিয়া, মিকির এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু—সকলেরই সমান মর্যাদা ছিল তাঁর 'নামঘরে' ; এঁদের মধ্য থেকে অনেকে তাঁর সম্প্রদায়ে আচার্য্য হলেন।

এই সময় শংকরদেব আরেকটি সরল পন্থা গ্রহণ করলেন। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করার পরিবর্তে (বিগ্রহসেবায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করাই ছিল প্রচলিত রীতি) উপাসনা-ঘরে কাষ্ঠবেদীতে ধর্মগ্রন্থ রেখে উপাসনা বা কীর্তনের রীতি প্রবর্তিত হল। এই গ্রন্থসেবায় কোন জাতবিচার ছিল না—যে-কোন বর্ণের ভক্তেরই গ্রন্থসেবার অধিকার ছিল।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা তাদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধার উপর এই হস্তক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে কোচদরবারে রাজা নরনারায়ণের কাছে অভিযোগ করল। অবশেষে অভিযোগকারীদের সঙ্গে শংকরদেবের এক আলোচনার আয়োজন করা হল রাজদরবারে। শংকরদেবের ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তাঁর অসাধারণ মেধা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পেয়ে নরনারায়ণ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন ; অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, রাজসভায় সম্মানলাভের পর শংকরদেব কোচবিহারকে তাঁর ধর্মপ্রচারের দ্বিতীয় কেন্দ্রে পরিণত করলেন।

শংকরদেব এরপর দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে বার হলেন। কোচবিহারে ফিরে এসে তিনি 'রামসীতা পরিণয়' নিয়ে একটি নাটক রচনা করেন এবং রাজপ্রাসাদে অভিনীত এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ভাগবত অনুবাদের কাজ করতে করতেই ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শংকরদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বা স্বধর্মমতের প্রতিপাদক কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর কবিতা, গান ও নাটকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর পুরাণ-গ্রন্থের অনুবাদেও তাঁর মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

শংকরদেব মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে হরিশ্চন্দ্রের জীবনকাহিনী অনুবাদ করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের কথ্য ভাষা 'কামরূপী'তে সরল পদ্যে তিনি অনুবাদ করেন ভাগবতের সমগ্র প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ অংশতঃ তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম স্কন্ধ। গরুড় পুরাণোক্ত ভক্তিবাদের উপর নির্ভর করে কামরূপী ভাষায় রচিত 'ভক্তিপ্রদীপ' কাব্যও তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের তত্ত্ব অনুসরণ করে তিনি সংস্কৃতে লিখলেন 'ভক্তিরত্নাকর'। মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের বিষ্ণুপুরীর 'ভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থ দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিষ্য মাধবদেবকে দিয়ে তিনি কামরূপী ভাষায় এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন (He was greatly influenced by Bhakti-ratnavali of Visnu Puri of the Madhvacarya sect, and had it translated in verse by his disciple

Madhava Deva into the Kamarupi language.) ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি কীর্তনের পদ রচনা করেন। তাঁর 'গুণমালা' শ্রীকৃষ্ণলীলাকে ভিত্তি করে রচিত সমগ্র ভাগবতের অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল পদ্যানুবাদ।

শংকরদেব দু'টি একাংক নাটিকা বা 'অঙ্কিয়ানাট' রচনা করেন। এর পাঁচটি কৃষ্ণলীলাভিত্তিক এবং ষষ্ঠটি রামসীতার পরিণয়কে ভিত্তি করে রচিত। এ ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনলীলাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি ধ্রুপদী গীত তিনি রচনা করেন; এগুলি 'বর-গীত' নামে পরিচিত।

গুরুর আদেশে মাধবদেব কামরূপী ভাষায় পদ্যে ভক্তিতত্ত্বমূলক 'নামঘোষা' রচনা করেন। বিবিধ ভক্তিশাস্ত্র থেকে সার সংগ্রহ করে এ গ্রন্থ রচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে মূলের আক্ষরিক অনুবাদও আছে। এ গ্রন্থে এক হাজার পদ বা ভক্তিগীতি আছে, এই কারণে এ গ্রন্থকে বলা হয় 'হাজারী ঘোষা'। তত্ত্বভূষণ মহাশয় আন্দাজ করেছেন ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শংকরদেবের জন্ম হয়। ৩৩ বছর বয়সে তিনি তীর্থভ্রমণে বার হন। ১২ বছর তীর্থভ্রমণ করেন। এ হিসাবে তীর্থভ্রমণ শেষ হয় ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে। অথচ আসামে জনশ্রুতি অনুসারে শংকরদেব শ্রীচৈতন্যের লোকান্তরের সময় পুরীতে উপস্থিত ছিলেন। শংকরদেবের জন্ম সাল ১৪৮৮-৯ হলে ১৪৮৬-র কাছাকাছিও হয়, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যতিরোভাব কালে পুরীতে থাকাও সম্ভবপর হয়।

আমরা আগে দেখেছি শ্রীচৈতন্য (চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায়) জগদানন্দের মাধ্যমে সনাতনকে জানাচ্ছেন, তিনি শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসবেন, সনাতন তাঁর জন্য যেন একটি জায়গা ঠিক করে রাখেন। সনাতন গোস্বামী তদনুসারে টিলার উপর চালি বেঁধে রাখলেন। আমরা আরও দেখেছি, কবিকর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যে বলেছেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন গেলে তাঁর বিরহে রায় রামানন্দ তনুত্যাগ করলেন। অর্থাৎ এটি ১৫২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দের বৃন্দাবনযাত্রা।

যাঁরা মনে করেন মহাপ্রভু একবারই বৃন্দাবন ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা অনবধান বশতঃ এসব তথ্য খেয়াল করেন নি। কিন্তু আসামের সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের নরনারায়ণের রাজত্বে কামরূপে আসার ঘটনার যে বিস্তর উল্লেখ আছে, তা কালের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা আগে দেখেছি নরনারায়ণ সিংহাসনে বসেন ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে। সে ক্ষেত্রে ঘটনাক্রম হল—

১৫২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দ	শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবনযাত্রা
১৫২৮ খ্রীস্টাব্দ	শ্রীচৈতন্যের কামরূপে ভ্রমণ, ভাগবত ও ভক্তিধর্ম প্রচার
১৫২৮ খ্রীস্টাব্দ	নরনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ
১৫২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দ	শংকরদেব কামরূপে রত্নপাঠকের নিকট ভাগবত ও ভক্তিধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অবহিত হন এবং শ্রীচৈতন্যের দেখা পেতে আগ্রহী হন এবং তীর্থভ্রমণে বার হন।

এ হিসাবে শংকরদেব তীর্থভ্রমণে বার হন ৩৩ বছরে নয়, ৪৩ বছর বয়সে। শংকরদেবের জন্ম সাল নিয়ে যখন বহুমত, তখন নির্দিষ্ট সন-তারিখ সমন্বিত অন্যান্য ঘটনার ভিত্তিতেই শংকরদেবের জীবনকাহিনীকে সাজিয়ে নিতে হবে। আমরা আগেই বলেছি, সাহিত্যিক প্রমাণও ঐতিহাসিক প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সন-তারিখ সমন্বিত ঘটনা হল এই ক'টি—নরনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ (১৫২৮), নরনারায়ণের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ এবং অসমীয়া সাহিত্যে এই ভ্রমণের এবং শংকর চৈতন্যের সাক্ষাৎকার বৃত্তান্ত। এই কালানুক্রমিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শংকরদেবের জীবনের ঘটনাবলী বিন্যস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত।

এবার আমরা শংকরদেবের রচনায় চৈতন্যপন্থার অনুগামিতা লক্ষ্য করব।

১. **নবধা ভক্তি ঃ** শ্রীচৈতন্যের ভক্তিসাধনায় ভক্তি নবধা—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং চৈব সৌখ্যমাত্মনিবেদনম্" ॥

শংকরদেব তাঁর কীর্তনে বলেছেন—

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বিষ্ণুর অর্চন পদসেবন।
দাস্য সখিত্য বন্দন বিষ্ণুত্ করিব দেহ অর্পণ॥ কীর্তন, ৩৪১

২. **দাস্যভাব ঃ** সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্য প্রথমেই বলেছেন--

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।" চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য/২০ ১০৮

মহাপ্রভু, আমরা আগেই দেখেছি, নিজেকে বলেছেন গোপীভর্তার পদকমলের দাসদাসানুদাস। মহাপ্রভু রচিত এই শ্লোকটি ('নাহং বিপ্র' ইত্যাদি) মাধবের 'নামঘোষায়' অনূদিত হয়ে সংকলিত হয়েছে এবং মাধবের ভাগিনেয় রামচরণ ঠাকুর কৃত 'শংকর-চরিত' গ্রন্থে চৈতন্য-উক্তি রূপে উল্লেখিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের এই উক্তিটি যে শংকরদেবকে পথের সন্ধান দিয়েছিল তার প্রমাণ রাজা নরনারায়ণ তাঁর জাতি ধর্ম আশ্রম জানতে চাইলে তিনি শ্রীচৈতন্যের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেই তার উত্তর দিয়েছিলেন।

"কোচরাজ নরনারায়ণ যখন শংকরদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন্ জাতি, কোন্ ধর্মাবলম্বী ও কোন্ আশ্রমী। তাহার উত্তরে শংকরদেব রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই মহাপুরুষ (মাধবদেব) রচিত ঘোষার একস্থানে তাহা এইরূপ ভাবে লিখিয়াছেন ঃ

নোহো জানো আমি চারি জাতি চারিও আশ্রমী নোহো আতি
নোহো পুণ্যশীল দান ব্রত তীর্থগামী।
কিন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্রর গোপীভর্ত্তা পদকমলর
দাসর দাস তান দাস ভৈলো আমি ॥ ৬৬৯"

['আসামে বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক মাধবদেব' ঃ শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ঃ শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ভাদ্র, ১৩৩৪, পৃ. ৬৩৩]

শংকর নিজেকে বলেছেন 'কৃষ্ণ-কিংকর'। তাঁর একটি বরগীতে আছে—

মোই মোই ঠাকুর মোহ জো হরি পরকাশা।
নাম ধরত রূপ স্মরত তাকেরি হামু দাসা॥··
কৃষ্ণ-কিংকর শংকর কহ ভজ গোবিন্দক পায়।

['শংকরদেব' ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ৮২]

৩. **কৃষ্ণদাস্য ঃ** মায়ামোহ বৈষয়িকতা বিসর্জন—

শ্রীচৈতন্য নন্দতনুজের কিংকর, শংকরদেবও কৃষ্ণ-কিংকর। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকটি স্মরণীয়,

অয়ি নন্দতনুজ কিংকরং পতিতংমাং বিষমে ভবাম্বুধৌ!
কৃপয়া তব পাদপংকজস্থিত ধূলিসদৃশং বিভাবয়!!

শংকরদেব কি এরই অনুবাদ করেছেন নিম্নোক্ত কীর্তনে?—

'হরি হরিয়ো ক্লেশ হে
হৃষীকেশ করুণাসাগর।
ময়া মহোদধি মাছে মজিলো হো
মাধব, মোক উদ্ধর॥' কীর্তন-ঘোষা [তদেব, পৃ. ৯৪]

৪. **মায়া ও লীলা ঃ** শ্রীচৈতন্যের 'বিষম ভবাম্বুধি' ও শংকরের 'মায়া মহোদধি'তে কোন পার্থক্য আছে কি?

লোকশিক্ষার জন্যই শিক্ষাষ্টকের অবতারণা। মায়াবদ্ধ জীব আপাত রমণীয় প্রেয়র পিছনে ধাবিত হয় বলেই শ্রেয়র সন্ধান পায় না। তাই ভবাম্বুধি তার পক্ষে বিষম হয়ে ওঠে। সে ওই অনিত্য বস্তুর মায়ায় হাবুডুবু খায়। কিন্তু যাঁরা ভক্ত, তাঁরা পারেন ওই ভবসমুদ্র বা মায়ার সমুদ্র অতিক্রম করতে।—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

গোবিন্দ কর্মকারের করচায় আছে, কাটোয়ায় লোকশিক্ষা দিতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

'পচাগৃহস্থের কথা কব কত আর। পুত্রকন্যা বিষয় বিভবে জরজর॥
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু তাহে দৃষ্টি নাই। চিরকাল বাঁচিব কেবল ভাব তাই॥'

পৃ ২১/১ম সং

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে আছে—

'মিছাসুত পতিনারী, পিতামাতা আদি করি
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বিহু আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ—সব মায়া তার॥ মধ্যখণ্ড, ৫৬৪

গোবিন্দের করচায় আরও আছে—

ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কার নয়।
সবে বস্ত্র অলংকার অর্থদাস হয়॥
শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে।
যাইতে হবে না আর শমন সদনে॥ পৃ. ৮৪, ১ম সংস্করণ।

একই কথা বলেছেন শংকরদেব—

'তোমার সে মায়া কর্মে বন্দী হুয়া
সংসারে উপজো মরো।
দুঃখ সাগরত ত্রাণ করা হরি
তোমার চরণে ধরো॥
তুমি আত্মা হেন জানিয়া তোমাকে
চিত্তে ভজে যিটোজন।
তুচ্ছ পুত্র দারা বিষয় ভোগত
নাহি তার প্রয়োজন॥
তোমার নামক মুখে ফুরোগাই
হিয়ে তবু রূপ ধরি।
শুনে মানে ধ্বনি পলায় পাতক
ডাকি বোলা হরি হরি॥

৫. মুক্তি নয়, ভক্তি কাম্য ঃ এইভাবে বিষয়াসক্তি ও দেহাত্মবোধ বিসর্জন দিলে ভক্তির সূচনা হয়। তখন মায়াময় জগৎ হয় লীলাময় জগৎ। ভক্ত তখন মুক্তি চায় না, নির্বাণের বিপরীতে লীলারস আস্বাদ করতে চায় সে জন্ম জন্ম ধরে।

শ্রীচৈতন্য বললেন, 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে!
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি !! শিক্ষাষ্টক ৬

গোবিন্দেব করচায় চৈতন্য-উক্তি— 'আগে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময়।
সেই দেখিবারে পায় যেই ভক্ত হয়॥
ভক্তিই পরম তত্ত্ব সংসার ভিতরে।
ভক্তিমান মুক্তিশিরে পদাঘাত করে॥

কবিকর্ণপুর 'নির্বাণ'কে বলেছেন 'নিম্বফল' (নাটক/৭ম অংক) এবং প্রবোধানন্দ 'কৈবল্য'কে বলেছেন 'নরক' (চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৫ম শ্লোকের টীকা)। শংকরদেবও 'মুকুতিউদাস'। তাঁর সম্পর্কে শিষ্য মাধবদেব লিখেছেন—

'ভকতি ভাণ্ডার-দ্বার সব চুড়ি মুকুতি কয়ল উদাস।
একশরণ হরিনাম ধরম কহো রাজা করু পরকাশ'।—নামঘোষা।

শংকরদেব নিজে লিখেছেন—'জাহে ভকতি তাহে মুকতি ভকতে এ তত্ত্ব জানা'।

[শংকরদেব, ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ৮২]

'তপ জপ তীরথ করসি গয়া কাশী বাসি বয়স গবাই।
জানি যোগ যুকতি মতি মোহিত বিন ভকতি গতি নাই॥' [তদেব, পৃ. ৮৩]

এবং সবে পরি—'না বাঞ্ছো হো সুখ ভোগ ন মাগো মুকুতি।
তোমার চরণে মাত্র থাকোক ভকতি॥
শুনে লোক নাম মোর কর্ণে তব কথা।
হৃদয়ত পাদ-পদ্ম থাকোক সর্বথা॥' [তদেব, পৃ. ৮৮]

ভক্তি সাধ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধার করেছেন ঃ

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি মর্মোর্জিতা॥'

[কর্ণপুরের কাব্য, ষষ্ঠ সর্গ ১০২]

'হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র অথবা সাংখ্যযোগ, কিম্বা স্ব স্ব বেদ-শাখার অধ্যয়ন বা তপস্যা অথবা দান. ইহারা আমাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় না। যেমন মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়॥'

[রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত]

শংকদেবও এই উক্তিটিই অনুবাদ করে বলেছেন—

'তপ-জপ পরম সন্ন্যাস মহীদানে।
ন পাবে আমাক সাংখ্য যোগ তত্ত্বজ্ঞানে॥
কেবল ভকতি মাত্র মোক করৈ বস্য।
কহিলা উদ্ধব ইটো তোমাত রহস্য॥ (শংকরদেব ; ড. মহেশ্বর নেওগ
পৃ. ১২৬)

৬. **অহমিকা বর্জন ও হরিনামকীর্তন ঃ** শ্রীচৈতন্য বলেছেন, তৃণের চেয়ে নীচ আর তরুর চেয়ে সহিষ্ণু হয়ে, অপরকে সম্মান দিয়ে নিজে অভিমান বর্জন করে সর্বদা হরি নাম কীর্তন করাই জীবের ধর্ম।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা!
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি!!' শিক্ষাষ্টক/৩

শংকরদেবও বললেন, শ্রবণ কীর্তন হীন কর্মে যার বিশ্বাস, হরি তার অনেক দূরে থাকেন : পক্ষ্যন্তরে শ্রবণ কীর্তন যাঁর ধর্ম, তাঁর অহংকার দূর হয় এবং তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণলাভ করেন।—

'করমতে বিশ্বাস জ্যর হিয়াত্ থাকন্ত হরি
অতিশয় দূর হন্ত তার ;
দূরত বিদূর হন্ত তার অহংকার থাকন্ত
সাক্ষাৎ কৃষ্ণক পাব শ্রবণ কীর্তন ধর্ম জার।'—ঘোষা

[*Literature in Kamata-Koch-Raj-Darbar*—Dr. Ajay Kumar Chakravarti, p. 34.]

শ্রীচৈতন্য বারংবার পুরাণপ্রবচন উদ্ধার করে বলেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শঙ্করদেব বলেছেন—'করিও হরির চরণে রতি, কলিত্ হরির নামে সে গতি'।
[কীর্তন-৫]

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমত—

হরি রাম হরি রাম এই মূল মন্ত্র।
কলিত নাহি তপ জপ যাগ যন্ত্র ॥ ['অসমীয়া সত্র ও সত্রাধিকারী প্রসঙ্গ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' আষাঢ় ১৩৩৪]

৭. **নাম-নামী অভেদ তত্ত্বে বিশ্বাস** : শ্রীচৈতন্য নাম-নামী অভেদ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন—

'মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই। কৃষ্ণে আর কৃষ্ণনামে কিছু ভেদ নাই'।
[গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পৃ. ১৮]

'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে, কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে মহাপ্রভু বলেছেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুইত সমান"। এ প্রসঙ্গে তিনি পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধার করেছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ ॥ [চৈ. চ. মধ্য ১৭/১৩৩]

ওদিকে নামঘোষায় আছে—

'যতেক প্রাকৃত আকার বর্জিত
বৈলন্ত যিহেতু হরি।
সেহি হেতু তেসে নিরাকার নাম
আছন্ত ঈশ্বরে ধরি ॥ ১৬২

এই ঘোষাটি উদ্ধৃত করে বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী বলেছেন, "ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শঙ্করদেব এবং তদীয় শিষ্য মাধবদেব নিরাকার ঈশ্বর সাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের কীর্তন পুঁথিতে ধ্যান বর্ণনায় যে ধ্যানের কথা উল্লেখ আছে, তাহা মানস ধ্যান। ঈশ্বরচিন্তা হেতু প্রথম অবস্থায় মানুষকে একটি রূপ চিন্তা করা বা ধ্যান করা আবশ্যক—নতুবা চিত্ত স্থির হয় না, কোন ধারণা জন্মিতে পারে না। সেইজন্য শঙ্করদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন, "মুখে বোলা রাম রাম, হৃদয়ে ধরা রূপ"। ঈশ্বর যে নিগুর্ণ, নিরাকার, নির্বিকার ও চৈতন্যস্বরূপ, ইহাও শঙ্করদেব বলিয়াছেন ; সগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে জ্ঞানোন্নতি হইলে পরে নিগুর্ণ ঈশ্বরের সাধনা করা যায়।" [অসমীয়া সত্র শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, আষাঢ়, ১৩৩৪]

৮. **নিরাকার তত্ত্ব ঃ** বলা বাহুল্য, নাম-নামী অভেদ তত্ত্বের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের নিরাকার তত্ত্ব। নাম তো নিরাকার ধ্বনি মাত্র। সেই নামের সঙ্গে যদি নামী অভিন্ন হন, তাহলে তাঁর নিরাকারত্ব অবধারিত হয়ে পড়ে।

চৈতন্য-পার্ষদ সনাতন গোস্বামী তাঁর 'দশমচরিত' বা 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে' লিখেছেন—

নির্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ নিরঞ্জন।
অব্যক্ত সত্য সন্মাত্র পরম জ্যোতিরক্ষর॥ ৪

আবার চৈতন্য পার্ষদ ওড়িষী পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দের কাব্যে নিত্যরাসের নিত্য বৃন্দাবন শূন্যস্থলী—'রূপরেখ বর্ণ সেঠারে নাহি" ('নিত্যরাহাস', ১ম ছান্দ)।

শ্রীচৈতন্য সমাদৃত 'ব্রহ্মসংহিতা'য় যে কৃষ্ণস্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা সৃষ্টি-তত্ত্বের আনন্দবাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।—পরমতত্ত্ব সর্বমূলাধার—তারই কালতত্ত্ব, তারই মায়াতত্ত্ব, তারই জীবতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব আত্মরতিপরায়ণ। কালকে নিয়ে তার সর্জনক্রীড়া। এইখানেই তার কাম—'কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'।
(ঋগ্বেদ, ১০ ১২৯ ৪)

বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে সৃষ্টি হল সেই পরমতত্ত্বের কামক্রিয়া ও বেণুবাদন—

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ ঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥১
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণ বৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্' ॥ ২৬ ব্রহ্মসংহিতা, ৫ অধ্যায়।

তিন কাল জুড়ে এই লীলা চলে বলে সেই পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ 'ত্রিভঙ্গিসুন্দর'। এখানে নিরাকার তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই তত্ত্বের দৃষ্টিতেই বলা হয়েছে 'শব্দব্রহ্মময়' বেণুর কথা। শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে নিবেশিত শব্দব্রহ্মময় বেণু বাজছে। সেইতো সৃষ্টির সুর—যে সুরের ঝরনার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে।

এই তত্ত্বের ধ্যানদৃষ্টিতেই শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম রূপ ত্রিভঙ্গিসুন্দর বেণুবাদনরত নন্দকিশোর—"শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রিয়তমং রূপং ত্রিভঙ্গি সুন্দর বেণুবাদনপর শ্রীনন্দকিশোর স্বরূপং " [শ্রীসনাতন গোস্বামী, বৃহদ্ভাগবতামৃত দিগ্দর্শিনী টীকা, ১/১/১১।]

তত্ত্বদৃষ্টির দিক থেকেই ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে পরমতত্ত্বের লীলাস্থল গোলোক 'অখিলাত্ম ভূতো' (৫ অঃ,৩৭) এবং সন্তগণ সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে প্রেমভক্তি ভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হৃদয়ে সর্বদা দেখতে পান ('প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি —তদেব, ৩৮)।

বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবের নিরাকার তত্ত্বদৃষ্টি এই ধ্যান-ধারণারই অনুসারী। সাকারের মধ্যে নিরাকার তত্ত্বটিকে দেখতেন বলেই শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন দেবদেবী-প্রতিমার সামনে নতিস্তুতি করেছেন, কিন্তু নিজে কোন বিগ্রহের অর্চনা করেন নি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির নিত্য পূজা এসেছে অনেক পরে। শঙ্করদেবের সময়ও আসামের কোন সত্রে বিগ্রহ ছিল না, তা এসেছে অনেক পরে।

৯ **অবিকারী পরিণাম ও ভেদাভেদবাদ ঃ** বৈষ্ণব সাধক বলেন, নিত্যকাল ধরে চলেছে লীলা ও লীলারস আস্বাদন। লীলাময় ঈশ্বর নিত্য, লীলাস্বাদী জীবও নিত্য। 'ব্রহ্মসংহিতা'য় বলা হয়েছে—জীবাত্মা নিত্য এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার নিত্যসম্বন্ধ—'স নিত্যো নিত্য সম্বন্ধঃ'। এর টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন—"'নিত্যঃ' অনাদ্যনন্তকালভাবী, 'নিত্যসংবন্ধঃ' (৫/২১) ভগবতা সহ নিত্যঃ সংবন্ধঃ সমবায়ো যস্য সঃ, সূর্য্যেণ তদ্রশ্মিজালস্যেবেতি ভাবঃ। তথা চ গীতাসু—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইতি শ্রুতিশ্চ নিত্য সংবন্ধং দর্শয়ন্তি॥"

এই নিত্য সম্বন্ধের জন্যই বৈষ্ণব দর্শনে জগৎ মিথ্যাবাদ অস্বীকৃত হয়ে পরিণামবাদ স্বীকৃত হয়েছে। বৈষ্ণব দর্শনে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের অবিকারী পরিণাম। জীবজগৎ ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার্য।

ভাগবতে সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে এই ভেদাভেদ বোঝানো হয়েছে। শ্রীহরিকে স্তুতি করে শঙ্কর বলেছেন—

'পূর্ণ ব্রহ্ম নিত্য তুমি অজ অবিকার। আনন্দ স্বরূপ নিরালম্ব নিরাধার॥
এক নিরঞ্জন হয়্যা নানাভেদ ধর। রূপভেদে বিশ্বোৎপত্তি স্থিতি লয় কর॥
একই সুবর্ণ যেন নানাভেদ ধরে। অগেয়ান বলে কটক কুণ্ডল হারে'॥
[ভাগবতাচার্য্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী', ৮ ৩]

মহাপ্রভু মহারাষ্ট্রীয় অর্জুন পণ্ডিতকে যা বলেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অর্জুন বলেছিলেন 'আত্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব দুই এক জানি'। তার উত্তরে মহাপ্রভু বলেন—

'দ্বা সুপর্ণা এ শ্রুতির মর্ম যদি জান। তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান॥
জীব আত্মা পরমাত্মা এইভাবে রয়। আত্মা মহাবৃক্ষ জীব তার পত্র হয়।
—গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পৃ. ১২৯, ১ম সং

অন্যত্র তিনি বলেছেন—
'সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল। সেই দেখে আঁখি যার হয় নিরমল॥' [তদেব]
অনুরূপভাবে বিভোর হয়ে শঙ্করদেব গেয়েছেন—

'যত জীব জঙ্গম কীট পতঙ্গম
অগ জগ নগ তোরি কায়া'। ['শঙ্করদেব', ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ৭৯]

এবং—'নমো নমো মাধব মাধব বিধির বিধিদাতা।
তুমি জগতর গতিমতি পিতামাতা॥
তুমি পরমাত্মা-জগতর ঈশ এক।

একো বস্তু নাহিকে তোমার বিতিরেক ॥
তুমি কার্য কারণ সমস্তে চরাচর।
সুবর্ণ কুণ্ডলে যেন নাহিকে অন্তর ॥
তুমি পশুপক্ষী সুরাসুর তরু তৃণ।
অজ্ঞানত মূঢ় মনে দেখে ভিনাভিন ॥...
সমস্ত ভূতর তুমি আছা হৃদয়ত।' [তদেব, পৃ. ৮৭]

যাঁরা বলেন শঙ্করদেব অদ্বৈতবাদী, তাঁরা একটি ভ্রান্ত প্রচারের অনুবর্তী মাত্র। ডঃ সতী ঘোষ প্রণীত 'ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী' থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি ;—"দার্শনিক হিসাবে কিন্তু শঙ্করদেব অদ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদী দার্শনিকদের মত তিনি পরমাত্মার দ্বৈতসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর সম্প্রদায়ে অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহের স্থান নেই। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শঙ্করদেবের অদ্বৈতবাদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় যাতে তাঁকে পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী বলে স্বীকার করা যায় না। শঙ্করদেবের মতে যদিও পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার উৎপত্তি তবু তাঁরা অভিন্ন নন, এবং অস্তিত্ব হিসাবে উভয়েই স্বাধীন, তবে অস্তিত্বে পৃথক হলেও পরমাত্মা ও জীবাত্মা অবিচ্ছেদ্য, এবং মায়ার বশে জীব ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দ থেকে বঞ্চিত।" [ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১২৩-২৪]

এই যে প্রায় একই নিশ্বাসে শঙ্করদেবকে 'অদ্বৈতবাদী' এবং 'পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী নয়' বলতে হচ্ছে, এরই মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত। অদ্বৈতবাদী অথচ পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী নন যাঁরা, তাঁরাই হলেন ভেদাভেদবাদী অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বলেছেন—"ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্ত্তা। তিনি জগতের অতীত। জগতের অতীত বলিয়া, জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদ। আবার জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ভিন্ন ইহার আর কোন উপাদান নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। জগৎ গুণাত্মক এবং ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণ (অথবা শক্তি) পৃথকরূপে অস্তিত্ববান্ নহে। অথচ গুণী বস্তু গুণ হইতে অতীতও বটে। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন। তত্ত্বমসিবাক্যে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মো ভেদও আছে। জীব ব্রহ্মের অংশ, এবং অসর্বজ্ঞ। ব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। জীবের মুক্তাবস্থায়ও সর্বশক্তিমত্তা হয় না। অতএব জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ। মুক্তিতেও জীব অংশই থাকে।"

['বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' পৃ. ৩৮০-১]

শঙ্করদেব বলেছেন, 'তুমি কার্য কারণ সমস্তে চরাচর।' 'এক নিরঞ্জন হুয়্যা নানাভেদ ধর। রূপভেদে বিশ্বোৎপত্তি স্থিতিলয় কর ॥' 'সমস্ত ভূতর তুমি আছা হৃদয়ত', 'যত জীব জঙ্গম কীটপতঙ্গম্ অগ জগ নগ তোরি কায়া'।—এ সবই দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদের কথা।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আচার্য নিম্বার্ক জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বলেছেন— "অবিভাগেহপি সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব, সূর্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ।" অর্থাৎ "যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য ও তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন – সেইরূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।" [বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, পৃ. ৩৮৫]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার মতবাদ নিম্বার্কীয় মতবাদে সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল"। [তদেব, পৃ. ৩৮৯]

আমরা আগেই দেখেছি, জীবগোস্বামী ব্রহ্মজীব সম্বন্ধে বলেছেন 'সূর্যেণ তদ্রশ্মিজালস্যেতি ভাবঃ'।

অর্থাৎ দার্শনিক প্রতীতির ক্ষেত্রে শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যেরই অনুগামী।

১০ গোপীভাব সাধনা ঃ মহাপ্রভু প্রেমভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

'ঈশ্বরের লাগি আর্তি হয় যদি মনে। নিশ্চয় তাহারে প্রেম কহে মহাজনে॥
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া। যার অল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া॥
যুবতীর আর্তি যথা যুবক দেখিয়া। সেইরূপ আর্তি আর না দেখি ভাবিয়া॥
এ কারণ ভক্তগণ ভজে যদুপতি। পত্নীভাবে তাঁর প্রতি স্থির করি মতি॥'

[গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা, ১ম সং, পৃ. ২০]

অন্যত্র উপদেশ দিয়েছেন,

বড়ই দয়াল হরি জগতের গতি। তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি॥
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ। কাত্যায়নী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধমন॥
কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়। কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয়॥

[তদেব, ১৪২]

এই স্বকীয়াভাবের সঙ্গে পরকীয়াভাবেরও উল্লেখ করেছেন তিনি,

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা। যেইভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা॥
সেইভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বারবার। আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের আঁধার॥

[তদেব, ১৫৫]

শ্রীসনাতন গোস্বামীও লিখেছেন,

যা ভর্তৃপুত্রাদি বিহায় সর্বং, লোকদ্বয়াত্থাননপেক্ষমানাঃ।
রাসাদিভিস্তাদৃশ বিভ্রমৈস্তৎপ্রীত্যাহ ভজংস্তত্র তমেনমার্তঃ॥

[বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৭।৮২]

টীকায় লিখেছেন, ' পরমরহস্যত্বেনাত্র প্রকাশয়িতুমযোগ্যয়া রীত্যা প্রকারেণ ঔপপত্যকৃত সৈরিণীবন্মধুর ভাববিশেষ পরিপাট্যেত্যর্থঃ।'

'যে সকল গোপী পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদিরূপ বিলাসশ্রেণী বা তাদৃশ অনির্বচনীয় বিলাস বিশেষ দ্বারা কোন এক সুগোপ্য রীতিতে প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। এখানে 'সুগোপ্য রীতি'র তাৎপর্য

এই যে, স্বৈরিণীকৃত ঔপপত্যসদৃশ মধুর ভাব বিশেষ পারিপাট্যের সহিত পরম তৃষ্ণাতুরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা।' [ভক্তিরত্ন গোস্বামী অনূদিত]

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে দাস্যভাব ও মাধুর্যভাব দুয়েরি কথা আছে—শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে তিনি নিজেকে বলেছেন 'নন্দতনুজের কিংকর' ; আবার শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে বলেছেন, ওই লম্পট নন্দতনুজই তাঁর একমাত্র প্রাণনাথ।—

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥'

শংকরদেবের রচিত বহু গান ও কবিতায় মধুর রসাশ্রিত গোপীভাব ব্যক্ত হয়েছে। ড মহেশ্বর নেওগের 'শংকরদেব' গ্রন্থ থেকে এই ধরনের কিছু পদ ও অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।—

১ হেরহু মাই চললি বিপিনে মধাই।
বেণু বিষণে নিসানে আওয়ত
হরষে হরষে ধেনু ধাই॥ ॥ ধ্রু॥
ওহি জগ-মোহন স্কন্ধে দধি ওদন
গোধন আও বুলাই।
বঙ্কিম নয়ন সরোরুহ হাসি
হেরইতে ভুবন ভুলাই॥
হরি-বিরহানল-আকুল গোপীনী
দরশন দিবসে ন পাই।
হরি গুণ কহি রহি প্রেমে ঝুরথ নীর
শংকর এহু রস গাই॥ [বরগীত]

'মাগো, দেখ, ঐ যে মাধব বনে চলেছে। বেণু বিষাণ বাজিয়ে সে ইশারা জানাচ্ছে আর হর্ষভরে ধেনুরা ধেয়ে যাচ্ছে। গোধনকে 'এস' 'এস' বলে সে জগতের মন হরণ করে দধি ওদন কাঁধে নিয়ে চলেছে। তার বাঁকা চোখ পদ্মের মত, তার হাসি ভুবন ভুলিয়ে দেয়। হরির বিরহানলে আকুল গোপিনীরা দিনের বেলা তার দেখা পায় না। কেঁদে কেঁদে তারা হরির গুণ গান করে—শংকর সেই রস গান করছে'।

দিনের বেলা গোপিনীরা হরির দেখা পায় না—এ সনাতন গোস্বামী কথিত সেই 'সুগোপ্য রীতি'।

২. কহরে উদ্ধব কহ প্রাণের বান্ধব হে প্রাণকৃষ্ণ কবে আবে।
পুছয়ে গোপী প্রেম-আকুল-ভাবে নাহি কেতন গাবে॥ [বরগীত]

'কহো হে উদ্ধব প্রাণের বান্ধব, প্রাণকৃষ্ণ কবে আসবেন'—প্রেমাকুল চিত্তে গোপীরা এ কথা উদ্ধবকে বলতে লাগল।'

৩. ঘোষা ॥ কৈত পাইবো প্রাণ গোপাল আমি
হরাইল অরুণ লোচন স্বামী ॥

পদ ॥ উচ্চ বৃক্ষ দেখি সোধে আদরি।
শুনিয়ো অশ্বত্থ বট পাকড়ি ॥
যাহান্তে দেখিলা নন্দ কুমার।
নেন্ত চুরি করি চিত্ত আমার ॥ [কীর্তন ঘোষা]

'কীর্তন ঘোষা'র অন্তর্গত 'রাসক্রীড়া' থেকে এই অংশটি গৃহীত হয়েছে। বৃন্দাবনে এক পূর্ণিমা-রাত্রে ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণায় গিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলে গোপিনীরা আকুল হয়ে তাদের চিত্তচোর নন্দকুমারের সন্ধান করতে লাগল।—

'কোথায় পাবো প্রাণ গোপালকে, আমার সেই অরুণলোচন স্বামীকে যে হারিয়ে ফেললাম'। উচ্চবৃক্ষ দেখে তাকে সাদরে প্রশ্ন করে—'শোন অশ্বত্থ-বট-পাকুড়, তোমরা কি যেতে দেখেছ নন্দকুমারকে? সে যে আমার চিত্ত চুরি করে নিয়ে গেল।'

৪. শংকরদেব রচিত 'কেলি-গোপাল' নাটকে গোপীদের গান—কৃষ্ণ ছলনা করে তাদের ঘরে ফিরে যেতে বললে গোপীরা বললেন—

'হরি হে বুঝলো তুহু বর নিদয়া
নিকরুণ বাণী বাণে মরম হানি
দারল হামাকেরি হৃদয়া ॥ ধ্রু ॥
পতি সুত সব অব ছোড়ি পরল নাথ
তুঝু পদ পঙ্কজ আগ।
ভকত গোপাল গোপাল তোহি কৈসে
টুটল নব অনুরাগ ॥
তুহু বিনি মাধব দেহা নাহি রাখব
বিরহিনী ছোড়ব প্রাণ।
ন কহ হু নৈরাশা তুহু জগতাবাসা
কৃষ্ণকিংকরে এহু ভাণ ॥

অনুবাদ

হরি তুমি বড়োই নির্দয়।
অকরুণ বাণী-বাণে বিঁধেছো অন্তর আর
ভেঙে দিলে মোদের হৃদয় ॥ ধ্রু ॥
পতিপুত্র সব কিছু ছেড়ে তো এসেছি নাথ
তোমারি এ পংকজ চরণে
ভক্ত-সহৃদয় ব'লে গোপাল তোমার খ্যাতি,
অনুরাগ টুটিল কেমনে ॥

মাধব তোমারে ছাড়া রাখিব না দেহ আর
বিরহিনী ছাড়িব জীবন।
বিশ্বপতি তুমি যেন কোরো না নিরাশ
কৃষ্ণের কিংকর এই কন॥

এখানে দেখা গেল, শংকরদেবের কৃষ্ণদাসা গোপীদের মধুর ও পরকীয়া রস আস্বাদনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। যাঁরা বলেন শংকরদেব পরকীয়া ভাব বর্জন করেছেন, এবং এইখানে শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেবে পার্থক্য, তাঁরা ভুলে যান ভাগবতের কৃষ্ণলীলাই শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়ের উপজীব্য এবং ভাগবতে স্বকীয়া পরকীয়া উভয় লীলাপ্রসঙ্গ আছে; নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকারের মত, স্বকীয়া-পরকীয়ারও সমন্বয় ক্ষেত্র ভাগবত। উপরি-উদ্ধৃত পদে গোপীরা পতি-সুত রমণী সব ছেড়ে এসেছে—মায়িক সম্পর্কের দিক থেকে এখানে পরকীয়াভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এই একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত পদেও—

৫. মাই, মাই, হরিক বিছুরি কত রহবি।
জাহে নেহারি সুর-রমণী মুরুছি পরে
তাহে বিরহ কত সহবি॥·· ·· [কেলিগোপাল নাট]

কৃষ্ণের সঙ্গে রাসনৃত্যের পর ব্রজগোপীদের দিনের বেলায় গৃহরুদ্ধ থাকতে হচ্ছে এই বেদনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

শংকরদেব সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মন্তব্য—"অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শংকরকে মাধুর্যরসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই"—স্মরণে রেখে বলতে পারি, শংকরদেবের প্রথম জীবনে এ কথা সত্য হলেও হতে পারে; কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি যে মাধুর্যরসও আশ্রয় করেছিলেন, তাঁর সমগ্র রচনার সাক্ষ্যে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। কেউ কেউ বলেন, শংকরদেব সত্যভামা রুক্মিনীকে গ্রহণ করেছেন, কেননা তিনি স্বকীয়ামার্গ আশ্রয় করেছেন; পরকীয়াবাদ পছন্দ করতেন না বলে তিনি রাধাপ্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। এ রকম ধারণার হেতু কি তা বোঝা যায় না। শংকরদেব লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বকীয়া ভক্তির প্রাধান্য দিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যও কৃষ্ণকে পতিভাবে উপাসনা করার কথা বলেছেন। শ্রীচৈতন্য কাব্য সংগীত বা নাটকের ক্ষেত্রে উপভোগ করতেন 'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস'। শংকরদেবও কাব্যে সংগীতে ও নাটকে প্রয়োজনমত পরকীয়াভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। যাঁরা বলেন, শংকরদেব রাধাবাদ বর্জন করেছিলেন, তাঁরা স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত—তাঁদের নিজেদের কথাতেই এর প্রমাণ আছে।

ড. অজয়কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন—"Sankardeva never supported the RADHA-HOOD, but sometimes, he painted the characters of the gopis and narrated their love towards Krishna. Sankardeva narrated the situation of Gokula when Krishna left for Mathura :

কমন ভাগ্যবতী ভয়োরে সুপরভাত
আজু ভেটব মুখ চন্দা ।
উগত সুব দূর গেও গোবিন্দ
ভয়ো গোপউর আন্ধা ॥
আজু মথুরাপুর মিলব মহোৎসব
মাধব সাধব মান ।
গোকুল মঙ্গল দূর গেও
নাহি বাজত বেণু বিষাণ ॥
আজু যত নাগরী করত নয়ন ভরি
মুখ পংকজ মধুপানা ।
হামারি বংক বিধি হাতে হরল নিধি
কৃষ্ণকিংকরে রস ভাণা । ·

Further we find :—

উদ্ধব চলহু গোকুল লাই
হামু বিনে গোপীর তিলেক যুগ যাই ।

of. Vidyapati :—

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি ।"

[*Literature in Kamata-Koch-Raj-Darbar* P.46-47]

অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"শংকরদেবের বৈষ্ণবধর্মে ও তদ্‌রচিত সাহিত্যে রাধার স্থান আদৌ নাই। 'It should however be noted that, unlike as in the Vaishnavite literature of other provinces, Radha does not appear, nor does she find a place in the whole of Shankarite literature'. [B. K. Barua—*History of Assamese Literature* (Sahitya Akademi, New Delhi, 1964. p. 24)] শংকরদেব প্রবর্তিত 'একশরণ নামধর্ম' ভাগবত পুরাণের রাস অংশে রাধার উল্লেখ নাই।···তবে তৎপ্রণীত 'কেলিগোপাল' নাটকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যথা,—'নিশম্য গর্বং গোবিন্দো গোপীনাং প্রেমবৃদ্ধয়ে। রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজযোষিতঃ ॥' (কেলিগোপাল) ; তুলনীয়, 'কংসারিরোহপি সংসার-বাসনাবন্ধশৃংখলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী ॥' (গীতগোবিন্দ)। অতএব দেখা যাইতেছে, শংকরদেবের রচনায় এই একটি মাত্র স্থানে 'রাধা'র উল্লেখ আছে।"

[পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য, পৃ. ২৩-২৪]

একটিমাত্র স্থানেও যদি শংকরদেব রাধার উল্লেখ করে থাকেন, তা হলে কি করে বলা সম্ভব যে, সমগ্র শংকরীয় সাহিত্যে কোথাও রাধার স্থান আদৌ নেই—তা আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে অপারগ। অনেক স্থানে রাধার নাম উল্লেখ না করে শংকরদেব গোপীর পরকীয়াভাব বর্ণনা করেছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। ভাগবতে 'রাধা' না

থাকলেও প্রধানা গোপী আছেন—যাঁর প্রতি ভাগবতের 'অনয়ারাধিতো ' শ্লোকটি প্রযুক্ত হয়েছে। শংকরদেব রাধাকে বর্জন করেন নি, গোপীভাবের আধারে রাধার পরকীয়া মধুরা রতি প্রকাশ করেছেন। অন্যতমা গোপীই তো রাধা।

রাধার এই গোপীসত্তা অনেকে ভুলে যান। রাধার প্রচুর উল্লেখ দূরে থাকুক, একেবারেই উল্লেখ নেই ভাগবতে। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকেও 'রাধা' নেই, আছে গোপীভাব। শংকরদেব একটি জায়গায় রাধার উল্লেখ করেছেন, না করলেও কিছু এসে যেত না। কেননা গোপীভাব তিনি নিয়েছেন।

ড. সতী ঘোষ প্রণীত 'ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী'তে শংকরদেব রচিত মধুররসের গোপীভাবের কয়েকটি কীর্তন উদ্ধৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনিও শংকরদেবের রচনায় 'রাধা' নামটি দেখতে না পেয়ে লিখেছেন, "এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শংকরদেবের রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণব সাহিত্যের বিপরীত, কোথাও রাধানামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।"

[ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১২৮]

এর আগে আমরা দেখেছি, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় শংকরদেবের 'কেলিগোপাল নাটে' 'রাধা' নামোল্লেখের স্থলটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "এই একটিমাত্র স্থানে 'রাধা'র উল্লেখ আছে।" এবং প্রায় একই নিশ্বাসে বলেছেন "শংকরদেবের বৈষ্ণবধর্মে ও তদরচিত সাহিত্যে রাধার স্থান আদৌ নাই।" এই স্ববিরোধিতার একটাই অর্থ—প্রচলিত মতের বিরোধিতা না করা। প্রচলিত মতের স্বার্থেই ড বিমানবিহারী মজুমদারের মত পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও বলেছেন—"অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শংকরকে মাধুর্য্যরসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই।"

[চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ৫১০]

অথবা, "শংকরদেব যদি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাকিত।" [তদেব পৃ. ৫১৭]

শংকরদেব রচিত 'কীর্তন ঘোষা'র নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে যে মধুর রস, তা কি যথেষ্ট মধুর নয়?—(ভাগবতে রাধা নাম নেই, তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য শংকরকে ভাগবতেই রাধার উল্লেখ করতে বলবেন কেন? শ্রীচৈতন্যের নিজের রচনা শিক্ষাষ্টকে গোপীভাব থাকলেও রাধার উল্লেখ নেই কেন?)—

'শরত কালর রাত্রি অতি বিতোপন। রাসক্রীড়া করিতে কৃষ্ণর ভৈল মন॥
ভৈলন্ত উদিত চন্দ্র পূর্ব দিশ হন্তে। কামাতুরা স্ত্রীর যেন সন্তাপ মার্জন্তে॥
বনকো দেখিলা চন্দ্র রশ্মিয়ে রঞ্জিত। সুস্বর মধুর করি হরি গাইলা গীত॥
শুনি কামে উত্রাবল হুয়া গোপীগণে। দিলেক লবড় গীতধ্বনি নিরীক্ষণে॥
পিয়ন্তে আছিল শিশু তাহাকো ন গণি। পতি শুশ্রূষাকো এড়ি যায় কতো প্রাণী॥

['কীর্তনঘোষা', একাদশ খণ্ড প্রথম ভাগ, প্রথম কীর্তন]

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের গার্হস্থ্যধর্মে উপদেশ দিবে বললেন—

'উপপতি সমে ক্রীড়া গরিহিত কর্ম। স্বামী শুশ্রূষা কুলস্ত্রীর মহাধর্ম॥
জানিয়া গৃহতে থাকি করিয়ো ভকতি॥ [তদেব, দ্বিতীয় কীর্তন]

দুঃখিত অন্তরে গোপীরা বললেন —

‘কহিলা যিটো কুলস্ত্রীর কর্ম। তোমাতে থাকোক সি সব ধর্ম ॥
জগতরে বন্ধু আত্মা তুমি। সমস্ত ধর্মর আপনি তুমি ॥
তুমি আত্মা হেন জানি সম্প্রতি। তোমাত সে করে ভকত রতি ॥
ন লাগে পতিপুত্র দুঃখ হেতু। হুয়োক প্রসন্ন গরুড় কেতু ॥
হরিলা চিত্ত ন থাকয় ঘরে। হস্ত দুই গৃহ কৃত্য ন করে ॥
জ্বলে কামানলে তোমার গীতে। নিমায়োক তাক অধরামৃতে ॥
নহি বিরহেতে দহিয়া তনু। লভিবো তোমার সামীবা পুনু ॥

[তদেব, তৃতীয় কীর্তন]

তখন —‘গোপীর শুনিয়া আকুল বাণী। ভৈলন্ত সদয় সারঙ্গ পাণি ॥
হাসিয়া বোলন্ত এড়িয়া তাপ। গোপীক ক্রীড়িলা জগতবাপ ॥
আনন্দে গোপীর বঢ়ায়া কাম। রোমিলা গোপীনাথ অবিশ্রাম ॥’

[তদেব, চতুর্থ কীর্তন]

গোপীর মধুর ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেবের বাক্‌সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ বিরহে ‘যুগায়িত নিমেখ’-এর কথা বলেছেন—

‘যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥’

এখানেও রাধার নাম নেই, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ একে রাধার উক্তিরূপেই গ্রহণ করেছেন। শংকরদেব অনুরূপ ভাব ফুটিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের জবানীতে—‘চলো উদ্ধব, গোকুলে যাই, আমা বিনা গোপীর এক মুহূর্ত একযুগ বলে মনে হচ্ছে।’

‘উদ্ধব চলহু গোকুল লাই
হামু বিনে গোপীর তিলেক যুগ যাই।’

ড. অজয় চক্রবর্তী এখানে বিদ্যাপতির সঙ্গে বাক্ সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। সে সাদৃশ্য অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, বিদ্যাপতি বলেছেন, ‘তিল এক হয় যুগ চারি’; আর শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়েই বলেছেন ‘যুগায়িত নিমেষে’র কথা, চারযুগের কথা নয়। তর্কচ্ছলে কেউ বলতে পারেন, এ ক্ষেত্রে শংকরদেব ভাগবতের গোপীভাবকেই অনুসরণ করেছেন, চৈতন্যকে নয়; তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে আসামে ওই ভাগবত প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য এবং রাজপুরুষ শংকর গোমস্তা তাঁর ধর্মজীবনের সূচনায় চৈতন্য নিয়োজিত ভাগবতপাঠকের নিকটই প্রথম ভাগবতের (এবং চৈতন্যেরও) সন্ধান পান। এ বিষয়ে প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেবের রচনায় আরও কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

১০. তর্কবাদ পরিহার : ‘অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়। বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর’ ॥ [চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য/৮/৩০৮]

শ্রীচৈতন্যের তর্কে রুচি ছিল না। চৈতন্যপার্ষদ প্রবোধানন্দ বলেছেন, তিনি দূর থেকেই কুতর্করূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করতেন ('দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান' 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, ১০৫)। গোবিন্দ কর্মকারের করচায় আছে—রামেশ্বর তীর্থে এক পণ্ডিত বিতর্কে আগ্রহী হলে,—

'প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই। হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই ॥
আতাল পাতাল দূর করি ভক্তিভরে। কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ-অন্তরে ॥
অহংকারে কিবা কাজ ওহে সাধুজন। বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥
নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাত্মা পণ্ডিত। এই কথা সবে বলে শাস্ত্রের লিখিত ॥
বহু শাস্ত্র জানিয়া যে হয় কামাচার। কি করিবে সেই মূর্খ করিয়া বিচার ॥'

[১ম সং, পৃ. ১০২]

'শাস্ত্র' বলতে মহাপ্রভু সম্ভবতঃ ভাগবতের কথাই বলতে চেয়েছেন। ভাগবতে (৭ ৪) আছে—

'বিবাদ বর্জিব তর্ক ন্যায় দরশন। কভু না করিব বহু শাস্ত্র অভ্যাসন ॥
বহু শিষ্য না করিব না পঢ়াব বেদ। কার সঙ্গে কভু না করিব মতভেদ ॥
সকল আরম্ভ তেজি তত্ত্বে মন দিব। সমচিত্ত শান্ত হয়্যা শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥

—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী

শংকরদেব এই পথেরই পথিক। কীর্তন ঘোষায় তিনি বলেছেন—

'মিছা তর্কবাদে ভৈল অন্ধকার
তাতে ভ্রমো মন্দমতি।
তবু জ্ঞান পন্থ খুজিয়া ন পা আো
করা হরি মোর গতি ॥'

[শংকরদেব : ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ৯৪]

আর একটি বরগীতে তিনি বলেছেন—

'পণ্ডিতে পঢ়ে শাস্ত্র মাত্র, সার ভবতে লিয়ে।
অন্তর জল ফুটয় কমল, মধু মধুকরে পিয়ে ॥' [তদেব, পৃ. ৮২]

১১ জাতিভেদ বর্জন: মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য অদ্বৈত আচার্য ভক্তিমার্গের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন চৈতন্যের কাছে।—

'অদ্বৈত বোলেন, যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥'

[চৈতন্যভাগবত, মধ্য ষষ্ঠ অধ্যায়]

সন্ন্যাসদীক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য সমাজে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। বর্ণাশ্রমের চিহ্ন শিখাসূত্র সে পথে বাধার সৃষ্টি করবে জেনে তিনি সেগুলি ত্যাগ করলেন।

মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বলিলা বচন। দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ ॥
শিখাসূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব। তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব ॥

[গোবিন্দ কর্মকারের করচা, পৃ. ৬]

শ্রীচৈতন্য বারবার ঘোষণা করেছেন—

'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।'

তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত 'ব্রাহ্মণ' বাসুদেব সার্বভৌম লুটিয়ে প্রণাম করেছেন 'যবন' হরিদাসকে, বলেছেন,—'জাতিকুলানপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ' (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)। চৈতন্যভাগবতের কালজয়ী ঘোষণা—'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি—নাই।'

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যসম্প্রদায়ে এই জাতিভেদ বিরোধী অভিযান যে অব্যাহত ছিল, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনকাহিনীতে তার পরিচয় আছে। 'অব্রাহ্মণ' হয়েও তাঁরা 'ব্রাহ্মণ'দের দীক্ষা দিয়েছেন। নরোত্তম ঠাকুর সম্পর্কে সেকালের 'ব্রাহ্মণ' সমাজ গেল গেল রব তুলেছিল।

'কৃষ্ণানন্দ দত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস। ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্বনাশ॥
বুঝি এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত। শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত্ত॥

[প্রেমবিলাস]

শ্যামানন্দের মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে সের খাঁ (বৈষ্ণব নাম শ্রীচৈতন্য দাস) উল্লেখযোগ্য।

শংকরদেব এ ক্ষেত্রেও চৈতন্যের অনুগামী ছিলেন। কীর্তনঘোষার একটি কীর্তনে আছে—উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

'সমস্তে ভূততে ব্যাপী আছো মই হরি।
সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণুবুদ্ধি করি॥
ব্রাহ্মণর চণ্ডালর নির্বিচারি কুল।
দাতাত চোরত যেন দৃষ্টি একতুল॥
কুকুর চণ্ডাল গর্দভরো আত্মা রাম।
জানিয়া সবাকো পরি করিয়া প্রণাম॥
স্ত্রী-শূদ্র করে যদি আমাত ভকতি।
তাহাত কহিবা হটো জ্ঞান মহামতি॥

[শংকরদেব ; ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ১০১]

'কীর্তনঘোষা'র আরেকটি পদে আছে—

যিটো মহা ম্লেচ্ছ জাতি সিও শুদ্ধ হোবে আতি
মুখে মাত্র হরিনাম লয়।
কলির ভয়ত গৈয়া নামত শরণ লৈয়া
রহিল সমস্ত ধর্মচয়॥ [তদেব, পৃ. ১০৪]

"শংকরদেব নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণদের তিনি ভক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরাও তাঁকে অধ্যাত্ম গুরুর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিলেন। উগ্র বর্ণভেদ-বাদীরা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁকে এজন্য কোচ রাজদরবারে

যুক্তি দাখিল করতে হয়েছিল। শূদ্র প্রচারিত ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে দামোদরদেবকেও জবাবদিহি করতে হয়েছে। সেদিন যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, শূদ্র যদিও বৈদিকমন্ত্রে কাউকে দীক্ষিত করতে পারেন না, নামমন্ত্র বিতরণে তাঁর অধিকার অবশ্যই আছে। শংকরদেবের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান চাঁদসাই ও জয়হরি; গারো গোবিন্দ; ভুটিয়া জয়ানন্দ; হীরা অথবা কুম্ভকার জয়ন্তী মাধব; বণিক দামোদর। .. আহোম, কোচ, মিরি, কাছাড়ি, মরাণ এবং অন্যান্য নানা উপজাতিও সহজেই শংকরদেবের সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়েছে।" [তদেব, পৃ. ৪৯-৫০]

১২. **শক্তিদেবীর পূজায় বলিদানের বিরোধিতা ঃ** সুরাটে সুরথ রাজার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা ভগবতীর মন্দিরে জীববলি নিষেধ করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। গোবিন্দ কর্মকারের করচায় আছে—

ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায়। অষ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায়॥
অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিত সুরথ রাজার। ভগবতী দেখে হৈল আনন্দ অপার॥..
কহিতে কহিতে কথা একই ব্রাহ্মণ। ছাগ বলি দিতে আসে দেবীর সদন॥
প্রভু বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে। নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে॥ .
তামস আহারে রতি তাই মেধ ছাগ। কাটিতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ॥
পশুহিংসা করিয়া পাইবে পরিত্রাণ। সেই লাগি আনিছ করিতে বলিদান॥
আত্মাবে বাহির কর শরীর হইতে। মৃতদেহ মধ্যে আত্মা পার কি পুরিতে॥
দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তি ভরে। নরবলি রূপে তব শিরশ্ছেদ করে॥
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই। পশু ছাড়ি দেহ মুহি চক্ষে দেখে যাই॥ .
পরম বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়। তবে কেন বলি দানে ভুলাও তাঁহায়॥

[১ম সং, পৃ. ১৫৫-৬]

শংকরদেবের শিষ্য দামোদর শংকরদেব সম্পর্কে লিখেছেন—"তেও পরম বৈষ্ণবী দুর্গা দেবীর পূজা করাতো কাকো বাধা নি দিছিল, কিন্তু জীব হিংসা করি তেও পূজা করিবা খুজিলে বর আপত্তি করিছিল।"—অর্থাৎ পরম বৈষ্ণবী দুর্গা দেবীর পূজা করতে তিনি কাউকে বাধা দেন নি, কিন্তু জীবহিংসা করে কেউ সেই পূজা করতে চাইলে তিনি খুব আপত্তি করেছিলেন।

[*Literature in Kamata-Koch Raj-Darbar* p. 53]

১৩. **অন্যদেবতার নিন্দন বন্দন নিষেধ ঃ** বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর *Bengal Vaishnavism* গ্রন্থে লিখেছেন—"হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পূজার্চনার বৈদিক প্রথা অনুসারে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে একমাত্র অধিকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত; —এ সবের অবসান ঘটিয়ে বৈষ্ণবেরা যে-কোন উৎসবেই করতেন নাম কীর্তন আর মহোৎসব। এই কারণেই বলা হয়েছে—

'না করিবে অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।
না করিবে অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ॥'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। অন্য কোন দেবতার নিন্দাবন্দনা প্রসাদ গ্রহণ কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।" [পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

শংকরদেবেও একই উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

'অন্য দেবী দেব না করিবা সেব
ন খাইবা প্রসাদ তার।
মূর্তিকো ন চাইবা গৃহো ন পশিবা
ভক্তি হৈব ব্যাভিচার॥
একে কৃষ্ণদেব করিয়োক সেব
ধরিয়ো তাহান নাম।
কৃষ্ণদাস হুয়া প্রসাদ ভুঞ্জিয়া
হস্তে করা তান কাম॥'

[শংকরদেব : ড. মহেশ্বর নেওগ, পৃ. ১২৪-৫]

উপরিলিখিত আলোচনায় আমরা দেখলাম—

১. আসামের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচয়িতাদের অধিকাংশের মতে রাজা নরনারায়ণ ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে কামতা-কোচ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শংকর গোমস্তা-পদে নিযুক্ত হন।

২. ১৫০২ (মতান্তরে ১৫১৩) খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের সেনাবাহিনী কামরূপের হাজো পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হাজো হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের অধিকারে থাকে।

৩. ১৫২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে জগদানন্দ বৃন্দাবনে যান শ্রীচৈতন্যের বার্তা নিয়ে। তদনুসারে সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের দ্বাদশাদিত্য টিলায় শ্রীচৈতন্যের থাকবার জন্য একটি চালিঘর তৈরি করে রাখেন।

৪. প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে বলা হয়েছে, নরনারায়ণ সবে মাত্র রাজা হয়ে বসে শংকরকে গোমস্তাপদে নিয়োগ করেছেন, এমন সময় চৈতন্যভারতী প্রভু হয়গ্রীব মাধব দর্শনে হাজোতে আসেন। সে সময় 'এহি কামরূপ দেশ প্রায় জঙ্গল আছিল'। চৈতন্য গোঁসাই সেখানে ভাগবত প্রচার করলেন এবং যাত্রা মহোৎসব-সংকীর্তন প্রবর্তন করলেন; রত্নপাঠক, কণ্ঠভূষণ, কবিশেখর, কণ্ঠহার প্রভৃতিকে ভাগবত পড়ালেন, নারদীয় ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখালেন। ভট্টদেব বিরচিত 'সৎসম্প্রদায় কথা'য় বলা হয়েছে এই সময়ই (শংকরদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের আগেই) মাধব ও দামোদর চৈতন্যকৃপা লাভ করেছিলেন। স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, মহাপ্রভু 'যাত্রামহোৎসব সংকীর্তন কর্মকো মাধবব দ্বারা প্রবর্তইলা'। দামোদরও মণিকূটে (মণিকূট হাজোর অন্তর্গত একটি ছোট পাহাড়) গিয়ে মহাপ্রভুকে দেখে 'দুর্লভ লাভ ভৈলা' বলে প্রণাম করলে তিনি তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে উড়িষ্যায় গেলেন (হেমচন্দ্র দেবগোস্বামীর প্রবন্ধে উদ্ধৃত নীলকণ্ঠ দাসের 'দামোদর চরিত্র' দ্রষ্টব্য)। শংকরদেবের দুই প্রধান শিষ্য মাধব ও দামোদর (১৪৮৮-১৫৯৮ খ্রীঃ) এখানে উদ্দীষ্ট। মাধব তাঁর 'নামঘোষা'য় মহাপ্রভুর 'নাহং বিপ্র' শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন। শংকরদেবের এই দুই শিষ্য সম্প্রদায়েই বলা হয়েছে শংকরদেব হাজোতে রত্ন পাঠকের নিকট ভাগবত ও চৈতন্যের ভাগবতপ্রচার

সম্পর্কে অবহিত হন এবং পুরীতে গিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করেন (১৫৩৩ খ্রীঃ)। শ্রীচৈতন্যের নিকট শংকরদেব একশরণ পন্থার সন্ধান পান 'শংকরেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে। এক যে শরণ ধর্ম চৈতন্যের স্থানে ॥' (দ্বিজরাম রায় কৃত 'গুরুলীলা')।

৫. ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের আষাঢ় মাস (মহাপ্রভুর তিরোভাব)-এর পর রচিত রূপ-গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকে সূত্রধার উক্ত নাটক রচনায় 'ভক্তাবতার' শংকরদেবের আদেশের কথা জানিয়েছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার 'এখানে আসামের মহাপুরুষ শংকরদেবকেই' লক্ষ্য করা হয়েছে ভেবেও সে ভাবনাকে প্রশ্রয় দেন নি এই ভেবে যে, "বিদগ্ধমাধবে মাধুর্য্যরস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; শংকরদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেষ্টা, দাস্যভক্তির উপাসক। তিনি যে এইরূপ নাটক লিখিতে আদেশ দিবেন সে সম্ভাবনা অল্প।" [চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৫২৬]

আমরা দেখিয়েছি শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব উভয়েই দাস্যভক্তির কথা বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের গোপীভাব অবলম্বন করে মধুর রসাশ্রিত পদও রচনা করেছেন।

৬. শ্রীচৈতন্য সমাদৃত ভাগবতের শ্রীধর ভাষ্য পুরী থেকে শংকরদেবের নিকট নিয়ে আসেন জগদীশ মিশ্র নামক এক সজ্জন। এই জগদীশ মিশ্র 'ভাগবত ভক্তি রত্নাকরের' সংকলয়িতা বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীর উপশিষ্য। বিষ্ণুপুরী ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং হিন্দি ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজী লিখেছেন,'জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাসকারী মহাপ্রভুর চিঠি ('লিখি প্রভু চিটি') পেয়ে বিষ্ণুপুরী কাশী থেকে ভক্তিরত্নাবলী সংকলন করে পাঠিয়ে দেন ('জানি লই বাত, নিধি ভাগবত রত্নাদাম দই পঠৈ')। শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত কন্ঠভূষণের নিকট শংকর এই গ্রন্থটি পেয়েছিলেন (দৈত্যারি পণ্ডিতের 'শংকর চরিত' দ্রস্টব্য)। মাধবের নামঘোষার প্রথম পদটি ('মুক্তিতো নিস্পৃহ যিটো') বিষ্ণুপুরী রচিত ('যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ' পদের অনুবাদ)।

৭. শ্রীচৈতন্য-উক্তি ও শংকরদেবের রচনার তুলনামূলক পাঠে দেখা গেল,— নবধাভক্তি, দাস্যভাব, 'বিষম ভবাম্বুধি' বা 'মায়া মহোদধি'-উত্তরণ, মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা-বর্জিত ভক্তির আদর্শ, অহমিকা বর্জন ও নামকীর্তন, নাম-নামী অভেদতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের নিরাকার তত্ত্ব, অবিকারী পরিণাম ও ভেদাভেদবাদ, গোপীভাব সাধনা, তর্ক পরিহার, জাতিভেদ বর্জন, শক্তিদেবীর পূজায় বলিদানের বিরোধিতা,—এতগুলি বিষয়ে শংকরদেব চৈতন্যপন্থার অনুগামী।

এই সব বিবিধ তথ্য-প্রমাণ একদিকে, আরেকদিকে প্রচলিত মত। ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "বেজবরুয়া মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শংকরের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নাই ; তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই।" [চৈ. চ. উ. পৃ. ৫১০]—এইটিই প্রচলিত মত।

আমরা উপরি-উক্ত বিবিধ তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলতে পারি, শংকরদেবের ধর্ম-প্রচার শুরু হবার আগেই শ্রীচৈতন্য আসামের মাটিতে ভক্তিবীজ বপন করেছিলেন, মাধব, দামোদর ও শংকরদেবকে তিনিই ভক্তিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন ; এবং আসামের শংকরদেব, তাঁর সম্প্রদায় এবং আসামের বৈষ্ণবধর্ম নিঃসন্দেহে চৈতন্যপ্রভাবিত।

চতুর্থ অধ্যায়

ওড়িআ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পুরী গেলেন। কয়েকবছর তীর্থপরিক্রমায় কাটালেও তাঁর জীবনের শেষার্ধের প্রায় সবটাই তিনি কাটালেন ওড়িষ্যায়। তাঁর দিব্যজীবনের পূর্বার্ধে নবদ্বীপ-লীলা, উত্তরার্ধে নীলাচল-লীলা। এই পরার্ধেই তিনি সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভাগবতপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক ও ভারত পর্যটক। এই সময়ই তিনি নামপ্রেম ছড়াবার ভার দিলেন বাংলাদেশে নিত্যানন্দকে, বৃন্দাবনে সনাতন ও রূপ গোস্বামীকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগকেন্দ্র ওড়িস্যায় রইলেন তিনি স্বয়ং। ওড়িষ্যায় তাঁকে ঘিরে রইলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ। প্রাচীকুলের এই চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে ভারতসমুদ্রে সেদিন জোয়ারের পূর্ণস্ফীতি।

শ্রীচৈতন্যের এই জীবনপরার্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কেবলমাত্র সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যজীবনীতে পাওয়া যাবে না। ওড়িআ চৈতন্যচরিতগুলির এ ক্ষেত্রে রয়েছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, ওড়িষ্যার তদানীন্তন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র এবং কিছু কিছু ওড়িষী-ভক্তের প্রসঙ্গ প্রচলিত সংস্কৃত-বাংলা-চৈতন্যচরিতে আলোচিত হলেও, ষোড়শ সপ্তদশ শতকের ওড়িআ চৈতন্যচরিতকাব্য, পঞ্চসখা ও তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত। অথচ এ প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা, ষোড়শ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে উৎকলীয় রেনেসাঁসেরও কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে শ্রীচৈতন্য যে-মানবতার ভিত্তিতে সংহত করতে চেয়েছিলেন, সেই একই ভিত্তিতে তিনি মেলাতে চেয়েছেন সর্বভারতীয় জনসমষ্টিকে। দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ সর্বত্র তাঁর মন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল এক—হরিনাম, খোল-করতাল সহ সম্মিলিত কীর্তন, বর্ণাশ্রমী বিভেদমূলক অনুশাসন লঙ্ঘন, ভক্তিভূমিতে 'বর্ণশ্রেষ্ঠ' ও ব্রাত্য অচ্ছুতের আন্তরিক মিলনসাধন। মাতৃভাষায় ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থের অনুবাদে তিনি উৎসাহ দিতেন। তিনি জানতেন মাতৃভাষায় শাস্ত্রপাঠের সুযোগ পেলে নিরক্ষর মানুষ সাক্ষরতা লাভে উৎসাহী হয়ে উঠবে। বঙ্গ-উৎকল উভয় প্রদেশেই এমন এক বৈষ্ণব সমাজ গড়ে তুললেন তিনি, যে-সমাজে জাতিভেদ রইল না, সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও চেতনার জাগরণ, এল অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহের অতি সরল পদ্ধতি।

শ্রীচৈতন্য অনুপ্রাণিত এই অভ্যুত্থান ওড়িষী জাতি ও ওড়িআ ভাষা-সাহিত্যের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। চৈতন্যজীবনের দিব্যোন্মাদনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন সেদিনের ওড়িষ্যার মানুষ। তাঁর চরিত্রের দার্ঢ্য তাঁদের জীবনচর্যায় অনুসরণীয় এক মহৎ আদর্শের সন্ধান দিয়েছিল। তাঁর চরিত্রের দিব্যপ্রেমাবেশ তাঁদের জাতীয় চরিত্রে এক অধ্যাত্ম সুষমার পেলবতা সঞ্চার করেছিল। ওড়িষী জাতি ও ওড়িআ সাহিত্যের এই

পর্বের পরিচয় না জানলে চৈতন্যজীবন-কর্মের, বিশেষতঃ চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্বের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর ভক্তসম্প্রদায় নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেবল ওড়িষী বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভেদ নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যেও নানা শাখা ও শাখাগত কোন্দল দেখা দেয়। বিভিন্ন শাখার বিবদমান রীতিপদ্ধতির মধ্য থেকে প্রকৃত চৈতন্যপন্থা কোন্‌টি তা আবিষ্কার করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন খোলামন নিয়ে অগ্রসর হলে তবেই পাঠক সত্যের সাক্ষাৎ পেতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শকে কোন বিশেষ একটি শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ড. বিমান-বিহারী মজুমদারের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌগিক বা তান্ত্রিক সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের কথা বলাইয়াছেন। ওড়িয্যার অচ্যুতানন্দ ও শ্রীখন্ডের নরহরি রূপ-সনাতন অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের কম অন্তরঙ্গ ছিলেন না ; জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যের বেশী পরবর্তী নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পক্ষে অচ্যুতানন্দ, নবহরি, জয়ানন্দ প্রভৃতির মত শ্রীচৈতন্যের মত নহে, রূপ-সনাতন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত মতই সত্যমত এরূপ নির্দেশ করা নিরাপদ নহে।"
[শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ২২৬]

এ ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই তুলনামূলক পাঠপদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। অসমীয়া, বাংলা ও ওড়িআ ভাষার শব্দভাণ্ডার প্রায় এক হওয়ায় এইসব ভাষায় রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদির তুলনামূলক আলোচনা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এর কতকগুলি সুফল আছে। তুলনামূলক আলোচনায়—১. চৈতন্যজীবনকর্মের সামগ্রিক রূপটি পরিস্ফুট হবে। ২. কতকগুলি তথ্য সকল ভাষায় রচিত চৈতন্যচরিতেই পাওয়া যায়, এতে ওই সব তথ্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ৩. সকল ভাষায় রচিত চৈতন্যচরিতে চৈতন্য-উক্তি বা চৈতন্যরচনা বলে কোন কিছু উল্লেখিত হলে তা নিশ্চয় প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা চলবে। ৪ গৌড়ীয় ও ওড়িশী বৈষ্ণবদের বিবাদ থেকে চৈতন্য সম্বাদ উদ্ধার করা যাবে। ৫ শ্রীচৈতন্যের গুরুপরম্পরা ও সমন্বয়ী ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা দূর করা যাবে। ৬. শ্রীচৈতন্যের পাঞ্চভৌতিক দেহের পরিণতি সম্পর্কে তথ্যের অসম্পূর্ণতা কিছুটা দূর হবে। এবং ৭. শ্রীচৈতন্যের জীবনকর্ম সম্পর্কে বঙ্গীয় ও উৎকলীয় পন্ডিতদের কিছু কিছু অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন করে প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

বঙ্গদেশীয় সাহিত্যে প্রচলিত প্রাচীন চৈতন্যচরিতের সংখ্যা ৯। ১. গোবিন্দ কর্মকারের করচা, ২. বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, ৩. লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, ৪. জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল, ৫ চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়, ৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত—এগুলি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলা চরিতকাব্য, ৭. মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, ৮. কবি কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, এবং ৯. কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—এগুলি ষোড়শ শতকের

সংস্কৃত চরিতকাব্য। পক্ষান্তরে ওড়িষ্যার সাহিত্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্যচরিত মোট ৫টি। ১. কহ্নাই খুণ্টিআর 'মহাভাবপ্রকাশ', ২. মাধব রথের 'চৈতন্যবিলাস', ৩. ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবত', ৪ দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' (প্রথম সাত অধ্যায়)—এগুলি ওড়িআ ভাষায় রচিত, ৫. গোবিন্দ কবির 'গৌর কৃষ্ণোদয়' কাব্য—এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

শ্রীচৈতন্যের ওড়িআ পার্ষদ 'পঞ্চসখা' (বলরাম-জগন্নাথ-যশোবন্ত-অনন্ত-অচ্যুতানন্দ) রচিত নানাগ্রন্থে চৈতন্যবন্দনা, চৈতন্যপ্রচারিত প্রেমভক্তিবাদের ও অন্যান্য প্রসঙ্গের উল্লেখ ও প্রভাব আছে। ওড়িআ ভাষায় রচিত এই গ্রন্থগুলি: বলরাম দাসের বেদান্তসারগুপ্তগীতা, জ্ঞান উজ্জ্বলমণি গীতা, জগমোহন রামায়ণ ; জগন্নাথ দাসের ভাগবত, পদ্মপাদসুধানিধি, নীলগিরিধ্যান, নিত্যনীলাদ্রিবিলাস, নিত্যগুপ্তচূড়ামণি, সুধাত্রয়ম্, বৈষ্ণব আচরণ, গুরুপ্রণালী, বলরাম দাসঙ্ক গুরুপরম্পরা ও সাধনা ; যশোবন্ত দাসের প্রেমভক্তিব্রহ্ম গীতা, স্বরোদয় ; অনন্তের পদ্মবনরাস, ঠুলশূন্যরাস ; এবং অচ্যুতানন্দের গুবুভক্তিগীতা, শূন্যসংহিতা, অণাকার সংহিতা, নিত্যরাহাস, গোপালঙ্ক ওগাল ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

এই পঞ্চসখাকে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপরিকর বলে অভিহিত করে কটক রেভেনশা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গীয় আর্তবল্লভ মহান্তি লিখেছেন—"ভক্ত হৃদয়ের দুঃখ নিবারণ, পাপর উচ্ছেদসাধন ও সাধুঙ্ক পরিত্রাণ ছলরে ভগবান হরি 'স্বলীলা' আস্বাদন নিমিত্ত শুদ্ধচৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মানববিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্বক ধরাধামরে অবতীর্ণ হেলে। স্বলীলা আস্বাদনক্রিয়ারে স্বীয় পরিকরবর্গংকর উপস্থিতি অপরিত্যাজ্য ; সেহি পরিকরবর্গমধ্য ধরাধামরে অবতীর্ণ হোইথিলে। পুণ্যভূমি উৎকলখণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হোইথিলা তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাঙ্কর পরিকরবর্গ। সেহি পরিকরবর্গ দুই শ্রেণীরে বিভক্ত, যথা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতংক মতরে সেমানে প্রভুংকর অন্তরঙ্গ সখা"। অর্থৎ—"ভক্তহৃদয়ের দুঃখনিবারণ, পাপের উচ্ছেদসাধন ও সাধুর পরিত্রাণ ছলে ভগবান হরি 'নিজলীলা' আস্বাদনের জন্য শুদ্ধ চৈতন্য প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মানববিগ্রহ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। নিজলীলা আস্বাদনে স্বীয় পরিকরবর্গের উপস্থিতি অপরিত্যাজ্য—সেই পরিকরবর্গও ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পুণ্যভূমি উৎকলখণ্ডে যে মধুর প্রেমলীলার হিল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরবর্গ। সেই পরিকরবর্গ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা—বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা।"

ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্যে পঞ্চসখার অবদান সম্পর্কে ওড়িষী পণ্ডিত শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস জানিয়েছেন—"ওড়িআ ভাষার প্রকৃত স্রষ্টা সারলা দাস। রাজদরবারে যখন সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা চলছিল, তখনই রাজদরবার থেকে দূরে সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসে সারলা দাস জাতিকে এক নবজন্ম ও নবীন আশ্বাস দান করেছিলেন। ওড়িষ্যার মানুষ এখন নিজের মুখের ভাষায় নিজেকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেল। এবং সারলা

দাস যে মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করলেন পঞ্চসখা (And what Sarala Dasa had initiated was completed by the Pancha Sakha', —-Balarama Das, Sahitya Akademi 1982. p. 84) ।

বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের ভাগবত এবং অচ্যুতানন্দের হরিবংশ এবং বলরাম জগন্নাথের গীতা অনুবাদ তৎকালীন কথ্য ওড়িআ ভাষার নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিল ('Balarama Das's Jagamohan Ramayana, Jagannatha Das's Bhagavata and Achyutananda's Harivamsa as well as the Gita translations of Balarama and Jagannatha were creations that raised the then spoken Oriya language to new heights.—p. 85) ।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে, সারলা দাস ও পঞ্চসখাদের মধ্যে ব্যবধান কয়েকশ' বছরের। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ওড়িআ ভাষা-সাহিত্যের যুগবিভাগ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

The history of Oriya literature may be divided into the following periods : (1) Old Oriya, to A. D. 1300 (2) Early Middle Oriya from A. D. 1300 to 1500. Then we have Middle Middle-Oriya, and Late Middle-Oriya, bringing the history of the literature to 1850, and finally we have the Modern Oriya, after 1850.

[*The Delhi Sultanate* : *Oriya*]

সারলা দাসকে ভাষাচার্য বলেছেন, 'the first great poet of Orissa' । সারলা দাস চতুর্দশ শতকের কবি। এই শতকে 'রুদ্র-সুধানিধি' রচয়িতা নারায়ণানন্দ অবধূত স্বামী, চণ্ডীপুরাণ, বিলঙ্ক রামায়ণ ও লঘুমহাভারত (৭০০ শ্লোকে) রচয়িতা সারলা দাস এবং রামকথার 'মহাভাষ্য' ও যশোদার আর্তিসূচক 'কেশব কোইলি' রচয়িতা মার্কণ্ড দাসের আবির্ভাবের ফলে ওড়িআ সাহিত্যে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব রেনেসাঁসের সূচনা হয়—'In the fourteenth century, we find also a sort of early renaissance of Vaishnava Bhakti in Oriya literature'

[*The Delhi Sultanate* : *Oriya*]

এরপর পঞ্চদশ শতকে 'রামবিভা' রচয়িতা অর্জুন দাস, জৈমিনী মহাভারত ও পদ্মপুরাণের অনুবাদক নীলাম্বর দাস প্রভৃতির যুগ পেরিয়ে আসে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক—এই দুই শতকের পর্বকে ভাষাচার্য জগন্নাথ দাসের যুগ বলে অভিহিত করলেও বলেছেন এই যুগের সূচনা হয় ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পুরীতে চৈতন্যের প্রথম আবির্ভাব থেকে—'Next we have the period of Jagannatha Dasa (sixteenth to seventeenth centuries). It begins with the advent of Chaitanya from Bengal into Orrissa for the first time in 1510'.

[*The Delhi Sultanate* : *Oriya*]

চতুর্দশ শতকের সারলা দাসের ও অন্যান্যের ইতিবাচক প্রভাব অস্বীকার না করেও বলা যায়, ষোড়শ শতকের বিপুল ও ব্যাপক অভ্যুত্থানের প্রেরণা-মূল শ্রীচৈতন্য।

চতুর্দশ শতকের সাহিত্যে ভক্তিবাদী ভাবধারা এলেও ষোড়শ শতকের অনুরূপ জাতীয় জাগরণ তাতে যুক্ত ছিল না। সেটি ছিল a sort of early reniassance, এবার এল প্রকৃত রেনেসাঁস। ওড়িষীজনমানসে পঞ্চসখা সাহিত্যের, বিশেষতঃ জগন্নাথ দাসের ভাগবতের প্রভাব সম্পর্কে সুনীতিকুমার লিখেছেন ঃ

"Jagannath Dasa was a close friend of Chaitanya who gave him the sobriquet of Ati-bada or 'Supremely Great' because of his saintly character. He translated the Bhagavata Purana, which is perhaps the most popular book in the Oriya language. Jagannatha Dasa introduced edifying stories from other sources into his Bhagavata, and used a simple and easily read metre of nine syllables for his great work. He has largely been responsible for elevating the moral qualities of the Oriya People through this work, and a general eagerness to be able to read it has helped the cause of literacy in many parts of Orissa. Jagannatha Dasa composed a large number of other works in both Oriya and Sanskrit. The other four associates of Jaganatha Dasa were similarly responsible for a large number of religious works in Oriya "

[*The Delhi Sultanate* : *Oriya*, p. 519-521]

জগন্নাথ দাসের ওড়িআ ভাগবত সম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনও জানিয়েছেন 'উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া শুনিয়া ভাগবত শিখিয়াছে' ('ওড়িয়া সাহিত্য', পৃ. ২১)।

পঞ্চসখাব অন্যতম অচ্যুতানন্দ সম্পর্কে ড. মায়াধর মানসিংহ লিখেছেন— "পঞ্চসখামানঙ্ক ভিতরে এহি নিম্নবয় সখাজনকহি প্রকৃত সমাজসেবক থিলে। সম্ভ্রান্ত করণকুলরে জন্মগ্রহণ করি মধ্য সে আজি কৈবর্ত ও গোপাল মানঙ্কর গোষ্ঠীগুরু ও গোষ্ঠীদেবতারূপে ওড়িশার চারি আড়ে পূজিত। সে নিজর জন্মজাতির অহমিকা পরিত্যাগ করি নিম্নশ্রেণীর সেহিমানঙ্ক মধ্যরে একত্র বাস করিথিলে ও প্রথম থর পাই সেহি নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায় মানংকু সে পর্য্যন্ত অলভ্য মন্ত্র ও শাস্ত্র অযাচিত ভাবরে পরিবেষিত করি দেইথিলে। সে পর্যন্ত এ সবু কেবল ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায় মানঙ্ক ভিতরে আবদ্ধ থিলা। অচ্যুতানন্দ কৈবর্তমানঙ্ক আধ্যাত্মিক উন্নতি পাই কৈবর্তগীতা ও গোপালমানংক সামাজিক শিক্ষা পাই গোপালঙ্ক ওগাল পর্য্যায় লেখিলে। সেকালরে এ প্রকার সামাজিক স্পর্শকাতরতা অত্যন্ত বিরল'।

[ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস, পৃ. ১৬১]

অর্থাৎ—পঞ্চসখার মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ এই সখা ছিলেন প্রকৃত সমাজসেবক। সম্ভ্রান্ত করণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি আজ কৈবর্ত ও গোপাল (গোয়ালা)-দের গোষ্ঠীগুরু ও গোষ্ঠীদেবতারূপে ওড়িষ্যার সর্বত্র পূজিত। তিনি নিজের জন্মগত

জাতি অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নশ্রেণীর সেই লোকজনের মধ্যে একত্র বাস করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর অবহেলিত সম্প্রদায়গুলিকে সে পর্যন্ত-অলভ্য মন্ত্র ও শাস্ত্র অযাচিতভাবে সেই প্রথম পরিবেশন করিয়াছিলেন। সে পর্যন্ত এসব কেবল ব্রাহ্মণ ও উচ্চ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অচ্যুতানন্দ কৈবর্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'কৈবর্তগীতা' ও গোপালদের সামাজিক শিক্ষার নিমিত্ত 'গোপালাংক ওগাল' লিখিলেন। সেকালে এ প্রকার সামাজিক সচেতনতা ছিল অত্যন্ত বিরল।

জগন্নাথ দাস ও অচ্যুতানন্দের এই বিবরণ পাঠে চৈতন্যচরিত পাঠকদের নিশ্চয় মনে পড়বে, ভারতের সর্বত্র ভাগবতের অনুবাদ কর্মে এবং সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সামাজিক মর্যাদা দানে শ্রীচৈতন্যের উৎসাহের কথা। আসামের ভাগবত পাঠক রত্নেশ্বর বিপ্রকে 'রত্নপাঠক', বরাহনগরের ভাগবতপাঠক রঘুপণ্ডিতকে 'ভাগবতাচার্য' এবং ওড়িষ্যায় ভাগবতপাঠক জগন্নাথ দাসকে 'অতিবড়' উপাধি দান করেছিলেন তিনি। ভাগবতাচার্য ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন—'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী'. জগন্নাথ দাস ভাগবতের ওড়িআ অনুবাদ করেন—

'প্রাকৃত ভাগবত বাণী।
শ্রীকৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী॥' [জগন্নাথ চরিতামৃত, ২য় অধ্যায়]

আর অচ্যুতানন্দের সমাজচেতনা নিঃসন্দেহে চৈতন্য প্রভাবিত। অচ্যুতানন্দ স্বয়ং তাঁর 'গুরুভক্তিগীতা'য় নিজের গোপাল শিষ্যদের বলেছেন, চৈতন্যকরুণাতেই তিনি তাদের নিয়ে রাসরচনা করেছেন—

'কলিযুগে শ্রীচৈতন্য খোল নৃত্য করে।
শ্রীচৈতন্য লীলা করে পাদে পাদে ফেরে॥
চৈতন্য করুণা যে তুম্ভঙ্কু ছন্তি করে।
বার গোপ রাহাসরে অট তুম্ভ সরে॥

['গুরুভক্তিগীতা', ২য় খণ্ড, ৯ম পটল]

পঞ্চসখার রচনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ওড়িষী সমাজে ও ওড়িআ সাহিত্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এল। এই জাগরণের প্রেরণামূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এ সম্পর্কে পঞ্চসখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি।—

'শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত।
তাঙ্ক সঙ্গে চারিসখা হোইলু যে জাত॥'

[গুরুভক্তিগীতা, ১ম খণ্ড, দ্বাত্রিংশছান্দ ৩৬]

'শিশু যে অচ্যুত যশোবন্ত বলরাম।
শূদ্রকুল উদ্ধারিবু আম্ভে চারিজন'॥ [তদেব, ৩৩ ১২৮]

অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তির গণনা অনুসারে অচ্যুতানন্দের জন্ম ১৫১১ বা ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ির পর তাঁর পিতা দীনবন্ধু তাঁকে নিয়ে পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট যান এবং অচ্যুত চৈতন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। তাঁর দেওয়া গুরুপ্রণালী নিম্নরূপ—চৈতন্যদেব-সারঙ্গ গোসাঁই-শ্যাম গোসাঁই-রামকৃষ্ণ গোসাঁই-নবকিশোর-সনাতন (চরণদাস)-অচ্যুতানন্দ (গুরুভক্তি গীতা, ১ম খণ্ড,

১ম ছান্দ)। দীক্ষার সময় অচ্যুতের বয়স পাঁচ বছর হলে, এ ঘটনা ১৫১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দের। এর আগেই, এবং পঞ্চসখার মধ্যে সর্বপ্রথম, বলরাম দাস চৈতন্যশরণ গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কবির 'গৌরকৃষ্ণোদয়' কাব্যে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভ্রমণের পর চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরে এলে বাসুদেব সার্বভৌম বলরামাদি ভক্তদের মহাপ্রভুর আশ্রয়ে নিয়ে আসেন—'যে চাপ্যন্যে তদনু বলরামাখ্যদাসাদি ভক্তা, ভেজুশ্চৈনং শরণমখিলাঃ সার্বভৌমানুনীতা' (গৌরকৃষ্ণোদয়, ১১ সর্গ / ৫)। এ তা হলে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পর অর্থাৎ ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের কথা। বলরামকে দীক্ষা দেন হৃদয়ানন্দ। বলরাম আবার দীক্ষা দেন জগন্নাথ দাসকে। দিবাকর দাস প্রণীত 'জগন্নাথ চরিতামৃত' কাব্যে জগন্নাথ দাসের গুরুপ্রণালী এই রকম—চৈতন্য-গৌরীদাস-হৃদয়ানন্দ-বলরাম-জগন্নাথ (গুরুপ্রণালীবন্দনা, ১ম অধ্যায়)। এই কাব্যের ২৪ অধ্যায়ে দিবাকর দাস লিখেছেন, জগন্নাথ দাস-'ষড়বরষ নিরন্তর সেবিলে চৈতন্যপয়র'—ছ'বছর অনুক্ষণ চৈতন্যের পদসেবা করেছিলেন। এ নিশ্চয় চৈতন্যজীবৎ-কালের শেষ ছয় বছর। কেননা, চৈতন্যদেবের জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দাসের ছাড়াছাড়ি হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোথাও নেইঃ 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' বরং আছে, গৌড়ীয় ভক্তদের বারংবার আহ্বান ও অনুরোধ উপেক্ষা করে শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 'অতিবড়' জগন্নাথ দাসের সংশ্রবে থাকাই পছন্দ করেছিলেন। সুতরাং ছ'বছর নিরন্তর চৈতন্য সেবা করে থাকলে চৈতন্য তিরোধানের ছ'বছর আগে অর্থাৎ সম্ভবতঃ ১৫২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ দাস বলরামদাসের নিকট দীক্ষা নিয়ে চৈতন্যশরণ নেন।

মোটের উপর, চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পঞ্চসখা সমগ্র ওড়িষ্যার সাহিত্যে ও সমাজে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' প্রেরণাময় চৈতন্যর যে চিত্র আছে তা সচেতন ধর্মপ্রবক্তা ও কর্মীর। তিনি পঞ্চসখাকে ভক্তিগ্রন্থাদি রচনায় উৎসাহিত করেছেন। আবার কে কি লিখলেন, সে বিষয়ে খোঁজখবরও করেছেন।—

> 'কটকে চৈতন্য গোসাই'। আনন্দে হরষিত হোই। ১২৮
> পঞ্চসখাঙ্কু আজ্ঞা দেলে। কি গ্রন্থ করিছ বোইলে। ১২৯/৫৯ অধ্যায়

উত্তরে পঞ্চসখা জানালেন তাঁরা কে কি গ্রন্থ লিখেছেন।

> 'য়ে আজ্ঞা শুনি বলরাম। চিন্তিণ শ্রীপুরুষোত্তম। ১৩১
> বালমিকঙ্ক কলা গ্রন্থ। শ্রীরামায়ণ যে উকত।
> সপত কাণ্ড গীতরস। শুণিণ সমস্ত হরষ। ১৩৩/৫৯ অধ্যায়

বলরাম দাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করলেন।

কাশী থেকে শ্রীচৈতন্য পণ্ডিত জগন্নাথের (?) লেখা 'বেদান্তসার' গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন। বলরাম তা ওড়িআ ভাষায় অনুবাদ করেছেন।—

> সিদ্ধান্ত বেদান্তর সার। ১৪৭
> য়ে শাস্ত্র লেখি জগন্নাথ। বারাণসীরে প্রাণ হত।
> য়ে শাস্ত্র চৈতন্য গোসাই'। সঙ্গতে অচ্ছন্তি অণাই।
> সমস্ত বসাই গায়ন। শুণি হরষ সর্বজন। ১৫০/৫৯ অধ্যায়

[বলরাম দাসের গ্রন্থের নাম 'বেদান্তসার গুপ্তগীতা'। 'বেদান্তসার' আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, পৃ. ৭২৩)। সদানন্দ ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন এবং চৈতন্য সংস্পর্শে এসেছিলেন। 'দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চসখার অন্যতম অনন্ত জানালেন, তিনি লিখেছেন—

'ভবিষ্যপুরাণ উকত। আগত লেখিছন্তি গীত'। ১৫৫

এরপর অচ্যুত ও যশোবন্ত—

'অচ্যুত যশোবন্ত কই। পুছন্তি চৈতন্য গোসাই'। ১৫৬
'কি শাস্ত্র করি অছ গীত। শুণিণ মুকত পণ্ডিত'। ১৫৭
এ আজ্ঞা শুণি দুই দাস। গীতরে নাম পরকাশ॥ ১৫৮
অনাদি গীত রসময়ে। শুণি আনন্দ দেবরায়ে॥ ১৫৯

এরপর ডাকলেন জগন্নাথ দাসকে।—

পুণি ডাকন্তি সখী আস। শুণহে জগন্নাথ দাস।
নাম মহিমা গীত রস। কি শাস্ত্র করিছ প্রকাশ।

'সখী' জগন্নাথ দাস বললেন—

'নিত্যস্থলব যে বারতা। উদ্ধব পাদুকাসংহিতা॥
চৌষঠি অধ্যা ভাগবত। সে অটে পুরাণ উকত'॥
শুণি হরষ শ্রীচৈতন্য। গোলোক প্রেম রসমান॥
সমস্ত ব্যাখ্যান উকত। হরষ শুণন্তি সমস্ত। ১৬৭/৫৯ অঃ

ঈশ্বর দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীচৈতন্যই পঞ্চসখাকে ওড়িআ ভাষায় এইসব গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। আধুনিক কালে ওড়িষ্যায় কোন কোন পণ্ডিতের মধ্যে ষোড়শ শতকের পঞ্চসখা সাহিত্যপ্রয়াসের পিছনে চৈতন্য-প্রেরণাকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'সখাহীন পঞ্চসখা' জাতীয় গ্রন্থ রচনা করে তাঁরা বলতে চান, চৈতন্য পুরীতে আসার আগেই পঞ্চসখা সাহিত্য অধিকাংশ রচিত হয়েছে। সম্ভবত এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সুনীতিকুমারও লিখেছেন—'In Orissa, Chaitanya came to have a number of intimate disciples and friends—e g. Raya Ramananda Dasa who followed pure Bhakti and also the five religious teachers and poets who followed Bhakti with Jnana, namely Balarama Dasa, Jagannatha Dasa, Yasovanta, Ananta and Achyutananda. Most of these writers had

already been engaged in their literary labours before they met Chaitanya'. [*The Delhi Sultanate : Oriya*, p. 521]

এঁদের মধ্যে রায় রামানন্দ চৈতন্য সাক্ষাৎকারের আগেই তাঁর 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করেন ; কিন্তু পঞ্চসখা যে চৈতন্য নির্দেশেই ওড়িআ ভাষায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন, পঞ্চসখা সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ ঈশ্বরদাসের উপরি-উক্ত বিবৃতি এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটায়।

॥ কহ্নাই খুণ্টিআ : শ্রীমহাভাবপ্রকাশ ॥

শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া সেবকদের মধ্যে কহ্নাই খুণ্টিআ সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'কানাই খুণ্টিআ আছেন নন্দবেশ ধরি। জগন্নাথ মহান্তি হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী ॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা। মাতাপিতা জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥

দেবকীনন্দন 'বৈষ্ণববন্দনা'য় বলেছেন—'কানাই খুণ্টিআ বন্দো বিশেষ পরচার'। বাংলায় কানাই খুণ্টিআর ভণিতাযুক্ত একটি পদও আছে : 'কানাই খুণ্টিআ' কয় মোর মনে হেন লয় বংশী হৈল অবলা বধিতে'। 'পদরসসার' গ্রন্থে সংকলিত এই পদটিতে খুণ্টিআর কবি প্রতিভার পরিচয় মেলে--

"মন চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর সুরে ॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছে গোয়ারের হাতে।
কাহ্নাই খুণ্টিআ কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে ॥

[অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ৪৩৪ সংখ্যক পদ।]

এই পদটি সম্পর্কে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়েব ওড়িআ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীফকীর মোহন দাস এম. এ. সাহিত্যাচার্য সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন—'উক্ত পদ্যটি কৌণসি

প্রৌঢ়া গোপীঙ্ক উক্তি পরি জনা পড়ুছি। মাত্র কহ্নাই খুন্টিআ নন্দ আবেশরে বাৎসল্যসেবার আদর্শ দেখাইছন্তি।' অর্থাৎ 'উক্ত পদ্যটি কোন প্রৌঢ়াগোপীর উক্তি বলে মনে হয়, পক্ষান্তরে কানাই খুন্টিআ নন্দ আবেশে বাৎসল্য সেবার আদর্শ দেখিয়েছেন।' (মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা)

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, নন্দোৎসবের সময় কানাই খুন্টিআ নন্দ সেজেছেন এবং মহাপ্রভু সেই সময় তাঁকে 'পিতা' বলে নমস্কার করলেও পরে ত কানাই খুন্টিআ মহাপ্রভুর সেবক হয়ে পরিচর্যা করেছেন। নন্দের বাৎসল্য ভাবটি সাময়িক ব্যাপার; এতে অন্যরসের পদ লেখায় আপত্তি কোথায়? শ্রীচৈতন্য ভারত পর্যটন থেকে ফিরে এলে যে নন্দোৎসব হয়, তাতে কানাই খুন্টিআ নন্দের ভূমিকা নিয়েছিলেন; তাই এটি ছিল সাময়িক ব্যাপার।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন, "কানাই খুঁটিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; তাঁহার লেখা বই ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু গ্রন্থখানি কোন আমেরিকান ভ্রমণকারী কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন শুনিলাম" (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৫০৫)। শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁর 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থে লিখেছেন—'এই পুঁথিটির অসম্পূর্ণ পত্র আমরা কটকে দেখিয়াছি'।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত একটি খণ্ডিত অনুলিপি এবং 'পুরুষোত্তম' সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ভাগবত শাস্ত্রীর নিকট প্রাপ্ত আরেকটি অসম্পূর্ণ অনুলিপির ভিত্তিতে শ্রী ফকীরমোহন দাস ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে 'মহাভাবপ্রকাশ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিই আমাদের অবলম্বন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন—

"মহাভাবপ্রকাশ গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এ পর্যন্ত মেলেনি, তবে আমার পরমবন্ধু বাবাজী শ্রীল কৃষ্ণানন্দ দাস, কাব্যব্যাকরণ তীর্থ, ভাগবত শাস্ত্রীর নিকট প্রাপ্ত অনুলিপির প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় যা উল্লেখ আছে তদনুসারে এই গ্রন্থ ছয়টি বৃন্তে সমাপ্ত হয়েছে। ১. প্রথম বৃন্তে মঙ্গলাচরণ, শ্রীগৌরবন্দনা, কবিপরিচয় ও গ্রন্থারম্ভ বিবরণী, ২. দ্বিতীয় বৃন্তে শ্রীরাধাতত্ত্ব ও গোপীভাবের উৎকর্ষ, ৩. তৃতীয় বৃন্তে শ্রীজগন্নাথতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণাগমীতত্ত্ব ও ঝুলনতত্ত্ব [শ্রীচন্দ্রাবলী রাস], ৪. চতুর্থ বৃন্তে শ্রীতুলসী মাহাত্ম্য, শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুলক্ষণ ও কলিযুগ ভক্তলক্ষণ, ৫. পঞ্চম বৃন্তে যোগতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব এবং ৬. ষষ্ঠ বৃন্তে যুগলতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে সে কালের অনেক নতুন সত্য তথ্য পাওয়া যায়। কারো কারো মতে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন (*Orissu and Her Remains* by Manmohan Ganguly, Calcutta. Mayurbhanj Archeological Survey, Vol. I. ppcxxi by Negendranath Vasu, Calcutta, 1911)। কিন্তু যে প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথের পরমকৃপাস্থল গজপতি রাজবংশে আবির্ভূত, তাঁর পিতামাতা একান্ত কৃষ্ণভক্ত (শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর পদাবলী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীরামদাসের দার্ঢ্যতা

ভক্তি দ্রষ্টব্য), এবং একান্ত কৃষ্ণভক্ত ভবানন্দ পট্টনায়ক, রায় রামানন্দ, কাশী মিশ্র প্রভৃতি যাঁর পরম প্রিয়, তিনি যে কোন অবৈদিক ধর্মের পক্ষপাতী হবেন, তা বিশ্বাস-যোগ্য নয়। বরং বৈদিক ধর্ম ও আচরণের প্রতি যে তাঁর অনুরাগ ছিল এবং তিনি যে নিজে মহারুদ্র পূজা করেছিলেন—একথা মহাভাবপ্রকাশ গ্রন্থে (পৃ. ২৪) বর্ণিত হয়েছে। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব রাজা হওয়ার দিন থেকে রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্রের পাদসম্বাহন ও শ্রীজগন্নাথের সেব্যর প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা যেভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৯/৮১-৮২) বর্ণিত হয়েছে, তদনুসারে তাঁর বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অভূতপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। যেমন,—'প্রতাপরুদ্রদেব এক আছয়ে নিয়মে। যতদিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসম্বাহন। জগন্নাথ সেবা সব করে ভিয়ান শ্রবণ' ॥

মাদলাপাঞ্জির বর্ণনা অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা নিজেই বহু বৌদ্ধের শিরশ্ছেদের আদেশ দিয়েছিলেন (মাদলাপাঞ্জি, প্রাচী সংস্করণ, ১ম, ১৯৫০)। আবার রাজা যে অবৈদিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তা নিম্নোক্ত প্রমাণে স্পষ্ট জানা যায়। যেমন —

"পদ্মালয়াপুত্র দুলি বাউরি অর্টান্তি। ব্রাহ্মণংক সঙ্গে বেদ পড়ুথান্তি। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বাউরি কনিষ্ঠ। এ পঢ়িখিলে রাজা প্রতাপরুদ্রংক ঠারু গোপ্য করি রখি অছন্তি।"

যা হোক, প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। সে সময় তাঁর রাজ্য বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জিলা থেকে মাদ্রাজের গুণ্টুর জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা হবার কয়েক বছর পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গেলেন। সুযোগ বুঝে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ ও তার সেনাপতি গাজিইসমিল ১৭ অঙ্কে অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে ওড়িষ্যা আক্রমণ করে বহু হিন্দু কীর্তি ধ্বংস করলেন এবং পুরী পর্যন্ত পেঁছে গেলেন। তখন শ্রীকহ্নাই খুণ্টিআ প্রভৃতি শ্রীজগন্নাথের সেবকবৃন্দ পরমেশ্বর (জগন্নাথ) কে দক্ষিণ দুয়ারে গুপ্তপথে নিয়ে গিয়ে বালি লোকনাথে রাখলেন; সেখান থেকে রাতারাতি শ্রীনৃসিংহ মহাপাত্র গড় কেঙবলে (চিল্কা ও ভার্গবীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ওড়িষ্যার একটি প্রাচীন বন্দর। এই গড় কেঙবলের বিষয় সদ্‌গুরু বাসুদেব সোমযাজী কৃত গঙ্গবংশানুচরিতে বর্ণিত হয়েছে।) নিয়ে গেলেন এবং সেখানে থেকে চিল্কা মধ্যবর্তী চড়েই গুহাপাহাড়ে নিয়ে রেখে রাজাকে খবর দিলেন। রাজা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আস্তে ব্যস্তে চড়েই গুহাতে গিয়ে পেঁছালেন। রাত্রে জগন্নাথ রাজাকে তাঁর অসাবধানতা সম্পর্কে সচেতন করলে রাজা বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করলেন (মহাভাব প্রকাশ, পৃ. ১৬)—'এমন্ত বচনমান স্বপনে শুণিলা। সে দিনু বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করিলা' ॥

তারপর রাজা তাড়াতাড়ি পুরী পেঁছালে সুলতান পলায়ন করলেন। রাজা তাঁর পিছে পিছে গিয়ে গঙ্গাতীরে তাঁকে পরাজিত করলেন। তখন সুলতান হুগলী জেলার গড় মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজা সে গড়ও অবরোধ করলেন, কিন্তু

গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দিলে রাজা আর অগ্রসর হওয়া উচিত মনে না করে সেখান থেকে ফিরে এলেন (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIX, 1900, p.6)। মাদলাপাঞ্জি অনুসারে রাজা গোবিন্দ বিদ্যাধরকে রাজ্যভার দিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন (History of Medieval Vaishnavism in Orissa, p. 173)।[১]

সেখান থেকে এসে রাজা কিছুদিন পুরীতে থেকে শ্রীজগন্নাথের সেবা করে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে গেলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের চৈত্র দ্বাদশী তিথি বৃহস্পতিবার শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছালেন।[২] তিনি পুরীতে আসার সময় প্রতাপরুদ্র পুরীতে ছিলেন না।—

"যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে।
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে। অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে॥" চৈতন্যভাগবত

অবশেষে কৃষ্ণদেবরায় 'সিংহাচলম্' পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তাঁর মন্ত্রী 'সাব' (সালুব) তিম্ম বা অপ্পাজীর পরামর্শ অনুসারে ওড়িষ্যার ষোল জন মহাপাত্রকে গোপনে ধন-রত্নাদি উৎকোচ দিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের পক্ষ পরিত্যাগ করালেন। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ছেড়ে চলে গেলে তিনি সুকৌশলে রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করলেন। কৃষ্ণদেবরায় রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত সন্ধি করলে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁর কন্যা জগমোহিনী (নামান্তর তুক্কা)-কে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে যৌতুক স্বরূপ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণের সমস্ত রাজ্যপ্রদান করলেন (*Sources of Vijaynagar History*, p. 115-16, 132, 143-44. R. Sewell's '*A Forgotten Empire*', p. 320)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণে গেলে মিথুন মাসে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীক্ষেত্রে ফিরে আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এলে শ্রীল রায় রামানন্দ ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যাদি গৌরাঙ্গ পার্ষদদের সাহায্যে রথযাত্রার সময় প্রতাপরুদ্রদেব মন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করলেন (মহাভাব প্রকাশ, পৃ. ১৬-১৭, চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য / ১২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

---

১. মাদলাপাঞ্জী [প্রাচী সংস্করণ, পৃ. ৫২-৫৩]-তে আছে, 'তাহাঙ্কু...রাজা রাজ্যভার দেলে'। অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'রাজ্যভার' কথাটির অর্থ করেছেন 'সমগ্র রাজ্যের ভার' এবং বলেছেন মাদলা পাঞ্জীর এ তথ্য অনৈতিহাসিক। এ বিষয়ে আমরা কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি যাতে দেখা যায়, সমগ্র রাজ্যের নয়, কলিঙ্গ প্রদেশ বা রাজ্যের ভার দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাধরকে।

বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রীব্যাস রায়ের সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীব্যাসযোগিচরিতম্' [রচনাকাল আঃ ১৫৩৫ খ্রীঃ]-এর পঞ্চম অধ্যায়ে বিদ্যাধর পাত্রকে 'কলিঙ্গাধিপতি' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—'বিদ্যাধর পাত্র নামা কলিঙ্গাধিপতিঃ'। এতে বলা হয়েছে কলিঙ্গাধিপতি 'বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট একটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রেরণ করেন; গুরু শ্রীব্যাস রায় অতি দ্রুত ওই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করলে কৃষ্ণদেব রায় চমৎকৃত হন।

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন মাঘে সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য—'ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল'। [মধ্য / ৭]

রাজা প্রতাপরুদ্রের পরম সহায়ক ছিলেন বেন্টপুরের পরম কৃষ্ণভক্ত ভবানন্দ রায় এবং তাঁর পঞ্চপুত্র যথাক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক, শ্রী কলানিধি শ্রীসুধানিধি ও শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক (চৈতন্যচরিতামৃত) কিন্তু 'মহাভাব প্রকাশ' গ্রন্থে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। 'মহাভাব প্রকাশ' অনুসারে শ্রীরায় রামানন্দ সর্বজ্যেষ্ঠ। শ্রীকলানিধি ও বাণীনাথের নাম নেই ; কনিষ্ঠপুত্রের নাম বলা হয়েছে 'ধরণীধর' (মহাভাব প্রকাশ, পৃ. ৭)।[১]

'মহাভাবপ্রকাশ' গ্রন্থ অনুসারে (পৃ. ৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে পুরীতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীল রামানন্দ বায় রাজমন্দ্রী বা রাজমহেন্দ্রী গ্রামে 'সেতিরি' নামক দ্বিজকে রেখে 'খলিকোটগড়' থেকে রাজীব নামক একজন পুরোহিত আনিয়ে ব্রত করিয়ে নীলাচলে ফিরে এলেন। উত্তর সীমান্তে সর্বদা আক্রমণের ভয় থাকায় রায় রামানন্দের ভাই শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক শেষ পর্যন্ত মালজাঠা দণ্ডপাট (মেদিনীপুর)-এর অধীশ্বর হয়ে রইলেন। শ্রীমঙ্গরাজ মহাপাত্র, শ্রীপ্রহরাজ মহাপাত্র, শ্রীশিখি মহান্তি, শ্রীকাশী মিশ্র ও শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু রাজকর্মচারী ও সদস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সদাশ্রয় গ্রহণ করলেন।

মাদলা পাঞ্জীতে আছে যে, রাজা প্রতাপরুদ্রের অপ্রকটের পরে পূর্বোক্ত বিশ্বাসঘাতী গোবিন্দ বিদ্যাধর তাঁর ৩২ পুত্রকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন।[২] ইতিহাসে এ ধরণের হত্যা বিরল না হলেও এর ভিতরে নিশ্চয় দীর্ঘদিন ধরে বিষোদ্‌গারী স্বার্থদৈত্য বাস করেছিল—একথা সহজেই অনুমান করা যায়। তথাপি রাজা প্রতাপরুদ্রেরই শাসন কৌশলে ও পরাক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ওড়িয়া তাঁর লোকান্তরেব পরেও কিছুকাল স্বাধীন হয়ে ছিল। তাঁর অসাধারণ প্রতাপ সম্বন্ধে শ্রীল রায় রামানন্দ লিখেছেন—

'যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
স্বংবর্গং কলবর্গভূমি তিলকঃ শ্বাসং সগদ্‌বীক্ষতে।
মেনে গুর্জর ভূপতির্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥

'তেন প্রতিভট নৃপঘটা কালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কর্মাপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোস্মি।' অর্থাৎ—'যাহার নাম শুনিবামাত্র সেকন্দর নামক যবন রাজা গিরি গুহায় প্রবেশ করেন, কলবর্গ (Culbarga) দেশের রাজা নিজ পরিবারবর্গকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন, গুর্জর নৃপতি নিজ রাজধানীকে জীর্ণ অরণ্যবৎ মনে করেন এবং গৌড়াধিপতি নিজেকে প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতস্থিত বলিয়া মনে করেন,—প্রতিপক্ষ নৃপকুলের কালাগ্নি রুদ্রস্বরূপ সেই শ্রীপ্রতাপরুদ্র

১. ধবণীধরকে বলা হযেছে—'সানপুত বা ছোট ছেলে ['সানপুত ধবণীধর যে বড কোপী' দ্বিতীয় বৃন্ত/৮] আবার বলা হয়েছে—"এ মস্তে তাবসভা বড় ভাই জান। বামানন্দ পট্টনায়ক যে নাম পুণ ঃ দ্বিতীয বৃন্ত / ১০।

২. ইতিহাসে পাওয়া যায়, বিদ্যাধব প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্র কালুয়াদেব ও কাখারুয়াদেবকে হত্যা করেছিলেন।

কর্তৃক হরিপাদপদ্ম অবলম্বনে কোন এক প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করিতে আমি সূত্রধার) আদিষ্ট হইয়াছি'। (জগন্নাথ বল্লভং নাটকম্, ১/৫)।

'মহাভাব প্রকাশ'—এই নামকরণেই গ্রন্থের গৌরব সহজে অনুমান করা যায়। ভাব, সংজ্ঞা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রে বহুভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কেবল অপ্রাকৃত রস শাস্ত্রে মহাভাবের পূর্ববর্তী ভাববিষয় এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাচীন লৌকিক আলংকারিকেরা সকলেই একবাক্যে দেবাদি বিষয়ক রতিকে 'ভাব' আখ্যা দিয়েছেন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে (৬/১৬) শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাদি আটটি নাট্যরসের মধ্যে ভক্তিরসের কোনও উল্লেখ নেই। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশনসায় (২য় অধ্যায়ে), মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশে, (৪র্থ উল্লাস) বলা হয়েছে, দেবাদি বিষয়া 'রতি' স্থায়ীভাব-পদবাচ্য হতে পারে না। ভোজের 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণে', বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' প্রভৃতি অলংকার গ্রন্থেও ভক্তি রস রূপে পরিগণিত নয়, ভক্তি একটি ভাবমাত্র।

ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্দ্ধনাচার্য লিখেছেন যে মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে পার্বতী-পরমেশ্বরকে জগতের (সুতরাং নিজের) পিতামাতা রূপে বন্দনা করেছেন, অথচ কুমারসম্ভবে মাতাপিতা উভয়ের শৃঙ্গার রস বর্ণনা করেছেন, এতে রসাভাস দোষ হয়েছে। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর বলেছেন—পার্বতী শিব প্রভৃতি উত্তম দেবতাদের শৃঙ্গার বর্ণনা অনুচিত। কালিদাসের সেই বর্ণনা নিজের পিতামাতার শৃঙ্গার বর্ণনার তুল্য হয়েছে। শ্রীরাধামাধব সর্বেশ্বরেশ্বর, তাঁরা দেবতা স্থানীয় নন, বিশেষতঃ তাঁদের দেবলীলা নয়, নরলীলা। যেসব কবি বা শ্রোতা তাঁদের বিষয়ে বর্ণনা বা শ্রবণ করেন তাঁরা শ্রীরাধামাধবকে দেবতারূপে দেখেন না। নায়ক শিরোমণি নায়িকা শিরোমণি রূপেই তাঁদের অপ্রাকৃত লীলাবলী শ্রবণ কীর্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও রাধাকৃষ্ণলীলা এইভাবে বর্ণনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনা শেষে শ্রীল শুকমুনি উপদেশ দিয়েছেন, ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রাকৃত রাসক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি অবিলম্বে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন এবং তাঁর হৃদ্রোগ জড় কামাদি অচিরে নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহূতি সংবাদে কপিলমুনি মাতা দেবহূতিকে বলেছেন—

> সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
> তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গকর্মণি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ বলেছেন—

"পূর্বোক্ত (৩।২৫।২৪) শ্লোকে 'প্রসঙ্গাৎ' এই বচনে প্রথমে শ্রদ্ধা তারপর প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গের মধ্যে ভগবৎ কথা ভজনক্রিয়াও উদ্দিষ্ট হয়েছে। ভজনক্রিয়ায় হৃদ্রোগ কামাদি অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তারপর সেই শ্রীহরি কথা ভজননিষ্ঠা উৎপাদন করে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বোধিকা রূপে ভজনে রুচি উৎপাদন করে হৃৎকর্ণ রসায়ন রূপে পরমানন্দ লাভ করায়। সেই শ্রীহরিকথা প্রীতির সঙ্গে সেবন করে

করে সাধক ক্রমশঃ অপবর্গের দ্বার স্বরূপ আসক্তি, রতি (ভাবভক্তি) ও প্রেমভক্তি লাভ করে।"

এই কথাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৪।১১) উল্লেখ করেছেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য চরিতামৃতে তারই অনুবাদ করেছেন।—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ভক্তি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন, সর্বানন্দ ধাম ॥" [চৈ. চ. মধ্য/২৩/৯-১৩]

আখের সব অংশ মিষ্টতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকলেও খণ্ডিত ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুরস এবং রস থেকে তৈরী গুড়, চিনি, কন্দ ও মিছরীর মধ্যে মিষ্টতার তারতম্য দেখা যায়; অনুরূপ ভাবে সেই কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব রূপ লাভ করে।

যখন অনুরাগ পরম চমৎকারিতার স্তরে কেবল আস্বাদনীয় হয় এবং অনুভাবিতাও এই আস্বাদনের ফলে সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিস্মৃত হয়ে আস্বাদন রসে নিমগ্ন হয়ে থাকে, —তখন এটি স্বসংবেদ্য দশা লাভ ক'রে স্পষ্ট ও অনির্বাচ্য আস্বাদনযুক্ত হয়ে ওঠে।

উদাহরণ—কূর্মাকৃতি প্রভৃতি অনুভাব যুক্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আস্বাদন মাধুর্যের গরিমায় 'আমি কৃষ্ণ' 'আমি শ্রীরাধা' এসব ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র এক অখণ্ড অনির্বচনীয় আস্বাদন রসে নিমগ্ন, এবং সেহেতু উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবে অলংকৃত হয়ে থাকতেন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান পৃ. ১।৫৫৫-৬)।

শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও দ্বারকায় অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণ যে কিরূপ ব্রজভাবে বিহ্বল হয়েছিলেন এবং কি কি লীলা করেছিলেন তা শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত শ্রীমন্দির ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠ ও ওড়িষ্যা মিউজিয়ামে এরকম তিনটি মূর্তি আছে যার উপরের ডান হাতে চক্র, বাম হাতে শঙ্খ এবং নীচের দুই হাতে বাঁশি। এই শ্রীবিগ্রহের লীলারহস্য বিষয়ে অধিকাংশ লোক অনভিজ্ঞ। দ্বারকায় অবস্থান কালে আদি দ্বারকায় যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ শঙ্খচক্রবংশীধারী শ্রীরাজেন্দ্র স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তা এই মহাভাব প্রকাশ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।—

'আদি দ্বারিকারে যাই' বনরে ভ্রমন্তি। বংশী ধারণ গোপীঙ্কু মনরে স্মরন্তি ॥

আপন ত তেজি গোপ দ্বারকাকু গলে। সেঠারে রাজেন্দ্র রাজ লীলাকু রচিলে ॥

*　　　*　　　*

আগন্তুকু করুণা বারে করি বনমালী। দেখিবু রাজেন্দ্রবেশ সকল গুআলি ॥

*　　　*　　　*

এমন্ত পাঞ্চিণ কৃষ্ণ দরহাস্য কলে। চতুর্ভুজ হোই শঙ্খ চক্রকু ধরিলে ॥
সদ্য বেণু অধরে লগাই ঠাণিরে। রাজরাজেন্দ্র ঠাণিরে প্রভু উভা হেলে ॥"

রথযাত্রা কালে মম্মহাপ্রভুর মহাভাববিকারাদির কথা 'মহাভাব প্রকাশ' গ্রন্থে (প্রথম বৃন্তে) যেমন বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনই বর্ণিত হয়েছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চৈতন্যচরিতামৃতে—

"মাংস ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়। লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্‌গম। 'জজ' 'গগ' 'জজগগ'—গদ্‌গদ বচন ॥
জল যন্ত্র ধার যৈছে বহে অশ্রুজল। আশপাশ লোক যত ভিজিলে সকল ॥
তেহ কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম ॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায়। শুষ্ক কাষ্ঠ সম পদ হস্ত না চলয় ॥
কভু ভূমে পড়ে কভু শ্বাস হয় হীন। যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্র বিম্বে বহে যেন ॥"

একমাত্র শ্রীগুরু বৈষ্ণবদের আশীর্বাদে, ধন-জন-পাণ্ডিত্য-ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে অযোগ্য হয়েও, এই গ্রন্থপ্রকাশ রূপ দুঃসাহসিক কাজে হস্তক্ষেপ করেছি। তাই সর্বশেষে সকলের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা, মুখে এই প্রার্থনা—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং বদামি।
হে মাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্য চন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

শ্রীপঞ্চমী ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১　　　শ্রীফকিরমোহন দাস।

॥ প্রথম বৃন্ত ॥

মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী কহ্নাই খুণ্টিআ গ্রন্থসূচনায় শচীনন্দনের বন্দনা করে লিখেছেন—

জয় পরমঙ্গল বাঞ্ছাকল্পতরু। জয়নীলাদ্রি ঈশ্বর জয় মহামেরু ॥
জয় কৃষ্ণ চিন্তামণি কমলার বর। তেত্রিশ কোটি ব্রহ্মাণ্ড লোমু জাত কর ॥
কেতে মহাপুরুষ দর্শনকু ইচ্ছন্তি। যোগীজন সর্বদা যোগরে সন্তরন্তি ॥
সেহি ভকতি মার্গে সে গউর সুন্দর। শচীনন্দন ধীর সুকোমল শরীর ॥
গৌর কান্তি যার যেহে সে মারতণ্ড। নবীন সন্ন্যাসী জ্যোতিরে পরচণ্ড ॥
তোর কলারে কলা পরম ব্রহ্মাণ্ডকর। দ্বাপর যুগ······সত্যবন মধ্যর ॥

সে নন্দ বলা অংশে জাত যে শচীসুত। রাধা কলারে জাত····· নবীন দ্বিজপুত ॥
নিত্যানন্দ অনুজ ভক্তহৃদয় ধন। চরণরে সেবন্তি বৈষ্ণব সুধীজন ॥
আরত ত্রাণ প্রভু ভকত জন প্রাণ। জগাই মাধাই জীবনর কারণ ॥
যাহার করুণারে পাপীএ যান্তি তরি। চণ্ডাল জনমরু মুকতি লাভ করি ॥
সে গৌর সুন্দর তোর পাদ পঙ্কজে। নির্মজ্জিলে কলারে সাক্ষাত দেব সে যে ॥
দইনে সে প্রভু উড্র নগরে গমিলে। হরি নামরে পাপীমানঙ্কু নাশ কলে ॥
কৃষ্ণলীলামৃত অমৃতময় হেলা। সকলভকতঙ্ক ভক্তি সাগর ভেলা ॥
শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত মানঙ্কর কান্ত। ॥
সার্বভৌম গউবব খণ্ডনে হে প্রাজ্ঞ। যাহার করুণারে অজ্ঞ হুএ বিজ্ঞ ॥
যাহার ত্রিভঙ্গঠানী দেখিলে নয়নে। নন্দকুমাব শোভা আসে গাঢে মনে ॥
যাহার মহিমাবে জগত আতযাত। যাহার দর্শনরে জড় হুএ জীবন্ত ॥
যাহার পাদ সেবি হুঅই ধন্য। যে ভক্ত কল্পতরু ভক্ত হৃদয় ধন ॥
কাশী মিশ্র যাহার চরণ সেবু থাই। সার্বভৌম যাহাব মহিমাকু বর্ণই ॥
যাহার পরশরে প্রতাপ নৃপবর। সে গজপতি শ্রেষ্ঠ নৃপমণি মণ্ডলর ॥
জগতনাথ পদে যার মতি মণ্ডিত। সেহু পবিত্র হেলা গউবে আতযাত ॥
গউরাঙ্গ চবণ পরশরে ধউত। যে নৃপরাণ ধন্য ধন্য তা পিতামাত ॥
সে প্রতাপরুদ্র ভূপ প্রশস্তি যার ধীট। গবাক্ষরে শোভিত যাহা রাজ মুকুট ॥
সে ভূপশিবোমণি যাহা পাদরে লোভী। মুঁ ছাৱ দ্বিজসুত তহিঁ কি পবাভবি ॥
অধম মুঁ হীনজন নুহেঁ তহিঁ সরি। কেমনে পাদ পঙ্কজে ধরি হেবি পারি ॥

কহ্নাই খুণ্টিআ আত্মপরিচয় এবং প্রথম চৈতন্য সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিযে লিখেছেন--

মো পিতা নিরঞ্জন খুণ্টিআ সুধী নর।
তার সুকৃতকু মোর জনম হেলা সার ॥
শ্রীকৃষ্ণচিন্তামণি শিবী নীলাদ্রীশ্বর।
সেবাবে নিযুকত থাউটি নিরন্তর ॥
এমন্তে দিনে শচীসুতর আগমন।
শুনি সবল জন আনন্দে তনমন ॥
দইবে শ্রীগুণ্ডিচা ঘোষ বিজয় বেলে।

তেলঙ্গী বাদ্যবাজনার সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হল। প্রথমে সুদর্শন, তারপর বলরাম, তারপর আদ্যাশক্তি সুভদ্রা, সর্বশেষে বামনরূপে মহাপ্রভু জগন্নাথ যাত্রা করলেন। সেবকদের মধ্যে ছিলেন খুণ্টিআ—'সেবক পণে খটুথাএ' মুরুখ মুঁ যে ॥'

গুন্ডিচা যাত্রা কালে দক্ষিণ প্রত্যাগত মহাপ্রভুর নৃত্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী খুণ্টিআ লিখেছেন—'শ্রীনিবাস নৃত্যরস সেকালে দেখই।

প্রভুর ভাবরে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হোই' ॥

এমন সময় হরিচন্দন নামক এক রাজপুরুষ নৃত্যের মহিমা না বুঝে নৃত্যরত মহাপ্রভুকে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে বারণ করল।

'এমন্ত সময়ে হরিচন্দন করণ। হস্ত ঠেলা দেই তারে করিলা বারণ॥
ভাবাবেশে পাইলাক ক্রোধ শ্রীপ্রভুর। নৃত্যর মহত্ত্ব বুঝি ন বুঝিলা বীর॥'

এই নৃত্য দেখতে দেখতে খুণ্টিআর এক দিব্যদর্শন হল। তিনি দেখলেন ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর জগন্নাথের ললাটনেত্র থেকে জ্যোতি গিয়ে গৌরের মুখে পড়ল। মহাভাবের এই আদান-প্রদান দেখে তিনি নিজের জীবন ধন্য মনে করলেন। তিনি তখন প্রভুর চরণে শরণ নিলেন। সাত্ত্বিক বিকারযুক্ত সেই উদ্দণ্ড নৃত্য শেষ হলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।—

শ্রীপ্রভুর নৃত্যক্রীড়া নেত্রে দেখিলই᳚। জনম পুন জনম ক্রিয়া মু হুড়িলই᳚॥
দেখিলি সে কালরে মুঁ ত্রৈলোক্য ঈশ্বরে। জ্যোতি প্রকাশই ছামুনেত্র মধ্যস্থলে॥
সে জ্যোতি পড়ই যাই গউর বদনে। দেখিলই᳚ মহাভাব আদান প্রদানে॥
জীবন মো ধন্য হেলা জনম মো ধন্য। অধিক পাইবা কিস ধীক মোর মান্য॥
চরণ ধরি প্রভুরে শরণ পশিলি। দাসানুদাস সমান প্রায় মুঁ মানিলি॥
সাত্ত্বিক বিকার পুনে উদ্দণ্ড নর্ত্তন। ত্যাগ করি কোল কলে ভকত বন্দন॥'

সেই দিব্য স্পর্শের অভিষেক হল খুণ্টিআর অশ্রুজলে।

'অশ্রুজল বোহি মোর গণ্ড যে তিন্তিলা। কি ভাগ্য মোহর প্রভু অনুগ্রহ কলা॥'

এ সময় মহাপ্রভুব ভাবাবেশ হল। ফল ভারাক্রান্ত গুল্ম যেন ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রত্যক্ষদর্শী খুণ্টিআ সে দৃশ্য বর্ণনা করেছেন—

'এ সময়ে প্রভুঙ্কব ভাবাবেশ হেলা। ফল ভারাক্রান্ত গুল্ম ভূমিরে লোটিলা॥
· · । ভূমিবে লুটিলে প্রভু স্থাণু অঙ্গ যে॥
শ্রীগৌর কণ্ঠ শুষ্ক অচেতন সর্ব। নাসাদ্বারে বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বোহে স্রাব॥
সকল ভকতগণ আকুলিত হেলে। প্রভুর চরণতলে সশোকে লোটিলে॥
পাহুণ্ডে আসন্তি প্রভু নীলাদ্রি ঈশ্বর। উদ্দণ্ডে নাচন্তি ভক্ত হৃদয় কিশোর॥
কালিআ হাতী সমান ব্রহ্মান্ড ঠাকুর। করভ প্রায় খেলন্তি গউর সুন্দর॥
রাধা রাধা নাম প্রভু করন্তি চিৎকারে। জগন্নাথ বিজে ভূমি তিন্তে লোতকরে॥'

জগন্নাথ সেবক কহ্নাই খুণ্টিআ হলেন শ্রীচৈতন্যের সেবক। প্রভুর সঙ্গে তিনি নানাদেশ ঘুরলেন, ভক্তদের সেবার সৌভাগ্য লাভ করলেন, হরিনামামৃতে তাঁর মন মগ্ন হল।—

'এহিপরি মহাপ্রভু করিলে বিজয়। এতেদিনে অধমর গতি করি থয়॥
ততপরু মুহিঁ প্রভু চরণে মজ্জিলি। ভাগ্যহেতু সুদয়ারু কাণিচে মজ্জিলি॥
শ্রীচরণে দরশন ভাগ্য মুঁ পাইলি। প্রভুর সঙ্গরে নানা কটক বুলিলি॥
মহাপ্রভু করুণারু ভকতগণকু। সেবা পাই ভাগ্যরু বলিলা জীবনকু॥
বহু বহু ভকতঙ্ক চরণ দেখিলি। হরিনামামৃতে মন বুড়াই রখিলি॥'

গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্যের সেবক হয়ে থেকে তিনি অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রায় রামানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর, পণ্ডিত গদাধর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ শিখী মাহাতি, শিখীর ভাই, গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি ভক্ত ও সেবক সমাগম লক্ষ্য করলেন। পর্যটনে মহাপ্রভু সাত বছর দূরে দূরে কাটালেন, তারপর অষ্টাদশ বর্ষ কীর্তনে কাটালেন।

'মহাপ্রভু পুণ শ্রীক্ষেত্ররে পাদ দেলে ॥

দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর। রামানন্দ কাশীশ্বর গোবিন্দ সত্বর ॥
সকল ভকতগণ চরণে মেলিলে। পুণ জগন্নাথ দেখিবাকু সর্বে গলে ॥
মধ্যলীলা সপ্ত বর্ষ কটাইলে দূরে। নীলশইল নিকটে অন্তলীলা কলে ॥
অষ্টাদশ বরষ কীর্ত্তনরে কটাইলে। অধম জনকু হরিনামে বুড়াইলে ॥'

একদিন 'চইত্র শুকল পক্ষ নবমী তিথির। শুভযোগে সুদয়া হেলা শ্রীমহাপ্রভুর' ॥

কাশীমিশ্রের প্রাঙ্গণে ভক্ত পরিবৃত শ্রীচৈতন্য অধোদৃষ্টি ত্যাগ করে ঊর্ধ্বে তাকালেন, শিবনেত্র হয়ে তিনি সমাধিস্থ হলেন।—

'সেহিদিন মহাপ্রভু গম্ভীর দিশিলে। অধোদৃষ্টি তেজি প্রভু ঊর্ধ্বে অনাইলে ॥
ঝরঝর নেত্রকোণু লোতক ঝরিলা। শিবনেত্র হৈলা প্রভু গাঢ়ে নিদ্রা গলা ॥'

কিছুক্ষণ পরে চেতনা পেয়ে তিনি 'রায় রামানন্দে গাঢ়ে কৈলে আলিঙ্গন'। দশমী প্রাতে কীর্তনমণ্ডলী এল।

দশমী প্রাতঃ কালবু উঠি মহাপ্রভু। কীর্ত্তন মণ্ডলী আনি পুজিলেক ।
কীর্ত্তন বিহ্বল হোই শচীর নন্দন। হাসাময় হেলে প্রভু ভকতবন্দন ॥
প্রভুর হাসাবদন পুলকিত হৈলা। নীলচক্র আড়ে দৃষ্টি উন্দাম হসিলা ॥
মহাপ্রভু কহিলে হে প্রিয়ভক্তগণ। প্রান্তলীলা প্রাপ্ত আমি কৈল দরশন ॥
জগন্নাথে আজ আমি হাসিতে দেখিল। ধন্য সেহি ব্রহ্মময় মোরে হসাইল ॥
এতে কহি মহপ্রভু উন্দাম হসিলে। পুরী গোসাইঁর পৃষ্ঠে করাঘাত কলে ॥
শ্রীমুখু হোইলা আজ্ঞা ধন্য ভক্তগণ। আজি আমি ব্রহ্ম জ্যোতি কৈল দরশন ॥

মহাপ্রভু বললেন, যার যা সংশয় আছে বল। 'যাহার সাংশয় যাহা ফেড়রে বোইলে ॥' তখন বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাতে 'রায় রামানন্দ হস্তে নেই পুষ্পরাশি। মহাপ্রভুর চরণে দেলেক বরষি ॥' তারপর রামানন্দ বললেন, "জগন্নাথ বিগ্রহে ত্রিভঙ্গিমা, অধরে মুরলী, মুখে রাধানাম নেই। তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হবেন কি করে, তাঁর ত বৃন্দাবন ধামও নেই।"—

'নাহি যেনু ত্রিভঙ্গিমা অধর মুরলী। নাহি বৃন্দাবন ধাম রাধানাম বোলি ॥
কেবণ ভাবরে প্রভু হেল জগন্নাথ। এথকু সংশয় অছি মোরটি বহুত ॥'

যোগতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন রামানন্দ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এ মহাভাব আজ প্রকাশ করি। এ সংকীর্তনের ভাব নয়,

এ গুপ্তস্বভাব। যে ভাব গোষ্ঠীতে বলা হয় না, তাকেই ভক্তরা বলেন গোপ্যভাব।' এই বলে কিছুক্ষণ মুদ্রিতনয়নে থেকে তিনি শ্রীমুখে মহাভাব প্রকাশ করলেন।

'হসি হসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দে চাহিঁ। কহিলে মহাভাব আজ প্রকাশই॥
এ ভাব সকল অটে ভকতঙ্ক ভাব। এহা নোহে সংকীর্তন গুপত সোভাব॥
গুপত ভাবকু কেবে গোষ্ঠীরে ন কহি। এ মন্ত ভাবকু ভক্ত গোপ্যভাব কহি॥··
শ্রী মহাপ্রভু সেবেলে হরষিত হেলে। ভাবাবেশে নয়ন যুগল মুদি দেলে॥
মুদ্রিত নয়ন রহিলাক অপলকে। মহাভাব প্রকাশিলে প্রভু শিরীমুখে॥'

খুণ্টিআ দাসভাবে মহাপ্রভুর পিছে বসে সব শুনলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আজ্ঞায় তিনি তা লিপিবদ্ধ করলেন। মহাপ্রভুর বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত লিখে গেছেন। এতে কোন ভ্রম হয়ে থাকলে খুণ্টিআ ক্ষমাপ্রার্থী। ভক্তরা এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন মহাভাব প্রকাশ।

শেষে ভক্ত কবি প্রার্থনা করছেন, যাঁর শ্রীমুখে এসব কথা তিনি শুনেছেন, তাঁরই পাদপদ্মে যেন সর্বদা তাঁর মতি থাকে, সেই নাম নিতে নিতেই যেন তাঁর দেহ লীন হয়, দেবদেবের সেবায় যেন তাঁর দিন যায়।—

মুই দাস ভাবে পৃষ্ঠে রহিথিলি। লেখনী দেইন তাহা লিপিবন্ধ কলি॥
এথকু মো অপরাধ ঘেনা ন করিব। মোহর ক্ষেমরে এহা কাহুঁ বা আসিব॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যে ভকতঙ্ক সার। তাহাঙ্ক আজ্ঞারে মুহিঁ কলি এ বেভার॥
গুরু বৈষ্ণব এথি দোষ ন ধরিব। ভ্রম থিলে নিজ গুণে ক্ষমা আচরিব॥
যে ক্রমরে প্রভু কৈল ভাব প্রকাশন। সেহি ক্রমে আমি দাস লিখিল বহন॥
যেউঁ মহাভাব প্রভু শ্রীমুখে বখানি। তাহা মাত্র মুই ছার করিলি বয়ানি॥
মহাভাব যেণু শিরী মুখরু বাহার। মহাভাব প্রকাশ যে তেনু নাম যার।
ভকত গুরু বৈষ্ণব কররে নিবেশি। অধম সেবক জনে রহিলা আশ্বাসি॥
এতে দিনে ভাগ্য মোর হোইলা উদয়। শ্রীপ্রভু মুখ বচন কলি মুঁ সংগ্রহ॥
ভকত করকমলে অর্পণ করিলি। ভ্রম মাত্রক পাইঁ কি ক্ষমা আচরিলি॥
এ মন্ত গ্রন্থর নাম দিল ভক্তগণ। আজ সিদ্ধি হেলা জগন্নাথ দাস পণ॥
যেউঁ পরম মুখরু এহা শুণিছইঁ। তাহারি পাদ কমলে নিবেশিলে যাইঁ॥
সেহি পাদপঙ্কজরে মোর মতি থাউ। সেহি নাম রটি মোর দেহ লীন হেউ॥
সেবক পণে জনম দেইছ হে হরি। এহি সৌভাগ্য দিঅন্তু করুণাকু করি॥
দেবদেব সেবা খটি খাউ মোর দিন। ভণই কহ্নাই প্রভু ভাব প্রকাশন॥
ইতি শ্রীমহাপ্রভু কথামৃত বর্ণনে মহাভাব প্রকাশে আদ্য বৃত্তঃ।

॥ দ্বিতীয় বৃত্ত ॥

খুণ্টিআ প্রথমে দীনতা প্রকাশ করেছেন—

'এ মহাভাব প্রকাশ গ্রন্থ মধ্যে সার। যাহা শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ কমলু বাহার॥

তাকু আম্ভে ছার কিবা করিবু বখাণ। প্রভু শ্রীমুখ বচন দৃঢ়ভেদ জাণ॥'

তারপর বেণ্টপুরবাসী ভবানন্দ পট্টনায়ক এবং তাঁর তিন পুত্রের কথা প্রসঙ্গে খুণ্টিআ বলেছেন—

'তাহার যে তিনি পুত্র অটে ধনুর্দ্ধর। নৃপকু সেবিলে সেহু অতীব চতুর॥
সানপুত ধরণীধর যে বড় কোপী। গ্রামর সকল ভেদি রখিলে বহপি॥
তার ভাই গোপীনাথ যে পট্টনায়ক। রাজবিদ্যারে খটণি নেলা তমলুক॥
এমন্তে তার সভা বড় ভাই জাণ। রামানন্দ পট্টনায়ক যে নাম পুণ॥
রামানন্দ রায় পদ পাইলেক সেহু। পরমমিত্র নৃপর অটন্তি সেহু॥
সর্বদা কৃষ্ণরসরে মজ্জি থাই মন। সর্বদা কৃষ্ণচরণে রত থাএ মন॥'

এমন ভাবে কৃষ্ণরসে মাতোয়ারা হলেন রামানন্দ যে রাজ্য পরিচালনার পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়লেন। রাজাকে বুঝিয়ে তিনি রাজকাজ ছেড়ে পুরীতে এসে চৈতন্যের আশ্রয় নিলেন।

'এমন্ত কৃষ্ণরসরে বাই সেহু হেলা। রাজ্যর গহণ সেহু চালি ন পারিলা॥
এমন্ত ভকতশ্রেষ্ঠ রহি ন পারিলে। শ্রীক্ষেত্র গৌরাঙ্গ রাধারসকু শুনিলে॥
রাধা রাধা নাম সর্বদা ত জপুথাই। প্রতাপনৃপকু সেহু দেলা সমুজাই॥
তেজিলা নৃপগহণ চৈতন্যে মিলিলা। গুরুগোবিন্দ পাদরে মন মজ্জাইলা॥
প্রতাপরুদ্র যে নৃপ তাঁঠারে বিশ্বাসী। তাহা সঙ্গে বিহরে নিত্যধামে আসি॥'

এরপর আবার গম্ভীরায় (কাশীমিশ্রের ভবনে) মহাপ্রভুর মহাভাব তত্ত্ব ব্যাখ্যান প্রসঙ্গ।—

'কাশী মিশ্র পুরীরে যে প্রবেশ হোইলে। প্রভুরে নৃপ আসিণ দণ্ডবত হেলে॥
আদেশকু প্রভু মুখুঁ শুনিবি বোইলে। ॥
অএলা তবুর মূলে চৈতন্য ঠাকুর। বসি যে ভাব প্রকাশ করিলে তৎপর॥
উঠ উঠ নৃপ বোলি চিৎকার করিলে। রায় রামানন্দ নৃপে তোলিন ধরিলে॥'

(এই ধরনের একটি ছবি প্রতাপরুদ্রের আদেশে আঁকা হয়েছিল এবং মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে ছিল।)

রায় রামানন্দ —

'কর যোড়ি উর্দ্ধে তোলি বেনি করমান। বোইলা ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতি করন্তু বখাণ॥
,যে বৃষভানুজা রাধা কৃষ্ণের ভাবিণী। যেউঁ মহাশক্তি অটে জগতপ্লাবিনী॥
সেহি রাধাতত্ত্ব আমায় করন্তু বখাণ। শুণি এহা মহাভাব ধন্য হেউ প্রাণ॥'

তখন মহাপ্রভু—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা নাম উচ্চারিলে। অধনেত্র করি মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে॥
এমন অটই টান গোপ্যতত্ত্ব পুণ। অপ্রকট লীলা এহু জাণ ভক্তগণ॥

রাধাতত্ত্ব প্রসঙ্গে এসেছে তন্ত্রের মাতৃকান্যাস ; তিনি বলেছেন পিঙ্গলা নাড়ীর অধিকারিণী প্রেমময়ী রাধা, শরীরের 'সারচক্রে' অষ্টবর্ণে আছেন অষ্ট সখী ; পরম জ্যোতি প্রভু আদি মূলের কামতত্ত্ব বা ক্রীড়াতত্ত্ব রাধাকে নিয়ে। তেজরূপে জগতের প্রকট লীলায় এবং অপ্রকটে চলছে সেই শক্তি ও শক্তিমানের চিরন্তনী ক্রীড়া।

'পঞ্চাশবর্ণ যে জ্যোতি পরকারে পূর্ণ। সর্বপরতত্ত্বকু ঘেনি অছান্তি প্রমাণ॥
এ মানঙ্ক মধ্য সর্বে দেবঙ্কর বীজ। রং যে অটই জাণ রাধিকার বীজ॥
র-কার অটই মহাতেজর স্বরূপী। র কার অটই জাণ পরম · ॥
অগ্নিতেজর আকার অটন্তি রাধিকা। রং বীজে প্রেম · হোই কৃষ্ণে বিকা॥
শরীর সার চক্ররে সকলে অছন্তি। অষ্ট বর্ণে অষ্ট সখী বেড়ি রহিছন্তি॥
রং বীজ অগ্নি স্বরূপ হৃদ মধ্যে স্থান। হৃদয় অধিকারিণী প্রেমরূপী জাণ॥
পিঙ্গলা নাড়ি সেহু যে অধিকারিণী। সেহিঁ প্রেমময়ী সুধা প্রেম বর্ষিণী॥
ললিতা-বিশাখা চন্দ্রলেখা আদি সখী। ল ব চ বীজমানঙ্ক বেড়িছন্তি দেখি॥
হৃদয় ঈশ্বরী রাধা অগ্নির সমান। অযোনি সম্ভূতা সেহু অটন্তিটি জাণ॥
রাধিকা অনল পূর্ণ যমুনা যে জল। অনল সন্তাপ সেহু সর্বদা ব্যাকুল॥
সবুবেলে অগ্নিতেজে হোইণ অস্থির। ক্রীড়া করুণ থাআন্তি যমুনা নীরর॥
কামতত্ত্বভেদ সেহু ন জাণি জাণন্তি। ক্রীড়াতত্ত্বমানঙ্কু সে মনরে ভালন্তি॥
সকল স্থানরে সেহু থান্তি বিদ্যমান। মাত্রক শূন্যমণ্ডলে থাই যার ধ্যান॥
দেখিলে পরম জ্যোতি প্রভু আদিমূলে। সকল রতি সুরতি করহিঁ বোইলে॥
রাধা অটে নারীরূপ যোগমায়া যেণু। পীত বৎস পরিধান করিথাএ তেণু॥
মানিনীমানঙ্কর সে মানিনী অটন্তি। মন্দগামিনীমানঙ্ক শ্রেষ্ঠ গামিনী বোলন্তি॥
সুন্দরীমানঙ্ক মধ্যে সে সর্বসুন্দরী। কৃষ্ণ রূপমোহিনী তেজ রূপ ধরি॥
অশরীর শরীররে নিত্য সে রমন্তি। ব্রজ কিশোরঙ্ক সঙ্গে সে ক্রীড়া করন্তি॥
কেবে শরীররে সেহু শরীর বহই। পুণ অদৃশ্য হোইণ কৃষ্ণকু ক্রীড়ই॥
রাধা যে ভাব রূপসী ভাবর আকর। ভাবময়ী যেণু নাম অটে তাহাঙ্কর॥
হৃদয়র ভাব বা কেলি যাকু সর্বে কহে। সেহু রাধা জাণ এথি গুপ্ত নাম বহে॥
ভাবাবেশে যেউঁ জন কৃষ্ণকু সেবই। সেহু রাধা অঙ্গ মধ্য প্রাপত হুঅই॥
ভাবরে মজ্জিণ কলে কৃষ্ণ আরাধনা। রাধা ভাব ভাবে তাহা অটই ধারণা॥
এ ভাব গুপত এহা অপ্রকট ভাব। এ কথা মানঙ্ক কেভে প্রকট ন হেব॥
প্রকৃতি মধ্যরে সার ভাব এহু জাণ। সেহি সাক্ষাত যে রাধা প্রকৃতি প্রমাণ॥
ভাবরে চিন্তিলে কৃষ্ণ নিশ্চয় ভেটিব। ভাব বিনা ভাবগ্রাহী কেবে ন লভিব॥
ভাবরে মজ্জিণ নিত্য চিন্তিব । ভাবরে ভাবিব নিত্য দাতা রসময়ী॥
আপণ ভাবরে যেবে অবতার হেব। তেবে যাই কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন লভিব॥
এহা রাধা গূঢ় কথা গুরু মুখু শুণি। এ মহাভাব প্রকাশ করিলই পুণি॥'

তখন রামানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, ভাব যদি রাধা হন, গোপীদের তত্ত্ব কি ?

'এথু অন্তে রায় রামানন্দ পুছা কলে।
ভাব যদি রাধা হেলে গোপী কে হোইলে ?'

মহাপ্রভু বললেন—

'নবচক্রে সর্বানন্দময় চক্র সার। সর্বানন্দময়ী রাধাঙ্কর যে বেভার ॥
সর্বানন্দ চক্রর যে ভাবময়ী রাধা। সচ্চিদ্ বিগ্রহরে সেহু সে আনন্দ ॥
পরাপরাতি রহস্য যেউঁ সখী গুণ। কৃষ্ণ রহস্য গামিনী ভক্তিরে নিপুণ ॥
এ মান গোপীজন যে রাধাকু ক্রীড়ন্তি। ভাবকু অষ্টধা ভক্তি গাঢ়ে · ॥
অষ্টসখী পুণ ভাব নবধা ভকতি। করই নিপুণে ভাব কৃষ্ণরে পীরতি ॥
ভাব মহাভাব নামে প্রকাশিত থাএ। কেবণ নন্দন কৃষ্ণ মন মজ্জু থাএ ॥
এমন্তে গোপীভাবকু যেজন দেখই। কৃষ্ণ রসর সার সে নিগূঢ়ে ভেদই ॥
পরম মঙ্গল কৃষ্ণ চরণ যে পাই।—

সে বিভব ইহকাল পরকাল সার। পরম কৃষ্ণর রস এহু অটে ঘোর ॥
জগত মঙ্গল কৃষ্ণ জীবর কারিণী। ভকত জনঙ্ক হৃদ বধু স্বরূপিণী ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরণে মন সুনিশ্চলে। ভাব নবধা ভেদরে রখিব নিশ্চলে ॥'

মৃদু কোমল কণ্ঠে এ কথা বলে চৈতন্য গোসাই বিস্ফারিত চক্ষে ভক্তদের দিকে তাকালেন। দুচোখের কোণ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল।

'এমন্ত মৃদু বচন কোমলে কহিলে।
নেত্র ফিটাই গোসাই ভকতে চাহিলে ॥
নয়ন কোণু বহই লোতকর ধার।'

কহ্নাই খুণ্টিআ নিজেকে 'প্রভুর কিঙ্কর' বলে পরিচয় দিয়ে দীনতা প্রকাশ করে বলছেন চৈতন্যচন্দ্রের করুণাই তাঁর সহায়-সম্বল।—

'প্রভুর কিঙ্কর আম্ভে অটু দাস ছার ॥

ভাব রাধা সঙ্গ তার যে আম্ভ ভেট নাহিঁ। আম্ভে কাহিঁ পাইবু বা শ্রীরাধার সাইঁ ॥
আম্ভে ভক্তগণ যেতে অধম সকল। চৈতন্যচন্দ্র করুণা আম্ভ সার বল ॥
তা করুণা বিনা আম্ভ জীব অকারণ। জগত মঙ্গল সেহি চৈতন্য আপণ ॥'

গুরু গৌরাঙ্গ ও নীলাদ্রি ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চলাভক্তি জানিয়ে খুণ্টিআ বলছেন—

'সে গুরু গৌরাঙ্গ তুলে মন মো নিশ্চলে। রহু এতিকি দয়িনী নীলাচল কূলে ॥
বিচার করিণ যেহু নীলাদ্রি ঈশ্বর। সেবারে কাটু এ কাল এ ঘোর জঞ্জাল ॥'

দ্বিতীয় বৃত্তের উপসংহারে খুণ্টিআ পুনরায় জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গ-মুখে শুনেই তিনি এই মহাভাব প্রকাশ লিখেছেন।—

'যাহা মুঁ গুরু গৌরাঙ্গ মুখরু শুনিলি। সেহি মহাভাব মুহিঁ মন্ত্র যে লেখিলি ॥
ভকত বান্ধবগণ মোর দোষ ক্ষমি। জানিবে ভাবপ্রকাশ গুরুপাদ গুণি ॥
কহ্নাই অধম ছার শরণ পশই। ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যগীর ভাষাছন্দে কহি ॥'

॥ তৃতীয় বৃত্ত ॥

তৃতীয় বৃত্তে প্রথমেই গজপতি প্রতাপরুদ্রের মহিমা বর্ণিত হয়েছে।—

'শ্রীপ্রতাপরুদ্র যেহু সূর্যবংশে জাত। বিষ্ণু অংশে অবতার এহু যে বিদিত॥
বিষ্ণুভক্তি কল্পদ্রুমে যাহার সঙ্গতি। বিষ্ণুপাদ সেবারে যাহার থাএ মতি॥
শিরী পুরুষ উত্তম নৃমণিঙ্ক সার। পরম ঈশ্বর যাকু রখন্তি সত্বর॥
সে পুরুষোত্তম রাজা অটই শরণ। তাহাঙ্ক সুত অটন্তি যেহু নৃপরাণ॥
সে প্রতাপরুদ্র রাজা বঢ়াতি আপণে। ত্রিভুবনে ন রহিলা কেহি' নৃপজণে॥'

এরপর প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণ গমন ও শাহ ইসমাইল গাজীর পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার খবর দিয়ে খুণ্টিআ লিখেছেন—

'এ সময়েশ্বর স্থানু গাজি ইসিমিলি। রহটি আসিলা নীলগিরি ক্ষেত্র মেলি॥
নীলাদ্রি কটক করি গইণ করিলা। পরম ঈশ্বরঙ্ক সে ঘেনিবি বোইলা॥'

হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী পুরী জয় করে পরমেশ্বর জগন্নাথকে দখল করতে এলে জগন্নাথ সেবকেরা (এঁদের মধ্যে খুণ্টিআ নিজেও ছিলেন) গোপনে গুপ্ত পথে জগন্নাথ বিগ্রহ নিয়ে চিলকা হ্রদের মধ্যে রেখে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নৃসিংহ মহাপাত্র।

'গুপ্ত দক্ষিণ দ্বাররে বাহার হোইলু। বালি লোকনাথ ঠারে ব্রহ্মাকু রখিলু॥
মাত্ররে রজনী যেহু গাঢ়তর হেলা। হস্তিরে বসাই নরসিংহ তাকু নেলা॥
সে নৃসিংহ মহাপাত্র অটইটি জ্ঞানী। সেবক কুলর নায়ক সে মহামানী॥
পট্টযোষী পদরে যে ভূষিত অচ্ছই। নেলা পরম ঈশ্বর দক্ষিণকু বাহি॥
চারিদিনে গড় কেঙ্কলরে পহঞ্চিলা। সররে স্নাহান করি সন্তোষ লভিলা॥
এ মস্ত ভয়রে নেই পরম ঈশ্বর। রখিলে গুর্মক থিলা হরদ মধ্যর॥'

রাজার এক পাত্র এই খবর দিয়ে 'কৃষ্ণাবেণী নদীতীরে রাজাকু ভেণ্টিলা॥' রাজা পাত্রের মুখে সব শুনে 'বোইলে আজ মারিণ যবন কি ছার'॥ এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি চিল্কা হ্রদের মধ্যবর্তী পাহাড়ের চড়াই গুহায় রক্ষিত জগন্নাথ দেখলেন—

'এমন্ত গাঢ় বচন চড়াই গুহারে। প্রবেশ হোইলে নৃপ অতি কাতররে॥
সেঠারে পরম ব্রহ্মা সেঠারে দেখিলে। হরি হরি বোলি তহিঁ প্রণামকু কলে॥'

সেদিন স্বপ্নে পরমকৃষ্ণ জগন্নাথ রাজাকে দর্শন দিলে রাজা বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

'বোইলে পরম কৃষ্ণ শুন তু রাজন। তু যদি চিন্তিত থান্তু আগরু এমান॥
আম্ভে তেজি সিংহাসন এঠাবরে থান্তু। তেজিন সকল ভোগ এমান ভোগন্তু॥
এমন্ত বচনমান স্বপনে শুনিলা। সে দিনু বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ যে কলা॥'

'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র নিয়ে রাজা সেই নাম স্মরণ করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। গাজী ইসমাইল প্রতাপরুদ্র আসছেন শুনে ভয় পেয়ে মন্দারণ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন—

'হোইলাক হরেকৃষ্ণ নামাক্ষর চারি। হোইণ রাজগহণে গলেক সুমরি॥
মন্দার দুরুণ গাজি যাইন রহিলা। প্রতাপরুদ্র আসিব বোলি ভয় কলা॥'

কিন্তু রাজা মন্দারণ দুর্গ ভেদ করতে পারলেন না।—'মাত্রক মন্দারগড় ভেদি ন ভেদিলে।' কিছুদিন জগন্নাথের সেবা করে রাজা আবার দক্ষিণ দেশে চলে গেলেন।—

'কিছিদিনে সেবিলেক প্রভু পয়র। গলাক নরেশ দক্ষিণ দিগকু সত্বর॥'

প্রতাপরুদ্র যখন দক্ষিণ অভিযানে গেছেন সেই সময় নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্য এলেন নীলাচলে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—মহাপ্রভু মাঘ শুক্ল পক্ষে সন্ন্যাস করে,—
[চৈ. চ. মধ্য ৭]

'ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল। প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন। বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হইল মন॥'

চৈত্রে 'সার্বভৌম বিমোচনে'র পরই শ্রীচৈতন্যের প্রতি নীলাচলের সকলে কৌতূহলী হন। কাহ্নু খুণ্টিআ সন মাস তিথি বারের উল্লেখ করে লিখেছেন—

'ন অ শ অঠর সাল[১] প্রবেশ হোইলা। এ মন্তে ভাগ্য ক্ষেত্রর যহুঁ প্রবেশিলা॥
চৈত্র মধুমাস সার বেণ্ট যাত্রা বেলে। কিশোর বয়স যতি প্রবেশিলে কালে॥
সঙ্গরে অছন্তি থোকে বৈষ্ণব মণ্ডলী। কিশোর বদনু জোতি পড়ুঅছি গলি॥
আনন্দ বদনে হরিনাম রটি। প্রবেশিলে ক্ষেত্র মধ্যে শচীচন্দ্র সেটি॥
পূর্ণচন্দ্র রূপ যার অকপট ভাব। দণ্ড কমণ্ডলু শোভা অটই স্বভাব॥
কিশোর সমান মধুহস চহটই। রাধা রাধা নাম রটি সুমধুরে গাই॥
আসিলে নদীআ শশী দ্বাদশী তিথির। সেহুদিন গুরুবার অটইটি সার॥
সকলে গমিলে নব যুবা দরশনে। দর্শনে পুরই প্রাণ নয়নে বা মনে॥
ঢলি ঢলি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ হোইলে। হরিবোল শবদরে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিলে॥
সেহি যে গৌরাঙ্গ প্রভু দরশন হেলা। যে লভিয়া জনমকু সুকৃত ভজিলা॥
অপ্রকট লীলামান মুখরে বখাণি। গলেক গউরচন্দ্র নামাবলী শুণি॥
সকলে এমন্ত বাণী কর্ণরে শুণিলে। আপণা দিনু জাণক বড়ই মণিলে॥
ভোগ মণ্ডপ গৃহরু প্রসাদ পাইলে। বেড়ারে যোগ মূরতি গাঢ়ে বিজে হেলে॥
দরশন পাই সর্বে হোইলে আকুল। দণ্ডীমানে বোইলে এ বাতুল বাচাল॥
এমন্তে কেতেক দিন এ পরি গড়িলা। ক্ষেত্র তেজ্যা করি নবযতি দক্ষিণে গমিলা॥'

রাজা দক্ষিণ থেকে ফিরে শ্রীক্ষেত্রে এলেন।—

'এ দেব দুর্লভ সেবা নৃপ যে করই। এ নিমন্তে আসিলেক ঘেণিণ বধেই॥'

---

১. চৈত্র মাসে নয়, ফাল্গুনে পুরীতে এসেছিলেন মহাপ্রভু। মহাভাব প্রকাশের এই অংশটি সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, মহাভাব প্রকাশে প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে। বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর ৯১৮ সালে পুরীতে প্রবেশ করলেন। ৯১৮ বছর (১৫১০-১৫১১ খ্রীঃ)। মুসলমান বিজয়ের পর আর কেউ এই লাইনগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন।
(শ্রীচৈতন্যাষ্টক, পৃ. ৫৪)

এই সময় রাজা শুনলেন নবীন সন্ন্যাসীর কথা। রাজা শুনে চমকিত হলেন, বললেন, 'আমি ত পাত্রের মুখে তাঁর কথা শুনেছিলাম !'—

'এ সময়ে শুণিলেক সন্ন্যাসীর গতি। সর্বদা কৃষ্ণরসরে যার থাই মতি ॥
তাহার সকল গাথা লেংকা বখাণিলা। নবীন সন্ন্যাসী দেব এথি আসিথিলা ॥
তড়উ আণি পড়িলা পাঞ্জিমান বাড়ি। কুমার বৈরাগী এক আসিথিলা মাড়ি ॥
ভকত মণ্ডল তাহা সঙ্গে আসিথিলা। পরম ঈশ্বর দেখি দক্ষিণাই গলা ॥
কুঞ্জমঠে প্রভু সেহু করিলা আস্থান। এ বিষয়ে মহাশ্রম হেউ অবধান ॥
শুণি দিব্যনৃপ এহু চমকিত হেলা। আগ্তে তাহার বিষয় পাত্রঠু শুণিলা ॥'

রাজা প্রতাপরুদ্র রামানন্দের মুখেও শুনেছিলেন নবীন যতির কথা। এখন তাঁকে দেখবেন স্থির করলেন। প্রতাপরুদ্রের মুখে কবি এখানে যে গৌর বন্দনা শুনিয়েছেন তা রাজার পরবর্তীকালের রচনা অথবা কবি কর্তৃক অরোপিত মনে হয়।—

সেহু অটে শ্রীগৌরাঙ্গ পরম ভকত। জগন্নাথর প্রধান . . ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ শচীমাতার দুলাল। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ জগন্নাথর বাল ॥
সে প্রাণ গৌরঙ্গ অটে মধুর মুরতি। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ দেহে অছি জগজ্জ্যোতি ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ পাদে নটবর ঠাণ। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ দেহে ব্রজের কাছেণ ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ নবযতি অবতার। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ রাধা অংশে সুকুমার ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ গলে তুলসীর মালা। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ নানা হস্তো অনর্গলা ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ সর্বজ্ঞানর আকর। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ গৌড়চন্দ্রনা ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ লক্ষ্মীদেবীর নায়ক। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ সর্ব শাস্ত্রর বিবেক ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ ঠারে সর্বজ্ঞান ঠুল। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ লীন থাএ আদিমূল ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ রঙ্গাধরকু দেখিলে। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ মধুহাস নিরেখিলে ॥
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ পূর্ণচন্দ্র সম মুখ। সে প্রাণ গৌরাঙ্গ শোভা ত্রিভুবন সুখ ॥
সেমান যে নরনেত্র বারে নিরেখই। জন্ম জন্মান্তর দুঃখ তাহার লিভই ॥
এমন্ত মহিমা তার চৈতন্য ঠাকুর। অটই যোগীন্দ্র সেহু মেদিনীখণ্ডর ॥
রায় রামানন্দ মুখু নৃপ শুনিথিলে। নবীন যতিকু বারে ভেটিবি চিন্তিলে ॥

ভারত পর্যটন করে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন শ্রীচৈতন্য। ইতোমধ্যে রায় রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবক হয়েছেন। রামানন্দ বালকৃষ্ণের উপাসক—মাধবেন্দ্রপুরীও বালগোপালের উপাসক ছিলেন। বলা হয়েছে রায় রামানন্দের ছিল দাসভাব। আবার 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে মধুর রসই প্রধান। অর্থাৎ বালগোপালকেন্দ্রিক বাৎসল্যের সঙ্গে দাস্য ও মাধুর্যরসের সহাবস্থান এখানে লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, রায় রামানন্দ ঠিক করলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ঘটাবেন।

দৈবকালে সেহু যতি শ্রীক্ষেত্র প্রবেশ। হোইলেক শ্রীগুণ্ডিচা যাত্রা সমাবেশ ॥
এঠাবে শ্রীগৌরাঙ্গর নাম প্রকাশিলা। সেমান শ্রীরায় রামানন্দ যে শুণিলা ॥
ভবানন্দ করণর সেহু যে সন্ততি। বেণ্টপুর গ্রাম সার তাহার ভোগতি ॥
সেহি অটে পট্টপাত্র (পাটপাত্র উ.বি.অ.) প্রতাপরুদ্রর। মাত্রক অটই ভক্ত ভাব নিরন্তর ॥

সদা কৃষ্ণরসে তার রহিথাই মতি। সদা বালকৃষ্ণ প্রেমে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি ॥
পরম কৃষ্ণঙ্কু সেহ করই ভাবনা। সদা সেবা দাসভাবে তাহার চেতনা ॥
তা অনুজ গোপীনাথ সে নোহে ভাজন। তাহ সঙ্গে নোহে ভাব সদাকৃষ্ণে মন ॥
কৃষ্ণ লয় লবে লবে বুদ্ধি হেলা যহুঁ। রাজকার্য্য গলা তার সর্ব হেলে শচী সাহ' ॥
শচীর দুলাল পাদে সেবক হোইলা। নৃপকু ভেটাইব বোলি বড় পণ কলা ॥

তদনুসারে রামানন্দ প্রতাপরুদ্রকে প্রভুর সামনে নিয়ে এলেন—'প্রতাপ নরেশ ছামু কলা নেলা।' এবং 'সে নৃপতি ভকতিরে হোইথিলা ভোল। সর্বদা মতি তার চৈতন্য ঠাকুর' ॥

এরপর আবার ভাবপ্রকাশ প্রসঙ্গ। রায় রামানন্দ চৈতন্যের প্রশংসা করে জগন্নাথ তত্ত্ব শুনতে চাইলেন।—

'বোইলে পরম গুরু শুণসি মো বাণী। আপণ ত যোগীমানঙ্কর শিরোমণি ॥
আপণ ত নদীআর পূর্ণতম শশী। আপণ ত স্বয়ং অট পূর্ণ ব্রহ্মরাশি ॥
আপণ ত স্বয়ং রাধা অঙ্গ অবতার। আপণ ত সর্বজ্ঞান ভণ্ডারর সার ॥
করুণা কর হে প্রভু বারে মো সন্দেহ। ফেড়ন্তু য়ে মহাপ্রভু যাউ মো সন্দেহ ॥
কেবল তত্ত্বরূপরে জাণিবাকু ইচ্ছা। তেণু জগন্নাথতত্ত্ব প্রভু কলি পুচ্ছা ॥
এহাত সাক্ষাতরে আম্ভে দেখি অছই'। নৃত্যকালে দুই জ্যোতি হেলা ছুআঁ ছুই' ॥
নীলধবল মুরতি একা অঙ্গ হেলা। যুগল পরম জ্যোতি তহুঁ প্রকাশিলা ॥
আপণঙ্ক শ্রীমুখরু সর্ব ভক্তগণ। শুণিবেক গূঢ়বাণী পশুছি শরণ ॥
এমন্ত মধুর গীর রামানন্দ রায়। ভাষিণ শরণ গলা প্রভু পদ্ম পায় ॥

প্রভু যে তাহাঙ্কু ধরি কোলে উঠাইলে। নয়নু লোতক ধারা পোছি বসাইলে ॥'

মহাপ্রভু বললেন—

'যে বা জগন্নাথ সেহু ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ কিচ্ছই ভেদ সো বে নাহি ভক্তগণ।'

কহ্নাই খুণ্টিআ লিখছেন—

'এমন্ত যে কথাসার প্রভু বখাণিলা। ভাষা প্রবন্ধরে তাহা অধম লেখিলা ॥
শুণসি হে ভক্তগণ করি স্থির মন। যে কথা শুণিবা পাই' মুনি এ ভাজন ॥'

প্রভু বর্ণিত সেই 'কথাসার' হল এই—'কৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় গিয়ে রাজা হয়ে বসলেন। রুক্মিণী আদি রাণীদের পেয়ে যোগেশ্বরী রাধাকে তিনি ভুলে গেলেন। কিন্তু সেই প্রেমময়ী কিশোরীকে কে ত্যাগ করতে পারে? অনাদি পুরুষের-রতি যে তাঁকে নিয়েই। দ্বারকার বনকে তাঁর মনে হয় বৃন্দাবন। বংশীধারী হয়ে তিনি মনে মনে গোপীদের স্মরণ করেন। ললিতাদি অষ্ট সখী সেখানে চলে আসেন। তাঁদের নিয়ে সেখানে রাসরচনা করেন দ্বারকাপতি। অমেয় রজনী মধুময় হয়ে ওঠে। সেই গুপ্তরাস ক্রীড়ায় নিমগ্ন হন গোপীনাথ।—

'রাজদণ্ড ধরি সেহু ব্রজের নন্দন। আনন্দে পালুথান্তি দ্বারকার জন ॥
রাধা আজি যোগেশ্বরী মনে ন ভাবিলে। রুক্মণী আদি নারীকু রাজেন্দ্র রহিলে ॥

পূর্বরু শুণিল ত হে রাধা ভাবরূপী। কেমনে তেজিলে তাকু পরব্রহ্ম রূপী ॥
প্রেমময়ী কিশোরীঙ্কু পারে কেবা তেজি। অনাদি পুরুষ রতি তাহাকুত হেজি ॥
যেবে সেহি প্রেমভাব স্মরণ করন্তি। বৃন্দাবন বোলি সেথি আসই ত ভ্রান্তি ॥
আদি দ্বারকারে পাই বনরে ভ্রমন্তি। বংশী ধরিণ গোপীঙ্কু মনরে স্মরন্তি ॥
ললিতাদি অষ্ট সখী মেলন্তি তক্ষণ। রাহাস রচন্তি তহিঁ নৃপ নারায়ণ ॥
মধুময় হোইথাএ অমেয় রজনী। ক্রীড়ারে মজ্জন্তি প্রভু গোপীগণ ঘেনি ॥
সে ঠাবে সবল গোপী ক্রীড়া আচরন্তি। নবকিশোর বদন ফুলরে সজান্তি ॥
এমন্ত গুপ্ত রাহাস রচন্তিটি হরি। কেতে বা পারিবি মুঢ় মুইঁবা বিস্তারি ॥'

একদিন ললিতা বললেন, 'হে গোপীজীবন, আমাদের তোমার রাজেন্দ্ররূপ দেখাও!' কৃষ্ণ মধুর হেসে গোপীদের দ্বারকানাথ রূপ দেখালেন। কবি বলছেন, 'ভক্তির মূল হল ভাব, ভাব ভক্তগুরু, ভাবে হিম মহামেরু পর্যন্ত টলে যায়'।—

'ভাবহিঁ ভকত মূল ভাব ভক্তগুরু। ভাবরে টলই সিনা হিম মহামেরু ॥

এই প্রেমভক্তির ক্রীড়ার পর দ্বারকাপতি দ্বারকার প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

'রুক্মিণী সত্যভামা যে সেবা আচরিলে। আপণে রাজকার্য্যকু সুধারি লগিলে ॥'

কিন্তু রাজকার্যের মধ্যেও রাধাকে ভুলতে পারেন না তিনি।—

'ভাবরে মণ্ডিজণ হরি থান্তি সবুকালে। ভাবরূপী রাধানাম হৃদপটে ভালে' ॥

একদিন রুক্মিণী সত্যভামার সমক্ষেই তিনি 'রাধা' বলে ডেকে উঠলেন।—

'এমন্ত চিৎকার শুণি দ্বারকার রাণী। বোইলে প্রভু এ কিস বিপরীত বাণী ॥
আপণ ত সর্বজ্ঞ যে সকল জাণন্তি। আপণ ত ব্রহ্মাণ্ডর সকল সৃজন্তি ॥
আপণ যে লোকমতে অণীতি করিলে। পরনারী নাম মুখে কেমন্তে ধরিলে ॥
অবর চরণ দাসী পাশে নিরন্তর। খটণী কালরে প্রভু এ কেউঁ বেভার ॥'

প্রাণনাথ, আমাদের মনের সন্দেহ মোচন করুন, রাধা নামে কে সেই নারী, কে সেই ভক্তরাজ যাকে আপনি স্মরণ করলেন।—

'রাধা নামে অছি যেবা কেউঁ সেহি নারী। কেবা সেহু ভক্তরাজ থিলা বা সুমরি'॥

এ কথা শুনে প্রভু চিন্তামণি বললেন, 'এ বড় গোপন কথা। তা ছাড়া, আমার কথা নিজমুখে বলা অশোভন। তোমরা, বৃন্দাবতী নামে যে নারীরত্ন আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন।'

'এমন্ত বচন শুণি প্রভু চিন্তামণি।…

বৃন্দাবতী নামে ছন্তি যেউঁ নারীমণি। তাহাকু পচার সে যে কহিব বখাণি ॥
আন্ত মুখে আন্ত কথা নুহই শোভন। পুণ এ কথা অটই অতীব গোপন ॥'

কৃষ্ণের দুই রানী তখন বৃন্দার কাছে গেলেন। তাঁদের কথা শুনে বৃন্দা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললেন, 'তিনি কৃষ্ণদেহের সার, জগতের জ্যোতি, সে গূঢ় কথা কি করে বলব, রাধা নাম উচ্চারণ করলেই কৃষ্ণ এখানে চলে আসবেন। সে গূঢ়কথা শুনতে চাও তো যোগমায়ী সুভদ্রাকে ডাক; তিনি দুয়ার আগলাবেন, কৃষ্ণ বলরামকে

ভিতরে ঢুকতে দেবেন না। সেইমত করা হল। বৃন্দা রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। রোহিণী মহাভাবময় কৃষ্ণের মহিমা ব্যাখ্যান করলেন।—

এমন্ত শ্রীকৃষ্ণ যহুঁ অন্তর হোইলে। দুই রাণী যাই বৃন্দা পাশরে মিলিলে॥
করযোড়ি বোইলে যে আপন্ন ভাবরে। আন্তর সন্দেহমান ফেড়িবু হৃদরে॥
কেবা অটে রাধা সে বা কে দেশ কুমারী। কেমন্ত গুণ তাহার নেলা নাথে কিণি॥
সর্বদা ত রাধাভাবে শ্রীহরি ব্যাকুল। তাহাংকর পরিচয় নেইণ সম্ভাল॥
এমন্তে বৃন্দা সে সখীরে শুণিলে। নয়নরু লোতক যে বসি গড়াইলে॥
বোইলে আচ্ছা কথাকু বলাইল মতি। যাহা কৃষ্ণ দেহ সার জগতর জ্যোতি॥
যাহা অতি গূঢ় কথা কেমন্তে কহিবি। কৃষ্ণংকর মনকু ত উচাট করিবি॥
রাধানাম যহিঁ তহিঁ উচ্চারণ হোই। কৃষ্ণ নিশ্চে প্রবেশিবে আসি শীঘ্র তহিঁ॥
কেমন্তে কহিঁবি মুহিঁ তাহাকুহি তেবে। দ্বারকা ঈশ্বর আসি এথি প্রবেশিবে॥
এ গূঢ় বচন যেবে শুণিবাকু বর। যোগমায়ী সুভদ্রাংকু ডকাঅ সত্বর॥
যোগমায়া সুভদ্রা যে দ্বার আগোলিবে। কৃষ্ণরাম মানংকু যে ভিতরে ন দেবে॥
মায়া একা মায়াধর বোধিবাকু ক্ষম। তেবে রাধা কৃষ্ণ কথা কহিবাকু ক্ষম॥
সেহিমতি সকল যে কলে মহারাণী। রাধা তত্ত্ব কহিলে বৃন্দা যে বখাণী॥
সুভদ্রা প্রতিহারিণী প্রায়েক বসিলে। সকলে সে গূঢ়তত্ত্ব মানংকু শুণিলে॥
রোহিণী কহিলে রাধা তত্ত্বমান গুণি। ভাব ভাবময় কৃষ্ণ মহিমা বখাণি॥

এখানেই 'মহাভাব প্রকাশ'-এর খণ্ডিত পুঁথির সমাপ্তি।

॥ মাধব রথ : চৈতন্যবিলাস ॥

'চৈতন্যবিলাস' প্রণেতা মাধবকেও কহ্নাই খুণ্টিআর মত শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। 'চৈতন্য বিলাস' পুঁথি সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আমি পুরীর মার্কণ্ডেশ্বর সাহীর অধিবাসী দুর্গাচরণ জগদ্দেব রায়ের গৃহে উড়িয়া ভাষায় লিখিত মাধবের চৈতন্য বিলাসের একখানি পুঁথি পাই। ইঁহারা রাধাকান্ত মঠের শিষ্য। দুর্গাবাবুর মাতা ঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতা নামে একজন বৈষ্ণবীর নিকট দীক্ষা লন এবং এই গ্রন্থ পান। শ্রীমতী মাতার অপর শিষ্যা রাধা মাতার নিকট 'চৈতন্য বিলাসের' একখানি প্রাচীন পুঁথি ছিল দেখিয়াছিলাম। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় "উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পুঁথি" নামক প্রবন্ধে এই গ্রন্থের পরিচয় দিই। সম্প্রতি 'প্রাচী অনুসন্ধান সমিতি' হইতে প্রকাশ করিবার জন্য আমার সংগৃহীত পুঁথিখানি রায় সাহেব অধ্যাপক আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয় কটকে লইয়া গিয়াছেন।" (চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ২৭৪)

'ওড়িআ সাহিত্যর মধ্যপর্ব" (১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ) গ্রন্থে শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তি লিখেছেন—'এহি কাব্যগ্রন্থটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য…মুঁ এ গ্রন্থটি পাঠ করিবার সুযোগ

পাই নাহিঁ"। শ্রীমহান্তি 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বনে লিখেছেন—'শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক উৎকলীয় শুদ্ধা ভক্তিবাদী বৈষ্ণব কাব্য ও গ্রন্থাবলীর একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থ বর্ণিত বিষয়বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্য, শ্রীচৈতন্যের নিকট শুনে উৎকল ভাষা বা ওড়িআ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হল বলে জানানো হয়। কহ্নাই খুণ্টিআর 'মহাভাব প্রকাশে' এ কথা আছে। মাধব পট্টনায়ক 'চৈতন্য বিলাস' গ্রন্থের শেষে লিখেছেন—

"যেতে চরিত গৌরর ব্রহ্মা শিবে অগোচর
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাংক ভাষারু মুহিঁ উৎকল ভাষারে যহিঁ
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।
সাধুজনে ন ঘেন দোষ
কহই মাধব তুম্ভ পাদরে আশ।"—দশম ছান্দ

এরপর শ্রীমহান্তি লিখেছেন, "ড. বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন এখানে উল্লেখিত 'ঠাকুর' শব্দে মাধবের গুরু গদাধর পণ্ডিতই উদ্দিষ্ট। গুরুকে 'ঠাকুর' বলে অভিহিত করা অবশ্য বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য সম্মত। অপর পক্ষে মাধব স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের কাছেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব শুনে থাকতে পারেন।"

[ওড়িআ সাহিত্যর মধ্যপর্ব, ৩য় সং, পরিশিষ্ট ১]

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"চৈতন্য বিলাসের গ্রন্থকারের নাম মাধব। তিনি নিজের কোন পরিচয় দেন নাই। তবে তাঁহার গুরু যে গদাধর সে কথা বলিয়াছেন; যথা—

'সে হি শ্রীচৈতন্যকথা কিছিহি বর্ণিবি।
এহি মনকু মোহর সুফল করিবি যে॥
বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
সে পাদ কমলে চিত্ত রহু মাধবর॥ প্রথম ছান্দ, ৪৬-৪৮

তিনখানি বৈষ্ণব-বন্দনাতেই (দেবকী নন্দন, দ্বিতীয় বৃন্দাবন দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর লেখা) মাধব পট্টনায়ক নামে একজন ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ নামের একজন ভক্ত শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ও ভক্তদলের মধ্যে কোন কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।…মাধবের গুরু গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী হইতে পারেন, কেননা গ্রন্থশেষে মাধব বলিতেছেন যে, তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই উড়িয়া ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া বলিতেছেন; যথা—

…তাহাংক ভাষারু মুহি উৎকল ভাষারে যঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস॥…

মাধবের ঠাকুর নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন; তাহা না হইলে ভাষান্তরিত করার কথা

উঠে না। গদাধর পণ্ডিত গোঁসাইয়ের নিকট যদি মাধব কোন কথা শুনিয়া তাহার অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা খুবই প্রামাণিক হয়।

কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশের অর্থ এরূপও হইতে পারে যে লোচনদাস ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মাধব উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে 'চৈতন্য বিলাসের' দশটি ছান্দের মধ্যে প্রথম ও শেষ ছান্দ ব্যতীত অপর আটটি ছান্দের সহিত লোচনের চৈতন্য মঙ্গলের—মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপে কেশব ভারতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহ হইতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রা পর্যন্ত—বর্ণনার ভাব ও ভাষার সহিত মাধবের চৈতন্য বিলাসের অনেক মিল আছে।" [চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ২৭৪-৫]

আবার বিপরীত প্রকার অনুমানও তিনি করেছেন যে, "লোচনদাস মাধবের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্য মঙ্গলের শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন…" (চৈ. চ. উ. পৃ. ২৮৩)। এ অনুমান অগ্রাহ্য করে প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"তাঁর 'চৈতন্য মঙ্গলের' আগে লেখা সংস্কৃত ও বাঙলা পুঁথিগুলির উপর নির্ভর না করে লোচনদাস কেন মাধব দাসের ওড়িয়া পুঁথি অবলম্বন করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। লোচনদাস বারম্বার মুরারিগুপ্তের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি চৈতন্য মঙ্গলে কোথাও মাধবদাসের নাম করেন নি।"

[শ্রীচৈতন্যাষ্টক, পৃ. ৫৪]

ড. বিমানবিহারী মজুমদার অবশ্য লিখেছিলেন—'ইহা অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে দৃঢ়তর প্রমাণ আবশ্যক।' [চৈ. চ. উ., পৃ. ২৮৪]

মাধব ও লোচন কে কার অনুবাদক, এ বিষয়ে আমরা একটি তথ্যের উল্লেখ করব। মাধবের চৈতন্য বিলাসের দুটি তালপত্র পুঁথি বর্তমানে ভুবনেশ্বরে State Museum ভবনের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীনীলমণি মিশ্র তাঁর *A Descriptive Catalogue of Oriya Manuscripts* গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে এই পুঁথি দুটির পরিচয় দিয়েছেন। O.L/616 (C) সংখ্যক পুঁথিটি গঞ্জাম জেলার ধারাকোটে পাওয়া গেছে। পত্রসংখ্যা ৩৩, দু'পিঠে দুই থেকে চার পংক্তি করে লেখা। লিপিকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দী। পুঁথির দশা খুব ভালো নয়। O.L/945 (A) সংখ্যক পুঁথিটি পাওয়া গেছে পুরী জেলার আলাসানা থেকে। লিপিকারের নাম কৃত্তিবাস। পত্রসংখ্যা ২৭, দুপিঠে চার থেকে পাঁচ পংক্তি করে লেখা। অন্যান্য বিবরণ পূর্ববৎ।

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, O.L/616 (C) সংখ্যক পুঁথিতে গ্রন্থের শেষে কবি লিখেছেন—

"যেতে চরিত গউর শিব আদি অগোচর
ঠাকুর লোচন এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষারে মুহিঁ ভক্ত উৎসলরে সেহি
কহিলি প্রভুর সন্ন্যাসর বিলাস।"

এই পাঠান্তর প্রামাণিক হলে মাধব লোচনের অনুবর্তী। ড. বিমানবিহারী দৃষ্ট পুথিতে আছে 'তাহাঙ্ক ভাষারু', এই পুথিতে আছে 'তাহাঙ্ক ভাষারে'। প্রথম পাঠের অর্থ 'তাঁর ভাষা থেকে', দ্বিতীয় পাঠের অর্থ 'তাঁর ভাষাতে'। অর্থাৎ প্রথম পাঠের অর্থ 'তাঁর ভাষা থেকে অনুবাদ করলাম', কিন্তু দ্বিতীয় পাঠের অর্থ 'তাঁর ভাষায় (তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করে) বললাম প্রভুর সন্ন্যাসলীলা'। যাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকার্য, লোচনের চৈতন্য মঙ্গলই মাধবের গ্রন্থের আদর্শ।

মাধবের পদবী কি ছিল? ড. বিমানবিহারী মজুমদার তিনখানি বৈষ্ণব বন্দনায় 'মাধব পট্টনায়ক' নামটি পেয়েছেন। তাঁর অনুমান চৈতন্য বিলাসের গ্রন্থকার মাধব পট্টনায়ক। কিন্তু O.L/616 (C) সংখ্যক পুথিতে কবি নিজের পদবী লিখেছেন 'রথ'।

'কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার কল
সাধুঙ্কু তারিবা পাইঁ য়ে রূপ ধইল যে।
তুম্ভার চরিত কিছি বর্ণিবি মু গীতে
প্রসন্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিত্তে যে।
... ...
কহই মাধব রথ করিঞা রোদন
সন্তত ঈশ্বর সে শচীর নন্দন।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভুবনেশ্বরে State Museum ভবনে পণ্ডিত নীলমণি মিশ্রের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তখন এ প্রসঙ্গে মিশ্র মহাশয় জানান, 'ড. বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্য বিলাসের গ্রন্থকারের 'পট্টনায়ক' পদবী কোথায় পেলেন বোঝা যাচ্ছে না, গ্রন্থ মধ্যে সর্বত্র পদবী বর্জিত উল্লেখ এবং একটি স্থলে 'রথ' পদবীর উল্লেখ আছে।' State Museum-এর পুথিশালার Catalogue অনুসারে আমরা কবির 'রথ' পদবীটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

মাধব রথ তাঁর গ্রন্থরচনায় লোচন দাস ঠাকুরের অনুবর্তী হলে 'চৈতন্য বিলাস' লোচনের 'চৈতন্য মঙ্গলে'র পরবর্তী অর্থাৎ ১৫৬৬ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী রচনা (চৈ. চ. উ., পৃ. ২৫২)। মাধবের গুরু গদাধর; লোচনের গুরু নরহরি সরকার ঠাকুর, কিন্তু লোচন নরহরি গদাধর উভয়েরই বিশেষ অনুগত—"জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥" (চৈতন্য মঙ্গল, সূত্রখণ্ড)। সুতরাং মাধব ও লোচনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও ভাববিনিময় খুবই সম্ভব। মাধবের গ্রন্থে লোচনের অনুবর্তিতাও সম্ভব।

কিন্তু ড. বিমানবিহারী মজুমদার পুরী মার্কণ্ডেশ্বর সাহীর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ জগদ্দেব রায়ের বাড়ীতে চৈতন্য বিলাসের যে পুথিটি দেখেছিলেন, সেই পুথির 'ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ'—পাঠটি যদি প্রামাণিক হয়, তা হলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তগুলি সব পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে ড. বিমানবিহারী মজুমদার বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এটি ১৩৩০ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় (পৃ. ১২৭-১৪২) প্রকাশিত হয়। এই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

"ঐ ঠাকুর শব্দের অর্থ যদি গুরু ধরা যায় এবং উদ্ধৃত পদের অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, গদাধর বঙ্গভাষায় যে সকল কথা মাধবকে বলিয়াছিলেন, মাধব তাহাই কাব্যাকারে উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান হয়।

এরূপ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিতেছি :—

১. শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া যে দ্বাদশ বৎসর কাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা করিতে পারেন।[১] যেহেতু—(ক) মাধব, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন,—ইহা বলিয়াই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন,—

ভকতংকু ঘেনি সঙ্গে বঞ্চান্তি ভাবতরঙ্গে
তহুঁ নেউটি আইলে শ্রীনীলাচলে।
কৃষ্ণসুখে বঞ্চান্তি দিন পরম হরষ ভক্ত জনছি মন ॥

(খ) নীলাচলে অবস্থানকারী শ্রীচৈতন্যকে আহ্বান করিলেই ভূমিকায় লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গতি হয় ;—

পতিত পাবন তুম্ভে গৌর অবতার।
যুগে যুগে এহিরূপে জনংকু নিস্তার যে ॥

(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্তমান কাল উল্লেখপূর্বক লেখা হইয়াছে—

বৃন্দাবনে করি বাস ছাড় কুবাসনা।
হরিনাম গাঈ হর ধন্য তো রসনা যে ॥
চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান্।
প্রকাশ করি অছান্তি কহি শাস্ত্র মান যে ॥

২. গ্রন্থখানি যদি শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে লেখা হইত, তবে কোন-না-কোন পরবর্তী মহাজনের বন্দনা থাকিত। কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া,

---

১ আসাম-পর্বে আমরা দেখেছি, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে অন্তত দুবার গিয়েছিলেন—একবার ১৫১৫-য়, আরেকবার ১৫২৭-এ ; ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ গিয়ে ১৫২৯-এ নীলাচলে ফিরে আসার পরও মাধবের গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

হরিদাস, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, কেশবভারতী—এই কয়টি নাম ব্যতীত আর কোন নামের উল্লেখ নাই। কবির গুরু যদি গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তিনি যদি কেবলমাত্র গদাধরের শাখাভুক্ত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কবি তাঁহার সাক্ষাৎগুরুর বন্দনা করিতেন।

৩. যাঁহাকে চোখের উপর সর্বদা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান বলিয়া অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক কার্যকে কৃষ্ণলীলার নিক্তিতে ওজন করিয়া কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মুরারি ও গোবিন্দ স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের কার্য কলাপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই বৃন্দাবনদাসের ন্যায় সর্বত্র কৃষ্ণলীলার উপমা টানেন নাই। কবি মাধব, ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, একথা বলিলেও গ্রন্থের মধ্যে সর্বত্রই শ্রীচৈতন্যকে মানুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা কৃষ্ণলীলাব সহিত তাঁহার কার্যের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। চোখের উপর শ্রীচৈতন্যকে না দেখিলে, শুধু তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহাকে সাধাবণ মানুষরূপে বর্ণনা করা কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়। শ্রী বৃন্দাবন দাস, শ্রী লোচন দাস, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার জীবনী আলোচনায় যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবর্তী লেখকের নিস্তার পাওয়া কিছু কঠিন বলিয়াই মনে হয়।

'তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল ভাষারে তঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।'

এই পদের অর্থ যদি অন্য কোন গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিতেছেন, ইহা হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। 'ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ'—এই পদের 'ঠাকুর শ্রীমুখ' শব্দ দ্বারা যথার্থ মুখের বাক্যকে না বুঝাইয়া যদি গ্রন্থই বুঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে?

বৈষ্ণব সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে 'ঠাকুর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে —বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচন দাস ঠাকুর। বৃন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বর্ণিত সন্ন্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লোচন দাস ঠাকুরের সহিত মাধবের গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের মিল আছে। সুতরাং ঐ 'ঠাকুর' শব্দ দ্বারা লোচনদাস উপলক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

১. লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা অতি সাধারণ ধরণের, তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, হরগৌরী প্রভৃতির ও নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে। মাধবের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে একই বলিয়া বন্দনা আছে; আর কাহারও নামোল্লেখ তাহাতে নাই। মাধবের বন্দনাই বৈষ্ণবোচিত। তদ্ব্যতীত মাধবের ভূমিকা, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও বৈষ্ণব দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া অতি প্রসন্ন গম্ভীর হইয়াছে।

২. লোচন দাস মুরারির 'চৈতন্যচরিত' অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা ভূমিকায় বলিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

মাধবের গ্রন্থ যদি অনুবাদ হইত, তাহা হইলে ঐ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ থাকিত। মাধব মূর্খ নহেন—তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব ও ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা থাকিলে, তাহা তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। একমাত্র লোচনের নাম করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ কখনও পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, লোচনের গ্রন্থে যেরূপ সাম্প্রদায়িক আভাস আছে, মাধবের মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না। লোচন গ্রন্থ আরম্ভই করিয়াছেন গোলোক, রুক্মিণী ও ভগবানের কথাবার্তা লইয়া ও যেখানেই পারিয়াছেন —হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, রামলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার মিল করিয়াছেন। লোচনের চৈতন্য বেশ জানেন যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর যুবক। অথচ মাধব শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

৩ লোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হইলেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে।—

তুম্ভর চরিত মোনু করিবি বর্ণন।
তেনু সুখ পাইবে এথিবে সাধুজন হে॥

এরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বলিবে যে, কবি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন?

৪. লোচন শ্রীচৈতন্যের ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি পরিণত বয়স্ক হইয়া গ্রন্থ লিখিবেন; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে আসিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষ্য তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

৫. মাধবের প্রথম পাঁচ সর্গে ও শেষ দশম ছন্দে লোচনের সর্বাপেক্ষা সুন্দর কবিত্বময় পদগুলি নাই; প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে লোচনের সে পদগুলি উদ্ধার করিলাম না।

৬. অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সহিত মাধবের বৈষম্য দেখা যায়,—

(ক) কেশবভারতী নবদ্বীপে একবার আসিয়াছিলেন, এ কথা মুরারি, লোচন ও মাধব—তিনজনেই বলিয়াছেন, কিন্তু লোচন একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে একরাত্রি কেশব ভারতীকে স্বগৃহে রাখিতে বলিলেন এবং পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে না দেখিয়া সন্ন্যাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতী যখন চৈতন্যকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, প্রহ্লাদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে,—

'তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়। সে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥'

মাধবের চৈতন্যকে ভারতী—

'কহে অংশ স্বয়ং তুম্ভে জগতেশ্বর। এ বাণী শুনিন প্রভু হৃদকাতর॥'

শ্রীচৈতন্যকে যখনই কেহ ভগবান বলিতেন, তখনই তিনি অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। এ স্থলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) লোচনের গ্রন্থে নিমাই সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন,—

'তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এড়িয়া। খাইব সংসার ব্যাঘ্রে সভারে ধরিয়া ॥'

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

'আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেও দুখ। কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক ॥'

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐহিক বা পারত্রিক কোন স্বার্থের জন্য নহে। লোচন এ স্থলে স্বার্থের অবতারণা করিয়া কিছু রসভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মুরারি নিজে তাঁহার গ্রন্থে এরূপ কথাবার্তা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

মাধবের চৈতন্য ভক্তগণের নিকট প্রেম ও নম্রতার সহিত বিদায় চাহিতেছেন—সে বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হুইয়া বলিতেছেন,—

"শুন সর্বজনে মোরে আশীষ কর। কৃষ্ণভক্তি হোই, দুঃখ পলাই দূর ॥"

(গ) লোচন বলিয়াছেন যে, শচীদেবী, নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা লোকমুখে শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সন্ন্যাসের কথা অন্তরঙ্গ কয়েকটি ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই নিমাই মায়ের নিকটে আসিতেছিলেন, ইহার মধ্যে শচীদেবীর অন্যলোকের নিকট সন্ন্যাস সংকল্প শুনিবার অবসর কোথায়?

মাধব বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের নিকট স্বসংকল্প প্রকাশ করিয়া মাঁয়ের নিকট নিজেই সন্ন্যাসের কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেন। মাতা এ কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই চিত্র কেমন স্বাভাবিক। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয়।

লোচনের নিমাই শচীর ক্রন্দন দেখিয়া বলিতেছেন,—

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন। মিছা কাজে দুখ চিত্তে কর কি কারণ ॥
বারে বারে কহি তারে নাহি অবধান। মিছা কর লোহমোহ ক্রোধ অভিমান ॥

আসন্ন পুত্র-বিরহ কাতরা জননীর প্রতি এরূপ বাণী একটু রূঢ় শুনায় না কি?
শচীর ক্রন্দন শুনিয়া মাধবের চৈতন্যের উক্তি অন্যরূপ,—

'বেলুং বেলুং সুত বদন নিরেখি, জননী করন্তি রোদন।
কাতর হোইণ গৌরাঙ্গ মাতাঙ্কু কহি ন পারন্তি বচন ॥
(মাতাঙ্কু) চাঁহিণ স্থকিতে রহিলে
কিছু বেল অন্তে প্রবোধবচন কহিবাকু সে আরম্ভিলে ॥
মিথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জীবন নরহিন যাই সত্বরে।

যাকু বোলু সুত বন্ধু ইষ্ট ভ্রাত, কেহু যিব তোর সঙ্গরে
(ভো মাত) ন লভু বিঅর্থ কথারে, মো ঠারে মমতা কলা প্রায়
করি মমতা কর কৃষ্ণ ঠারে ॥

কেতে জন্মে মুহি তোহব জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভগিণী।
কেতে জন্ম পশু মনুষ্য হেলু নি এথক, চিতে শোক ভেলি
(ভো মাত) ॥

এইরূপ স্থূল বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই শ্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের মাতাই শচীদেবী ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার, ইহা বলিয়াছেন।

মাধবের বর্ণিত শচীর বিলাপ অতি সুন্দর, অতি মর্মস্পর্শী। শচী বলিতেছেন,—

গৌবদেহকু কোলরে বসাঈ মুখবে দিঅন্তি চুম্বন।
মাথারে কুলিশ পকাঈ জীবন ছাড়ি যিবু তুহি নন্দন ॥ (ভো সুত)

কে তোতে এহু শিক্ষা দেলা।
কহুঁ কহুঁ তোর কঠিন শরীর ফাটি যাঈত রহিলা ॥
তু মোর অন্ধর লউড়ি, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জীব ॥
তোতে ন দেখি মু জীবন রাখিবি এহা মোর দেহ সহিব ॥ (ভো সুত)

—শচী মা গৌরাঙ্গকে কোলে বসিয়ে মুখ চুম্বন করে বললেন, 'ওরে বাছা, আমার মাথায় বজ্রাঘাত করে আমাকে মেরে যাবি তুই? কে তোকে এ শিক্ষা দিল? তোর এ কথা বলতে বাঁধল না? তুই যে আমার অন্ধের যষ্টি, গলার হার, চোখের মণি, প্রাণের প্রাণ। তোকে না দেখে আমি বেঁচে থাকব কি করে—প্রাণহীন দেহ কি বেঁচে থাকতে পারে?'

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলিয়া যাঁহাদেব নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও এক উপেক্ষিতা রমণী আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্য হানির ভয়েই হউক, আর শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান নাই বলিয়াই হউক, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস করিয়া যাইবার পূর্বে বা পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্তও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই।

কবি লোচন দাস, বাসু ঘোষ ও জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। সন্ন্যাসের পূর্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বা কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি :—

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক কথা বলিয়া, বলিতেছেন,—

শুন শুনে প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ বাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি ॥
বড় প্রীতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিব
এ নবযৌবনে দিবে হাত ।

ইহার পর বলিতেছেন যে, তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন, নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিয়া কাজ নাই ।

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই কোন রূপে সান্ত্বনা দিয়া বিলাসাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। পরে শেষ রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাস বিষয়ে কাতরে জিজ্ঞাস করায়, নিমাই তাঁহাকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখাইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন। আর মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা শুনুন—একটু বড় হইলেও, ইহা কাব্যামোদীদের প্রীতি উৎপাদন করিবে জানিয়া উদ্ধার করিতেছি,—

'গদগদ হোঈ রামাবর । কহি ন পারে কিছি উত্তর ।
পুন পুন গাঢ়ে রোদন করন্তি । কান্ত পাদ নিবেশিণ শির হে ॥ (সুন্দরী)
বসাঈলে কান্ত কোলে আনি ! দুতে আলিঙ্গন কলে পুনি ।
বধূলি অধরে চুম্বন দেঈণ । স্নেহে করন্তি মধুর বাণী যে ॥ (গৌরাঙ্গ)
আগো ন মুণ্ডু নয়ন আপ । মনু ছাড় কঠোর সন্তাপ ।
দয়ানিধি তোর এসন দেখিণ । শর সন্ধুছি কুসুমচাপরে ॥ (সুন্দরী)
নানা মতরে উচাট কলে । গাঢ় রতিরে মন তোষিলে ।
তনু ঘর্মবিন্দু সুখাঈ বহন । মনিভূষণ মান খণ্ডিলে সে ॥ (নাগর)
যেঁউ অঙ্গ অত্যন্ত রুচির । তঁহি লাগি সার্থ অলঙ্কার ।
কি শোভা দিশিলা উপমা দেবাকু নাহি । নব পঞ্চ ভুবনর রস ॥ (শ্রীঅঙ্গ)
কান্ত কোমল চরণ ধরি । কহে বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারী ।
এহি কমল চরণে যাউথিব । খরা বরষারে দণ্ড ধরি হে ॥ (জীবন)
দীর্ঘ নীল কুঞ্চিত কুন্তল । কিছি ন থিব শির কমল ॥
এমন্ত শোভাকু ধরিথিব তুম্ভে । এহা দেখিব নেত্রযুগল হে ॥ (সুন্দর)
দিব্য কুন্তল ন থিব কর্ণ । তৈল বিনু শরীর বিবর্ণ ।
ঘর তেজি যাঈ সন্ন্যাস মাত্র । কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে ॥ (জীবন)
তেজি দিব্য সুক্ষীহ্ন বসন । ডোর কৌপীন পিন্ধিব ধন ।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ ন থাউ দণ্ডে হে । ফাটি যাউ শরীর বহন হে ॥ (জীবন)
যেবে মুই যোগাইলি নাহি । দিব্য কন্যা ত আছন্তি মহী ।
যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হুঅ তুম্ভে । প্রাণনাথ ! গৃহ ছাড় নাহি হে ॥ (সুন্দর)
সাত গর্ভ যাঈছি মাতার । প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিধুর ।
তাঙ্ক ঠারে দয়া নোহিলা হৃদরে । এবে কঠোর হেলে সুন্দর হে ॥ (জীবন)
ধর্ম ন সাধি গৃহরে যাঈ । ঈহা কেঁউ পুরাণে পঢ়ঈ ।
অণ অপরাধী রমণী তেজিলে । জানি অছ ধরস হৈ হে ॥
শচী হৃদয় লোহে পাষাণ । প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিহীন ॥

বৃদ্ধ মাতা ভজিথিবা কান্ত তেজি। পুণ্য মাণ লভিব সুজান হে ॥ (জীবন)
শিশুকাল যাহাংকর তুলে খেলু অছ নানা কুতুহলে
সে সখামানঙ্কু দয়া ন বসিলা এহু কোমল হৃদ কমল হে ॥ (সুন্দর)
নদীয়ার নরনারী শিরে। বজ্র পকাঈ থিব হেলারে।
কেতে পৌরুষ লভিব জগতে এহু শিক্ষা দেলা কে তুম্ভরে হে ॥
পুনঃ পুনঃ করন্তি রোদন। কান্ত পদে ধরি আলিঙ্গন।
যেবে যিব থিব মোতে সঙ্গে ঘেনি যাঅ। ঘাটথিবি জানি তুম্ভ মন হে ॥ (জীবন)

মাধবের দশম সর্গে বর্ণিত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুরই সহিত লোচনের কোন রূপে মিল নাই। লোচনের মুদ্রিত গ্রন্থ বোধহয় অসম্পূর্ণ—তাহাতে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করার পর, বিভীষণের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, মাধবের গ্রন্থে ঐরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা নাই। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন এমং তথা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।”

মাধব লোচন কে কার অনুবাদক—এ বিষয়ে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন —“খুঁটীনাটীতে পার্থক্য থাকিলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু মাধবের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সহিত মিলিয়া যায়। কেবল ভাষা ও অক্ষরে মাত্র ভেদ—নহিলে ভাব ও ঘটনা অবিকল একরূপ। প্রথম পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পড়িয়া দুইজন যে পৃথক কবি, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু মধ্যের এই চারি সর্গ পড়িয়া এককে অপরের অনুবাদক বলিয়া মনে হয়। লোচন মুরারির নিকট হইতে লইয়া লিখিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যে কয়েকটী অধ্যায়ে মাধবের সহিত তাঁহার লেখার মিল দেখা যাইতেছে, সে কয়টী অধ্যায়ের বিষয় মুরারির গ্রন্থে কিছুই নাই। এ বিষয়ে তিনি মাধবের নিকট ঋণী হইলেও হইতে পারেন। আবার মাধব, আমার ওকালতী সত্ত্বেও, সত্যসত্যই লোচনের গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন। অথবা উভয়েই কতকগুলি প্রচলিত গীতি হইতে স্ব স্ব কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাও হইতে পারে।” (তদেব)

‘চৈতন্য চরিতের উপাদান’ গ্রন্থে ড বিমানবিহারী মজুমদার লোচনকেই মাধবের অনুবাদক বলে মনে করেছেন।—“এইরূপ সন্দেহ কি কারণে উঠে তাহা বুঝাইবার জন্য লোচন, মাধব ও মুরারি গুপ্তের কড়চার কিছু তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছি।

লোচন লিখিয়াছেন—

‘শুন শুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস। এক কথা কহি যদি না পাও তরাস ॥
প্রেম উপার্জনে আমি যাব দেশান্তর। তো সভারে আনি দিব শুন দ্বিজবর ॥
সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ। ধন উপার্জন লাগি করে নানা ক্লেশ ॥
আনিঞা বান্ধবজনে করয়ে পোষণ। আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন ॥
এবোধে শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত। তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত ॥

জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ। দেহান্তরে করে তার শ্রদ্ধা তর্পণ ॥
যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন। তোমা না দেখিলে হৈবে সভার মরণ ॥
[মধ্য খণ্ড, পৃ. ৪৮]

মাধব লিখিয়াছেন—

'শুন শুন দ্বিজপ্রিয় হে শ্রীনিবাস। কহিবা কথাএ মনে ন পাও ত্রাস ॥
প্রেমধন অর্জনকু যিবি বিদেশ। আনিন তুম্ভকু দেবি এহি মানস ॥
কহে শ্রীনিবাস যার থিব জীবন। তাঙ্কু তুম্ভে দেব আনি সে প্রেমধন ॥
ক্ষণে তুম্ভকু ন দেখি জীব ন থিব। আম্ভমানঙ্কু মারি সন্ন্যাস করিব' ॥
দ্বিতীয় ছান্দ, ১৭-২০

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'ততঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্ছ্রীবাসদ্বিজ পুঙ্গবম্।
ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্ ॥
সাধুভির্নাবমারুহ্য যথা গত্বা দিগন্তরম্।
অর্থমানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ ॥
দিগন্তরাৎ সমানীয় দাস্যামি প্রেম সন্ততিম্।
যয়া সর্বসুরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং পরিপশ্যসি ॥
পুনঃ প্রোবাচ তচ্ছ্রুত্বা শ্রীবাসঃ শ্রীহরিং প্রভুম্।
ত্বয়া বিরহিতো নাথ কথং স্থাস্যামি জীবিতঃ ॥

লোচন নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি মুরারি গুপ্তের বইকে উপজীব্য করিয়া চৈতন্য মঙ্গল লিখিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থে লোচন কর্তৃক কথিত "জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ" প্রভৃতি চারি চরণের কোন ইঙ্গিত নাই। মাধবের গ্রন্থে ১৯ সংখ্যক পয়ার ঐ ভাবের। মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি মুরারি ও লোচনের "সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশে" ও "জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ" এই দুইটি উপমা বাদ দিতেন ?···

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে প্রভু রাঢ় দেশে যাইতেছেন, তাহার বর্ণনা করিয়া মুরারি লিখিয়াছেন—

মত্ত কবীন্দ্রবৎ কাপি তেজসা ববৃধে কচিৎ।
কচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ॥
তত্র দেশে হরের্নাম শ্রুত্বা চাতীব বিহ্বলঃ।
প্রবিশ্যাহং জলে ক্ষিপ্রং ত্যজামি দেহমাত্মনঃ ॥
ন শৃণোমি হরের্নাম কথং ব্রাহ্মণ সংস্থিতিঃ।
ইতি নিশ্চিত্য তোয়স্য সমীপং স ব্রজন্ প্রভুঃ ॥
দদর্শ বালকাংস্তত্র গবাং সঙ্ঘ-বিহারিণঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন শিক্ষিতান্ হরিকীর্ত্তনম্ ॥

তত্রৈকো বালকোঽত্যুচ্চৈর্হরিং বদ হরিং বদ।
ইতি প্রোবাচ হর্ষেণ পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতো দেবঃ সংরক্ষন্ দেহমাত্মনঃ।
তত্রৈব প্ররুরোদার্ত্তো বিহ্বলশ্চাপতদ্ভুবি ॥—৩/৩/৫'১০

লোচন লিখিয়াছেন—

কদম্ব কেশর জিনি একটী পুলক। কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥
মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায়। নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণগুণ গায় ॥
ক্ষণেকে পড়য়ে ভূমি রহে স্তব্ধ হঞা। ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া ॥
ক্ষণে গোপিকার ভাব ক্ষণে দাস্য ভাব। ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র ধায় ॥
এই মনে দিবারাত্র না জানে আনন্দে। রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম-গন্ধে ॥
কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে। নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে ॥
দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ। গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবেরে বাপ ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে। রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥
সেইখানে শিশুগণ গোধন চরায়। নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায় ॥
যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে। হরি বলি ডাকে সব শিশু আচম্বিতে ॥
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি। বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি ॥
তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্। কৃতার্থ করিলি রে শুনাইয়া হরিনাম ॥ মধ্যখণ্ড

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মুরারির বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে (১) শ্রীচৈতন্যের দেহ কদম্ব কেশরের ন্যায় দেখাইতেছিল; মাধবে ঐ উপমা আছে। (২) নিত্যানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি আপন প্রতাপে শ্রীচৈতন্যের জীবন রক্ষা করিবেন;…

মাধব ঐ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

কদম্বকেশর প্রায় পুলক। রোমাঞ্চ অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥
মত্ত করিবর প্রায় চলই। আনন্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গাই ॥
পড়ই ভূমিরে।
রহই ক্ষণ স্থকিত শরীরে ॥
ক্ষণে আস্বাদই গোপী ভাবরে। ক্ষণে আস্বাদই দাস ভাবরে ॥
কেতে বেলে ধীরে ধীরে গমই। কেতে বেলরে ত্বরিতে ধামই ॥
রজনী দিবস।
ন জানই প্রভু হোই হরস ॥
প্রবেশ হেলে গৌড় দেশরে। কৃষ্ণনাম না শুনিলে কর্ণরে ॥
বহুত চিন্তা লভিলে মনর। কেমন্তে এ জনে হেবে নিস্তার ॥
আচম্বিতে কৃষ্ণ।

কোহিন বোলন্ত হোইলে তৃষ্ণ ॥ অষ্টম ছান্দ, ১৬-১৮

হরিনাম না শুনিতে পাইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন-ত্যাগের সংকল্প একটি অতি সুন্দর ও প্রেমোদ্দীপক বর্ণনা। মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিবেন তবে তিনি কদম্ব কেশরের উপমাটি গ্রহণ করিয়া এমন একটি ঘটনা বর্জন করিবেন কেন? যদি লোচন হইতে মাধব অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে রাঢ়দেশকে গৌড়দেশ বলিতেন না। গদাধরের মুখে শুনিয়া মাধব গৌড় ও রাঢ়ের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ঐরূপ করিয়াছেন মনে হয়।" (চৈ. চ. উ. ২৭৭-৮১ পৃ.)

গ্রন্থের সূচনায় তিনটি শ্লোকে মাধব শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করেছেন যাতে তাঁর ভক্তি ও বৈষ্ণবীয় রসদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম শ্লোকটি[১]—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

অর্থাৎ 'সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (অনুবাদঃ চৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় মঠ সং) দ্বিতীয় শ্লোকটি—

'অবিরত কৃত রাধা ধ্যান সংকল্প গৌরঃ ক্ষিতি পতি রমণীয়ং পূর্ণচন্দ্রাননশ্রীঃ।
পতিত গতি নিধার্য্যে ভূতলে খ্যাতকীর্তিঃ জয়তু জয়তু কৃষ্ণঃ পূর্ণচৈতন্যমূর্তি ঃ ॥

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "দ্বিতীয় শ্লোকটি সম্ভবতঃ কবির সকৃত; কারণ, এ পর্য্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে শ্লোকটি পাই নাই।·· একজন উৎকলবাসীর নিকট শ্রীচৈতন্যের যে ভাব সর্বপ্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে।"

['উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩০ সন]

তৃতীয় শ্লোকটি—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপিচ ॥ প্রভৃতি

অর্থাৎ—'যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরম পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্‌গত কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণি বিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমন মাত্রই নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতি-চিদানন্দময়, পরম

---

[১] এ শ্লোকটি রূপগোস্বামী রচিত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রথম অঙ্কে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক। চৈতন্যচরিতামৃতে [অন্ত্য ১/১৩২] আছে, রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধবের অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকটিও মহাপ্রভুকে পুরীতে পড়ে শোনাচ্ছেন। বিদগ্ধমাধবের রচনাকাল শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর [চৈ. চ. উ. পৃ. ৩৮৫] ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। চরিতামৃতের বিবরণ নিঃসন্দেহে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য নাটক রচনার অনেক আগে ইষ্ট বন্দনা-সূচক এ শ্লোকটি রূপ রচনা করে থাকতে পারেন। তা না হলে মাধবের 'চৈতন্যবিলাস' চৈতন্য তিরোভাবের পরবর্তী রচনা হয়ে পড়ে।

চিৎপদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, (সেই পরম পীঠকে আমি ভজন করি)'।

এটি ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ৫৬ সংখ্যক শ্লোক।

চৈতন্য বিলাসের প্রথম ছান্দে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও ভক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করে বলেছেন—

'চৈতন্যরূপেরে এহা কৃষ্ণ ভগবান। প্রকাশ করি অছান্তি কহি শাস্ত্রমান যে॥

গ্রন্থসূচনায় কবি বলেছেন—

'জয় গোকুলনন্দন ব্রজেন্দ্রনন্দন জয় জয় জয় বৃষভানুজানন্দন হে।
দশবিধ রূপ ধরি মহীভার হরে গোপীংক তোষিলে নিজ লীলা বিলাসরে হে।···
কলিযুগে পীতবর্ণ অবতার কল সাধুংকু তারিবা পাই' যে রূপ ধইল যে।

তুম্ভর চরিত কিছি বর্ণিরি মু গীতে
প্রসন্ন হোইবা মহাপ্রভু মোর চিত্তে যে। [O. L. 616 (c) পুথি]

এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যলীলার কিয়দংশ গীতে প্রকাশ করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। চৈতন্যবিলাসের আরেকটি পুথির সূচনা অংশ—

সঙ্গম তিআরি বাণীরে

জয়তু শচীকুমর দয়ার সাগর	প্রেমে বুড়াইল নবদ্বীপ নগর।
জয় নিত্যানন্দ জয় শ্রীগদাধর	জয় যেতে ভক্ত গউরাঙ্গ পয়র।
নবদ্বীপে বিহরই গউর কিশোর	নিগূঢ় প্রেম প্রকাশ হোইব ত তার।
মনে বিচারই কলিকাল যে ঘোর	পামর তারণে অবতার মোহর।
মোর মায়ারে জগত অটে মোহিত	দেশে দেশে ভ্রমি মু করিবি মুকত।
য়ে সময়ে পরবেশ সন্যাস বর	দেখি চরণ বন্দিলে গউর কিশোর।···

[O. L./954 (A) পুথি]

পদশীর্ষে 'সঙ্গম তিআর' কথাটি বোধহয় রাগ বা সুরের নির্দেশক।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করায় শ্রীনিবাস (শ্রীবাসপণ্ডিত) সকাতরে বললেন 'তোমাকে না দেখতে পেলে আমরা বাঁচব না, আমাদের মেরে তুমি সন্ন্যাস কর'। গৌরাঙ্গ মায়ের কাছে এলেন। মা কাঁদতে লাগলেন। গৌরাঙ্গ কাতর হয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরল না। কিছু সময় পরে ধীরে ধীরে মাকে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগলেন 'এ সংসার মিথ্যা, মুহূর্তের এই জীবন, এই আছে এই নেই। পুত্র মিত্র ইষ্ট ভ্রাতা কেউ সঙ্গে যাবে না। মাগো, আমার প্রতি তোমার যে মমতা, কৃষ্ণের প্রতি সেই মমতা কর। কত জন্ম আমি তোমার জনক হয়েছিলাম, কত জন্ম তুমি আমার ভগিনী হয়েছ, কত জন্ম পশু হয়ে, কত জন্ম মানুষ হয়ে কেটেছে, প্রতিবারই, মাগো, হৃদয়ে লেগেছে শোকের আঘাত।' শচীমা বিলাপ করতে লাগলেন, 'তু মোর অন্ধর লউড়ি, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জীব।'

মাধবের কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বিষাদ, সমগ্র চৈতন্য চরিতে তার তুলনা নেই।—

"নিরন্তরে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে বিষ্ণুপ্রিয়া বারংবার আকুল হয়ে কাঁদতে

কাঁদতে লাগলেন। কান্ত তাকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, বাঁধুলীর মত রক্তিম অধর চুম্বন করে সস্নেহে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'ওগো, চোখের জল ফেলো না, সন্তাপ ত্যাগ করো। দয়ানিধি তোমার এ অবস্থা দেখে বুঝি কুসুমধন্বাকে পাঠিয়েছেন, মদনদেব শর সন্ধান করছেন।' নানাভাবে রভসক্রীড়ায় নাগর গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুষ্ট করলেন।···কান্তের কোমল চরণ ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া বলতে লাগলেন—'ওগো আমার প্রাণ, খরায় বর্ষায় দণ্ডধারী হয়ে এই কমল চরণে হেঁটে যাবে। দীর্ঘ কুঞ্চিত এই কেশ কিছুই থাকবে না। তোমার সে রূপ চোখে দেখব কি করে? কানে থাকবে না কর্ণভূষা, তেল না দিয়ে শরীর হবে বিবর্ণ। ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ হবে? হে জীবনধন, এই দিব্যবসন ত্যাগ করে ডোর কৌপীন ধারণ করবে। ধিক্ আমার প্রাণ, এ দেহ এখনই নিপাত যাক। প্রাণনাথ! আমি ত তোমার উপযুক্ত হতে পারলাম না, পৃথিবীতে দিব্যকন্যার অভাব নেই। তোমার যত ইচ্ছা বিয়ে কর, তবু গৃহত্যাগী হয়ো না। মায়ের সাতগর্ভের সন্তান নষ্ট হয়েছে, সেই শোকের উপর তোমার বিচ্ছেদ আর সহ্য হবে না, মা প্রাণত্যাগ করবেন। তাঁর জন্যও তোমার হৃদয়ে দয়া হল না, এমন কঠোর হলে তুমি। ঘরে থেকে ধর্মসাধনা হয় না—এ কথা কোন্ পুরাণে পড়লে? নিরপরাধ রমণীকে ত্যাগ করলে কি ধর্ম হয়? শচী-হৃদয় লৌহ পাষাণের মত কঠিন হলেও তোমার বিহনে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করে কি পুণ্য লাভ করবে তুমি? শিশুকাল থেকে যাদের সঙ্গে কৌতুক ক্রীড়ায় কাটালে, সেই সখাদের জন্যও তোমার কোমল হৃদয়কমলে দয়ার উদ্রেক হল না! নদীয়ার নরনারীর মাথায় বজ্রাঘাত করে চলে যাবে তুমি—এতে জগতে তোমার পৌরুষের প্রশংসা হবে, এ শিক্ষা তোমায় কে দিল?'—এইভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পা জড়িয়ে ধরে বারংবার রোদন করতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'যদি যাবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল'॥"

শেষ পর্যন্ত শচী মা, বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনেই বিশ্বাস করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ নন্দনন্দন।—

'গৌরাঙ্গ-বাণী শুনিন জননী বর্দান্তি নোহ তু মনুষ্য।
জানিলি সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন তু এরূপে হউছ প্রকাশ॥'

এবং—'এতে কহিণ গৌরাঙ্গ হরি। সেহু বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারি॥
সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন এ। এমন্ত সত্য করি মনে অবধারি সে॥ [চতুর্থ ছান্দ]

কাটোয়ায় সন্ন্যাস দীক্ষাগুরু কেশব ভারতী গৌরাঙ্গকে বললেন, 'তুমি অংশ হয়েও স্বয়ং জগদীশ্বর'। এ কথা শুনে প্রভু ব্যথিত হলেন।—'বহে অংশ স্বয়ং তুম্ভে জগতেশ্বর। এ বাণী শুনিণ প্রভু হৃদকাতর॥' এই রকমই ছিলেন মহাপ্রভু, কেউ তাকে ভগবান বললে সঙ্কুচিত ও ব্যথিত হতেন।[১]

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গেলে সেখানকার লোকেরা তাঁকে বলল, 'বৃন্দাবনে গেলে তুমি কৃষ্ণ অবতার'। তখন—
'প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিবা। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবা॥' (মধ্য ১৮।১১১)

কেশবভারতী গৌরাঙ্গের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় চন্দ্রশেখর আচার্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসীকে নমস্কার করে তিনি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন, হেসে বললেন, 'এসেছ, ভালই করেছ'।—

'এহি মতে দুহি জন ছন্তি যেউ ঠারে। চন্দ্রশেখর আচার্য্য গলে সে কালরে॥
সন্ন্যাসকু নমি মহাপ্রভুঙ্কু বন্দিলে। আইলা উত্তম হেলা হসিন বোইলে॥'
[সপ্তম ছান্দ]

সন্ন্যাস গ্রহণের পরই চৈতন্যের ভাবাবেশ দেখা দিল। সর্বাঙ্গে তাঁর কদম্বকেশরের মত পুলক-রোমাঞ্চ। মত্ত হস্তীর মত চলন। মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম গান। কখনও স্তম্ভন, কখনও ভূমিতে পতন। কখনও গোপীভাব, কখনও দাসভাব। গমন কখনও ধীর, কখনও দ্রুত। দিন রাত্রির চেতনা নেই। [অষ্টম ছান্দ, ১৬-১৮]

শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন নবীন সন্ন্যাসী। তাঁর তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দেখে আনন্দিত হলেন হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীনিবাসাদি ভক্তবৃন্দ। তাঁরা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। সাশ্রুনয়নে তাঁরা চৈতন্যবদন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—

'তেজ দেখি আনন্দ সে হরিদাস। মুরারি মুকুন্দ দত্ত শ্রীনিবাস যে॥
দণ্ড প্রণাম করি পড়ি ভূমিরে। বদন দেখি অশ্রুপূর্ণ নেত্ররে॥' [নবম ছান্দ, ২৮]

অদ্বৈতভবন থেকে নীলাচল যাত্রা করলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তখন -

সঙ্গে অদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত। নিত্যানন্দাদি আর যেতে ভক্ত যে'॥ [নবম ছান্দ, ৫০]

অদ্বৈত কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসেন। [দশম ছান্দ/৫]

পুরীতে পৌঁছে শ্রীচৈতন্য প্রথমেই জগন্নাথ দর্শন করেন। জগন্নাথ দেখে প্রেমে অচেতন হয়ে পড়লে সার্বভৌম এই অপরূপ সন্ন্যাসীকে নিজভবনে নিয়ে যান, সেখানে সঙ্গী ভক্তরা গিয়ে মিলিত হন। দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে রইলেন। তখন ভক্তরা প্রভুর সমীপে নামকীর্তন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। তিনি ভক্তদের তাড়াতাড়ি জগন্নাথ দর্শন করে আসতে বললেন। —

প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধমকু করি ধন্য
আসি প্রবেশিলে নীল সুন্দর গিরি।
জগন্নাথ দেখিণ প্রেমে হোই অচেতন
বিকচ কঞ্জনয়নু বহই বারি॥
সার্বভৌম দেখিলে আসি।
কাঁহু আসিছন্তি অপরূপ সন্ন্যাসী॥
নেই আপনা সদনে রাখিলে দিব্য ভুবনে
এমন্ত মিলিলে সঙ্গ ভকতগণ।

ত্রিযাম হেইছি দিন   প্রভু আবেশিত মন
প্রভুর সমীপে কলে নাম কীর্তন।
মহাপ্রভু হোই সচেত।
বোলে বেগে দেখি আস জগন্নাথ ॥

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'কবিকর্ণপুর ও লোচনের মতে শ্রীচৈতন্য প্রথমে সার্বভৌম-গৃহে যাইয়া, পরে সার্বভৌম-পুত্র-সহ জগন্নাথ দর্শনে যান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কথা স্বীকার করেন নাই। মাধব যদি সত্যই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শুনিয়া বিবরণ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; কেন-না গদাধর শ্রীচৈতন্যের অনুগামী হইয়াছিলেন' চৈ. চ. উ. ২৮৫ পৃ.)।

শ্রীচৈতন্যের আরেক অনুগামী ভৃত্য গোবিন্দ কর্মকারও একই কথা বলেছেন।--

'মহাবিষ্ণু দেখিয়া প্রভুর হৈলা রতি।   পুনঃ পুনঃ করে প্রভু ভকতি প্রণতি ॥
মুরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া।   যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়া ॥
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছিল সেই স্থানে।   কোলে তুলি লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥
কত সেবা করিলেন প্রভুরে লইযা।   সার্বভৌমের ভক্তিরস পড়ে উছলিয়া ॥'

[করচা ১ম সং, পৃ. ৪৭]

মাধব-কাব্যের দশম ছান্দে শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুর থেকে নীলাচল গমন, জগন্নাথ দর্শন, সার্বভৌম উদ্ধার, দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন দর্শন ও পুরীতে প্রত্যাবর্তন সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবন থেকে পুরীতে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করছেন—এই পর্যন্ত বর্ণনা করে মাধব গ্রন্থ শেষ করেছেন।—

ভকতঙ্কু ঘেণি সঙ্গে বঞ্চান্তি ভাবতরঙ্গে।   তহুঁ নেউটি আইলা শ্রীনীলাচল ॥
কৃষ্ণ সুখে বঞ্চান্তি দিন।   পরম হরষ ভক্তজনঙ্ক মন ॥

কবি মাধব ছিলেন এই পরম হরষিত ভক্তদের একজন—চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'যে-সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রবর্ণনায় যায়, তা-ই উত্তমভাবে যায়, অন্য সব সময় বৃথা যায়।' তাঁর বৈষ্ণবীয় রসদৃষ্টি ছিল অতিশয় গভীর। এ সম্পর্কে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"কবি অতি সরল ভাষায় অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিয়া বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত কিরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি,—

'সেহু সর্বনাম সর্বরূপরে বিখ্যাত।   এ মন্তে সে ব্রহ্ম বলি বোলন্তি জগত হে ॥
বনলতা তরুজল সব রূপ সেহি।   সর্বজীবঠারে পরম ব্রহ্ম অছি রহি যে ॥
এ মন্ত বোলিণ জ্ঞানী, এহু অস্তি ভ্রম।   এহু নুহইটী নিশ্চে, শাস্ত্র ধর্মাধর্ম যে ॥

বন ঘন জল ব্রহ্মা বোলি বোলু যেবে। এ হাঙ্কর নাম ধরি দেখু থ সর্বে যে ॥
কাহারি ত মুক্তি নোহে সুখ দুঃখ হোএ। ঈশ্বরের মায়া এহু তাহিঁরে ভ্রময়ে যে ॥
শুন মোহতত্ত্ব দিব্য, তত্ত্বর বিধান। ক্লেশমাত্র রহে ন, লভন্তি সুখমান যে ॥
বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ হরি। এ আদি নাম তাঙ্কর অটে গতিকারী যে।
রাজার যেমন্ত রাজপাল হে অটঈ। তাহার দেবার সর্বজনকু হুঅঈ হে ॥
তহিঁ অন্তে পুর হই অছয়ি তাহার। তহিঁ অন্য ঠাকু গলে, দিশে বলৎকার হে ॥'

ভাগবতরত্ন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—"ব্রহ্মের বিশ্বানুগত্ব বা বিশ্বময়তা (Immanence) অনেক সময়ে আরাধনা বা পূজার ভাব নষ্ট করিয়া দেয়। Pantheism অনেক সময়ে জড়বাদে পরিণতি লাভ করে। 'তরুলতা আদি সকলই ব্রহ্ম'—এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্থকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে। এই কারণে তিনি ব্রহ্মের Transcendence বা বিশ্বাতীতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। এই প্রকাশিত বিশ্ব ঈশ্বরের মায়া বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরূপ-বৈভব আছে। রাজা স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেখান হইতে শক্তি চালন করিয়া কর্মচারিগণের দ্বারা তিনি যেমন রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান সেইরূপ নিজের স্বরূপ বৈভবে থাকিয়া মায়া শক্তির সাহায্যে দেবগণের দ্বারা বিশ্ব শাসন করিতেছেন। স্বরূপ শক্তির এই বর্ণনা গৌড়ীয় ভক্তিবাদের একটি বিশেষ শিক্ষা। কবি এই তত্ত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন।"

মাধবের 'চৈতন্যবিলাস' পুঁথির আবিষ্কারক ড. বিমানবিহারী মজুমদার। এই কাব্য সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন দিয়েই এ প্রসঙ্গে শেষ করি—'এই কাব্যখানি ঐতিহাসিকের তৌলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কবিত্ব গৌরবের জন্য ইহা ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইবে।' ['উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পুঁথি : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩০, চতুর্থ সংখ্যা]

দিবাকর দাস ঃ জগন্নাথ চরিতামৃত

'জগন্নাথ চরিতামৃতে' যাঁর চরিত্র মহিমা বর্ণিত হয়েছে, তিনি জগন্নাথ দাস—শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া ভক্ত 'পঞ্চসখা'র অন্যতম। এঁকে মহাপ্রভু 'অতিবড়' আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমানে এঁর সম্প্রদায় 'অতিবড়ী' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। পুরীর সমুদ্রতীরে 'সাতলহর' মঠটি এই সম্প্রদায়ের মঠ। গ্রন্থকার দিবাকর দাস এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে দিবাকর দাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থের প্রথম সাত অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। পুরীর বড় ওড়িআ মঠের অধিকারী শ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামী

প্রকাশিত (১৯৬৩ খ্রীঃ) 'শ্রীজগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থটি অবলম্বনে এখানে আলোচা করা হল।

প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থসূচনায় মহাপ্রভু জগন্নাথকে গোপীনাথ কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদজ্ঞানে বন্দনা করা হয়েছে—

'সহস্রারং পদ্মং দলততিষু গোপীভিরভিতঃ পরীতং গোবৃন্দৈরপি
নিখিলকিঞ্জল্ক মিলিতৈঃ।
ববাটে যস্যাস্তি স্বয়মখিলশক্তি প্রকটিত প্রভাব ঃ সত্যশ্রীপরমপুরুষঃ
সোঽপি ভগবান্ ॥
বাধাচন্দ্রাবলীভ্যাং বলয়িতবপুষং কোটি কামাভিলাষ প্রেমানন্দৈকপূর্ণং
বিপুলতরমুদং নিত্যবৃন্দাবনস্থম্।
শুদ্ধস্নিগ্ধেন্দ্রনীলদ্যুতিবিমলতনুং শেষ পর্য্যঙ্কলীনং কৃষ্ণং নীলাচলেশং
সুরুচিরবদনং শ্রীজগন্নাথমীড়ে ॥' ইত্যাদি।

এরপর লক্ষ্মী-সরস্বতী-ভানু-মহেশ-গণনায়ক-ব্রহ্মা-হৃষীকেশের বন্দনার পর যথাক্রমে চৈতন্য, গুরু ও বৈষ্ণবের বন্দনা। চৈতন্যবন্দনায় দিবাকর দাস চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগল বসমূর্তিরূপে দেখেছেন।—

'কিশোরী প্রেমবক্তায় ভাব সলগ্ন মূর্ত্তয়ে। গুপ্তায় রসরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ ॥
কিশোরী কিশোর যুগল। প্রেমালিঙ্গনে হোই ঠুল ॥
গুপতভাব রসমূর্ত্তি। রূপে প্রকাশ হোই ছন্তি ॥
শ্রীচইতন্য নাম যার। করুছি তাঙ্কু নমস্কার ॥'

কিন্তু এরপর 'নিত্যমঞ্জরীগণ'-এর উল্লেখ কালে বলা হয়েছে-

'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসিন্ ! গৌর রূপধৃক্।
ভক্তাবতার ! ভক্তেশ ! ত্বৎপদং প্রণমাম্যহম্।
কলৌ শ্রীকৃষ্ণঃ সম্ভূতো বিখ্যাতো গৌররূপধৃক্।
শ্রীকেলিমঞ্জরী নাম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুঃ।

চৈতন্যপার্ষদ গদাধর নিত্যমণ্ডলে রাধা, তিনি সৌভাগ্যমঞ্জরী। রঙ্গদেবী রূপে প্রকীর্তিত গৌরীদাস সার মঞ্জরী, হৃদয়ানন্দ হৃদয়মঞ্জরী, রত্নরেখা রূপে প্রকীর্তিত মত্ত বলরাম মোদমঞ্জরী এবং অতিবড় জগন্নাথ দাস নিত্যমণ্ডলের ললিতা--গোকুলে মালিকামঞ্জরী। এঁরা সব ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য নরদেহ ধারণ করেছিলেন।-

'এ সবু নিত্যস্থলবাসী। মর্ত্যে জনম হেলে আসি ॥
কলিবে পাপমতি নর। করিবা পাইঁ কি উদ্ধার ॥
নরদেহরে লীলা করি। ভকতি যিবে যে প্রচারি ॥
নিত্য ঠাকুরঙ্ক আদেশে। জাতমলে এ ভারতবর্ষে ॥'

নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে রাধার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ হাসছেন। তাঁর সেই মন্দমধুর হাসি থেকে জন্মালেন শ্রীচৈতন্য এবং রাধার হাসি থেকে জন্মালেন জগন্নাথ দাস—

'শ্রীরাধামুখ চাহি' হরি। মন্দে মধুর হাস্য করি ॥
যে হাস্য মধুর অমৃত। তহুঁ চৈতন্য হেলে জাত ॥
যেণু দুহিঙ্ক একভাব। রাধা হসিলে তহুঁ লব ॥
সে হাস্যু জন্মলে ত্বরিত। শ্রী অতিবড় জগন্নাথ ॥

রাধা অংশে ওড়িশা রাজ্যে কপিলেশ্বরপুর গ্রামে জন্ম হল জগন্নাথ দাসের পিতা পুরাণ পণ্ডা তার বারো বছর বয়সের সময় বিবাহ ঠিক করলে জগন্নাথ আপত্তি করলেন। 'সিদ্ধান্তবেদান্ত' ঋক-যজু সাম তিন বেদ অভ্যাস করলেন, রামায়ণ মহাভারত পড়লেন এবং-

দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত। টীকা টিপ্পনীহিঁ সহিত।
এমান সাধিলে বিশেষ। হোইলা অষ্টাদশ বর্ষ ॥
বটগণেশঙ্ক অগ্রত। রচিলে ভাষা ভাগবত।
পড়ুণথান্তি সুখ পাই। গণেশ দেউথান্তি কহি ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় বলা হয়েছে, কলিকলুষ মোচনের জন্য নন্দন দন শচীনন্দনরূপে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করলেন।

স বৈ কলিকালে দুষ্কৃতান্ লোকান্ পাপেষু তৎপরান্।
মহাপাতকসংযুক্তান্ বীক্ষ্য বেদাদিনিন্দকান্ ॥
শ্রীশোহবাতরদত্র বিগ্রহধর প্রেম্ণা জগত পালকো—
ভক্তিপ্রেমদ নামকীর্তন বশাৎ সর্বপ্রজাতারকঃ।
গৌড়ে মূঢ়জনান্নিরীক্ষ্য ভগবান্ বৃন্দাবনানন্দনো- -
গঙ্গাতীরমুপেত্য নন্দতনয়ো জাতঃ শচীনন্দনঃ ॥
শুণ সুজনে দেই চিত্ত। যে গ্রন্থ চরিত অমৃত ॥
নিত্য শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা পাই। সে প্রভু চৈতন্য গোসাই' ॥

প্রেম ভকতি বিতরণ—করি তারিবে প্রাণীগণ ॥

যে নামে প্রেমভক্তি জাত। সে নাম রটিবে নিরত ॥
নাম কীর্তন করি তর। হে মূঢ়জন। নিরন্তর ॥
এহি মানসে পরবেশ। মর্তমণ্ডলে গৌড়দেশ ॥
তাহাঙ্ক জন্ম শুণ এবে। নিত্যু আনিণ অনুরাগে ॥
জাহ্নবী নদীর সমীপে। নদীআ নগ্র নবদ্বীপে ॥
শচী দেবীঙ্কর উদরে। নিবাস কলে আনন্দরে ॥

গৌড়দেশে কুলাচারে কিছুদিন কাটিয়ে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গে গয়া কাশী ইত্যাদি বহুতীর্থ ভ্রমণ করে পুরুষোত্তমে এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন শ্রীচৈতন্য সখাদের নিয়ে পুরী মন্দিরে এসে কল্পবটের মূলে জগন্নাথ দাসের

ভাগবত পুরাণ পাঠ শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং জগন্নাথ দাসকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গনবদ্ধ করে রাখলেন। 'আঢাই দিবস পর্যন্ত। যোগি রহিলে প্রেমচিত্ত ॥' আড়াই দিন পর্যন্ত সপ্রেমে তাঁরা দুজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রইলেন।

এরপর শ্রীচৈতন্য রোজই জগন্নাথ দর্শনে এসে বটতলায় জগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠ শুনতে লাগলেন। তখন সঙ্গী বৈষ্ণবেরা ভাবলেন শ্রীচৈতন্য যেভাবে এই উৎকলী ব্রাহ্মণের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন, তাতে তিনি হয়তো এই রাজ্যেই থেকে যাবেন এবং উৎকলী কর্ম আচরণ করতে থাকবেন। উৎকলী ব্রাহ্মণের সঙ্গ ছাড়াবার জন্য তাঁরা বহু চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য বললেন-

যদঙ্গে বসতি কৃষ্ণো যদঙ্গে ভক্তিরাশ্রিতা। তস্য বিপ্রস্য কৃষ্ণস্য বিভেদং নৈব কারয়েৎ ॥

দাস জগন্নাথের মুখে 'হরে কৃষ্ণ' আদি মন্ত্রের পরিবর্তে 'হরে রাম' আদি মন্ত্র শুনে শ্রীচৈতন্য বিস্ময় প্রকাশ করলে জগন্নাথ বললেন—

ব্যুৎক্রমো বা ক্রমোবাস্তু তস্যাজ্ঞা লভ্যতাং কথম্ ।
ব্যুৎক্রমো বা ক্রমাদগ্নির্দহেৎ শীতলতাং ত্বপাম্ ॥

ক্রম অনুসারেই হোক, বিপরীতক্রমেই হোক জলে অগ্নিসংযোগ হলে শীতল জল উষ্ণ হবেই।

ক্রমরে অবা বিপরীতে। অগ্নি দহন করে নিত্যে ॥
জলে সংযোগ হেলে অগ্নি। শীতল গুণ নিএ টানি ॥
ক্রমরে হেউ বা ন হেউ। উষ্ণ হুঅই জল তহুঁ ॥

সেই রাত্রে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে শ্রীচৈতন্যের দ্বিধা দূর করলেন

সেহি রাত্রিরে জগন্নাথ। প্রত্যক্ষ স্বপ্নে উপস্থিত ॥
স্বঅঙ্গ গউর বিগ্রহে। কহিলে প্রভু অতি স্নেহে ॥
হে চইতন্য শুণ এবে। আম্ভ দুহিঁক মধ্যে বেবে ॥
তত্ত্বরে ব্যবহারে অবা। ভেদ নাহিঁটি শুণ বাবা ॥
সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলায়ুধ। সেহি অটন্তি নিত্যানন্দ ॥
শ্রীজগন্নাথ দাস যে হি। শ্রীরাধা অটন্তিটি সেহি ॥
এ হরে রাম মহামন্ত্র। মহিমা হোইছি উক্ত ॥
পুরুষ বোধিনী আদিরে। শাস্ত্র সকলে বিস্তরে ॥
তাহা হুঁ কহুঅছি শুণ। হে প্রিয় বৎস চইতন্য ॥

এরপর শ্রীচৈতন্যের আদেশে মত্তবলরাম দাস জগন্নাথকে মন্ত্রদীক্ষা দান করলেন—

শ্রীমত্তোবলরামোঽসৌ চৈতন্য উবাচ তব বাঞ্ছাফলপ্রদঃ।

উপদেক্ষ্যতি তে মন্ত্রং ত্বনুত্তং মদনুস্থয়া ॥
ইতুক্ত্বা স তমাহুয় তস্মৈ দীক্ষিতুমাদিশৎ ॥

এই অধ্যায়ের শেষে দিবাকর দাস তাঁর তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানিয়েছেন—

গুরোঃ সংক্ষিপ্ত লেখাতো লব্ধ্বায়ল্লিখিতং ময়া।
তত্র দোষো ন ধর্ত্তব্যঃ ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥

'গুরুর লেখা থেকে সূত্র আহরণ করে গ্রন্থে বিস্তারিত করে লিখেছি, ভ্রমপ্রমাদ কিছু ঘটে থাকলে সজ্জনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।'

তৃতীয় অধ্যায়ে জগন্নাথ দাসের চৈতন্যসেবা বর্ণিত হয়েছে—

'চৈতন্যঙ্কর সেবাবিধি। দাসে আপনা হস্তে সাধি ॥
যে কালে সে নিদ্রা তেজন্তি। দাসে যে এহি' বসি থান্তি ॥
সাষ্টাঙ্গ করি দণ্ডবত। করান্তি শ্রীমুখ ধউত ॥
শয়ন শয্যাকু মার্জন। শ্রীহস্তে মৃত্তিকা শোধন ॥
দণ্ড কাষ্ঠে দন্ত ধাবন। স্নাহান অর্থে জলদান ॥
শ্রী অঙ্গ প্রোঞ্ছন করন্তি। সুক্ষীন বস্ত্র পাহিরন্তি ॥
সংন্যাস নিত্যকর্ম মান। দণ্ড কমণ্ডলু মার্জ্জন ॥
শ্রীজগন্নাথ দরশন। সঙ্গতে খটিবা বিধান ॥
চরণ ধউত আসন। নির্মাল্য করন্তি সেবন ॥
হস্ত ধউত জলদান। শেষেণ আপণ ভোজন ॥
সুসঙ্গে শয়ন আসন। পাদ সেবন রাত্রি দিন ॥
হরে রামকৃষ্ণ কীর্তন। উচ্চেণ করন্তি রটন ॥

দাস জগন্নাথের সেবায় প্রীত হয়ে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথকে তাঁর 'পূর্বসিদ্ধ অঙ্গের' কথা জানতে চাইলেন। দাস জগন্নাথ বললেন—পরমধাম বৈকুণ্ঠে নিত্যরাসমণ্ডলে রাধাকৃষ্ণ যখন পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন 'তহি'রু তুম্ভে হেলা জাত। প্রভুঙ্ক অগ্রে উপগত ॥ রাধাঙ্ক হাস্যরু মুঁ জাত। তুম্ভর পছে হেলি স্থিত ॥" প্রভু তোমাকে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে হরিনাম প্রচারে আজ্ঞা দিলেন, বললেন, অচেতনকে চেতন করাবে বলে সকলে তোমাকে চৈতন্য বলবে—'অচেতে করা অচেতন। তেণু বোলাইব চৈতন্য' ॥ এরপর শ্রীকৃষ্ণ আমাকেও পৃথিবীতে জন্ম নিতে আদেশ করে বললেন 'এহি স্বরূপ ভাবুথিব। অন্তে এহি গতি পাইব ॥'

দাস জগন্নাথের এ কথা শুনে শ্রীচৈতন্য বললেন, 'যোগীর অগম্য বেদের অগোচর এতবড় কথা তুমি বললে। তুমি আজ থেকে 'অতিবড়' হলে।—

'শ্রী অতিবড় জগন্নাথ। স্বামীঙ্ক বোলন্তি জগত ॥
মহাপ্রভুঙ্ক মুখঁ শুণি। সর্বে বোলন্তি এহু বাণী ॥

কিন্তু 'অতিবড় পদং শ্রুত্বা বৈষ্ণবা দুঃখিতাশয়াঃ—মহাপ্রভু দাস জগন্নাথকে 'অতিবড়' বলায় দুঃখিত হলেন সঙ্গী বৈষ্ণবেরা। নিত্যানন্দ বললেন—'উৎকলায়ে দ্বিজে প্রীতির্ভবতো যদি জায়তে। কিমিতি ন্যূনতাস্মাসু নোচিতং ভবতা কৃতম্ ॥' উৎকলীয়

ব্রাহ্মণকে ভাল লেগেছে ভাল কথা, তা বলে আমাদের ছোট করা আপনার উচিত হয় নি।' শ্রীচৈতন্য বললেন—'এ দেশের কীটপতঙ্গ, কাঠপাথর, বালুকা সবই শ্রেষ্ঠ, মানুষের তো কথাই নেই, এই কারণে আমি দাসকে 'অতিবড়' বলেছি। তা ছাড়া, এ ব্রাহ্মণ মহাজ্ঞানী ও ভক্ত ; এঁর সঙ্গেই আমি থাকবো, এ ক্ষেত্র ছেড়ে যাব না।' মহাপ্রভুর এ কথা শুনে বৈষ্ণবেরা পুরী ছেড়ে যাজনগর বা যাজপুরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

একদিন স্নেহপরবশ হয়ে শ্রীচৈতন্য হরিদাস নামক বৈষ্ণবকে একটি অনুজ্ঞাপত্র দিয়ে যাজপুরে পাঠালেন। এই পত্রে মহাপ্রভু লিখে পাঠালেন 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' মহাপ্রভুর পত্র পেয়ে জগদানন্দ চক্রবর্তী বৈষ্ণববৃন্দের অনুমতি নিয়ে লিখলেন, 'প্রভু, এই ভক্তদের প্রতি আপনার স্নেহ থাকলে আপনি এসে ভক্তবৃন্দকে নিয়ে যান'—

'এষু ভক্তেষু ভো দেব স্নেহশ্চেদ্ ভবতোঽস্তি বৈ।
আগত্য ভক্তবৃন্দান্নঃ সাকংস্বেন নয় প্রভো॥'

পত্রবাহকের হাতে পত্র পেয়ে এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে মহাপ্রভু তাঁর সহচর ছয় বৈষ্ণব এবং দাস জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে যাজপুরে গেলেন। জগন্নাথ যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রতি তাদের বিমুখতা নাশ করব'— 'ত্বয়ি তেষাং বৈমনস্যং নাশয়ামীতি।'

মহাপ্রভু যাজপুরে গেলে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। 'আনন্দে সাধুবৃন্দ সঙ্গে, যাজনগ্রে রহিলে রঙ্গে॥' দু'দিন আনন্দে কেটে গেল। তারপর মহাপ্রভু জগন্নাথকে ডেকে বললেন, 'অতিবড়, পুরী যাবার জন্য তৈরী হও।'

সে প্রভু প্রেম অভিলাষে। ডাকিলে অতিবড় দাসে॥
ক্ষেত্রকু যিবা সজ হুঅ। তা শুণি সমস্তে বিস্ময়॥
যেউঁ কথারু এতে দূর। অইলু পুণি তা প্রচার॥
পুরুষোত্তমে যেবে থিবা। এহি ভাষা সিনা শুণিবা॥

মহাপ্রভু ফিরে এলেন পুরীতে। দুঃখিত বৈষ্ণবেরা বনবিষ্ণুপুরে চলে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা জনৈব মাধব দাসকে পত্রবাহক করে প্রভুর নিকট পাঠালেন, তাঁদের অনুরোধ তিনি তীর্থদর্শনে আসুন, পুরুষোত্তমে কি-ই বা আছে---

'হে দেবদেব, আগচ্ছ তীর্থদর্শন কাংক্ষয়া
কিংবা তত্রাস্তি ভগবন্ যতস্ত্বং ভক্তবান্ধবঃ॥'

তখন, 'এমন্ত বৈষ্ণবঙ্ক বাণী। শুণি চৈতন্যদেব ভণি
আঠটি শ্লোকরে তাহার। প্রভু যে দেলে প্রত্যুত্তর॥
কহ মাধোই দাসে যাহি। এ আজ্ঞাপত্রিকাকু নেই॥

মহাপ্রভু এই পত্রে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য সূচক আটটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন,

সর্বতীর্থসার এই পুরুষোত্তম। অতএব ভক্তিসাধন মার্গে যাঁরা চলতে ইচ্ছুক, তাঁরা পুরুষোত্তমে চলে আসুন—

'তুম্ভে সকল সাধুগণ। ভক্তিসাধন যেবে জাণ॥
সত্বর এঠাকু আসিব। মো সঙ্গে প্রভুঙ্কু ভাবিব॥'

কিন্তু এ পত্র নিষ্ফল হল। যাজপুরের বৈষ্ণবেরা ভেবেছিলেন 'দয়া করিবে শচীসুত' ॥ 'অতিবড় পদ ছড়াই। পুরুষোত্তম নেবে সেহি॥' কিন্তু 'অতিবড়' পদ তিনি প্রত্যাহার করবেন না, অতএব যাজপুর ছেড়ে সকলে বৃন্দাবন চলে গেলেন, সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

ছাড়ি পুরুষোত্তম ধাম। বৃন্দাবনে কলে নিবাস॥
পুরুষোত্তমে মোতে বিধি। তা ছাড়ি বলে আন সিদ্ধি॥
নির্মাল্য সেবা দূর কলে। ব্রজ রজকু আস্বাদিলে॥
ছাড়িণ সমুদ্র স্নান। যমুনা জলে দেলে মন॥
হরি মন্দির ত্যাগ কলে। কলি তিলক আশ্রে কলে॥
শঙ্খ চক্র চিহ্ন নোহি। নাম অঙ্কিত সর্বদেহী॥
ছাড়ি জগন্নাথ মূরতি। মদনমোহনে পীরতি॥
কল্পতরু ছায়া ছাড়ি। কদম্ব মূলে যান্তি পড়ি॥
ক্ষেত্রভ্রমণ ছাড়ি দিন। বুলন্তি গোবর্দ্ধন গিরি॥

এইভাবে দ্বাদশ মোহান্ত দ্বাদশ পাটে চলে গেলেন, সেখানে তাঁদের 'মহিমা বিখ্যাত হোইলা।' 'দ্বাদশ মহন্ত যে থিলে। লেউটি দেশকু অইলে॥ দ্বাদশ স্থানে করি ঘর। আদরি রহিলে সংসার॥' এঁদের মধ্যে 'রামকেলি গ্রাম পাটরে। রূপক গোসাই তহিঁরে॥' অথচ এরপর আবার বলা হয়েছে, রূপ গোসাই গুণ্ডিচা যাত্রার সময় পুরীতে এসে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। কেবল রূপ নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীজীব আর সনাতন, মোট কুড়িজন।

আদ্যেণ প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী সনাতনটি আনন্দ॥
শ্রীমান রূপক গোসাই। গোপাল দাসে তথা তহিঁ॥
শ্রীরঘুনাথ দাসে স্থিতি। এভাবে কোড়িএ মূরতি॥
সারিণ গুণ্ডিচাদর্শন। বৃন্দাবনকু কলে মন॥
বোইলে চৈতন্যঙ্কু চাহি। চাল ভ্রমিবা তীর্থ মহী॥

কিন্তু মহাপ্রভুর সেই এক উত্তর—

শুণিণ আজ্ঞা শ্রীচৈতন্য। তীর্থে কি অছি প্রয়োজন॥
ক্ষেত্রাদি তীর্থ মোক্ষ স্থান। পুরুষোত্তমবে গোপন॥
তুম্ভে ন ছাড় এহি পুর। ভজ জগন্নাথ পয়র॥
ক্ষেত্র তীর্থে মো কার্য নাহিঁ। এ ক্ষেত্র ন ছাড়িবি মুহিঁ॥

মহাপ্রভু এ কথা বললে তাঁরা মৌন হয়ে রইলেন। প্রভুর কথায় অনাদর করে তাঁরা বিদায় নিয়ে বৃন্দাবন চলে গেলেন। তারপর প্রতি বৎসর তাঁরা গুণ্ডিচা যাত্রার সময় পুরীতে আসেন আবার বৃন্দাবনে ফিরে যান। বৃন্দাবনে থেকে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করেন।--

মহাপ্রভু এহা কহিলে। শুনি সে মউন হইলে ॥
আদর কলে শ্রীচৈতন্য। সে তাহা ন ঘেনিলে মন ॥
বৈষ্ণবে মেলাণি হোইলে। বৃন্দাবনকু চলি গলে ॥
প্রতি সম্বৎসরে আসন্তি। গুণ্ডিচা গহণ খাটন্তি ॥
অতিবড় পদে বসন্তি। লেউটি বৃন্দাবনে যান্তি ॥
বৃন্দাবন পদ টেকিলে। তহিঁ কি লক্ষ গ্রন্থ কলে ॥
[চৈতন্য চরিতামৃত, তৃতীয় অধ্যায়]

জগন্নাথ চরিতামৃতের এ প্রসঙ্গটি বর্তমান কালের ওড়িয়া সমালোচকদের প্রায় সকলেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। 'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যেই যে এর বিরোধিতা আছে তা খেয়াল করেন নি, এবং সমগ্র প্রসঙ্গটির ঐতিহাসিকতা বা প্রামাণিকতা নিয়েও কোন প্রশ্ন তোলেন নি। অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর *Medieval Vaishnavism of Orissa* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করলেও বিস্তারিত কোন আলোচনা করেন নি। এ সম্পর্কে তাই বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমত, এ গ্রন্থের সর্বত্র কৃষ্ণ জগন্নাথকে অভিন্ন দেখা হয়েছে।

কৃষ্ণনাম জগন্নাথঃ পরং তত্ত্বং তদেব হি।
কৃষ্ণোহয়ং দিব্যরূপশ্চ কৃষ্ণঃ পরম পুরুষঃ ॥ (অষ্টম অধ্যায়)
বলভদ্রো হরে শিষ্যো রামোগরুঃ সুভদ্রিকা।
কৃষ্ণো দেবো জগন্নাথো ন ভেদো জায়তে ত্রিষু ॥ (নবম অধ্যায়)

দাস জগন্নাথ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ উৎকলখণ্ড ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন

সচ্চিদানন্দ রূপস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিকারণম্।
রাসক্রীড়ারতৌ রাধাকৃষ্ণৌ শ্রীদারু বিগ্রহে ॥
রাধাকৃষ্ণতনুঃ মনোঃ বভু জগন্নাথস্ত্রিলোকেশ্বরঃ ॥
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপশ্চ শ্রীজগন্নাথ উচ্যতে।
অবতারী জগন্নাথোহবতারান্ কোটিশোহসৃজৎ ॥
রাধিকাসঙ্গ নিরতঃ কদাচিন্নো বিযুজ্যতে। ..
য দৃশ্যতে তব যুগ্মাঙ্গং কদাচিদ্দৃশ্যতে পুনঃ।
প্রেমমূর্তৈঃ কৃপা যস্মিন্ তস্মৈতচ্চ প্রদৃশ্যতে ॥

কোন কোন ভক্ত ভাবদৃষ্টিতে জগন্নাথের এই যুগল মূর্তি দেখতে পান।
'সে বেণি অঙ্গ ন দিশই। দিশন্তি ভক্তিভাবে কাহিঁ ॥

প্রেমমূর্তি কৃপা যাহারে। সে করি পারন্তি গোচরে ॥
যে রাধা সে কৃষ্ণ অটন্তি। কৃষ্ণ রাধা ভাবেণ ছন্তি ॥
যুগ্মাঙ্গ অভেদ পীরিতি। প্রেমভক্তে এহা জাণন্তি ॥
নীলকন্দরে কৃষ্ণ রাধা। ক্রীড়া করুছন্তি সর্বদা ॥
সে নীলাচল নাম বহি। রাহাস স্থল এ অটই ॥

নীলাচল যদি রাসস্থল হয়, তা হলে ভাবদৃষ্টিতে নীলাচলই বৃন্দাবন। এই অভের তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীর ভেদদৃষ্টি মেলে না।

দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণ-জগন্নাথে অভেদ দৃষ্টি চৈতন্যপার্ষদ গোস্বামীদের মধ্যে যথেষ্টই ছিল। দিবাকর দাসের কাহিনীতে মহাপ্রভুর সঙ্গত্যাগী বৈষ্ণবদের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সনাতন গোস্বামী 'জগন্নাথ বন্দনা'য় বলেছেন—

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরো মুকুটরত্ন হে। দারু ব্রহ্মণ্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত। গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ পুরন্দর ॥
নিজাধর সুধা দায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্নে প্রসাদিত। সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোহস্তুতে ॥
গুণ্ডিচারথযাত্রাদি মহোৎসব বিবর্দ্ধন। ভক্তবৎসল বন্দেত্বং গুণ্ডিচারথ মণ্ডনং ॥
দীনহীন-মহানীচ দয়াদ্রীকৃত মানস। নিত্যনূতন মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥
[১০৩, লীলাস্তব।]

'হে শ্রীজগন্নাথ, নীলাচল শিরোমণি, হে দারুব্রহ্ম, ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ, হে লবণসমুদ্রতটের অমৃত, হে গুটিকোদর, নানাভোগ বিলাসিন্, আমাকে পালন কর। তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, তুমি সুভদ্রার লালনে ব্যগ্র, হে রামানুজ, তোমার চরণে নমস্কার। তুমি গুণ্ডিচারথযাত্রাদি বিবিধ মহোৎসবের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছ। হে ভক্ত বৎসল, হে গুণ্ডিচারথভূষণ, তোমাকে বন্দনা করি। তোমার চিত্ত সদাকালের জন্য দীনহীন মহানীচ জনকেও দয়া করিবার জন্য উদ্যত থাকে। তুমি নিত্যই নূতন নূতন মহিমা প্রদর্শন করাও। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রিয় অথবা শ্রীচৈতন্যই তোমার প্রিয় কিম্বা তুমি চিন্ময় এবং সকলেরই বল্লভ তোমার চরণে প্রণত হইতেছি ॥' [হরিদাস দাস অনূদিত]

যিনি এ কথা বলতে পারেন, তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবনের মহিমা বেশি মনে করবেন কেন? সনাতন রূপের জীবনকথা যাঁরা জানেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন মহাপ্রভুর আদেশেই তাঁরা বৃন্দাবনবাসী হয়ে সেখানে থেকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং কাব্য নাটক রসশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেছিলেন। সমগ্র চৈতন্যচরিতে কোথাও দিবাকর দাস বর্ণিত ঘটনার কোন সমর্থন নেই।

এ ছাড়া, সনাতন গোস্বামী তাঁর 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' যা লিখেছেন তাতে পরবর্তীকালের গদীয়ান বাবাজীদের ধামতত্ত্ব—'আমার ধাম বড়, তোমার ধাম ছোট'—এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি টেকে না।—

যস্য শ্রীভগবৎ প্রাপ্তাবুৎকটেচ্ছা যতো ভবেৎ।
স তত্রৈব লভেতামুং নতু বাসাহস্য লাভকৃৎ॥ ১/৪ ৩৪

"যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই স্থানেই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; প্রভু অমুক স্থানে বাস করেন, অতএব তাঁহাকে অমুক বাসস্থানে পাওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।" [ভক্তিরত্ন গোস্বামী অনূদিত]

স্বকৃত টীকায় সনাতন বলেছেন, "শ্রীভগবতঃ প্রাপ্তৌ যস্য উৎকটেচ্ছা লালসাধিক্যং প্রেমৌৎকণ্ঠ্যমিতি যাবৎ, ন তু ইচ্ছামাত্রম্। অমুং ভগবন্তম্ ; ন তু অস্য বাসো বসতি বাসস্থানং বা কেবলমস্য শ্রীভগবতো লাভং প্রাপ্তিং করোতীতি॥" অর্থাৎ 'প্রেমোৎকণ্ঠা ব্যতীত কেবল বাসস্থান তাঁহাকে প্রাপ্তি করাইতে পাবে না।'

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র, ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন—

তদর্থং ভগবৎপূজাং করিয়াসি করোমি চ
আবাসো জগদীশস্য তস্য ন ক্ব বিদ্যতে॥ ১/২/৬৩

"তারপর আমার লোকের মধ্যে যে বৈকুণ্ঠলোক বলিয়াছ, তাহাও অসাধারণ নহে। কারণ, সেই ভগবানের বাস কোন্ স্থানেই বা নাই ; অপিচ তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্দ্বারা উক্তবাক্যের পরিহার হইল।" [ভক্তিরত্ন গোস্বামী অনূদিত]

স্বকৃত টীকায় সনাতন লিখেছেন—"যচ্চোক্তং 'ভবল্লোকমধ্য এব বৈকুণ্ঠলোকঃ' ইতি তৎপরিহরতি—আবাস ইতি। বসতিস্থানং কুত্র ন বিদ্যতে, অপি তু বহিরন্তশ্চ সর্বত্রাপি বর্তত ইত্যর্থঃ জগদীশ্বরত্বাৎ।"

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, রাধামাধবের লীলাস্থান গোলোক 'অখিলাত্মভূতো' ৫/৩৭ ; এবং সন্তগণ সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে প্রেমভক্তিভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হৃদয়ে সর্বদা দেখতে পান—'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতে ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি' (৫/৩৮)।

এখানেই আমরা একটা 'অতিবড়' কথা পেয়ে যাচ্ছি। সনাতন-শ্রীজীব কেউই বলেন নি, 'আমার বৃন্দাবন বড়, তোমার পুরুষোত্তম ছোট', তাঁরা বলেছেন বৃন্দাবন 'অখিলাত্মভূতো' নিখিল চরাচরই নিখিলেশের লীলাক্ষেত্র, জগতের কোথায় তাঁর বাস নেই ?

পরবর্তীকালে ওড়িশী বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে 'ধাম' নিয়ে যে বিবাদ লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে পাণ্ডা বা গদীয়ানের বিত্তবাসনা বা ব্যবসায়িক বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু সে বিবাদে পূর্ব আচার্যদের সমর্থন নেই।

আসলে বৃন্দাবন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা যে কোন ক্ষেত্রের মহিমা বর্ণনে, সেই সেই ক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বড় করে ধরলে প্রকৃত তত্ত্বদৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়। যিনি জগন্নাথ, জগতের নাথ, তাঁর ধাম স্কন্দ পুরাণোক্ত দশযোজন পরিমিত ক্ষেত্র মাত্র, না

সর্বজগৎ ? দক্ষিণ ভারতীয় মাধবসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যদের সমাধিকে বলা হয় 'বৃন্দাবন' —তা নিশ্চই ভৌগোলিক অর্থে নয়।—

"The exsistence of the Brindavana of Padmanava Thirtha at Anegondi appears to show that Padmanava Thirtha went to Harihara and Bukka at Kampili. Padmanava Thirtha died on the 16th November 1324 A. D. Narahari Thirtha's Brindavana also is near Anegondi. He died on the 29th December 1333 A.D." (page xxxv)

"Sri Vyasaraya Swami reposes in the Nava Vrindavana, an island in the Tungavadra, near Vijaynagar" (page cl xxv).

[*Introduction, The Life of Vyasaraya*, V. Venkoba Rao]

এর তাৎপর্য বৈষ্ণবতত্ত্বরসিক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারবেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা নিত্যলীলা, দেশকালের পরিচ্ছেদে অপরিচ্ছিন্ন লৌকিক ভৌগোলিক দৃষ্টির বৃন্দাবন নয়, রসদৃষ্টির সেই অলৌকিক নিত্য বৃন্দাবনেই লীলাবাদী বৈষ্ণব সাধক আশ্রয় পেতে চান।

সুতরাং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, আলোচ্য কাহিনীটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ; 'পুরুষোত্তমে কী আছে ? চাল ভ্রমিবাতীর্থ মহী' - এ কথা সনাতন প্রমুখ বৈষ্ণবেরা বলতে পারেন না।

'জগন্নাথ চরিতামৃতে'-র চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই সমন্বয় মূর্তি শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করা হয়েছে। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। চৈতন্যঃ কৃষ্ণনাম স্বজনপরিবৃত সর্বমার্গানুসারং। গায়ন্ যে তত্ত্বসারং পরমমনুমথ শ্রীজগন্নাথরূপম্। দিব্যং ত্রৈলোক্যপূজ্যং সুজনকরুচিরং ভক্তিদং প্রেমমূর্তিং—

ধ্যায়ন্ ক্ষেত্রে সদাস্তে সুরগণ মহিতে তং নমামোহনুকালম্ ॥

শুণ সুজনে দেই মতি। চৈতন্য দেবঙ্ক প্রখ্যাতি ॥
তিনি লোকরে পূজ্য যেহু। কনকরুচি মহাবাহু ॥
প্রভু যে ভক্তগণ সঙ্গে। মহানন্দে ভক্তিরঙ্গে ॥
ভক্তিদায়ক প্রেমমূর্তি। তাহাঙ্করূপ হৃদে চিন্তি ॥
সকল মার্গ অনুসরি। শ্রীকৃষ্ণনাম গান করি ॥
সুর পূজিত যে পবিত্র। খ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ॥
পরমমন্দ্র মূর্তিমন্ত। শ্রীমূর্তি প্রভু জগন্নাথ ॥
তাই যে নিত্যকলে বাস। বন্দই তাঙ্কু অহর্নিশ ॥

এরপর সার্বভৌম উদ্ধার বৃত্তান্ত। সে সার্বভৌম ভট্টাচার্য। প্রবৃত্তি মার্গে তাঙ্ক কার্য্য ॥
নিবৃত্তিমার্গ হরিভক্তি—সাধন প্রেম ন জানন্তি ॥

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অটন্তি। অভিমানরে পূর্ণ জতি ॥
তাহাঙ্কু তরিবার আশে। প্রভু যে স্বয়ং বিজে পাশে ॥

সার্বভৌম মহাপ্রভুকে দেখে বললেন—

সৌভাগ্যং জন্মকোটীনাং দুর্লভং তব দর্শনম্।
পাদপদ্মং বিলোক্যাহং বিশুদ্ধাত্মা ভবানঘ ॥
কোটি এ জন্মভাগ্য থিলা। এ তুম্ভ দর্শন মিলিলা ॥
তুম্ভ শ্রী পাদপদ্ম দেখি। পবিত্র হেলা মোর আখি ॥

এই বলে প্রভুকে দিব্য আসনে বসিয়ে ষড়র্ঘ্যবিধি পূজো করে সার্বভৌম নিবেদন করলেন—

ত্বংব্রহ্মসারঃ সুখবেশধারী ত্বং কৃষ্ণদেবো রুচিরাননশ্চ
শশাঙ্ক সৌম্যো জগদাদিনাথঃ স্ফূর্ত্তীর্রতিঃ প্রীতির্রতির্ত্বয়িসন্যঃ ॥
সার্বভৌমগতং মৌর্খ্যং নাজ্ঞাতং বিদ্যতে তব।
তব নাম কৃপাম্ভোধিঃ ক্ষমস্বাগঃ কৃপাং কুরু ॥
ত্বমেব সর্বরূপশ্চ ত্বমেব করুণোদয়ঃ।
ত্বমেব রসিকশ্রেষ্ঠস্তুমেব শরণং মম ॥
মাতা পিতা সখা ভ্রাতা জগতাং পরমো ভগবান্।
অধমে ময়ি ভো ব্রহ্মণ্ জ্ঞানালোকং প্রকাশয় ॥
তুম্ভে শ্রীব্রহ্ম সুখময়। তুম্ভে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেহ ॥
তুম্ভে ত রুচির আনন। তুম্ভে শ্রী শশাঙ্ক শোভন ॥
তুম্ভে এ জগতর নাথ। স্ফূর্তির্রতি প্রীতিরে যুক্ত ॥
মোহর মূর্খতা তুম্ভর। প্রভু নুহই অগোচর ॥
তুম্ভর নাম কৃপাসিন্ধু। ক্ষমা কর মো অপরাধু ॥
সকল রূপ তুম্ভ দেহ। তুম্ভে ত করুণা উদয় ॥
তুম্ভে শ্রেষ্ঠ রসিকরাজ! মোর শরণ পাত্র পূজ্য ॥
মাতা পিতা সুহৃদ ভ্রাত। পরম পুরুষ প্রখ্যাত ॥
মুঁ অটে অধম অজ্ঞান। দেখাঅ মোতে ব্রহ্মজ্ঞান ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতাপরুদ্র উদ্ধার—

সার্বভৌমঙ্কু ভক্তি কহি। সে প্রভু চৈতন্য গোসাই ॥
নিজ আশ্রমে চলি গলে। তহুঁ চরিত শুণ ভলে ॥
প্রতাপরুদ্র নৃপবর। মহিমা শুণ তাহাঙ্কর ॥
অত্যন্ত ভকতি ভাবরে। সেবিলা তাহাঙ্ক পয়রে ॥
দক্ষিণ পারুশরে নেই। উত্তম স্থানে স্থান দেই ॥
রখিলা তাহাঙ্কু আদরে। সম্মান করি নিরন্তরে ॥
সিদ্ধ বকুল সে বোলাই। চৈতন্য মণ্ডলী তা কহি ॥

সেহি স্থানরে শ্রীচৈতন্য । সেঘি জগন্নাথ চরণ ॥
চৌবিংশ বরষ পর্যন্তে । সে স্থানে রহিলে নিশ্চিন্তে ॥

এরপর নিত্যানন্দের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য 'হরে নাম কৃষ্ণ' 'কবচবাণী' ব্যাখ্যা করলেন—

শ্রীচৈতন্য উবাচ

হকারো নাসিকাং পাতু রেফারো বদনং তথা ॥
রাকারো নেত্রমধ্যং চ মকারঃ স্তনযুগ্মকম্ ॥
কৃকারো ভ্রূলতামধ্যং ষ্ণকার স্তানুকং তথা ॥ ইত্যাদি ।
রাধা দেবীঙ্ক অনুরাগে । অচলা ভক্তি কৃষ্ণসঙ্গে ॥
কহিলে যেতে ভক্তিরস । বৈষ্ণব মানে থিলে পাশ ॥
সত্য এ বাক্য নিত্যানন্দ । স্মরণ কর লভি মোদ ॥
থিলে যে দাস জগন্নাথ । সে বিদ্যা শুনিলে সমস্ত ॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগে । শ্রী চইতন্য অনুরাগে ॥
সমস্ত কর্মদূর কলে । সে বিদ্যা হৃদরে থইলে ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনায় জগন্নাথকে সর্বতীর্থসাররূপে বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসকে বলছেন, 'জগন্নাথাদন্যো মম হৃদি কদাচিৎ স্ফুরতু নো'—সে জগন্নাথ বিনু আন। মো হৃদে ন পাই যে স্থান।' সেই 'আন' বা অপরের মধ্যে আছেন 'নৃসিংহ অবা সীতাপতি। যদপতি গোকুলপতি ॥' অথচ এরপরই শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধার করে কৃষ্ণকেই পরম ঈশ্বর ও সর্বকারণের কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥ [ব্র. স. ৫অ/১]

এবং বলেছেন 'শ্রীকৃষ্ণ এহি জগন্নাথ' এরপর ব্রহ্মসংহিতার একগুচ্ছ শ্লোক (২,৩,৫,৭,৬, ২৫, ৫৪ নং'৫ অধ্যায়) উদ্ধার করে মহাপ্রভু আদিপুরুষ গোবিন্দের বন্দনা করলেন। ভাগবতে এই আদি পুরুষকে কৃষ্ণ বলা হয়েছে। এখানে মহাপ্রভু আদি পুরুষকে বলেছেন জগন্নাথ এবং রাধাকৃষ্ণের স্বরূপের সঙ্গে তিনি জগন্নাথের জ্যোতিরূপের অভিন্নতা বর্ণনা করেছেন—

মনুরূপৈশ্চ দশাভির্দিক পালৈঃ পরিতোবৃতম্ ।
শ্যামৈর্গৌরেশ্চ রক্তৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ ॥
শোভিতং শক্তিভিশ্রাভিবভুতাভিঃ সমন্ততঃ ।
এবং জ্যোতির্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥ [ব্র. স. ৫অ'৫-৬]
মন্ত্ররূপরে দশগোটি । দশদিগরে ছন্তি ঘোটি ॥
শ্যামহরিত রক্তধলা । বর্ণপ্রকাশ থহি মেল ॥
এ শক্তি মন্ত্ররে আবৃত । জ্যোতিরূপরে জগন্নাথ ॥
সদানন্দ পরমপর । এ হেতু বোলান্তি ঈশ্বর ॥

আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ।
মায়য়া রমমানস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ॥ [ব্র. স ৫ম অ ৬, ৭]

সেহি অটই আত্মারাম। নাহিঁ তা প্রকৃতি সংগম॥
মায়ারে রমণ করই। তহুঁ বিযুক্ত ন হুঅই॥
সর্বদা রসভাবমূর্তি। প্রেম ভক্তিরে লভ্য হোন্তি॥

এই রসেরই আনন্দময়ী বিগ্রহ রাধা।—

রসানন্দময়ী রাধা রসদা রসমূর্ত্তয়ে। পরমাত্মা রসে মগ্নঃ প্রসন্ন বদনাম্বুজঃ॥
প্রেমানন্দঃ স্মিতমুখঃ প্রেমমণ্ডন মণ্ডিতঃ। প্রেমারামো রসস্নিগ্ধঃ প্রেমালিঙ্গন হর্ষিতা॥

'রসানন্দ রাধিকা তোহিঁ। রসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ দেহী॥
রসমূর্ত্তিঙ্কু রসদান। করন্তি শ্রীরাধাটি জান॥
পরম আত্মা রসে মগ্ন। প্রসন্ন তাহাঙ্ক বদন।
প্রেমানন্দ যে মুখে স্মিত। প্রেম মণ্ডন রে মণ্ডিত॥
প্রেম আরাম রস স্নিগ্ধ। প্রেম আলিঙ্গনরে মুগ্ধ॥
পরস্পররে প্রেমসুখ। প্রসন্ন উভয় শ্রীমুখ॥
প্রেম আত্মারে মগ্ন দেহী। বেণি স্বরূপে ন দিশই॥
এ শুদ্ধ প্রেম ভক্তিস্থান। এহা যে ন জাণন্তি আন॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ জগন্নাথ। মুখমণ্ডলে সুশোভিত॥
এহি মূর্ত্তিরে অঙ্গ দুই। মগন ছন্তি সুখ পাই॥
একত্বভাবে সদা যেণু। সচ্চিদানন্দ নাম তেণু॥
প্রেমভক্তি কি যে ভাবই। সে প্রেমভাব এথি পাই॥
শুদ্ধপ্রেমলক্ষণাভক্তি। দিশন্তি জগন্নাথ মূর্ত্তি॥
রসমার্গরে যে ভজিলে। সে রাগ মিলে এ অঙ্গরে॥
মাধুর্যভাব ভক্তিস্থায়ী। অন্যোন্য ভাবরে মেলই॥
নবধা ভক্তির লক্ষণ। চৌষটি অঙ্গ এ প্রমাণ॥ ...
মাধুর্য্যভাবে এথেঁ ভজ। অন্যান্য ভাব দূরে তেজ॥'

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখের এই বচন শুনে বৈষ্ণবেরা সকলে সন্তুষ্ট হলেন। অতিবড় জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর এই শিক্ষা মনে রেখে তাঁরই আদেশে ষোল চৌপদী ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করলেন। পুরী মন্দিরের 'জগমোহন' মণ্ডপে এসব পাঠ করতেন তিনি।

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। এ ভাবে শ্রীমুখবচন॥
বৈষ্ণব মানে যেতে থিলে। শুণি সন্তোষ সর্বে হেলে॥
থিলে অতিবড় গোসাইঁ। প্রভু আজ্ঞা শুনিলে তহিঁ॥

সে কথা মনরে রখিলে। ষোল চৌপদী লেখিলে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম যেহি। গ্রন্থে সংগ্রহ কলে সেই ॥
সমস্ত তহিঁ বিস্তারিলে। যাহা চৈতন্য আজ্ঞা দেলে ॥
জগমোহন ঘরে সেহি। এতেক প্রসঙ্গ পড়ই ॥

এইভাবেই ষোড়শ শতাব্দীতে ওড়িষ্যায় মহাপ্রভুর শিক্ষায় জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ একীকরণের মধ্য দিয়ে সমন্বয়মূলক প্রেমভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে। জগন্নাথ দাস-বলরাম-অচ্যুত-অনন্ত-যশোবন্ত—এই 'পঞ্চসখা'র সাহিত্যরচনার মূলে যে শ্রীচৈতন্যের দিব্যপ্রেরণা, তাকে অস্বীকার করার ঝোঁক বর্তমান কালের কোন কোন ওড়িষী পণ্ডিতের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও, আমরা লক্ষ্য করব পঞ্চসখাদের নিজেদের রচনায় সেই প্রেরণার স্বীকৃতি বেশ মুক্তকণ্ঠেই আছে। মহাপ্রভুর এই সমন্বয়মূলক প্রেমভক্তি-বাদেরই এক অপূর্ব ফসল অচ্যুতানন্দের 'নিত্যরাহাস' বা 'নিত্যরাস'। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গে আসা যাবে।

'জগন্নাথ চরিতামৃত' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বৈষ্ণব মণ্ডলী মধ্যে শ্রীচৈতন্যের নামতত্ত্বব্যাখ্যান, গুরু পরম্পরা, 'হরে রাম কৃষ্ণ' এবং 'হরে কৃষ্ণ রাম' মন্ত্রের তুলনা, প্রতাপরুদ্র উদ্ধার এবং প্রকটলীলা সংবরণ বর্ণিত হয়েছে। বোঝা যায় এককালে 'হরে রাম' ও 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রে রাম ও কৃষ্ণের আগুপিছু নিয়ে জোর লড়াই বেঁধেছিল।

অধ্যায়ের সূচনায় গ্রন্থকার জানিয়েছেন, তাঁর গুরু শ্রীচৈতন্যের মুখ থেকে শুনে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই বিবরণী অনুসারেই দিবাকর অমৃতোপম চৈতন্যচরিত প্রণয়ন করলেন।—

চৈতন্যচরিত অমৃত। শ্রীচৈতন্যঙ্ক মুখু উক্ত ॥
গুরুঙ্কু উক্তিরু উদ্ধার। করই বিপ্র দিবাকর ॥

একদিন 'দ্বাদশ মহন্ত,' 'ষট্ গোসাইঁ' এবং অন্যান্য ভক্ত জগন্নাথ মন্দিরে চলেছেন—

দিনেক দেব শ্রীচৈতন্য। বিজয়ে শ্রী জগমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ। গৌরীদাস অদ্বৈত বোধ ॥
সে যে অভিরাম ঠাকুর। দাস গোস্বামী সঙ্গতর ॥
ছন্তি জগদীশ পণ্ডিত। শ্রীরূপ শ্রীবৎস সঙ্গত ॥
সিন্দুরানন্দ যে ঠাকুর। ভাগবতাচার্য্য সঙ্গর ॥
আবর আচার্য্য গোসাইঁ। দ্বাদশ মহন্তটি সেহি ॥

এবং—শ্রী সনাতন রূপ দুই। রঘুনাথ দাস গোসাইঁ ॥
জীবক স্বামী সেহিঠারে। গোপাল দাস সঙ্গতরে ॥
শ্রীরঘুনাথ ভট্টে স্থিতি। এ ষট্ গোসাইঁ অছন্তি ॥

শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পার্ষদের মধ্যে দিবাকরদাস নিম্নোক্তদের নাম উল্লেখ করেছেন— জগন্নাথ দাস, সার্বভৌম, ওড়িআ কাশীমিশ্র, জগদানন্দ চক্রবর্তী, মুকুন্দ দত্ত, দামোদর চক্রবর্তী, দুই (ছোট ও বড়) হরিদাস, শ্রীনিবাস, গদাধর গোপীনাথ আচার্য্য মুরারি গুপ্ত এবং অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।

দিবাকর দাস লিখেছেন, শ্রীচৈতন্য সারাদিনে চারবার জগন্নাথ দর্শনে যেতেন এবং বারো বার দণ্ডবৎ ইত্যাদি করতেন। একবার গুণ্ডিচাযাত্রা কালে গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবেরা এলে মহাপ্রভু তাঁদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালন (গুণ্ডিচা গহন ঘটিলে) ইত্যাদি করলেন। তারপর গুণ্ডিচা-বাড়ী থেকে নীলকন্দরে জগন্নাথ ফিরে এলে আষাঢ় শুক্লা একাদশীতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবদের সামনে শ্রীচৈতন্য হরে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে জগন্নাথের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন এবং শাস্ত্রশ্লোক উদ্ধার করে হরে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদির সঙ্গে জগন্নাথের অভিন্নতা প্রমাণ করলেন—দিবাকর দাস লিখেছেন—

শ্রীচৈতন্য উবাচ

মন্ত্রং ভগবতঃ স্থানং মন্ত্রস্তস্য স্বরূপকম্।
নাম্নৈব তস্য শ্রীকৃষ্ণরাধা চন্দ্রাবলীতি চ॥
এবং প্রেমরসানন্দং ত্রিতত্ত্বেনৈব ভাবয়েৎ!
চন্দ্রাবলী ততো রাধা ততঃ কৃষ্ণো যথাক্রমম্॥
হরিঃ সুধাপূর্ণপাত্রং রামনাম সুধাত্মকম্।
কৃষ্ণ আস্বাদনরতো নামতত্ত্বমিদং স্মৃতম্॥
হরিশ্চন্দ্রাবলী প্রোক্তা রামোরাধাপরা মতা।
পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রো জগন্নাথ মুখে স্ফুটা॥··
তং বন্দে পরমাত্মানং পরং ব্রহ্ম স্বরূপকম্।
নিষ্পৃহং নিত্য নীলাদ্রি নায়কং পরমেশ্বরম্॥
বলভদ্রঃ সুভদ্রা শ্রীজগন্নাথ ইতি স্মৃতম্।
সচ্চিদানন্দরূপং বৈ ত্রিতত্ত্বসাধনং পরম্॥··
অনাদিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদ্যা প্রকৃতি রাধিকা।
সৈব রামো বিজানীয়াত্তয়োঃ শেষে হরিঃ স্মৃতঃ॥
স হরিঃ প্রেমরূপশ্চ সৈব চন্দ্রাবলী স্মৃতা।
স এব বলভদ্রস্তু স দেবঃ শেষ মূর্দ্ধকঃ॥

হরি, রাম ও কৃষ্ণের নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দিবাকরের কাব্যে শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

স হরি র্যো হরেৎ পাপং যস্তু তাপত্রয়ং হরেৎ।

রাধাকৃষ্ণপ্রেমণি চিত্তং যো হরেৎ স হরিঃ স্বয়ম্ ॥

'সে হরি যে পাপ হরন্তি। পুণি ত্রিতাপ বিনাশন্তি ॥ রাধাকৃষ্ণঙ্ক প্রেমে চিত্ত। যে হরে সে হরি নিশ্চিত।' অর্থাৎ যিনি আমাদের পাপ হরণ করেন, ত্রিতাপ বিনাশ করেন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে আমাদের চিত্ত হরণ করে নিয়ে যান, তিনিই হরি। রামনামের তত্ত্বব্যাখ্যা করে তিনি বললেন—

আত্মানং রময়ত্যেষ রাম ইত্যভিধীয়তে, অর্থাৎ পরমতত্ত্ব লীলার আনন্দে আত্মারাম হলে, তাকেই বলে রাম।

বৈদগ্ধ্য সারসর্বস্ব মূর্ত্তিলীলাদি-দেবতা।
রাধায়া রসকেলিজ্ঞো রাম ইত্যভিধীয়তে ॥
রমন্তে যোগিনোহনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

ওড়িআ অনুবাদে দিবাকর দাস লিখেছেন—

বিদগ্ধা নায়িকা সর্বস্ব। যাহাঙ্ক মূরতি বিশেষ ॥
লীলারে বিগ্রহ যাহার। ব্রহ্মা আদিঙ্ক অগোচর ॥
রাধিকা রস কেলি রত। সে হি যে রাম নামে খ্যাত ॥
রমন্তি তহিঁ যোগীগণ। তেনু যে রাম ব্রহ্ম জাণ ॥
মহাযোগী যে হৃদগতে। রামভাবন্তি ধ্যানপথে ॥
রাম বোলিন যাকু কহি। অচিন্ত্যাব্যক্ত ব্রহ্ম সেহি ॥
রামটি ব্রহ্ম নিরাকার। ভক্তি মুকতি মূলাধর ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণকালে রামানুজীয় বিপ্র 'রমন্তে যোগিনো' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। 'নিত্যানন্দে' শব্দের স্থলে বিপ্র 'সত্যানন্দে' ব্যবহার করেছেন। যাঁরা বলেন কৃষ্ণদাসের 'চরিতামৃত'-কে অনুসরণ করেই দিবাকর জগন্নাথ চরিতামৃত রচনা করেছিলেন, তাঁদের এই ধরনের পাঠান্তরের স্থলগুলি খতিয়ে দেখা উচিত।

সে যাই হোক, হরি বা রাম নামের এই তত্ত্বব্যাখ্যা ওড়িষার চৈতন্যপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কাশীমিশ্রের বাড়ীতে গম্ভীরায় সেবার ভার পান মহাপ্রভুর পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিত। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য মকরধ্বজ পণ্ডিত বা গোপাল গুরু। এই গোপালগুরু সম্পর্কে ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' থেকে জানা যায়—

মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর। তাঁহার সেবক শ্রী গোপাল গুরুবর ॥
শ্রীহরি নাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয়। আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয় ॥
তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা। অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা ॥

এই তথ্যটি জানিয়ে ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—ইহার পর গোপালগুরুকৃত হরিনামের ব্যাখ্যাযুক্ত এই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহম্‌ ।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী ।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥
আনন্দৈক মুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥
বৈদগ্ধাসারসর্বস্ব মূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাম্‌ ।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ হরিকে 'হরি' বলা হয় এই জন্য যে তিনি চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহ ভগবানের তত্ত্বকে বিশেষরূপে জানাইয়া অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্যসমূহকে হরণ করেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদ স্বরূপিনী (হ্লাদিনীশক্তি)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন। এই জন্য 'হরা' শব্দে শ্রীরাধাই পরিকীর্তিতা হন। কেবলানন্দ সুখের স্বামী শ্যামবর্ণ কমল-লোচন গোকুলের আনন্দ স্বরূপ নন্দনন্দনই 'কৃষ্ণ' শব্দে কথিত হন। শ্রী রাধিকার মূর্তি বৈদগ্ধের (রসিকতার) সার সর্বস্ব-রূপ। তিনি লীলার অধিদেবতা, (অধীশ্বরী)। তিনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন, তিনিই 'রাম' শব্দে অভিহিত হন।"

[গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ : ১৯৬১ পৃ ৪২৬]

দিবাকর দাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্য এরপর কৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন—

'নো কৃষ্ণো লীলয়া সংখ্যো রসভাবাদি রূপধৃক্‌ ।
চতুঃষষ্টি কলাপূর্ণঃ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধিকাপতি ॥

এই শ্লোকটির সঙ্গে ব্রহ্মসংহিতা (৫ম অধ্যায়)-র ৩৭ সংখ্যক শ্লোকের মিল লক্ষণীয়—

আনন্দচিন্ময় রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

'কৃষ্ণ' নামটি বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য আরো বলেছেন—

আনন্দৈকপরঃ শ্রীমান্‌ শ্যামঃ কমললোচনঃ । গোকুলানন্দদো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে ॥
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণস্তু নির্বৃতিবাচকঃ । তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

দ্বিতীয় শ্লোকটির উৎস মহাভারত উদ্যোগপর্ব (৭১ অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক)। এটি চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য/৯/৩০) ব্যবহৃত হয়েছে, দক্ষিণভারতীয় বিপ্রের মুখে। শব্দ-কল্পদ্রুম (২১২ পৃ.) অনুসারে এই ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামীর অনুমোদিত। চৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃত প্রবাহভাষ্যে বলা হয়েছে—"কৃষ্ ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তাবাচক, ণ শব্দ নিবৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক ; কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে – 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।" [গৌড়ীয় মঠ সং. পৃ. ৪৭০]।

এর আগের শ্লোকটির উৎস ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। দুটি শ্লোকের অনুবাদ করে দিবাকর দাস লিখেছেন—

'শ্রীকৃষ্ণ নামর ব্যাখ্যান্। কহিলে দেব শ্রীচৈতন্য ॥
সকল জীবর পরম-- আনন্দ সুখ কৃষ্ণনাম ॥
আনন্দধারু সে আনন্দ। ব্রহ্মরূপী সচ্চিদানন্দ ॥
রাধাঙ্ক অঙ্গু লক্ষ্মীজাত। তেনু সে বোলান্তি শ্রীযুক্ত ॥
সে রাধা মিলিত হোইণ। যুগলে ছন্তি সঙ্গ তেণ ॥
ইন্দ্রনীলমণি পরায়ে। শ্যামসুন্দর দিব্যকায়ে।
গো শব্দ অটই মহীর। কুল শব্দ দেবঙ্কর ॥
এ বেণি শবদে আনন্দ। এনু নাম গোকুলানন্দ ॥
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণার। এমন্ত অছই তাহিঁরে ॥
রাধা যে বেণি পরকার। কে নিত্য কে বা অবতার ॥
যেতে অছান্তি ভক্তবৃন্দ। তাহাঙ্ক নেত্রকু আনন্দ ॥
ভক্ত আনন্দু জাত হোন্তি। নন্দনন্দন ত বোলান্তি ॥
বচনে কহি যেতে বাণী। সে হরি নামরে বখানি ॥
যেতে রূপ চক্ষু দেখই। জাণিম রাম নাম সেহি ॥
কর্ণে শুণ যেতে বচন। সে কৃষ্ণ নামটি প্রচ্ছন্ন ॥
কৃষ্ণ শব্দ ভূবাচক। ণ কার যে সুখবাচক ॥
সেহি দুহিঙ্ক ঐক্য জাণ। পরম ব্রহ্ম সনাতন ॥
এহি অটই কৃষ্ণতত্ত্ব। কে জাণে তাহার মহত্ত্ব ॥

সৃষ্টির আনন্দবাদী ব্যাখ্যা নতুন নয়। উপনিষদের যুগ থেকে তা চলে এসেছে। কিন্তু মায়াবাদ যখন মানুষকে জীবন ও জগতের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে, তখন মানুষের দৃষ্টিকে ইহমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে ওই আনন্দবাদের প্রয়োগ নতুন। এই ব্যাপারটিই করলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি বললেন, সৃষ্টির মূল সুর বিষাদের নয়, আনন্দের। ব্রহ্মরূপী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, তাঁর আনন্দ থেকে হয় সৃষ্টি ; এবং সেই সৃষ্ট

জগৎ বা গোকুলের আনন্দ তিনি, তাই তিনি গোকুলানন্দ। তাঁর আনন্দ মূর্তিমতী রাধা—নিত্যবস্তু হলেও, অবিকারী পরিণামে সৃষ্ট জগৎ, ভক্তবৃন্দ তাঁর লোচনসুখ। অচিন্ত্যভেদাভেদের সমন্বয়ী দৃষ্টিতেই বোঝা যায় জীবনের যত কথা সবই হরিনামের ব্যাখ্যান, জীবনের যত রূপ-মাধুরী সবই 'আত্মনা রময়া রেমে' রামের রমণাভিলাষ জাত আনন্দমূর্তি, আর যত ধ্বনি এসে কানে বাজে, সবই কৃষ্ণনাম। এইভাবেই পৃথিবীতে আনন্দের কৃষি করে চলেছেন পরম ব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ।

পরবর্তী প্রসঙ্গে 'হরে রাম কৃষ্ণ' বনাম 'হরে কৃষ্ণ রাম'-- অর্থাৎ পরবর্তী কালের গৌড়ীয় ও উৎকলীয় বৈষ্ণবের ভজন পদ্ধতির বিভিন্নতা উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ব-প্রসঙ্গে যে সমন্বয়ী দৃষ্টির অগাধ উন্মুক্ত আনন্দক্ষেত্র রচিত হয়েছিল, এখানে তা সাম্প্রদায়িক সীমানা প্রাচীরের সংকীর্ণতায় খণ্ডিত হয়ে গেল।

'ওড়িশী বৈষ্ণবধর্ম' নিবন্ধে অধ্যাপক শ্রীকাহ্নুচরণ মিশ্র লিখেছেন—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবমানঙ্ক মতরে ভজনমন্ত্র হেউছি, 'হরে কৃষ্ণরাম' ; কিন্তু উৎকলীয় মানঙ্ক মতরে হেউছি 'হরে রাম কৃষ্ণ'। উৎকলীয় মানঙ্কর 'হরে রাম কৃষ্ণ' মন্ত্ররে কৃষ্ণঙ্কু রামঙ্ক পরে স্থান দিআ যাইছি ও 'কৃষ্ণ' বিষ্ণু বা জগন্নাথ রূপরে পরিকল্পিত। এহি মন্ত্র শাস্ত্রানুমোদিত। কলি সন্তরণ উপনিষদর মহামন্ত্ররে এহি ক্রম স্বীকৃত'।

[ওড়িশী বৈষ্ণবধর্ম, পৃঃ ৪৩]

শ্রী মিশ্র অন্যত্র শ্রীচৈতন্যকে বলেছেন 'গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মর গুরু' (পৃঃ ২৯) উৎকলকে বলেছেন 'জগন্নাথঙ্ক দেশ' (পৃঃ ২৪) এবং পঞ্চসখা বলরাম-জগন্নাথ-যশোবন্ত-অচ্যুত-অনন্ত চৈতন্য পন্থী ছিলেন না—একথা প্রমাণ করতে আগ্রহী তিনি।

আমরা জানি চৈতন্যের জীবদ্দশায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও উৎকলীয় বৈষ্ণব বলে কোন আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় ছিল না। আগেই দেখেছি চৈতন্যপন্থী সনাতন তথাকথিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়েও জগন্নাথ বন্দনা করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে জগন্নাথ জগতের নাথ, কেবল উৎকল নয়, সমগ্র বিশ্বভুবন তাঁর দেশ। এবং পঞ্চসখা নিজেরাই স্বীকার করেছেন তাঁরা চৈতন্যপন্থী—চৈতন্য পার্ষদ কর্তৃক দীক্ষিত।

আসলে চৈতন্য পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। চৈতন্য পন্থা ছিল সমন্বয়ের পন্থা—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গুরু' এ পরিচয় তাঁর নিতান্ত আংশিক পরিচয়। তাঁর সমন্বয় দৃষ্টি ছিল বলেই তাঁর প্রেমভক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়েছিল, কেবল উৎকলের নয়, সমগ্র ভারতের মানুষ। পঞ্চসখা প্রসঙ্গে তাঁর সমন্বয় পন্থার পরিচয় আমরা পরে পাব। এখানে কেবল এইটুকু বক্তব্য যে, দিবাকর দাস 'হরে রাম' বা নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে কথা শ্রীচৈতন্যকে দিয়ে বলিয়েছেন, তা প্রামাণিক নয়, তা পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রসূত। জগন্নাথ দাসের মহিমা বৃদ্ধির

উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দের মহিমা খর্ব করা হয়েছে এবং চৈতন্যকে দিয়ে বলানো হয়েছে, 'নিত্যানন্দের সঙ্গে যে দ্বাদশ গোপাল তারা বৈকুণ্ঠ ভুবন থেকে জাত, তাই তারা জগন্নাথের মহিমা জানে না। তুমি (জগন্নাথ দাস) আমার সঙ্গে নিত্যলোকে জাত।'

তিনি আরও বললেন-

'এসব বৈকুণ্ঠ এ জাত। ভজিবে বৃন্দাবন পথ ॥
পুরুষোত্তমে স্নেহ নাহিঁ। এ দুর্লভ লভিবে কাহিঁ ॥

এ কথা শ্রীচৈতন্য বলতে পারেন না, কেননা বৃন্দাবন পথের পথিক চৈতন্যপার্ষদ সনাতন গোস্বামী পুরুষোত্তম জগন্নাথের বন্দনা করেছেন, পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম নিবাসী চৈতন্য পার্ষদ রামানন্দ রায় তাঁর 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে কৃষ্ণকথা বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন বনাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, কৃষ্ণ বনাম জগন্নাথ– এ দ্বন্দ্বটি পরবর্তীকালের এবং তত্ত্বদৃষ্টির অভাব প্রসূত।

সপ্তম অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে চৈতন্যজীবনের কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।—
রাজা প্রতাপরুদ্র (সিদ্ধ অঙ্গে সুবেশ্বর) অনেক বৈষ্ণব সেবা করেও ভক্তিলাভ করতে পারলেন না। শ্রীচৈতন্যকে প্রথম যেদিন দেখলেন, সেদিন থেকেই তিনি তাঁর সেবক হলেন। রাজা চৈতন্যের কৃপা ভিক্ষা করলেন। চৈতন্য বললেন বিষয়রসে ডুবে থাকলে ভক্তি মেলে না। রাজা দিনের পর দিন কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। প্রভু দৃক্‌পাত করলেন না। রাজা তখন মনে মনে ভাবলেন, ভয়ে ভয়ে মেগেছি, তাই তাঁর কৃপা পাই নি। একদিন রাজা ছদ্মরূপ ধরে জগমোহন মণ্ডপে কুৎসিত বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীচৈতন্য দর্শন করতে এসে জগন্নাথকে দণ্ডবৎ করে ভাবাবেশে 'হরে রাম কৃষ্ণ' কীর্তন করতে লাগলেন। রাজা সেই নাম উচ্চারণ করলেন। মহাপ্রভু বিরস হয়ে বললেন বিষয়ী নাম স্পর্শ করল—এতে ভক্তি ক্ষীণ হয়। এ কথা শুনে রাজা প্রভুর চরণে পড়লেন, বললেন, "দেব আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত নামামৃত পান করেছি। ত্রিনামের তত্ত্ব আমাকে দান করুন।' মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়ে জগন্নাথ দাসকে বললেন, 'হে অতিবড় জগন্নাথ। রাজাঙ্কু কহ প্রেমতত্ত্ব।'

এরপর চৈতন্য নিজেন মনে মনে চিন্তা করলেন। 'কলিকাল দুরন্ত। এখানে আর থাকা উচিত নয়, আমি নিজধামে চলে যাব।' "এমন্ত ভাবি শ্রীচৈতন্য। শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।"

গোপন হোইলে সদেহে। দেখি কাহার দৃষ্টি নোহে ॥
পূর্বে যাহিঁরু আসিথিলে। লেউটি সে অঙ্গ মিশিলে ॥

তিনি এসেছিলেন ভক্তিসাধনা করতে, ভক্তদের ভক্তিপথ দেখাতে। সংসারকে ভক্তির আধার করে তিনি নিজ ধামে চলে গেলেন।

আগত ভক্তি সাধিবাকু। ভক্তি দেখাইলে ভক্তঙ্কু ॥
সংসারে ভক্তিগুণ থোই। নিজ ধামকু বিজে হোই ॥

যে কালে নামের প্রচার ছিল না, সকলে ছিল অহমিকাগ্রস্ত, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকেরা নির্দোষীজনের বিনাশ ও অগম্যাগমন করে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, সেকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জাত হলেন এবং জগতে ভক্তি স্থাপন করলেন। সেই কৃষ্ণ চৈতন্যের চরণে শরণ নিলেন বিপ্র দিবাকর দাস।

সে কালে নাম ন জানন্তি। মুহিঁ বড় বোলি বোলন্তি ॥
নির্দোষী জনঙ্কু বিনাশ। রাজস তামসরে বশ ॥
অগমে করন্তি গমন। ভ্রষ্ট করন্তি নিজধর্ম ॥
কৃষ্ণচৈতন্যরূপে জাত। ভক্তি স্থাপি গলে জগত ॥
সে কৃষ্ণচৈতন্য চরণ। বিপ্র দিবাকর শরণ ॥

জগন্নাথ চরিতামৃতের সপ্তম অধ্যায়ের এখানে পরিসমাপ্তি।

জগন্নাথচরিতামৃতের ২৪ অধ্যায়ে আছে

'অষ্টাদশ বরষ ঠারে। শ্রীচইতন্য ভেট হেলে ॥
ষড় বরষ নিরন্তর। সেবিলে চৈতন্যপয়র ॥
এ অন্তে ছতিশ বরষ। প্রেম সাধিলে অহর্নিশ ॥
ষাঠি এ বর্ষ সময়রে। প্রেম স্থাপি স্থানে গমিলে।'

জগন্নাথ দাস 'ষড়বরষ নিরন্তর সেবিলে চৈতন্য পয়র'—ছ'বছর নিরন্তর চৈতন্যের পদসেবা করেছেন। এ নিশ্চয় চৈতন্য তিরোভাবের আগেকার ছয় বছরের কথা। কেননা, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরের আগে চৈতন্যদেব প্রায় আঠারো বছর পুরীতে ছিলেন; জগন্নাথ দাস চৈতন্যমণ্ডলীতে আরো আগে যুক্ত হলে আরো অনেক বছর চৈতন্য সেবা করার সুযোগ পেতেন। সুতরাং ধরে নিতে হয়, ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যশরণ নিয়ে জগন্নাথ দাস চৈতন্যদেবের প্রকটকালের শেষ ছ'বছর তাঁর সেবা করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ দাসের বয়স কত ছিল? দিবাকর দাস লিখেছেন—'অষ্টাদশ বরষ ধাবে। শ্রীচইতন্য ভেট হেলে'। ১৫২৭-এ আঠারো বছর বয়স হলে তাঁর জন্ম সাল হয় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ। দিবাকর দাস লিখেছেন—'ষাঠি এ বর্ষ সময়রে প্রেম স্থাপি স্থানে গমিলে'। সুতরাং জগন্নাথ দাসের তিরোভাব ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

দিবাকর দাস লিখেছেন। তিনি জগন্নাথ দাসকে জীবিত দেখেছেন। তাঁকে প্রণাম করেছেন—

'শুনি আনন্দ শিষ্যগণ। নমিলা স্বামীঙ্ক পয়র ॥

সেহি সঙ্গতে দিবাকর। নমিলে স্বামীংক পয়র ॥
শ্রী অতিবড় যে গোসাইঁ। রাধা স্বরূপে নিত্যস্থায়ী ॥'

[জগন্নাথ চরিতামৃত, ১৩ অধ্যায়]

এই সাক্ষাৎ হয়েছে ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে। ১৫৬৯-এ জগন্নাথ দাসের তিরোভাবের পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই দিবাকর দাসের গ্রন্থ রচনা স্বাভাবিক। এ হিসাবে এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়।

জগন্নাথ দাস ও শ্রীচৈতন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এ গ্রন্থের প্রথম সাত অধ্যায়ের উপজীব্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন, নাহলে ওড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে ও ওড়িআ সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করা যাবে না।

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন, একথা সত্য। ইঁহারা পূর্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন; শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরও ব্রজের প্রেমধর্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। পঞ্চসখা প্রভৃতির মতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কোনই সাদৃশ্য নাই। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন"। [চৈ. চ. উ ৪৯৬ পৃ.]

জগন্নাথ দাস পঞ্চসখার অন্যতম (অন্য চারজন বলরাম, যশোবন্ত, অচ্যুতানন্দ ও অনন্ত)। ঈশ্বরদাস তাঁর চৈতন্যভাগবতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৌদ্ধাবতারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র লিখেছেন সত্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যকে তিনি বিষ্ণু জগন্নাথ বা হরির অবতারও বলেছেন—

অনাদি দেব বিষ্ণুনাথ। যাহার নাহিঁ আদি অন্ত।
জগত নিস্তারিবা পাইঁ। মণ্ডে মানব দেহ বহি।
নিস্তার জগত নিমন্তে। অনাদি নাথ শূন্য পথে।
ভক্তবৎসল জগন্নাথ। অব্যয় অনাদি অচ্যুত।
মর্ত্যে মনুষ্যদেহ ধরি। অনাদি নাথ দেব হরি ।
নদিআ নগ্রে অবতার। পশুজন্মরু কলে পার ॥

[চৈতন্যভাগবত, প্রথম অধ্যায়]

পঞ্চসখার অন্যতম সখা অচ্যুতানন্দ লিখেছেন, কলিযুগে মানুষ স্বল্পায়ু, তাই যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ তার পক্ষে অতি দুরূহ। একথা উপলব্ধি করে নিত্যকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং খোল করতাল সমেত নাম প্রচার করলেন।—

'নিত্যকৃষ্ণে সেহি কলিরে যাই, তেণু চইতন্য জনম হোই।...

নদীআ নগরে জন্ম তাঙ্কর, চইতন্য বোলি সে অবতার।'

[তত্ত্ববোধিনী, সপ্তম অধ্যায়]

জগন্নাথ দাসের শাখার অন্তর্গত দিবাকর দাস চৈতন্যকে 'কিশোরী কিশোর' বা রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার রূপে প্রণাম করেছেন—

'কিশোরী প্রেমরক্তায় ভাব সলগ্ন-মূর্তয়ে।
গুপ্তায় রসরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥

কিশোরী কিশোর যুগল। প্রেমালিঙ্গনে হোই ঠুল ॥
গুপ্তভাব রসমূর্ত্তি। রূপে প্রকাশ হোইছন্তি ॥
শ্রীচইতন্য নাম যার। করুছি তাঙ্কু নমস্কার ॥'

[জগন্নাথ চরিতামৃত, ১ম অধ্যায়]

সুতরাং পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যকে বুদ্ধদেবের অবতার রূপে দেখেছেন একথা ঠিক নয়।

পরবর্তীকালে 'অতিবড়ী' শাখা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখার মধ্যে ব্যবধান রচিত হলেও আদিতে এই পার্থক্য বা দূরত্ব ছিল না—তার অনেক প্রমাণ 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' পাওয়া যায়। দিবাকর দাস তাঁর যে গুরু পরম্পরা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় তিনি এবং জগন্নাথ দাস উভয়েই মাধব গৌড়ীয় মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত:—

আদৌ সদ্‌গুরুদেব এব সুমহান্ খ্যাতঃ কিশোরাহ্বয় -
স্তস্য শ্রীপরমঃ কৃপালুভবদ্ যঃ কেলি কৃষ্ণাখ্যাকঃ।
তস্য শ্রী বনমালি নামক ইতিশ্চাসীদ্ জগন্নাথক—
স্তস্য শ্রী বলরাম এব হৃদয়ানন্দস্তদীয়ো গুরুঃ।
শ্রী গৌরসুন্দ্‌গুরুঃ খ্যাতস্তস্য চৈতন্য এব চ।
শ্রীচৈতন্যস্যৈব দেবস্য গুরুরীশ্বর পঞ্চকঃ।
মাধবেন্দ্রপুরী তস্য ব্যাসতীর্থোহি তস্য চ।
ব্রহ্মাণ্যাখ্যো মুনিস্তস্য তস্য শ্রী পুরুষোত্তমঃ।
জয় ধর্ম মুনিস্তস্য তস্য রাজেন্দ্র এব চ।
তস্য বিদ্যানিধিঃ শ্রীমান্ তস্যাপি শ্রী মহানিধিঃ।
জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য গুরু জয়তীর্থোহি তস্য চ।
অক্ষোভতীর্থস্তস্যৈব তস্য মাধব এব চ।
আচার্য্যো নৃহরিস্তস্য পদ্মনাভস্তু তস্য চ।
মাধবাচার্য্যস্তুতস্তস্য ব্যাসদেবস্তু তস্যবৈ।
তস্যৈব নারদর্ষিঃ স্যাত্তস্য ব্রহ্মা পিতামহঃ।
তস্য নারায়ণঃ সাক্ষাৎ সম্প্রদায় প্রবর্তকঃ॥ [প্রথম অধ্যায়]

জগন্নাথ-চরিতামৃতে যে ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিসাধনার কথা বলা হয়েছে, তা শ্রীচৈতন্য অনুমোদিত নিঃসন্দেহে, কেননা কৃষ্ণের নির্বিকল্প নিরঞ্জন শূন্যমূর্তির কথা সনাতন গোস্বামীর মত চৈতন্যপার্ষদ বলেছেন, তা আমরা আগে দেখেছি।

এ গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সকল আকরগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তা শ্রীচৈতন্য অনুমোদিত, প্রামাণিক চৈতন্যচরিতে মহাপ্রভু ওইসব গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন ; আবার অনেকক্ষেত্রে রূপগোস্বামীর মত চৈতন্যপার্ষদের গ্রন্থাদির সাহায্য নিয়ে বৈষ্ণব রসের আলোচনাও করা হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে ওড়িয়া বৈষ্ণবদের ভেদ যাঁরা বড় করে দেখেন, তাঁরা ভুলে যান সাধনগত বা তত্ত্বগত কিছু পার্থক্য বৃন্দাবনের গোস্বামী ও শ্রীখণ্ডের নবদ্বীপের গৌর পারম্যবাদী ঠাকুরদের মধ্যেও আছে এবং সেজন্য কেউ ঠাকুরদের চৈতন্যমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করেনি। অতি বড়ী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগুরু তোতারাম বাবাজী নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। যিনি যাই করুন, পঞ্চসখাকে চৈতন্যঅনুগত বৈষ্ণবরূপে না দেখে কোন উপায় নেই। পরবর্তী কালের বিভেদপন্থীদের কাজকর্মের দায় বর্তেছে মহাপ্রভুর উপর। উড়িষ্যার বিদগ্ধ মহলের একাংশে তোতারাম বাবাজীর নির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে- চৈতন্য 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেব গুরু'।

। কাহ্নুচরণ মিশ্র, ওড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম, পৃ. ২১ ।।

'দশচক্রে ভগবান ভূত'—এ প্রবাদের সার্থকতা এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চৈতন্যচরিতের নিষ্ঠাবান ও সতর্ক পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, মহাপ্রভু কখনই কোন সম্প্রদায়-গুরুমাত্র ছিলেন না, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন শাখার বৈষ্ণবদের সঙ্গে ছিল তাঁর মর্মগত যোগ, প্রচলিত বিভিন্ন বৈষ্ণব শাখার মধ্যে তিনি সমন্বয় করে চলেছেন, আন্তরিক অকপট ভক্তিই ছিল তাঁর সেই মিলন সূত্র। তাঁর এই সমন্বয় দৃষ্টিই প্রতিফলিত জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ অথবা যোগপন্থা ও রাগপন্থার সমন্বয়ে। এই সমন্বয়ের পরিচয় জগন্নাথ চরিতামৃতে আছে বিপুল পরিমাণে।

'চৈতন্যঃ কৃষ্ণনাম স্বজন পরিবৃতঃ সর্বমার্গানুসারম্
গায়ন্ বে তত্ত্বসারং পরমমনুমথ শ্রীজগন্নাথ রূপম্ ॥'

[চতুর্থ অধ্যায় প্রথম শ্লোক]

আকর গ্রন্থ :

দিবাকর দাস তাঁর গুরু লিখিত 'কথাদিশায়' যে সব বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির সন্ধান পেয়েছেন সেগুলি এখানে উল্লেখস্থল সহ দেখান হল।—

ঋগ্বেদ (অধ্যায় ১৮ , ব্রহ্ম সংহিতা (অধ্যায় ৬, ১৮), সাত্বৎসংহিতা (অধ্যায় ১৫) গীতা (অধ্যায় ১৩), শ্রীমদ্‌ভাগবত (অধ্যায় ২, ১০, ১৫, ১৬), শ্রীধর স্বামীর 'ভাবার্থ দীপিকা' (অধ্যায় ২, ৭), বৃহন্নারদপুরাণ (অধ্যায় ১৫), বৃহৎবামন-

পুরাণ (অঃ ১৪), পদ্মপুরাণ (অঃ ২৩), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (অঃ ১২), পুরুষ-বোধিনী (অঃ ২), শ্রীস্বরোদিত (অঃ ২), রুদ্রার্ণব (অঃ ২), তন্ত্রসার (অঃ ২০ , হরিবংশ (অঃ ১৮, ২৩), গীতগোবিন্দ (অ° ২৫), বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ (অঃ ৮), শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (অঃ ১৬) এবং উজ্জ্বলনীলমণি (অঃ ৮) ।

এই সব শাস্ত্রগ্রন্থের উপর নির্ভর করে যে ভক্তিতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতির পরিচয় এ গ্রন্থে (জগন্নাথ চরিতামৃতে) দেওয়া হয়েছে, তার স্বরূপ উপলব্ধির সুবিধার্থে এ গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ।—

উপাস্যতত্ত্ব

শ্রী নিত্যানন্দ উবাচ

এতজ্জগন্নাথমূর্ত্তৌ কথং ভক্তিঃ সমাশ্রিতা ।
তন্মার্গং কথয় স্বামিন্ শ্রোতুমিচ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥

এ যেউঁ জগন্নাথ মূর্ত্তি । কিভাবে হুএ এথি ভক্তি ॥
প্রসন্ন হোই কহ প্রভু । শুণন্তু বইষ্ণব সবু ॥
তা শুনি প্রভু চইতন্য । হোইলে আনন্দিত মন ।
সে প্রেম রসাত্মক বাণী । গদ্‌গদ কণ্ঠরে বখানি ॥

শ্রীচৈতন্য উবাচ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব কারণ কারণম্ ॥ [ব্রহ্মসংহিতা ৫/১]

শ্রীকৃষ্ণ এহি জগন্নাথ । ঈশ্বর পরম পদার্থ ॥
সত চিত আনন্দভাব । অনাদি সর্ব আদি দেব ॥
সর্বকারণর কারণ । ক্রীড়া যাহার ভুবন ॥
ভুক্তি মুক্তি ভক্তিদায়ক । কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রবর্তক ॥

চিন্তামণি প্রকরসদ্ম—সুকল্পবৃক্ষ— লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভি পালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মী সহস্র শতসম্ভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
[ব্রহ্মসংহিতা ৫/২৫]

রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদাসকে বললেন—'জগন্নাথ ও রাধাকৃষ্ণের ঐক্যের বিষয় আমাকে বলুন। শ্রীচৈতন্যের নিকট আমি শুনেছি, অধমকে তত্ত্ব মন্ত্র দিয়ে উদ্ধার করার জন্যই আপনার আবির্ভাব হয়েছে ।'—

'এষ এব জগন্নাথো মন্ত্ররূপী কথং বদ ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমভাবমৈক্যং তয়োঃ কথং প্রভো ॥

অধমোদ্ধারণার্থায় তত্ত্ব মন্ত্রোদয়ায় চ।
তবাবির্ভাবঃ সংসারে চৈতন্যাত্ত্ব শ্রুতং ময়া ॥

তখন জগন্নাথ দাস বললেন—

নীল অচল যে বোলাই। সহস্রদল পদ্ম সেহি ॥
এহি পুরুষোত্তম সার। এ মধ্যে প্রভুঙ্ক বিহার ॥
শ্রী রাধাকৃষ্ণ এক হোই। শ্রী জগন্নাথ দেহে স্থায়ী ॥
বিদ্ধি যুগ্মাক্ষরযুগং রাধাকৃষ্ণ ইতি দ্বয়ম্।
বিহারং কুরুতে নিত্যং নীলকন্দর মন্দিরে ॥
বুঝহে যুগ্মরূপে বীর। রধাকৃষ্ণ দ্বি দ্বি অক্ষর ॥
বিহার করন্তি সন্তত। নীলকন্দর মধ্যগত ॥
শ্রীরাধাবল্লভ নাগর। মহাশোভা নীলকন্দর ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসাস্বাদ। নীলকন্দর কুঞ্জমধ্য ॥
নীলপর্বত শীর্ষস্থান। তাহাকু বোলি কুঞ্জবন ॥
[তদেব, অঃ ১২]

জগন্নাথ দাস অন্যত্র তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, গোবিন্দ আদিপুরুষই জগন্নাথ, জগন্নাথের শরীরেই নিত্যরাধা নিত্যকৃষ্ণের অবস্থান। মহাবিষ্ণু পর্যন্ত সেই আদি পুরুষের কলাবিশেষ। পূর্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ। নন্দনন্দন সেই নিত্যকৃষ্ণের অংশ, বৃষভানুসুতা সেই নিত্য রাধিকার এক কলা।

যস্যৈক নিঃশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথা।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ [ব্রহ্মসংহিতা ৪৮]

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডর পতি। যা রোমমূলু উৎপত্তি ॥
সে মহাবিষ্ণু যাঙ্ক কলা। কে বা বর্ণিব তাঙ্ক লীলা ॥
যাহাঙ্ক নিঃশ্বাস কালরে। বর্তি অছন্তি সকলে ॥
ছাড়িলে নিঃশ্বাস গোটিএ। জন্মন্তি ব্রহ্মাণ্ড কোটি এ ॥
হোইণ যা এ কোটি সৃষ্টি। ব্রহ্মা কোটিএ শিব কোটি ॥
কোটিএ লোক লোকপাল। কোটি সমুদ্র খমণ্ডল ॥
কোটিএ বিষ্ণু অবতার। হুঅন্তি নিঃশ্বাস মধ্যর ॥
পুণি নিঃশ্বাস সংহরন্তে। প্রলয় হুঅই যুকতে ॥
সে জগন্নাথ শ্রীমূরতি। নীলাচলরে বিরাজন্তি ॥
নিত্য শ্রীপরুষোত্তমরে। রাধাকৃষ্ণ এক শরীরে ॥
যে নির্বিকল্প নিরাকার। প্রতিরূপরে তা বিহার ॥

গোবিন্দ সে আদি পুরুষ। ভজই মুঁ তাঙ্কু বিশেষ ॥
চিন্তামণি নির্মিত গৃহ। অতুলনীয় শোভাময় ॥
আবৃত লক্ষ কল্পদ্রুমে। অতি পবিত্র দিব্যধামে ॥
লক্ষধেনু পালন কারী। বিরাজুছন্তি নরহরি ॥
শত সহস্র লক্ষ্মী যার। সেবা করন্তি নিরন্তর ॥
গোবিন্দনাথ প্রকটই। সে আদি পুংসকু নমই ॥

যস্যৈকনিঃশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ড নাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

[তদেব, ৫.৫৪]

যাহাঙ্ক নিঃশ্বাস চালন। যাবত হুএ পরিমাণ ॥
তাবত কালটি আয়ুষ। ভোগন্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ঈশ ॥
যা রোম মূলুঁ অবতার। হোই ত্রিভুবন ঈশ্বর ॥
এ বিষ্ণু যার কলা মাত্র। তার বর্ণনে কেবা পাত্র ॥
সে আদি পুরুষ গোবিন্দ। নিত্যে মুঁ নমে তাঙ্ক পদ ॥

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎ কর্ণিকায়াং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্ ॥

[তদেব, ৫/২]

কর্ণিকায়াং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গং ষট্‌পদং স্থানং প্রকৃত্যাপুরুষেণ চ ॥

[তদেব, ৫ ৩ ঈষৎ ভিন্নপাঠ]

সহস্র দল যে কমল। মহিত পদ শ্রীগোকুল ॥
কর্ণিকা মধ্যে মহাধাম। অনন্ত যা অংশু জনম ॥
কর্ণিকা পরে মহাযন্ত্র। ষট্‌কোণ ষড়বীজ মন্ত্র ॥
বজ্রকীলক শোভাবন। ষড়ঙ্গ ষটপদ স্থান ॥
তাঁহি মধ্যরে সুরঞ্জিত। প্রকৃতি পুরুষ শোভিত ॥
এহি শ্রীজগন্নাথ মুখ। পদ্মরে গুপ্ত তত্ত্ব দেখ ॥

চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যামদ্ভূতম্।
চতুরস্রং চতুর্মূর্তেশ্চতুর্ভির্ধামভির্বৃতম্ ॥
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভি বৃতম্।

[তদেব, ৫.৫]

তহুঁ পদ্ম চতুর কোণ। চতুর মূর্ত্তি চতুঃস্থান ॥
ধর্মার্থ কাম মোক্ষ ধরি। দ্বারকা আদি ধাম চারি ॥
যে বাসুদেব সংকর্ষণ। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ পুণ ॥
ঋক, যজু সাম অথর্বণ। কর্মজ্ঞান মোক্ষ সাধন ॥
এ জগন্নাথ ভদ্রাবল। সুদরশন রূপে ঠুল ॥
এ ভাবে চতুর্দ্ধা মূর্তি। জগতে যে যেমন্ত চিন্তি ॥
চতুর হেতু যাহা কহি। শুণ তা তুম্ভে মন দেই ॥
এ বড দাণ্ড যে গোলক। বাইশি পাবছ এ দেখ ॥
মহানিত্য জগমোহন। পরম নিত্য সিংহাসন ॥

প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সংগতম্ ॥

[তদেব, ৫/৩]

প্রেম আনন্দ মহানন্দ— রসকু করিণ আস্বাদ ॥
জ্যোতি রূপ যে মন্ত্রবর। কামবীজটি তত্ত্বসার ॥
তা সহ হোইণ সঙ্গত। যে হোইছন্তি অবস্থিত ॥

মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক পালৈঃ পরিতোবৃতম্।
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদৈর্ভিঃ ॥
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ।
এবং জ্যোতির্ময়োদেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥

[তদেব, ৫/৬]

মন্ত্র বপুরে দশগোটি। দশ দিগরে ছন্তি ঘোটি ॥
গোকার আদি মন্ত্রসার। যন্ত্রবে বলয় আকার ॥
শ্যাম হরিত রক্ত ধলা। বর্ণ প্রকাশ যহিঁ মেল ॥
এ শক্তি যন্ত্ররে আবৃত। জ্যোতিরূপবে জগন্নাথ ॥
সদানন্দ পরম পব। এ হেতু বোলান্তি ঈশ্বর ॥

আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ।
মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ ॥

[তদেব, ৫/৬, ৭]

সেহি অটই আত্মারাম। নাহিঁ তা প্রকৃতি সংগম ॥
মায়ারে রমণ করই। তহুঁ বিযুক্ত ন হুঅই ॥
সর্বদা রস ভাব মূর্তি। প্রেম ভক্তিরে লভ্য হোন্তি ॥

[জগন্নাথ চরিতামৃত, ষষ্ঠ অধ্যায়]

পূর্ণঃকৃষ্ণো জগন্নাথঃ শেষস্তস্যোর্দ্ধমুচ্যতে।
অংশো মদনগোপালো গোবিন্দাদ্যংশভাগতঃ।
শ্রীমন্নারায়ণাদ্যাশ্চ কলান্তে লীলয়া স্থিতাঃ।
কলার্দ্ধং ব্যূহদেবাশ্চ মহেশস্তু কলাসমঃ।
তদর্দ্ধং শক্তিরাখ্যাতা আবেশাঃ স্যাত্তদর্দ্ধকম্।
রামার্জুনৌ চ তদ্ভাগৌ সর্বে কৃষ্ণসমুদ্ভবাঃ।
অগ্নিকূটাদ্ যথা দীপো দীপাদ্দীপান্তরং যথা॥

পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ। অর্দ্ধরূপ শেষ বিদিত॥
অংশ শ্রীমদনগোপাল। তদ্ভাগ গোবিন্দাদি ঠুল॥
কলারূপ শ্রীনারায়ণ। লীলা করন্তি ত্রিভুবন॥
কলার্দ্ধ যে ব্যূহ চতুর। কলা সমান মহেশ্বর॥
ব্যূহার্দ্ধ যে শকতিগণ। ওহুঁ মৎস্যাদি অর্দ্ধজাণ॥
পরশুরাম অরজুন। আবেশ রূপ মাত্র জাণ॥
অগ্নি কুড়রু লাগি দীপ। তহিঁরু যে অনেক দীপ॥
সেপরি এহা তাহুঁ সর্ব। জাত হোইছি এহা ধ্রুব॥

গোপে মদন গোপালো গোবিন্দেনৈব ক্রীড়িতঃ।
অনন্তোবলরামোঽপি লীলয়া ভার হারকঃ।
বাধা জগন্নাথদেবো নিত্যকৃষ্ণ বিহারিনী।
লক্ষ্মীশ্চ রুক্মিনী চৈব রাধিকাংশং সমাশ্রিতে।

গোপরে মদনগোপাল। গোবিন্দ সঙ্গে হোই মেল॥
অনন্ত কলা বলরাম। ভূভার হরণে জনম॥
রাধা জগন্নাথ মূরতি। নিত্য সে কৃষ্ণে বিহরন্তি॥
এ হাণ্ক ঠারু সর্বে জাত। রাধা-লক্ষ্মী রুক্মিনী খ্যাত॥
এ হরিবংশর প্রমাণ। বুঝ হে সাধু বিজ্ঞ জন॥
নিত্যরে রাধাকৃষ্ণ ছন্তি। সে তেজ-অংশুজাত হোন্তি॥
রাধা লক্ষ্মী রুক্মিনী হোই। পুরুষ সংযোগকু পাই॥
লক্ষ্মীনারায়ণ সহিতে। প্রকাশ দেখ এ জগতে॥
নিত্য রাধিকা কলা এক। সে জাত হেলে ব্রজলোক॥
বৃষভানু সুতা বোলাই। সে নন্দনন্দনঙ্কু মোহি॥
রুক্মিনী বাসুদেব সঙ্গে। বিহার কলে নানারঙ্গে॥
এরূপেঁ হোই অবতার। কলে বিশ্রাম এহিপুর॥
জগন্নাথ আজ্ঞারে সর্বে। বিহরুছন্তি স্ব স্বভাবে॥
জগন্নাথ আজ্ঞা ন পাই। কে ভোগ ভুঞ্জবটি মহী॥

[জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যায় ১৮]

পরমব্রহ্মের নির্বিশেষ সবিশেষ দুইরূপই গ্রাহ্য।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দযতি জগন্নাথ দাসকে বললেন,

ব্রহ্মচেদ্ ভবতি নির্বিশেষকম্
কং বিশেষমবলম্ব্য তস্য চ।
বর্ণয়ত্যতিতরাং খলু শাস্ত্রম্
যেনচোপনিষদেকমেয়তা ॥
যতোবাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যাদি বচনৈঃ পুনঃ।
অবাচ্যত্বং স্ফুটং তস্মান্ন বাচ্যং ব্রহ্ম সর্বথা ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু ভাগত্যাগে ন লক্ষ্যতে।
অতো লক্ষ্যং তু ব্রহ্মস্যান্ন বাচ্যং তু কথংচন ॥

ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ, তার আবার বিশেষ কি? উপনিষদে বলা হয়েছে 'যতোবাচো নিবর্তন্তে'—যেখান থেকে বাক্ নিবৃত্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম কখনও বাচ্য হতে পারে না। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণার সাহায্যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় সত্য। কিন্তু তা কখনও বাচ্য নয়।

তখন শ্রীদাস বললেন—

বেদের কোন স্থলে 'ব্রহ্ম অবাচ্য' বলা হয়েছে—তার অর্থ ব্রহ্মের সমস্ত কিছু বাচ্য নয়। এরকম সমাধান কর, না হ'লে বেদ অধ্যয়ন ব্যর্থ হবে।—

বেদর বোলিসি স্থলে। ব্রহ্ম অবাচ্য বোলি মিলে ॥
তা অর্থ নুহই অবাচ্য। কিন্তু সমস্ত নুহে বাচ্য ॥
এ পরি কর সমাধান। নোহিলে বেদ অধ্যয়ন ॥
বোধি বিঅর্থ হেব জান। হে যতিবর এ প্রমাণ ॥

তখন যতি ব্রহ্মানন্দ আবার বললেন—

কি করে তা বাচ্য হবে? শব্দ প্রবৃত্তির কারণ থাকা চাই। তাছাড়া

জাতিগুণ বা ক্রিয়ানাম। রূপ আদি যে সরঞ্জাম।
তাহাত নাহিঁ তাঙ্ক ঠারে। বাচ্য হোইবে কি প্রকারে ॥

দাস তখন বললেন,—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য না হলে ব্রহ্মকে তোমার লক্ষ্য বা অভীষ্ট বলে ভাববেই বা কি করে? মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হবে কি করে?

যদ্যেবমুচ্যতে তর্হি শ্রূয়তাং যতিসত্তম।
ব্রহ্মচেৎ সর্বশব্দানামবাচ্যং সর্বথা ভবেৎ ॥
লক্ষ্যং ভবেৎ কথং বা তৎ শিরোনাস্তি ব্যথা কুতঃ।
অতো ভবন্তং ব্রহ্ম লক্ষ্যং স্যান্নৈব কর্হিচিৎ ॥

তথেব— সে ব্রহ্মসগুণ নিশ্চয়। শ্রুতি কহই করি থয় ॥
আকার অপ্রাকৃত তার। প্রাকৃত জনে অগোচর ॥
গীতারে অর্জুনঙ্কু হরি। বুঝাই ছন্তি ভল করি ॥
দ্বাদশ অধ্যায়রে এহি। বিষয় নিরূপণ হোই ॥
শ্রীকৃষ্ণঙ্কর উপাসক। যে বা অক্ষর উপাসক ॥
এ দুই ভক্তঙ্ক মধ্যরে। কে শ্রেষ্ঠ বোলি পুছিবারে ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ বোলি। কহিছন্তি নির্ভর করি ॥
অব্যক্ত উপাসনা পুনি। অসম্ভব বোলি যে ভণি ॥

দেহ ধারী পক্ষরে সেত। হোই ন পারে কদাচিত ॥
অক্ষর উপাসক জন। ক্লেশ লভই অনুক্ষণ ॥
তেণু নির্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা কর দূর ॥
এ দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ। নাম ব্রহ্ম খ্যাত জগত ॥
এহাঙ্ক উপাসনা কর। তরিব সংসার সাগর ॥
এমন্ত শুনি ব্রহ্মানন্দ। মনরে হোই গদগদ ॥
সাধু সাধু বোলি ভাষিলে। দাসঙ্কু বহু প্রশংসিলে ॥

ধামতত্ত্ব :

বৃন্দাবনধাম বনাম পুরুষোত্তমধাম-গত যে-বিবাদ, তা যে পরবর্তীকালের এবং প্রক্ষিপ্ত, তার প্রমাণ জগন্নাথ দাসের নিজের কথা—তিনি নিত্যবৃন্দাবন ও নীলাচলকে অভিন্ন ভাবেই উপলব্ধি করেছেন—

অবাচ্যমব্যক্তমথোহগাধম অত্যন্তদুর্গমম।
শ্রীবৃন্দাবনকং নিত্যং শ্রী নীলাচল এব চ ॥
বচনে নুহই কথিত। রূপার নুহই ব্যকত ॥
অগাধ অত্যন্ত দুর্গম। শ্রীবৃন্দাবন নিত্যধাম ॥
নীল অচল যন্ত্র স্থিতি। সেহি ধামটি এ অটন্তি ॥

যা 'রূপবে নুহই ব্যকত'—রূপে ব্যক্ত নয়, সে নিত্যধাম কোন ভৌগোলিক ক্ষেত্র নয়। ব্রহ্মসংহিতায় (৩৭ শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়) তাই বলা হয়েছে, রাধামাধবের লীলাস্থল গোলোক 'অখিলাত্মভূতো' ('গোলোক এব নিবসতি অখিলাত্মভূতো') এবং সন্তগণ সেই অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরকে প্রেমভক্তিভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হৃদয়ে সর্বদা দেখতে পান ('প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি'-তদেব, ৩৮)। অর্থাৎ ভৌগোলিক বৃন্দাবন বা ভৌগোলিক নীলাচল থেকে যাত্রা করে পৌঁছাতে হবে নিত্যবৃন্দাবনে বা নিত্য নীলাচলে।

সিদ্ধভক্তি : স্বকীয়া পরকীয়া

শ্রীকৃষ্ণোহয়ং জগন্নাথো হৃদয়ং মে সমাশ্রিতঃ।
যদ্ব্রবীতি লিখাম্যত্র ভক্তিশাস্ত্র প্রমাণতঃ ॥
স্বকীয়ে পরকীয়ে শেব ভক্তীপ্রাকৃত্তো মহীতলে।
সিদ্ধমার্গানুসারেণ প্রখ্যাতে ভুবনে সদা ॥
স্বকীয়া পরকীয়া দুই। ভকতি ছন্তি সিদ্ধ হোই ॥
স্বকীয়া নির্গুণ স্বভাব। পরকীয়া সগুণ ভাব ॥
পরধর্মকু যে ভাবই তাহাকু পরকীয়া কহি ॥
আপনা ধর্মে যে নিপুণ। তাহা স্বকীয়া ভক্তি জাণ ॥

[জগন্নাথ চরিতামৃত, অঃ ৮]

দিবাকর দাস বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে'র নায়িকাভেদ প্রকরণ' অবলম্বনে স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ বর্ণনা করেছেন।

বিনয়ার্জবাদিযুক্তা গৃহকর্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া।

[সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ৫৬ শ্লোক]

বিনয় সরলতা গুণে । ভূষিত যেহু নারী জান ॥
গৃহ কর্মরে তত্তপর । পতিব্রতা যে ধর্মপর ॥
তাহাকু স্বকীয়া যে কহি । তা ভক্তি স্বকীয়া অটই ॥

পরকীয়া দ্বিধাপ্রোক্তা পরোঢ়া কন্যকা তথা ।
যাত্রাদি নিরতান্যোতা কুলটা গলিতত্রপা ।
কন্যাত্বয়াতোপয়মা সলজ্জা নবযৌবনা ॥ [তদেব, ৩/৬৬]

পরকীয়া যে দ্বি প্রকার । পরোঢ়া কন্যকা আবর ॥
যাত্রাদি রসে যেহুরতা । অন্যর অটে বিবাহিতা ॥
কুলটা লজ্জা-বিরহিতা । পরোঢ়া সেহিটি সম্মতা ॥
অবিবাহিতা লজ্জাশীলা । নব যৌবনবে মঞ্জুলা ॥
কন্যকা অটে নাম তাব । এ সর্বশাস্ত্রর বিচার ॥
এভাবে কেহু ভক্তি করে । পরকীয়াটি সেহু ভলে ॥
গোপেগোবিন্দ গোপীজন । সে ভাব পরকীয়া মান ॥
গোপলীলা কেহু ভাবই । সে ভাব পরকীয়া কহি ॥
আঠ প্রকার সে অটই । স্বাধীন ভর্ত্তৃকাটি কেহি ॥
খণ্ডিতা কে অভিসারিকা । কলহান্তরিতা কে একা ॥
বিপ্রলবধা অটে কেহি । প্রোষিতভর্ত্তৃকাট কাহিঁ ॥
বাসকসজ্জা কে হুঅই । বিরহোৎকণ্ঠিতা বা কেহি ॥

ব্যূহেষু সভয়াভক্তির্মথুরায়াং তু সপ্ত চ ।
বাৎসল্যভক্তিরেব চ স্যাৎসুহৃদ্ভক্তিস্তু গোকুলে ॥
পঞ্চবিংশতি পীঠেষু রসো মাধুর্য্যমেব চ ।
ভাবভক্তিশ্চাবরণে শুদ্ধং প্রেম স্বতঃ পরম্ ॥

চারি ব্যূহে সভয়া ভক্তি । মথুরাপুরে সপ্তস্থিতি ॥
বাৎসল্য ভক্তি গোপপুবে । সুহৃদভক্তি গোপীংকরে ॥
পঞ্চবিংশতি পীঠে জাণ । মাধুর্য্য রসভক্তি যেন ॥
আবরণরে ভাব ভক্তি । এথি উত্তারু প্রেম স্থিতি ॥

অষ্টৌ প্রকারা যথা—

কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদান্তিকম্ ।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীন ভর্তৃকা ॥ [সাহিত্যদর্পণ, ৩/৭৪ ,
রতিগুণে আকৃষ্ট হোই । যা পতিপাশ ন মুঞ্চই ॥
বিচিত্র রতিচেষ্টাসক্তা । স্বাধীন ভর্তৃকা কথিতা ॥
পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা ॥ [তদেব, ৩/৭৫]
নিদ্রাকষায় কলুষীকৃত তাম্রনেত্রঃ
নারীনখব্রণ বিশেষ বিচিত্রিতাঙ্গঃ ।

যস্যাঃ প্রভাত সময়ে গৃহমেতি কান্ত ঃ
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি। তদেব, ৩/৭৫ [ভিন্নপাঠ]

অন্য সম্ভোগ চিহ্ন নেই। যার নিকট পতি যাই ।।
ঈর্ষ্যারে হুএ কষায়িতা। সেহুটি অটই খণ্ডিতা ।।

অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথবশম্বদা।
স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা ।। [তদেব, ৩/৭৬]

কুল লজ্জাকু দূরে থোই। মদন বশবর্তী হোই ।।
সংকেত স্থানে অভিসার। পতিকু করাএ সত্বর ।।
নিজে বা করে অভিসার। সে অভিসারিকাবিচার ।।

চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা ।। [তদেব, ৩/৮২]

যেহুটি প্রাণনাথঙ্কর। চাটুবচন বারম্বার ।।
শুণি রোষরে করি দূর। পস্তাই হুএ নিরন্তর ।।
কলহান্তরিতাটি সেহি। শুণ এ রস মন দেই ।।

অহরহরনুরাগাদ্দূতিকাং প্রেষ্যপূর্বং—
সম্ভসমভিধায় ক্বাপি সংকেত কুঞ্জে।
ন মেলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ
প্রবদতি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাম ।। [তদেব, ৩/৮৩ পাঠান্তর]

অত্যন্ত অনুরাগ বশে। দূতিকা পেশি কান্ত পাশে ।।
কেউঁ নিভৃত কুঞ্জে পুণি। সংকেত দেইণ রমণী ।।
আপে অপেক্ষা করি রহে। কান্ত মিলন যদি নোহে ।।
সেহি নায়িকা বিপ্রলব্ধা। ভরত মতরে প্রসিদ্ধা ।।

নানা কার্য্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ ।।
সা মনোভব দুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ।। [সাহিত্যদর্পণ, ৩।৮৪]

নানাদিকার্য্য বশে যার। পতি চলই দেশান্তর ।।
কন্দর্পব্যথিত নায়িকা। সে অটে প্রোষিতভর্ত্তৃকা ।।

কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাস বেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জা স্যাদিতি প্রিয়সঙ্গমা ।। [তদেব, ৩/৮৫]

বাসগৃহকু সুমণ্ডন। কাহি রাখিব সুযতন ।।
উত্তম তলপ সজাই। কান্ত আগমনকু চাহিঁ ।।
যে বসি রহিথাএ একা। বাসক সজ্জা সে নায়িকা ।।

আগন্তুং কৃতচিত্তোহপি দৈবান্নায়াতি চেৎ প্রিয়ঃ
তদনাগম দুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা ।। [তদেব, ৩৮৫]

প্রিয়াপাশকু প্রিয় যার । আসিবাকু করি বিচার ।
দৈবযোগরে ন আসই । তহুঁ দুঃখিতা যে হুঅই ।।
সেহি নায়িকা অটে জান । বিরহোৎকণ্ঠিতা প্রমাণ ।।

দিবাকর দাস শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি'র 'শ্রীহরিপ্রিয়াপ্রকরণম্' (শ্লোক ৩) অবলম্বনেও স্বকীয়া ধর্মলক্ষণ নিরূপণ করেছেন।—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরা ।
পাতিব্রত্যাদবিচলা স্বকীয়া পরিকীর্ত্তিতা ।।
সুখদুঃখে সমে জ্ঞাত্বা পত্যুঃ পাশ্বং ন মুঞ্চতি ।
স্বীয়ায়া গৃহমে ধন্যা এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।।

পাণিগ্রহণ বিধানরে । যে সমর্পিত পতি করে ।।
পতি আদেশ পালনরে । তৎপর থিব নিরন্তরে ।।
পাতিব্রত্য ব্রতে অটল । স্বকীয়া সেহি মহীতল ।।
সুখে দুঃখে এ স্বামী মোর । ছাড়িলে ন ছাড়ে পয়র ।।
গৃহ মেধিনী স্বকীয়ার । এ ধর্ম অটই নিকর ।।

লক্ষ্মীঃ সত্যা রুক্মিনী চ সীতা পর্বতনন্দিনী ।
যুগানুসারং তাভর্তুঃ সহগামিন্য এব চ ।।

সত্যা লক্ষ্মী রুক্মিনী সীতা । পুণি সে পর্বতদুহিতা ।।
ন ছাড়ি স্ব স্বামীঙ্ক সঙ্গে । বিহরুছন্তি যুগে যুগে ।।
এ নিষ্ঠা নিত্য ধর্ম স্থায়ী । এ ভক্তি ন জাণন্তি কেহি ।।
নিত্য স্বকীয়া ধর্ম পথ । এ যুগ যুগান্তরে উক্ত ।।

সাধ্যভক্তি : রাগানুগা

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ় লৌল্যৈক লভ্যা ।
সা স্যাৎ প্রাপ্তাযয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীং তস্য সেবাম্ ।।
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈ র্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যকং তস্য নৌমি ।

শ্রীরাধাঙ্কর প্রাণপতি । তাহাঙ্ক পাদপদ্ম প্রাপ্তি ।।
যে প্রেম ভক্তিরতা হোই । সাধ্য ভকতি সে বোলাই ।।
ব্রহ্মা শিব যে শেষদেব । পাই নাহান্তি যার লব ।।
যে সনে ব্রজ নারীগণ । কৃষ্ণ প্রেমরে থিলে মগ্ন ।।
সেপরি যেহু আচরই । সেহি কেবল ভক্তি পাই ।।
গাঢ় প্রেমরে হো এ লাভ । অন্যাথা তাহা অসম্ভব ।।
যেহে সে ভক্তি প্রাপ্তি হোই । তাহা প্রচার পাইঁ মুঁহি ।।

ব্রজলীলাকু স্মরিণ। সেবই সে প্রভু চরণ॥
সে নিত্যলীলা বিগ্রহঙ্ক। চরণে মুঁ অটে সেবক।
রাগ মার্গরে যে পথিক। সে এহি ভাবরে ভাবুক॥
হোইবা অটই উচিত। মানস সেবাটি যথার্থ॥
মানস মত্তে আশ্রে কর। প্রাপ্তি হেব সুখ সাগর॥
ছাড়িণ সমস্ত চরিত। এ মার্গে ভজ হে নিরত॥
[জগন্নাথচরিতামৃত, অধ্যায় ৩]

নিস্পৃহা ভক্তি ঃ

শুণ সুজনে দেই চিত্ত। নিস্পৃহাভক্তির চরিত॥
অক্রোধ বৈরাগ্য জিতেন্দ্রিয়ত্ব ক্ষমা দয়া সর্বজনপ্রিয়ত্ব—
নির্লোভ্যদাতৃত্বদভীতিশোকত্বর্তী তু ভক্তিদর্শলক্ষণৈষা॥
অঙ্গরু ক্রোধ হুএ ত্যাগ। সকল বস্তুরে বৈরাগ্য॥
সর্ব ইন্দ্রিয় করি জয়। মউন করিব নিশ্চয়॥
সর্বদা ক্ষমা আচরন্তি। সর্বভূতরে দয়া চিন্তি॥
সমস্ত ঠারে রখি প্রীতি। নির্লোভিতা যে প্রকাশন্তি॥
নিঃস্বার্থপর দাতা হেব। ভয় শোক যে বর্জিথিব॥
দশ লক্ষণ ভক্তি এহি। শাস্ত্ররে প্রসিদ্ধ অটই॥

বিবাদরহিতো নিত্যং মিথ্যাভাষণবর্জিতঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বপ্রাণিহিতেরতঃ॥
লোকাচার বিহীনশ্চ সর্ববর্ণরতিঃ পুনঃ।
কৃষ্ণপ্রেম মদোন্মত্তো মত্তে ভর্গাংগৈব চ।
খলোক্তৌ বধিরো যদত্তথা বিকার বর্জিতঃ। [তদেব, অধ্যায় ১৬]

কেবে বিবাদ ন করন্তি। মিথ্যা বোলিবা ন জাণন্তি॥
আত্মা সমানরে জগত। জানান্ত সর্বপ্রাণী হিত॥
দেলে ন দেলে ভিক্ষা লোক। কেবেহেঁ নহুন্তি বিমুখ॥
লোক আচার করি দূর। সর্ববর্ণরে রতি পর॥
কৃষ্ণ প্রেমমদে ঘূর্ণিত। মত্তহস্তী গতি যেমন্ত॥
খলবচন শুণি কর্ণ। বিকার ন আণই মন॥
বধির রহই যেমন্ত। তেমন্ত হুঅই ভকত॥
[জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যায় ১৬]

অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও প্রেমভক্তি

ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত) ও বৃহন্নারদীয় পুরাণ অবলম্বনে দিবাকর দাস অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও প্রেমভক্তির কথা বলেছেন।—

স্তম্ভ স্বেদোহথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোহথবেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ॥
স্তম্ভ পরায় হোই রহি। দেহরু ঝাল গলুথাই॥

কেতেবেলে টাঙ্কুরে রোম। স্বরভঙ্গে কহে বচন ॥
শরীরে হুঅই কম্পন। বিবর্ণ দিশে অপঘন ॥
অশ্রু গলই নিরন্তর। মূর্চ্ছা প্রলয় বারম্বার ॥
রাগ ধর্ম মার্গটি এহি। সাধন্তি প্রেমভক্তি পাই ॥
প্রেমমার্গ ভকতজন। এ ভাবে করিব সাধন ॥

তথা চ—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যাবিনাশয়ঃ।

উন্ধব পর দ্রব চিত্ত। রোম পুলক অশ্রুপাত ॥
এ তিনি ব্যতিরেক ভক্তি। কেহে হোইব উতপত্তি ॥
ভকতি বিহীনে আশয়। কেবেহেঁ নুহে শুদ্ধিময় ॥
সমস্ত লোকঙ্কু পবিত্র। করন্তি শ্রীকৃষ্ণ ভকত ॥
যে প্রেমভক্তি ভক্তজন। কহই গদ্‌গদ বচন ॥
সে কথা শুণি তার চিত্ত। ক্ষণকে হুএ দ্রবীভূত ॥
নির্লজ্জ হোই উচ্চে গাই। নাচই রোদন করই ॥
কণ্ঠ কুণ্ঠিতে কহে বাণী। ভ্রম হুঅই নাম শুণি ॥
এ মন্ত যে কৃষ্ণ ভকত। সেবারে জগত পবিত্র ॥
দেহরে আত্মা অছি নাহিঁ। মোহ হোই ক্ষণে পড়ই ॥

[তদেব, অধ্যায় ১৬]

প্রেমভক্তিমার্গে কৃষ্ণে দেহসমর্পণ (তুলনীয় : 'তিল তুলসী দেই এ দেহ সমর্পিলুঁ'— বিদ্যাপতি] এবং অহংবোধ ত্যাগ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে দিবাকর দাস শ্রীজীবের প্রতি শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশের উল্লেখ করেছেন :

রাগমার্গের বইরাগী। যদি চ গৃহকর্ম ত্যাগী।
কাহিঁরে বাঞ্ছা তার নাহিঁ। মুহিঁ মোহর ন বোলই ॥
দ্রব্য বোলিব যেবে মোর। রাগভকতি ভ্রষ্ট তার ॥

কৃষ্ণে সমর্পয়েদ্দেহং নিস্পৃহো রাগমার্গগঃ।
দ্রব্যং মমেতি যোমহঃ সনোদ্ধারণ কারণম্ ॥

এ রস সিন্ধুর ভকতি। শ্রীরূপ গোস্বামী বদতি ॥
জীবক স্বামী বসিথিলে। মোহর কৌপীন বোইলে ॥
রূপ বোইলে তাঙ্কু চাহিঁ। তুম্ভর মোহ ছাড়ি নাহিঁ ॥
নিস্পৃহ বইরাগী হেব। মোহর বোলিণ বোলিব ॥
কৃষ্ণে সমর্পি থিব দেহ। দ্রব্য মোহর কেহে কহ ॥
মোর বোইলে ভ্রম হেব। এ জন্মে উদ্ধার নোহিব ॥

[তদেব, অধ্যায় ১৬]

অযত্নো দেহাদৌ বিগলিত শিখা সূত্রবসন—
স্তথাস্থানস্থত্বং ক্বচিদপি চ মালাতিলকয়োঃ ॥
কদাচিদ্ গ্রামে বা বনগিরি দরীষু ক্বচিদপি—
ক্বচিদ্ গন্ধালেপঃ ক্বচিদপি চ পঙ্কাঙ্কিততনুঃ ॥

নিজ দেহকু যত্ন নাহিঁ। নখ লোমরে সজ্জা দেহী ॥
খসি পড়ই শিখা সূত্র। আবর পরিধান বস্ত্র ॥
মালা তিলক অস্থানরে। ডোর কৌপীন সে প্রকারে ॥
নিজ দেহে নাহিঁ আদর। তাহার নাহি আত্মাপর ॥
কেবে বা রহন্তি গ্রামরে। কেবে বনগিরি দরীরে ॥
পঙ্ক চন্দন বেনি সম। তৃণ বিভব মনোরম ॥
ভোজন উপবাস পরি। নামকু পান একা করি ॥
প্রেমতরঙ্গে ভাসুথান্তি। তেণে মগন তাঙ্ক মতি ॥
এ বৃহন্নারদ পুরাণ। নারদে আজ্ঞা ভগবান ॥ [তদেব, অধ্যায় ১৬]

নবধা ভক্তি : বৈধী ও রাগানুগা—

নবধাভক্তি প্রসঙ্গে দিবাকর দাস ভাগবতের (সপ্তম স্কন্ধ) প্রহলাদ উক্তি উদ্ধার করেছেন :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ [তদেব, অধ্যায় ১৫]

বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির তুলনা করে দিবাকর দাস রাগানুগা মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন :—

নৈকান্তিকং তদ্ধিকৃতেঽপি নিষ্কৃতে।
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে ॥
তৎকর্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে—
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥

ব্রতাদি কর্ম করি নীতি। পাপরু নিষ্কৃতি ॥
একাগ্র ন হোইণ মন। যদি অসতে ধাবমান ॥
তেবে সে কর্ম ছাড়িবাকু। ইচ্ছা করুথিবা লোককু ॥
এহা হিঁ অটে উপদেশ। যাহিঁরে মন হুএ বশ ॥
শ্রীহরিঙ্কর গুণগান। করিব ভকতিরে পূর্ণ ॥
তহিঁরে মন হুএ পূত। সত্ত্ব ভাবনা হুএ জাত ॥

জিহ্বে কীর্ত্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরম্।
পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চয়াচ্যুতকথাং শ্রোত্রদ্বয়ং ত্বং শৃণু ॥
কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাংঘ্রিযুগ্মালয়ম্
জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূর্ধন্নমাধোক্ষজম্ ॥

হে জিহ্বা কর সংকীর্ত্তন। কেশব যশ গুণমান ॥
হে চিত্ত মুরারিঙ্কু ভজ। তাহাঙ্ক পদে সদা মজ্জ ॥

হস্তযুগ কর অর্চন। শ্রীধঙকব শ্রীচরণ॥
শ্রোত্রযুগল শুন নিতি। অচ্যুত কথা বহি প্রীতি॥
শ্রীকৃষ্ণঙকর শ্রীমূরতি। লোচন দেখ নিতি নিতি॥
সতত হে পদযুগল। হরি মন্দিরে গতি কর॥
মুকুন্দঙক পাদতুলসী। নাসিকা ঘ্রাণ কর রসি॥
হে শির নত হুঅ বারে। অধোক্ষজঙক শ্রীপয়রে॥
বিদ্যাতপঃ প্রাণ নিরোধমৈত্রে স্তীর্থাভিষেক ব্রতদানজপৈঃ।
নাত্যন্ত শুদ্ধোভবতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥
বিদ্যা তপস্যা প্রাণায়াম। মন্ত্রতীর্থাভিষেক কর্ম॥
ব্রত দান যে জপবিধি। এথি আত্মার নাহিঁ শুদ্ধি॥
হৃদে বিরাজমান হরি। হোইলে শুদ্ধিটি যে পরি॥
সে পবি সে সবুরে নুহে। কেবল শ্রম মাত্র হুএ॥
যে দৃঢ়ে হরিঙকু ভজই। কিপাঁ অপেক্ষা তার এহি॥
সর্বদান ব্রত তাহার। অটই গোবিন্দ পয়র॥...
বইধ কর্ম যে সাধই। পঞ্চ সপ্ত জন্মে তবই॥
যে প্রেম মার্গরে অছন্তি। সেহি নিকটে কৃষ্ণ পান্তি॥

[জগন্নাথচরিতামৃত, অধ্যায় ১৬

কলিযুগে হরিকীর্তন

কৃতে তু জপযজ্ঞশ্চ ত্রেতায়াং দানমুচ্যতে।
দ্বাপরে পরিচর্য্যা চ কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥

[জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যায় ১০

তুলনীয়ঃ 'কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ॥

[চৈতন্যভাগবত আদি ১০।

মুক্তি নয়, ভক্তি

অষ্টাদশ যোগে মুক্তির পথ খুলে যায়, কিন্তু ভক্তি পাওয়া যায় না॥ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য এ সব মুক্তির বিভিন্ন রূপ—ভক্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়, কেননা যে মুক্তি চায়, সে ভজনসুখ থেকে বঞ্চিত হয়।—'যে অবা হোইথান্তি মুক্ত, ভজন সুখু সে বঞ্চিত'।

যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়ঃ।
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনো যোগ সাধনে॥

আদ্যরে যম যে নিয়ম। পুণি আসন প্রাণায়াম॥
প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান। এ অষ্ট বিধি পরমাণ॥
এ যে অষ্টাঙ্গ যোগ কর্ম। এ যোগী মানঙ্ক ধর্ম॥
প্রত্যেকে আঠ আঠ কলা। এ মন্তে চউষটি হেলা॥

এ সবু মুকতির পথ। এথেঁ ভকতি অপ্রাপত ॥
সালোক্য সার্ষ্টি যে সামীপ্য। সাযুজ্য আদি মুক্তি রূপ ॥
এ সবু ভকতির তুলে। সম নহিবে কদা কালে ॥
ভকতি বেনি মত হোই। সিদ্ধাঙ্গে শুন মন দেই ॥
সাধন ভক্তি সিদ্ধ ভক্তি। এ রূপে বেনি যে অটন্তি ॥
কেহি সাধন ভক্তি করি। জনম লভন্তি যে ফেরি ॥
পুরি ভজন্তি শ্রীপয়র। এণু সে মুক্তি ঠারু সার ॥
যে অবা হোইথান্তি মুক্ত। ভজন সুখুঁ সে বঞ্চিত ॥
সংসারে লভিণ জনম। যেহু ন ভজে কৃষ্ণ নাম ॥
জনম তাহার বিফল। জীইবা মাত্রটি কেবল ॥

[জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যায় ১০]

মঞ্জরীতত্ত্ব

"রূপগোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহরীতে রাগাত্মিকাভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, তন্ময়ী অর্থাৎ সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই হইল রাগাত্মিকা ভক্তি। আর ব্রজবাসিজনের ভিতরে অভিব্যক্তরূপে বিরাজমানা যে রাগাত্মিকা ভক্তি তাহার অনুসৃতা ভক্তিই রাগানুগা নামে খ্যাত।' রাধাপ্রেম হইল পূর্ণ মধুর রসের রাগাত্মক প্রেম। তাহা এক রাধা ব্যতীত আর কোথাও সম্ভব নয়। এই রাধার কায়ব্যূহস্বরূপ হইল সখীগণ। সেই সখীগণের অনুগতা সেবাদাসী হইল মঞ্জরীগণ; শ্রীরূপমঞ্জরী আদি এই মঞ্জরীগণও গোলোকের নিত্যপরিকর, তাঁহাদের অনুগভাবে সেবা ও লীলা আস্বাদনই হইল জীবের শ্রেষ্ঠকাম্য। এই রাগানুগ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকালীন' লীলার স্মরণই হইল বৈষ্ণব সাধকগণের প্রধান সাধন। কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার আভাস পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, রূপগোস্বামী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।" [শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' ১৩৬৪ সং, পৃ. ২৩৫]

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'তে মঞ্জরীভাব সাধনার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করেছেন।

অপারকরুণাপূর পূরিতান্তর্মনোহ্রদে!
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি! নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥১৭
কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্র সূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গ প্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া ॥১৮
ত্বাং সাধু মাধবী পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাদ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥১৯
কেলি বিস্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥২০
কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥২১

ব্রজরাজকুমার বল্লভা—কুলসীমন্তমণি ! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥২২
করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি !
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ সচাটু প্রার্থন ভাজনং জনঃ ॥২৩

অপার সাগর	করুণার পূরে	পূরিত অন্তর যার।
হে দেবি রাধিকে,	এই যে দাসীকে,	করি লেহ আপনার ॥১৭
নন্দের নন্দনে,	বিনয় বচনে,	কত না সাধিবে তোরে।
তুহু সে মানিনী,	প্রিয়বাণী শুনি,	প্রসন্ন হইবি তারে ॥
এ সব তোমার	প্রেমের পসার,	তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব,	সে সঙ্গে রহিব,	সে লীলা হেরিব আর ॥১৮
মাধবীর ফুলে,	করি পুটাঞ্চলে,	তোমারে সাধিব কাণ।
কাম-কলানিধি,	রসের অবধি,	বিহি কৈল নিরমাণ ॥
তুহু কমলিনী,	তাহে স্বেদ জানি,	চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর,	হইবে আমার,	এ কৃপা করিবে মোরে ॥১৯
নানা লীলাভরে	রসের আবেশে,	কেশবেশ হব দূরে।
কবে হেন হব,	সে বেশ করিব,	এ কৃপা করিবে মোরে ॥২০
তব মুখাম্বুজে,	তাম্বুল এই যে,	কবে বা যোগাব আমি।
নন্দসুত তাহা	কাড়িয়া খাইব,	এমন করিবে তুমি ॥২১
নন্দের নন্দন,	তার প্রিয়জন,	সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি,	কি বলিব আমি,	প্রসন্ন হইবে মোরে ॥
পরিবারগণ	আছে যত জন,	তোমার প্রেমের দাসী।
তা-সভা মাঝারে,	দাসীপদ মোরে,	কবে দিবে ভালবাসি ॥২২
বারে বারে বলি,	তুয়াপদ ধরি,	বৃন্দাবন বিহারিণি !
যদি কৃপা কর,	এ দাসী উপর,	রাখ মোর এই বাণী ॥
কেশিরিপুজন,	প্রার্থনাভাজন,	তুয়া প্রেম-পরসাদে।
যদি কৃপা কর,	এ দাসী উপর,	নিবেদিয়ে দেবি রাধে !২৩

[শ্রীযদুনন্দন ঠাকুর অনূদিত]

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় মঞ্জরী ভাব সাধনাকে পরিস্ফুট করে লিখেছেন :

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত, লোকবেদসার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা, এইভাবে জুড়াবে পরাণী ॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত, মুখ্যসখী করিয়ে গণন।
ললিতা বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা, রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা, এবে কহি নর্ম সখীগণ।
ইহা সভা সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি, প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর, শ্রীরতি মঞ্জরী সার, লবঙ্গ মঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥

এ সভার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখী মাঝে ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিগে সখীগণ, সময়ের সেবা রসমুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে, তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥

ওড়িষ্যায় এই মঞ্জরীভাব সাধনার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ পাই পঞ্চসখা সাহিত্যে এবং জগন্নাথ দাসের শিষ্য মণ্ডলীতে। কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশ' বা রূপ গোস্বামীর 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'র কোন উল্লেখ দিবাকর দাস করেন নি। 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' চৈতন্য ও চৈতন্য পার্ষদদের নিত্যলোকে ও বৃন্দাবনে স্বরূপ নির্ণয় অনেকটা স্বাধীনভাবে হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্ধতিই যে এখানে অনুসৃত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'জগন্নাথ চরিতামৃতে' পরমধাম বৈকুণ্ঠে মঞ্জরীদের অবস্থান নির্ণয় করে জগন্নাথ দাস বলেছেন :

বিষ্ণোশ্চক্রং পরংধাম শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠমদ্ভুতম্। কর্ণিকাপত্রবিস্তারং রহস্যমেকমীরিতম্ ॥
তস্যোপরি স্বর্ণপীঠং মণিমণ্ডপ মণ্ডিতম্। কর্ণিকাসু মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্ ॥
তদ্দলেষু বসন্ত্যেব মঞ্জর্য্যঃ প্রেমসংযুতাঃ। তন্মধ্যেবর্ত্ততে কৃষ্ণো রাধামালিঙ্গ্য কৌতুকাৎ ॥
তদ্রাসমণ্ডলং নিত্যং নিগমাগম দুর্গমম্। অপ্রাকৃতপ্রেমবতো নিজলীলা প্রকাশিতা ॥

বিষ্ণুচক্র পরমধাম। শ্রীবইকুণ্ঠ যার নাম ॥
কর্ণিকাপত্ররে বিস্তর। রহস্যপূর্ণ সেহি স্থল ॥
সুবর্ণপীঠ তা উপরে। মণ্ডিত মণি মণ্ডপরে ॥
কর্ণিকা তার মহাধাম। বিষ্ণুক স্থান অনুপম ॥
মঞ্জরীগণ পীঠদলে। সেবা করন্তি প্রেম ভরে ॥
তা মধ্যে রাধা দামোদর। একান্তে করন্তি বিহার ॥
সে নিত্য রাহাস মণ্ডল। আগম অগম্য সে স্থল ॥
সে অপ্রাকৃত প্রেমরসে। মগন অছন্তি বিশেষে ॥
নিজ লীলার পরকাশ। পাঁই বলাইলে মানস ॥
নিত্য বৈকুণ্ঠ নিজধাম। একান্তভাব রাধাশ্যাম ॥

চৈতন্যবন্দনায় শ্রীচৈতন্যকে জগন্নাথ ও রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে এক করে দেখা হলেও মঞ্জরী নির্ণয়কালে কিন্তু শ্রীচৈতন্যকেও 'ভক্তেশ' ও 'ভক্তাবতার' বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- শ্রীচৈতন্য কেলিমঞ্জরী। শ্রীগদাধর নিত্যে শ্রীরাধা, বৃন্দাবনে প্রেমরাধা, আবার সৌভাগ্য মঞ্জরী। শ্রীগৌরী দাস রঙ্গদেবী ও সার মঞ্জরী। হৃদয়ানন্দ প্রিয়ম্বদা মদোন্নতা এবং হৃদয়মঞ্জরী। শ্রীমত্তবলরাম রত্নরেখা ও মোদমঞ্জরী। অতিবড় জগন্নাথ নিত্যে ললিতা, বৃন্দাবনে রঙ্গিনী মালিকা মঞ্জরী।

নিত্যে মঞ্জরীগণ :

"জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসিন্! গৌররূপধৃক্।
ভক্তাবতার! ভক্তেশ! ত্বৎপদং প্রণমাম্যহম্।

কলৌ শ্রীকৃষ্ণঃ সম্ভূতো বিখ্যাতো গৌররূপধৃক্ ।
শ্রীকেলিমঞ্জরী নামা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুঃ ।

স কিশোরবয়াঃ শ্রীমান্ বর্ষং পঞ্চদশাধিকম্ । গ্রহসংখ্যামিতামাসা অহানি সপ্ত তস্য চ । ১
শ্রীগদাধর নামা চ শ্রীরাধা নিত্য মণ্ডলে । বৃন্দাবনে প্রেমরাধা তস্মিন্ বৃন্দাবতী স্মৃতা ।
সৌভাগ্যমঞ্জরী খ্যাত্যা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণভাক্ ; নীলপট্টাম্বর ধরা সুভগাবামমধ্যগা ।
অস্যাবয়ঃ ক্রমঃ পঞ্চদশ বর্ষাণি সংখ্যয়া । অষ্টৌমাসা দ্বাদশ চ দিনানি কথিতানি বৈ । ২
শ্রীগোবিন্দদাস নামা চ বঙ্গদেবী প্রকীর্ত্তিতা । সখীগণেষু সিদ্ধাসা তস্মিংশ্চ সারমঞ্জরী ।
শ্রীকৃষ্ণস্য রসোৎকর্ষা সর্ব বেশাধিকারিণী । শয্যাসেবা স্বর্ণবর্ণা পীতবস্ত্র বিভূষণা ।।
[illegible] ্যাবয়ঃক্রমঃ প্রোক্তো বর্ষাণি চ ত্রয়োদশ । পঞ্চমাসা দশাহানি বিজ্ঞেয়ানি সুবুদ্ধিভিঃ । ৩
সদানন্দো বিখ্যা[illegible] প্রিয়ম্বদা সদোন্নতা । শ্রীকৃষ্ণহৃদয়োল্লাসা নাম্না হৃদয় মঞ্জরী ।
হরিদ্বর্ণ প্রধানা সা নীলবস্ত্র সুশোভনা । বামমধ্যা পুষ্পসেবা হায়ন [illegible] চতুর্দশ ।
মাসাস্ত্রয়ো দিনানিস[illegible] সপ্তৈবেতি বয়ঃক্রমঃ । ৪
শ্রীমন্তোরবলরামশ্চ [illegible]রেখা প্রকীর্ত্তিতা । বালার্কবর্ণ সং[illegible]ক্তা গোকুলে মোদমঞ্জরী ।
[illegible] বদ্‌বস্ত্রা গন্ধসেবা শ্রীকৃষ্ণানন্দবর্দ্ধিকা । বয়ঃক্রমোহস্যাঃ কথিতো বর্ষা ন চ ত্রয়োদশ ।
[illegible]াসাঃ সপ্তৈব দিবসা একাদশ উদাহৃতাঃ । ৫
[illegible] বৃহজ্জগন্নাথ দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমে । সিদ্ধদেহঃ [illegible]দাচারী [illegible] ললিতা স্মৃতা ।
ভগনী মালিকা নাম্না মঞ্জরী গোকুলে তথা । গৌরী গোরোচনাভাসা প্রেমোৎকর্ষ স্বরূপিণী ।
[illegible]ম্বরা বামমধ্যা [illegible] বীটিকা । বয়স্ত্রয়োদশাব্দাশ্চ ষণ্মাসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ । ৬
[illegible]বং মঞ্জর্য্যঃ ষট্ খ্যাতাঃ স্মরণীয়া নিরন্তরম্ ।”

[illegible] স্থলবাসী এ ষট্ মঞ্জরী কলিযুগে মানুষের উদ্ধারের জন্য নবদেহ ধারণ করে [illegible] ঠাকুরের আদেশে ভারতবর্ষে জন্মেছেন ।

এ সব নিত্যস্থলবাসী । মর্ত্ত্যে জনম হেলে আসি ।
কলিরে পাপমতি [illegible]র । করিবা পাষণ্ডি উদ্ধার ॥
নব দেহরে লীলা করি । ভকতি যিবে যে প্রচারি ।
নিত্য ঠাকুরঙ্ক আদেশে । জন্মিলে এ ভারতবর্ষে ॥

[জগন্নাথচরিতামৃত, ১ম অধ্যায়]

জগন্নাথ দাসের ষোলজন শিষ্যের সিদ্ধদেহ নির্ণয় করে বলা হয়েছে—

আদ্যে উদ্ধব দাসে গলে । উপদেশ কর্ণে ধইলে ॥
নিত্যরে চিত্ররেখা অংশু । মর্ত্ত্যে জনমে ভক্তিবশু ॥
রামচন্দ্র দাস = সিদ্ধাঙ্গে চন্দ্রাবলী ।
গোপীনাথ = চিত্রকলা অংশুজাত ।
হরিদাস = প্রিয়া অংশে যে জাত সেহি ।
রামনি মহাপাত্র = কৃষ্ণপ্রয়াণক অংশে হোই ।
[illegible]নন্দন দাস = মনোহরা অংশে সম্ভূত ।
গোপীপাট মহাদেই – অতি মঞ্জরী অংশ সেহি ॥

গোপাল দাসে যে ব্রাহ্মণ=প্রেমানন্দা অংশ যে জাণ ॥
আখণ্ডল দাস=সত্যানন্দা অংশে উৎপত্তি।
জনার্দ্দন পাত্র=প্রেমনন্দাঙ্ক অংশ সেহি।
কৃষ্ণ দাসঙ্ক সেবা দেখি। স্বামী হোইলে মহাসুখী।
নিত্যে কৃষ্ণবল্লভা সেহি। ভক্তি সাধিলে সুখী হোই।
শ্রীবনমালী যে গোসাঁই। ভক্তি সাধন কলে সেহি ॥
নিত্যরে মদন সুন্দরী। সে অংশে জাত বনমালী ॥
গোবর্দ্ধন মহাপাত্র=চন্দ্রকান্তিক অংশে জন্ম।
কাহ্নু খুণ্টিআ যে বোলাই। শশিরেখাঙ্ক অংশ সেহি ॥
শিষ্য যে জগন্নাথ দাসেঁ। উৎপন্ন সে কিশোরী অংশে ॥
মধুসূদন দাসে যেহু। মধুমতী অংশটি সেহু ॥
এ সর্বে নিত্যস্থলবাসী। মনুষ্যরূপে পরকাশি ॥
নিত্যযুগল সেবামান। করুথিলে সিদ্ধ অঙ্গেণ ॥
এতা নিত্যস্থলস্থাশ্চ জগন্নাথস্য সেবকাঃ।
নিত্যসিদ্ধা ভক্তিগ্রাহ্যা রাধাঙ্গ সঙ্গমাশ্রিতাঃ ॥
[জগন্নাথ চরিতামৃত, ত্রয়োদশ অধ্যায়]

মঞ্জরী ভাব : অষ্টকালীয় লীলা

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ হইতেছে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করা। .. 'তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট বস্তুর অনুচিন্তনই স্মরণ'। সেই স্মরণের সুবিধার জন্য তাঁহারা অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের বঙ্গবাসী সংস্করণের ৫২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়ে বৃন্দাদেবী নারদকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতের বর্ণনার মূল বিষয় হুবহু মিলিয়া যায়। ..অনেকে মনে করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া কথিত 'স্মরণ মঙ্গল-স্তোত্র' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই বিষয়ে রচনার উৎস স্বরূপ। উহাতে এগারটী মাত্র শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকে বন্দনা, দ্বিতীয়ে লীলাসূত্র ও বাকী নয়টি শ্লোকে নিশান্ত, প্রাত, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, নিশালীলা বর্ণিত হইয়াছে।… 'দশশ্লোকীভাষ্য'প্রণেতা রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র শ্রীরূপ নিজে লেখেন নাই, তাঁহার ইঙ্গিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপের স্তবমালায় 'স্মরণ মঙ্গল' পাওয়া যায় না।"

[ড. বিমানবিহারী মজুমদার—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ পৃ. ৪৩৯]

জগন্নাথ চরিতামৃত দ্বাদশ অধ্যায়ে অষ্টসখীর অষ্টকালীয় লীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তাদৃশীস্ত্রিয়স্তদ্বপুষা কৃষ্ণৈকত্বমাস্থিতা।
প্রীত্যা তদাস্বাদরতা শ্রীরাধারমণীমণিঃ ॥
চত্বারোহপি ভুজা রাজন্ ভাসন্তে দেবীভুজাবিব।

চত্বার্য্যপি পদান্যেব দৃশ্যন্তে দ্বে পদেইব ॥
এবং রূপেণ তাবত্র বিহরন্তৌ যুগে যুগে।
সখ্যশ্চাষ্টাবষ্টকালং সেবন্তে তাবতীন্দ্রতাঃ ॥
কৃষ্ণদেহরে একদেহ। তাহাঙ্ক ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় ॥...
এ ভাবে যুগল মূরতি। যুগে যুগে যে বিহরন্তি ॥
অষ্ট সখী এ অষ্টকাল। সেবন্তি কিশোরী কিশোর ॥
[জগন্নাথ চরিতামৃত, ত্রয়োদশ অধ্যায়]

অষ্ট সখী হলেন ললিতা, শ্যামলা, শ্রীমতী, হরিপ্রিয়া, বিশালা, শ্রদ্ধা, পদ্মা ও ভদ্রা ; জগন্নাথ রূপী নিত্যকৃষ্ণের সিংহাসন পদ্ম মধ্যে আটদিকে অষ্টনায়িকা অবস্থিত।

সখীকে অষ্ট অষ্ট সখী। সেবা করন্তি কাল দেখি ॥
নায়িকা প্রতি নায়িকারে। সেবা করুছন্তি প্রীতিরে ॥

প্রতি সখীর অনুগ আট আট মঞ্জরী—এঁরা কিভাবে সেবা করেন, সেই সেবাসুখ আস্বাদন করাই বৈষ্ণব তত্ত্ব।—

চতুঃ ষষ্টি সহস্রাণি সেবায়াঃ কথিতং শৃণু।
আস্বাদন সুখামোদং বৈষ্ণবীতত্ত্বলক্ষণং ॥

ললিতায়াঃ সখীগণো যথা—

অঞ্জনা কজ্জলং দত্ত্বা জলং বিশ্বাসবর্দ্ধিনী।
মোহিনী চামরং ধৃত্বা রঙ্গণী পট্টবস্ত্রকম্ ॥
রম্ভা পুষ্পং তু তাম্বূলং সুবিদ্যা দিব্যদর্পণম্।
মালতী রসসঙ্গীতং মালিনী নীলবস্ত্রকম্ ॥

অঞ্জনা যে কজ্জলদানী। জল বিশ্বাস বিবর্দ্ধিনী ॥
মোহিনী চামরকু ধরি। রঙ্গনী পটবস্ত্রচারী ॥
রম্ভা পুষ্পাদি তাম্বূলরে। সুবিদ্যা দিব্য দর্পণরে ॥
মালতী সঙ্গীত গায়িনী। মালিনী নীল বস্ত্র ঘেনি ॥
এ মানে ললিতা আশ্রিতে। সেবা করন্তি অবিরতে ॥

শ্যামলায়াঃ সখীগণো যথা—

স্বর্ণবর্ণা চ কর্পূরং সুবর্ণা চ সুগন্ধকম্।
কেতকী কর্ণভূষাং চ কামদা কেশমার্জনম্ ॥
রত্নকেলী চ সিন্দূরং সুকেলী চোত্তরীয়কম্।
পদ্মা চ মণিমাণিক্যং ভাবিনী কটিমেখলাম্ ॥

স্বর্ণবর্ণা কর্পূর করে। সুবর্ণা সুগন্ধ হস্তরে ॥
কেতকী কর্ণভূষা ঘেনি। কামদা যে কেশ মার্জনী ॥
রত্নকেলী সিন্দূর পাত্র। সুকেলী উত্তরীয় বস্ত্র ॥
পদ্মা মণিমাণিক্য মালা। ভাবিনী কটির মেখলা ॥
এ মানে শ্যামলা মঞ্জরী। অছন্তি সেবা অনুসরি ॥

শ্রীমত্যা মঞ্জরীগণো যথা—

শ্রদ্ধা চ কঙ্কণং ধৃত্বা **মেধা** কস্তুরিকাং তথা।
রম্ভা পদ্মং চামরাদি **কৌতুকী** যন্ত্রবাদিনী॥
লবঙ্গী পারিজাতং চ **ঝিল্লিকা** শ্রীফলং তথা॥
তারা সর্বাণি পুষ্পাণি **চন্দ্রা** সর্বফলানি চ॥

শ্রদ্ধা কঙ্কণ করে ধরি। মেধা হস্তরে যে কস্তুরী॥
রম্ভা পদ্ম চামর ঘেনি। কৌতুকী যে যন্ত্র বাদিনী॥
লবঙ্গী পারিজাত করে। ঝিল্লিকা শ্রীফল মোদরে॥
তারা সমস্ত পুষ্প মাল। চন্দ্রাব ধরে সর্ব ফল॥
এ মানে শ্রীমতী অধীনা। সেবারে সদা সুশোভনা॥

হরি প্রিয়া মঞ্জরীগণো যথা—

রত্নরেখা সুভোগং চ **শশিরেখা** সুপাত্রকম্।
মঙ্গলা গীত নাট্যো চ **মল্লিকা** ধূপদীপকো॥
চম্পকা দিব্যবাদ্যং চ **কদম্বা** নৃত্যশালিনী।
পদ্মা শিখণ্ডব্যজন মালাপং **কাম মর্দিনী**॥

রত্নরেখা সুভোগ ধরে। শশিরেখা সুপাত্র করে।
মঙ্গলা গীতি নাট্য করি। মল্লিকা ধূপ দীপ ধরি॥
চম্পকা দিব্যবাদ্য বাই। কদম্বা নৃত্যশালী হোই॥
পদ্মা শিখণ্ড ব্যজনকু। কাম মর্দিনী আলাপক॥
এ হরি প্রিয়াঙ্ক মঞ্জরী। অছন্তি সেবা অনুসরি॥

বিশালায়াঃ মঞ্জরীগণো যথা—

চন্দ্রিকা কালগানং চ বর্ণনং **পাদমঞ্জরী**।
কুমুদিনী ভ্রূভঙ্গী চ **তরুণা** মুদ্রিকাদিভিঃ॥
পদ্মিনী পদ্মমালাং চ **শঙ্খিনী** চ ষড়র্ঘ্যকম্।
মালিনী বাক্যালাপং চ **দিব্যাঙ্গী** কেশমার্জনী॥

চন্দ্রিকা তাল গায়নার। বর্ণনা পাদ মঞ্জরীরে।
কুমুদিনী ভ্রূভঙ্গিমারে। তরুণা মুদ্রিকাদি ধরি॥
পদ্মিনী পদ্মমালা কর। শঙ্খিনী ষড়র্ঘ্য সম্ভার॥
মালিনী কাব্য আলাপরে। দিব্যাঙ্গী বেশ মার্জনরে॥
এ মানে বিশাখা মঞ্জরী। অছন্তি কাল অনুসরি॥

শ্রদ্ধয়া মঞ্জরীগণো যথা—

বিশেষা ভূমিস্তবনং **চন্দনী** ঘণ্টবাদিনী।
বেদোদ্গাত্রী **জয়া** চৈব **সৌগন্ধী** সাঙ্গভূষণা॥
সুবাণী বৌনপুষ্পং চ **প্রবলা** সঙ্গীতং তথা।
তরলা পাদসেবাং চ **চঞ্চলা** চাপ্যলক্তকম্॥

বিশেষা জগান জগাই। চন্দনী ঘণ্টা যে বজাই ॥
জয়া বেদকু গান করে। সৌগন্ধী অঙ্গভূষা করে ॥
সুবানী বেণি পুষ্পকর। প্রবলা সংগীত বিচার ॥
তরলা পাদ সেবা যুক্ত। চঞ্চলা পাদরে অলক্ত ॥
এ শ্রদ্ধা দেবীঙ্ক মঞ্জরী। অছন্তি নিত্য সেবা করি ॥

পদ্মায়াঃ মঞ্জরীগণো যথা—

বরাঙ্গী পত্রিকাত্রাসং **কুশলা** ছত্রধারিণী।
মাধুরী বেশ বস্ত্রং চ **নারঙ্গী** মধুপাত্রকম্ ॥
কমলা কুরুতে স্তোত্রং **মৃদঙ্গী** হাস্যলালসী।
চন্দ্রা চৈব চমৎকারং **মৃগাক্ষী**মোদদায়িনী ॥

বরাঙ্গী যে পত্রিকা ত্রাস। কুশলা ছত্র ধরি পাশ ॥
মাধুরী বেশ বস্ত্র সার। নারঙ্গী মধুপাত্র কর ॥
কমলা স্তোত্র উচারই। মৃদঙ্গী হস্যরে মোহই ॥
চন্দ্রা চমৎকার দেখাই। মৃগাক্ষী অতি মোদদায়ী ॥
এ পরি পদ্মাঙ্ক মঞ্জরী। স্বভাবে ছন্তি অনুসরি ॥

ভদ্রায়াঃ মঞ্জরীগণো যথা—

উৎকণ্ঠা মধুরালাপং **মঞ্জরী** ভোগ সম্পদম্।
মধুমতী সভামার্জিং **ধন্যা** কিরীটি সঞ্চয়ম্ ॥
মৃদঙ্গী মার্জনী হস্তা **বিশ্বাসা** সর্বশোধনী।
গৌরবী বেণু হস্তা চ **বিচিত্রা** সর্বসাধিনী ॥

উৎকণ্ঠা মধুরালাপবে। মঞ্জরী ভোগ সংপদবে ॥
মধুমতী সভা মার্জনে। ধন্যা কিরীটি সংচয়নে ॥
মৃদঙ্গী মার্জনী হস্তরে। বিশ্বাসা সর্ব শোধনরে ॥
গৌরবী বেণু হস্তে ধরি। বিচিত্রা সর্ব সন্ধি করি।
এ ভদ্রা সখী মনোহরা। নিত্যে এহি পরম্পরা ॥

এতাশ্চাষ্টদলে পদ্মে তিষ্ঠন্তি সেবনে রতাঃ।
আসামেকৈকশশ্চাষ্টৌ সখ্যস্তু পরিচারিকাঃ ॥

এ সর্বে অষ্টদল মধ্যে। সেবা করুছন্তি আনন্দে ॥
এককে অষ্ট অষ্ট সখী। সেবা করিণ হোন্তি সুখী ॥

সুতরাং দেখা গেল, কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে ভূরি ভূরি সাদৃশ্যও আছে জগন্নাথ দাস আচরিত ধর্মসাধনায়। সখীভাব ও মঞ্জরীভাব সাধনার ক্ষেত্রে রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' (রচনাকাল ১৫৪১ খ্রীঃ) এবং কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' (১৫৭৬ খ্রীঃ)-র প্রভাব সুস্পষ্ট। নায়িকা (হরিপ্রিয়া) প্রকরণে রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' (ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর কয়েক বৎসর পরে রচিত) গ্রন্থকে অনুসরণ করা হয়েছে। উপরন্তু শ্রীচৈতন্যসমাদৃত

'ব্রহ্মসংহিতা'ই পঞ্চসখা প্রচারিত শূন্যতত্ত্বের আকর গ্রন্থ। অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদি পর্বের সঙ্গে জগন্নাথ দাসাদি পঞ্চসখা প্রচারিত তত্ত্বের যে খুবই নৈকট্য ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। জগন্নাথ চরিতামৃতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

১. শ্রীচৈতন্যের স্বরচিত স্তোত্র ও উপদেশ

ক. ব্রাজনগর স্থিত বৈষ্ণবদের পত্রযোগে উপদেশ দিয়ে মহাপ্রভু লেখেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এবং 'তত্রস্থৈ বৈষ্ণবৈঃ সর্বৈরস্য সম্বর্ধনংকৃতম্।
শ্রীমুখোক্তশ্চ পঠিতা তেষাং মোদ বিবর্দ্ধিনী॥'

[জগন্নাথ চরিতামৃত, অধ্যায় ৩।]

খ. 'কদাচিৎ কালিন্দী তটবিপিন সঙ্গীত করবো
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদ মধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মামরপতি গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥'[১] [তদেব, অধ্যায় ২০।]

গ. 'কুলাচারোধর্মো ন কিল যতিধর্মোন বচনম্
ন বেদাভ্যাসো বা ন পরমতপো নাপি সুরভুঃ।
ন বৈকুণ্ঠাবাসো ন পুনরবনীশস্য পদবী
জগন্নাথাদন্যঃ স্ফুরতু ন হি কো বা মম হৃদি'॥

[জগন্নাথ চরিতামৃত, ষষ্ঠ ও দশম অধ্যায়]

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮শ বার্ষিক দশম মাসিক অধিবেশনে শ্রীশিবচন্দ্র শীল 'শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দশক' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩২১ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (পৃ. ৮৯-৯১) প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। শীল মহাশয় লিখেছেন—"সন ১২৭৪ সালে ৯৬ নং আহীরিটোলায় শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'নিত্যকর্ম' পুস্তকের ৫-৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মুখপদ্ম বিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টকং" দেখিতে পাই। উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। ...১২২৮ চৈত্র সংখ্যার 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' দেখিলাম 'কবি বিশ্বম্ভর পানি ও জগন্নাথ মঙ্গল' প্রবন্ধলেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বলিতেছেন,—জগন্নাথ মঙ্গলের সন ১৩০১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে 'জগন্নাথের স্তব' নূতন সন্নিবিষ্ট নূতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে—"জগন্নাথের স্তবটি সেই সর্বজন পরিচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মুখপদ্ম বিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টক।" ...আমি বহু বৎসর পূর্বে আমার গৃহস্থিত পুঁথিসমূহের মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাতড়া পাই। ঐ তিনখানিতেই তিনটি জগন্নাথ দশক লিখিত. জগন্নাথ দশকের পাঠের মেলন করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনা করি, মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থান কালে এই জগন্নাথ দশক রচনা করিয়া, ইহা দ্বারা জগন্নাথ দেবের স্তব করিয়াছিলেন। ...আমি যে জগন্নাথ দশকের উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই,—

"শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
কদাচিৎ কালিন্দীতট বিপিন সংসর্গি ভবনে
মুদ ভীরীনারীবদন কমল স্বাদ মধুপঃ।
রমাশম্ভু ব্রহ্মা সুরপরিগণেশ চিত পদো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥..."

রূপগোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে (৬৩ অঃ/৭৪) শ্রীচৈতন্য রচিত একটি শ্লোক—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে–
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

জগন্নাথচরিতামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকটির ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

২. শ্রীচৈতন্য সকলমার্গ অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণনাম গান করতেন—

"চৈতন্যঃ কৃষ্ণনাম স্বজন পরিবৃতঃ সর্বমার্গানুসারম্,–
গায়ন্ যে তত্ত্বসারং পরমমনুমথ শ্রীজগন্নাথ রূপম্।
দিব্যং ত্রৈলোক্যপূজ্যং সুজনকরুচিরং ভক্তিদং প্রেমমূর্ত্তিং–
ধন্বন্ ক্ষেত্রে সদান্তে সুরগণ মহিতে তং নমাম্যোহনুকালম্ ॥

শুন সুজনে দেই মতি। চৈতন্য দেবঙ্ক প্রখ্যাতি ॥
প্রভু যে ভক্তগণ সঙ্গে। মহাআনন্দে ভক্তিরঙ্গে ॥
সকল মার্গ অনুসরি। শ্রীকৃষ্ণ নাম গান করি ॥
পরম মন্ত্র মূর্ত্তিমন্ত। শ্রীমূর্ত্তি প্রভু জগন্নাথ ॥
তিনি লোকের পূজ্য যেহু। কনকরুচি মহাবাহু ॥
ভক্তি দায়ক প্রেমমূর্ত্তি। তাহাঙ্ক রূপ হৃদে চিন্তি ॥
সুরপূজিত যে পবিত্র। খ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ॥
তহিঁ যে নিত্যকালে বাস। বন্দই তাঙ্কু অহর্নিশ ॥

[তদেব, চতুর্থ অধ্যায়।]

৩. সার্বভৌম-কৃত চৈতন্যবন্দনা—

ত্বং ব্রহ্মসারঃ সুখবেশধারী ত্বং কৃষ্ণদেবো রুচিরাননশ্চ
শশাঙ্ক সৌম্যো জগদাদিনাথঃ স্ফূর্তীরাতঃ প্রীতিরিতি ত্বয়িসন্তঃ ॥
সার্বভৌমগতং মৌর্খং নাজ্ঞাতং বিদ্যতে তব।
তব নামকৃপাম্ভোধিঃ ক্ষমস্বাগঃ কৃপাং কুরু ॥
ত্বমেব সর্বরূপশ্চ ত্বমেব করুণোদয়ঃ।
ত্বমেব রসিকশ্রেষ্ঠ ত্বমেব শরণং মম ॥
মাতা-পিতা সখা-ভ্রাতা জগতাং পরমো ভবান্।
অধমে ময়ি ভো ব্রহ্মণ্ জ্ঞানালোকং প্রকাশয় ॥ [তদেব, চতুর্থ অধ্যায়]

৪. চৈতন্য-রামানন্দ সংবাদ

জগন্নাথ দাস তাঁর শিষ্যদের চৈতন্যরামানন্দ বৃত্তান্ত শুনিয়ে উপদেশ দিয়েছেন চৈতন্য ইষ্ট সাধ্যপদ হৃদয়ে নিত্য স্মরণ করতে ঃ—

শ্রীগুরুরুবাচ

শৃণুধ্বং ভো শিষ্যগণাঃ শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গতম্।
গোদাবরী তটাসীনং রায় রামানন্দঙ্ক প্রতি ॥

পৃষ্টবান্ তৎকথাব্যাজাৎ শ্রোতুং কর্ম্মহিমার্ণবঃ ।
তৎসর্বং কথয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥
বিদ্যা মধ্যে ভক্তি বিদ্যা তৎকর্ম শ্রেষ্ঠমেব চ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলপ্রেমা সম্পত্তিরেব চ ॥
উক্তা চৈতন্যায়রামানন্দো ভক্তিং সমাশ্রিতঃ ॥

শুন হে শিষ্যগণে উক্ত চৈতন্যচরিত অমৃত ॥
গোদাবরী তটরে আসি । বিজয় চৈতন্য সন্ন্যাসী ॥
রায় রামানন্দ যে ছিলে । প্রভু তাহাঙ্কু পচারিলে ॥
তাহাংক হৃদয়ে প্রবেশ—করি শুনিবে এ সন্দেশ ॥
এ ইচ্ছা হৃদয়রে পোষি । পুছিলে চৈতন্য সন্ন্যাসী ॥
বিদ্যামধ্যরে কে বা সার । কহ হে রামানন্দ বর ॥
কহিলে রামানন্দ রায় । ভকতি বিদ্যাটি নিশ্চয় ॥
সংসারে যেতে কর্মস্থায়ী । ভক্তিকর্মটি শ্রেষ্ঠ হোই ॥
সংপত্তি রাধাকর্মপ্রেম । যুগল ভাব অতিপ্রেম ॥
যে যুগ্মপ্রেম ন জানই । দুঃখীংকপরে দুঃখী সেহি ॥
যে রাধাকৃষ্ণ ভক্তি সাধে । সে শিরোমণি ভক্ত মধ্যে ॥
জ্ঞানীংক পরে জ্ঞানী সেহি । যে রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধ্যায়ি ॥
তহিঁ হরষ রামানন্দ । চৈতন্য ইষ্ট সাধ্য পদ ॥
য়ে কথা কহিলুঁ তুম্ভংকু । হৃদয়ে নিত্য ভাবিবাকু ॥

[তদেব, ত্রয়োদশ অধ্যায়]

(৬) জগন্নাথ দাস-প্রতাপরুদ্র সংবাদ

রাজা প্রতাপরুদ্রের উত্তরে জগন্নাথ দাস নীলাচলে রাধাকৃষ্ণ বা প্রকৃতি পুরুষের অনাদিক্রীড়ার রহস্য প্রকাশ করেছেন ঃ

রাজোবাচ—

নীলাদ্রৌ পরমঃ কৃষ্ণঃ স্থিতো রাধিকয়া সহ ।
কল্পকোটিমিতে কালে গতেঽপি চ তয়োঃ কদা ॥
ক্রীড়াভঙ্গো ন জায়েত প্রকৃত্যা পুরুষো যতঃ ।
ক্রীড়ত্যনাদিভগবান্ বিচ্ছেদ্যেত কথং নু বা ॥
সন্তি পৃথিব্যাং স্থানানি প্রসিদ্ধানি বহূন্যপি ।
এতৎ স্থানং কথং স্বামিন্ ভগবৎপ্রীতিদায়কম্ ॥
কথং গুহ্যতমংদেব রাধাকৃষ্ণরহঃ স্থলম্
অধমোদ্ধারকস্তং মে সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি ॥

নীল অচলরে পরম—কৃষ্ণরাধারে করি প্রেম ॥
কোটি এ যুগ যেবে হোই । এ ক্রীড়াভঙ্গ তেবে নোহি ॥
পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গরে । ক্রীড়া করন্তি নিরন্তরে ॥

এ ক্রীড়াঙ্গ হেব কাহু । যেহেতু নিত্যস্থল এহু ॥
ভেবে মু পচারই দেব । বুঝাই মোতে কহিদেব ॥
পৃথিবী মধ্যরে বহুত । প্রসিদ্ধ স্থান এহি মত ॥
এ স্থান কি পাই অটই । শ্রীকৃষ্ণংকর প্রীতিদায়ী ॥
রাধাকৃষ্ণ রাসকেলি । কি পরি অটে গুপ্তস্থলী ॥
তুম্ভে অধম উদ্ধারণ । সংশয় কর নিবারণ ॥

এর উত্তরে জগন্নাথ দাস পুরাণ প্রবচন উল্লেখ করে বললেন—

সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মণ্ রাজতে নীল পর্বতঃ ।
পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপ সুদুর্লভম্ ॥
সুরাসুরাণাং দুর্জ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছাদিতং মম ।
সর্বসঙ্গ পরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ ॥
ক্ষরাক্ষরাবতিক্রম্য বর্তেঽহং পুরুষোত্তমে ।
সৃষ্ট্যা লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রংমে পুরুষোত্তমম্ ॥
সিংহাসনং যোগমায়াযুক্তং ব্রহ্ম ত্বয়া সহ ।
ক্ষীরনীরে যথাঽভিন্ন তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকে ॥
প্রত্যঙ্গং বলদেবোঽপি পার্শ্বস্থঃ সহ পূজিতঃ ।
জাতান্যসংখ্যরূপানি শ্রীরাধানখরশ্মিতঃ ॥
বিষ্ণুকোটি দেবকোটিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডমেবচ ॥
অবতারী জগন্নাথোঽবতারান্ কোটিশোঽসৃজৎ ॥
রাধিকাসঙ্গনিরতঃ কদাচিন্নো বিযুজ্যতে ।···
ন দৃশ্যতে তদ্যুগ্মাঙ্গং কদাচিদ্দৃশ্যতে পুনঃ ।
প্রেমমূর্ত্তেঃ কৃপা যস্মিন্ তস্মৈতচ্চ প্রদৃশ্যতে ॥
নিত্য নীলাচলাখ্যোঽয়ং সর্বোপরি বিরাজতে ।
রঙ্গভূমিরিবাভাতি শেষদেব শিরঃ স্থিতঃ ॥

সে বেনি অঙ্গ ন দিশই । দিশন্তি ভক্তি ভাবে কাহিঁ ॥
প্রেম মূর্ত্তি কৃপা যাহারে । সে করি পারন্তি গোচরে ॥
যে রাধা সে কৃষ্ণ অটন্তি । কৃষ্ণ রাধা ভাবেণ ছন্তি ॥
যুগ্মাঙ্গ অভেদ পীরতি । প্রেমভক্তে এহা জানন্তি ॥
নীল কন্দরে কৃষ্ণরাধা । ক্রীড়া করুছন্তি সর্বদা ॥
সমস্ত পরে দেব এহি । এ ভাবে প্রেমাঙ্গ জানই ॥
সে নীলাচল নাম বহি । রাহাস স্থল এ অটই ॥
এ রঙ্গভূমির মধ্যরে । শেষদেবঙ্ক শির পরে ॥
অষ্টদল পদ্ম মধ্যরে । চিন্তামণি পীঠ উপরে ॥
অশেষ লীলারে বিহার । অগম্য অপ্রেমী জনর ॥

[জগন্নাথচরিতামৃত, দ্বাদশ অধ্যায়]।

৬. জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা অনুসারে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। দিবাকর দাস লিখেছেন—

নবধা ভক্তির লক্ষণ। চৌষঠি অঙ্গ এ প্রমাণ ॥
দর্শন মাত্রে ভক্ত মুক্তি। কামনা সিদ্ধি পদ প্রাপ্তি ॥
মাধুর্যভাবে এথে ভজ। অন্যান্য ভাব দূরে তেজ ॥
শ্রী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। এভাবে শ্রীমুখ বচন ॥
বৈষ্ণব মানে যেতে থিলে। শুনি সন্তোষ সর্বে হেলে ॥
থিলে আত বড় গোসাই। প্রভু আজ্ঞা শুনিলে তহিঁ ॥
সে কথা মনরে রাখলে। ষোল চউপদী লেখিলে ॥
শ্রী রাধাকৃষ্ণ প্রেম যেহি। গ্রন্থে সংগ্রহ কলে নেই ॥
সমস্ত তহিঁ বিস্তারিলে। যাহা চৈতন্য আজ্ঞা দেলে ॥
জগমোহন ঘরে সেহি। এতেক প্রসঙ্গ পড়ই ॥
এতেক প্রসঙ্গ প্রমাণ। শ্রী চইতন্যঙ্ক বচন ॥ [তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়]

যাঁরা বলেন, শ্রীচৈতন্য-সংস্পর্শে আসার আগেই জগন্নাথ দাস গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, তাঁরা স্পষ্টত ভ্রান্ত। চৈতন্য আজ্ঞায় জগন্নাথ দাস ভাগবত অনুবাদ করেছেন, এ তথ্য ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবতেও আছে।

৭. গ্রন্থ সমাপ্তিতে দিবাকর দাস বলেছেন, ১৮ বছর বয়সে জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পান, ৬ বছর নিরন্তর তাঁর পদসেবা করেন, তারপর ৩৬ বছর প্রেমধর্ম সাধনে কাটিয়ে ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

ওড়িষ্যার কাপিলেশ্বরপুর গ্রামে ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে জগন্নাথ দাসের জন্ম। পিতা পুরাণ পণ্ডা, মা পদ্মাবতী। বারো বছর বয়সে পিতা বিবাহ স্থির করলে জগন্নাথ বিবাহে আপত্তি জানান। জগন্নাথ বেদবেদান্ত রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ইত্যাদি পড়লেন। আঠারো বছর বয়সে শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হল। এই বছরই তিনি ওড়িআ ভাষায় ভাগবত রচনা করেন।—

'খেল কৌতুকে শিশুমেলে। বিদ্যা পঢ়িলে যথাকালে ॥
যথাকালরে ব্রতবিধি। বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্র আদি ॥
কলাপ বর্দ্ধমান দুই। রখিলে জিহ্বাগ্ররে নেই ॥
অনায়াসরে হুএ সাধ্য। সর্বদা মনরে আনন্দ ॥
জনম যেতে কালু মহী। হেতুহুঁ কৃষ্ণভক্তি হোই ॥
দ্বাদশ বরষর বেলে। পিতা বিবাহ বিচারিলে ॥
পিতাঙ্কু বিভা বোলি নাস্তি। সিদ্ধান্ত বেদান্ত পঢ়ন্তি ॥
ঋক যজু যে সাম তিনি। বেদ অভ্যাস কলে পুণি ॥
সকল শাস্ত্রে পূর্ণ হেলে। ভারত সমগ্র পঢ়িলে ॥
শ্রীরামায়ণ গ্রন্থ সাধি। শ্রীভাগবতে দেলে বুদ্ধি ॥
দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত। টীকা টিপ্পনীহিঁ সহিত ॥
এমান সাধিলে বিশেষ। হাইলা অষ্টাদশ বর্ষ ॥
বটগণেশঙ্ক অগ্রত। রচিলে ভাষা ভাগবত ॥

[জগন্নাথচরিতামৃত, প্রথম অধ্যায়।]

এবং, 'অষ্টাদশ বরষঠারে। শ্রীচইতন্য ভেট হেলে ॥
ষড় বরষ নিরন্তর। সেবিলে চৈতন্য পয়র ॥
এ অন্তে ছতিশ বরষ। প্রেম সাধিলে অহর্নিশ ॥
ষাঠি এ বর্ষ সময়রে। প্রেম স্থাপি স্থানে গমিলে ॥
[তদেব, চতুর্বিংশ অধ্যায়]

৮. গ্রন্থশেষে দিবাকর দাস লিখেছেন—
'সে গুরু চরণাবুজরস। পিঅই দিবাকর দাস ॥
জগন্নাথ চরিতামৃত। সুজনে পিঅ শ্রুতিপথ ॥
হে সাধুজনমানে শুণ। শ্রীগুরুদেবঙ্ক পুরাণ ॥
সংসারে এ জাহ্নবীনীর— পবিত্র ধার বহে খর ॥
সাধু এ এথি হুঅ মগ্ন। সংসারে ন হুঅ উদ্‌বিগ্ন ॥
বিপ্র দিবাকর কহই। ভবজলকু নাব এহি ॥
মুঁ অটে মূঢ় অকিঞ্চন। কিবা বর্ণিবাকু ভাজন।
গুরুঙ্ক লেখারু সুচনা। পাই যা করিছি বর্ণনা ॥
সে থিরে থিলে দোষমান। ক্ষমা করিব সাধুজন ॥

ঈশ্বরদাস : চৈতন্যভাগবত

চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল

ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, "চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১৫০/১৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয়, মনে করা যাইতে পারে" (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৪৯৬)

পক্ষান্তরে, প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ঈশ্বরদাসের জীবৎকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (*The History of Medieval Vaishnavism in Orissa* p. 58)।

ড. মজুমদার চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত একটি গুরু প্রণালীর উল্লেখ করেছেন। সেটি নিম্নোক্তরূপ,—মত্ত বলরাম-জগন্নাথ দাস-বিপ্র বনমালী-কেলিকৃষ্ণ দাস-পুরুষোত্তম দাস কৃষ্ণবল্লভ-কাহ্নুদাস। এর মধ্যে বলরাম ও জগন্নাথ দাস চৈতন্যের সমসাময়িক। এঁদের পর থেকে কাহ্নুদাস পর্যন্ত প্রত্যেক গুরুর সময় ২৫ বছর হিসেবে এবং ঈশ্বরদাসকে কাহ্নুদাসের শিষ্য বলে নিরূপণ করে ড. মজুমদার চৈতন্যভাগবতকে চৈতন্যতিরোভাবের ১৫০/১৭৫ বছর পরের রচনা বলে স্থির করেছেন।

ড. মজুমদারের এই হিসাবে ফাঁক আছে। প্রত্যেক গুরুর সময় সীমা ২৫ বছর ধরার কোন যুক্তি নেই। কেননা, পুরুষানুক্রমে ও শিষ্যানুক্রমে পার্থক্য আছে। এক পুরুষেই যে একাধিক শিষ্যানুক্রম হতে পারে, তার প্রমাণ ত এই গুরু-প্রণালীতেই আছে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় 'চৈতন্যভাগবতে'র আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে এর কালনির্ণয় করতে চেয়েছেন। চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট অংশে ঈশ্বরদাস জানিয়েছেন যে, পুরীর মুক্তিমণ্ডপে যখন তাঁর কাব্যের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছিল, তখন উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ বুধমণ্ডলী কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করেন; কিন্তু খ্যাতনামা সন্ন্যাসী মহাপ্রভুপার্ষদ বাসুদেব তীর্থ শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হওয়ার ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারলেন না। এই ঘটনায় বোঝা যায়, ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবত যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনও চৈতন্যদেবের তিরোভাব নিয়ে লোকে বলাবলি করছে। এ কাব্যে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের এবং দিবাকর দাস রচিত জগন্নাথ চরিতামৃতের উল্লেখ আছে। সুতরাং বীরভদ্রের প্রতিষ্ঠা এবং জগন্নাথ চরিতামৃত রচনার পরই একাব্য রচিত হয়। জগন্নাথ চরিতামৃতে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র' উল্লেখ আছে এই কথা ভেবে নিয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরদাসের কালনির্ণয় করেছেন: '**Thus Iswara Dasa lived possibly in the first half of the 17th century** (***A History of the Medieval Viashnavism in Orissa***, **p. 88**)

শ্রীমুখোপাধ্যায় 'চৈতন্য চরিতামৃত' উল্লেখ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং ধরে নিয়েছেন উল্লিখিত কাব্যটি কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত। কিন্তু তা ধরে নেবার বিশেষ কোন যুক্তি নেই। তিনি জগন্নাথ চরিতামৃতের যে অংশটি উদ্ধার করেছেন, সেটি হল—

"চৈতন্য চরিত অমৃত। গোদাবরী কুল চরিত।।
রায় রামানন্দ পুচ্ছিলে। শচীকুমর আজ্ঞা কলে।।"

এই 'চৈতন্য চরিত অমৃত'শ্রীচৈতন্যের চরিত মাধুরীর প্রতিই প্রযোজ্য, কোন কাব্যবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না।

জগন্নাথ চরিতামৃতের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আরেকটি স্থল উদ্ধৃত হল—

শ্রীগুরুরুবাচ

শৃণ্বধং ভো শিষ্যগণাঃ শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গতম্।
গোদাবরী তটাসীনং রায়রামানন্দঙ্ক প্রাত।।...

শুন হে শিষ্যগণে উক্ত—চৈতন্যচরিত অমৃত।।
গোদাবরী তটরে আসি। বিজয় চৈতন্য সন্ন্যাসী।।
রায় রামানন্দ যে থিলে। প্রভু তাহাঙ্কু পচারিলে।।

'চৈতন্য চরিত অমৃত' এখানে চৈতন্যমুখোদ্গত অমৃতবাণী। কোন গ্রন্থ এখানে উদ্দিষ্ট নয়।

আসলে ঈশ্বদাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার কাল নির্দেশ করা যায় তাঁর কাব্যের পরিশেষে পরিবেশিত তথ্য থেকে। ঈশ্বরদাস তাঁর কাব্যের পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ অবতার পাঁই। অচিন্তে শয়ন গোসাই।
তদন্তে ত্রৈলোক্য ঠাকুর। ধইলে চৈতন্য শরীর।
কালেক সন্ন্যাসে বিহরি। প্রবেশ যাই নীলগিরি।

শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। দেখন্তি সর্ব বিদুজন।
এ শাস্ত্র মুক্তমণ্ডপেণ। শুণন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
য়েমন্ত সময়রে মুহিঁ। শ্রীপুরুষোত্তম গলইঁ।
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী। আপে সরস্বতী প্রকাশি।
তাঙ্ক ছামুরে পুণি গ্রন্থ। প্রকাশ কলে বৈষ্ণবন্ত।
অনেক বিপ্র তপী জন। শুণন্তি মুক্তমণ্ডপেণ।
সমস্তে আনন্দে শুনন্তি। গ্রন্থকর্ত্তাকু প্রশংসন্তি। [২৪-৩০]
প্রভু অঙ্গে চৈতন্য মিশি। তীর্থঙ্ক মনকু ন আসি।
বৈষ্ণবে প্রমাণ করন্তি। সন্ন্যাসী বেভে ন মানন্তি। ৪২-৪৩
তীর্থে যে কহন্তি মধুর। বোলন্তি শুণ হে ঈশ্বর। ৪৬
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। কাহুঁ লেখিল এ বচন। ৪৯

এই বাসুদেব তীর্থ কে?

ড. বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীজীবগোস্বামীর নামাঙ্কিত যে সংস্কৃত বৈষ্ণব বন্দনার পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, সেই বন্দনার ২৭১ পংক্তিতে আছে 'বন্দে বাসুদেবং তীর্থং শ্রীলানন্তপুরীং ততঃ। 'প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা (১৩১ নং) ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব বন্দনায়ও (১৩০ নং) বাসুদেব তীর্থের উল্লেখ আছে। হরিদাস দাস প্রণীত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন' গ্রন্থে (পৃ. ১২৯-৩০) বলা হয়েছে—"বাসুদেব তীর্থ-শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব বন্দনা)। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম (গৌ.গ ৯৮.১০১)।

বাসুদেব তীর্থ! মনে রহু সে চরিত।
জীবে কৃপা লাগি যার বেশ বিপরীত।। (নামা ১৬৪)

সুতরাং বাসুদেব তীর্থ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসী পরিকরদের অন্যতম।

ঈশ্বদাস তাঁর গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের পরবর্তীকালে বাসুদেব তীর্থের প্রসঙ্গটি সংযোজিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মূলগ্রন্থ বাসুদেব তীর্থের জীবদ্দশায় রচিত। বাসুদেব তীর্থের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায় না। তিনি চৈতন্য পার্ষদ। চৈতন্যদেবের সমবয়সী হলে তাঁর জীবৎকালের শেষ সীমা ধরা যায় ষোড়শ শতকের শেষভাগ এবং ঐ সময়ই ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ধরা যেতে পারে।

গ্রন্থ পরিচয়ঃ

১ অধ্যায়ঃ ভক্তকবি ঈশ্বর দাস স্বকৃত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে জগন্নাথের সগুণ নিগুর্ণ উভয় ভাবের স্তুতি করেছেন। অরূপ চিন্ময় ভগবান; ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশ নিমিত্ত সংসারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। গ্রন্থকার এ গ্রন্থে ভগবান বিষ্ণুর সাধারণতঃ নবম অবতার বুদ্ধের স্থলে চৈতন্যকে বুদ্ধরূপে গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যচন্দ্র নদীয়া নগরীতে অবতীর্ণ হয়ে জনসাধারণকে পশুজন্ম থেকে উদ্ধার করেছিলেন, এই বিষয় গ্রন্থকার বর্ণনা করতে মনস্থ করেছেন, উৎকলের অন্যান্য পুরাণ ও গ্রন্থকারের ন্যায় তাঁরও স্বপ্নাদিষ্ট হবার কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁকে গ্রন্থরচনা করার আদেশ দিলেন। তিনি বাগ্দেবীর নিকট নিজের বাক্যস্ফুরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করলেন। তারপর গুরুরূপী প্রাচীন সাধুসন্তদের নমস্কার করলেন। ভগবান চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজের নাম নিজে গান করে জগৎকে উদ্ধার করেছেন এবং চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞানভক্তির স্বরূপ—এই কথা বলে কবি জনসাধারণকে তাঁর গ্রন্থের দোষ না ধরে অনুকূল হৃদয়ে গ্রন্থ পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। সর্বশেষে জ্যোতিষ কুলে তাঁর জন্ম—এই পরিচয় দিয়ে এবং নিজের নাম উল্লেখ করেছেন।

২ অধ্যায়ঃ অতি ধার্মিক ও প্রজাবৎসল সম্পূর্ণ নগর রাজার সভায় অগস্ত্য ঋষি উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে যথোচিত সম্বর্ধনা করে বিষ্ণুর নবম অবতারের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন কৃষ্ণ অবতারের পর ভগবান বৈকুণ্ঠে যোগস্থ ছিলেন। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবী ব্রহ্মাকে নিজের দুঃখ জানালে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নবম অবতারের প্রয়োজন জানাবার জন্য নারদকে বিষ্ণুর কাছে পাঠালেন। নারদের আগমনের কারণ বিষ্ণু জানতে চাইলেন, নারদ বলল—'প্রভো! তীর্থ-ধাম-সহিত মর্ত্ত্যে সর্বত্র ধর্মের গ্লানিহেতু পৃথিবীদেবী ভারবহনে অসমর্থ; সে কারণে ব্রহ্মা—"আপনি অবতীর্ণ হয়ে ধর্মস্থাপন করুন" এই অনুরোধ করার নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।'

তা শুনে ভগবান বললেন—'দেব-গন্ধর্ব-যক্ষগণ জগতে আবির্ভূত হয়ে গুপ্তভাবে থাকুক। আমি নদীয়ায় বিপ্রঘরে জন্ম নেব এবং লোককে হরিদীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করব।' তারপর ভগবান নারদকে বিদায় দিলেন। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিজের মত জানিয়ে গরুড়কে দিয়ে দ্বাদশ গোপাল, পঞ্চসখা ও জয় বিজয়কে জানিবে পঞ্চসখাকে বললেন—'তোমরা মর্ত্ত্যে নীলাচল সমীপস্থ ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে পুরাণ ও রসময়গীতি রচনা করে জগন্নাথকে সেবা করবে এবং সেখানে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে।' গরুড় এবং জয়-বিজয়কে মর্ত্ত্যে জন্ম নিয়ে তাঁর লীলায় যোগদানের আদেশ দিলেন।

তখন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকাকে অদ্বৈতরূপে ও বলভদ্রকে নিত্যানন্দরূপে জন্ম গ্রহণের আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী সরস্বতীকে রেখে মর্ত্ত্যে বিপ্র সন্ন্যাসীরূপে এসে নদীয়া নগরীতে পুরন্দর মিশ্রের ঘরে শূন্যপথে প্রবেশ করলেন। পুরন্দর মিশ্রের তিন নাম—যথাঃ জগন্নাথ, পুরন্দর, বিপ্রবর। তাঁর কনিষ্ঠ দুই ভাই-এর নাম যথাক্রমে নীলকণ্ঠ, আদিবন্ত ও ভগিনী চন্দ্রকান্তি। নীলকণ্ঠ জন্মান্ধতা হেতু অবিবাহিত। পার্বতীর অংশে জাত, গৌতম ঋষির কন্যা 'শচী দেবী' পুরন্দরের স্ত্রী। তাঁর পঞ্চপুত্রের অকালমৃত্যু হেতু পুরন্দর দুঃখের সঙ্গে শ্বশুর গৌতমকে নিজের দুঃখ জানালে তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন—'এবার তোমার পত্নীর গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করবেন।'

তারপর নিদ্রিতা শচীকে ভগবান প্রবোধিত করে বললেন, 'আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম নেব। তুমি আমাকে গর্ভে স্থান দাও।'

৩ অধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ রাজা অগস্তিকে পুরন্দর মিশ্র ও শচীদেবীর পূর্বজন্মবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলে অগস্তি সত্য ও ত্রেতাযুগে তাঁদের স্বরূপ বর্ণনা না করে কেবল দ্বাপরের বার্ত্তা উপস্থাপন করে বললেন যে বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে গোপে বড় হতে লাগলেন। গোপে অসুরাদি বিনাশ করে মথুরায় প্রবেশ করলেন

এবং সেখানে কুব্জার উদ্ধার, চানূর ও কংসাদি বিনাশের পরে কৃষ্ণচন্দ্র দেবকী বাসুদেবকে নমস্কার করে, দেবকীকে 'মা, মা' বলে আহ্বান করলে দেবকী কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হয়ে কৃষ্ণকে নিজের গর্ভজাত পুত্র বলে জানতে না পেরে দুঃখিত হলেন। সেখানকার উপস্থিত লোকেরা দেবকীকে 'কৃষ্ণ তাঁর পুত্র'-এ কথা বললে দেবকী নিজের পুত্রহীনতায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের জন্ম বৃত্তান্ত বলে তাঁকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন 'তুমি আমার বাল্য ও কৈশোর লীলা দৈবক্রমে না দেখলেও যুবা ও বৃদ্ধাবস্থার লীলা দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করবে।'

'তারপর ঘোর কলিযুগে তুমি বাসুদেবরূপী পুরন্দর মিশ্রের পত্নী শচীরূপে আমাকে প্রসব করবে। আমি চৈতন্য নাম ধারণ করে লোকের জড়াবস্থা নাশ করব।' তারপর পুরন্দর মিশ্রকে শচী নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে পুরন্দরও গৌতমের কথা বললেন। মিশ্র শচীকে এ বিষয় গোপন রাখতে বললেন। এরপর শচীর গর্ভাবস্থা বর্ণন।

৪ অধ্যায়ঃ শচীর গর্ভাবস্থা শুনে ভৃগুঋষি 'বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করবেন' বলে শচীর প্রশংসা করলেন। বৃহস্পতি গোদাবরী বিপ্র নামে গুপ্তভাবে নদীয়া নগরীতে বিষ্ণুজন্মের প্রতীক্ষা করে রইলেন। দশমাস সম্পূর্ণ হলে দোলপূর্ণিমা পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র গুরুবার অর্ধরাত্রে চৈতন্যের জন্ম হল। নাভিচ্ছেদনের পূর্বে পুত্রদর্শনের ফলে পুরন্দরের গণ্ডদোষ দূর হল, তাঁর বড় ভাই নীলকণ্ঠর চক্ষুলাভ হল। সেই সময়ে বিষ্ণুর আদেশে মেঘ অমৃতকল্প জলধারা বর্ষণ করল। নায়েকী ও কামোদী চৈতন্যের নাভিচ্ছেদন করার পরে শিশু স্তন্যপান না করায় শচী, পুরন্দর ও নদীয়াবাসী ব্যাকুল হল। অদ্বৈত ঋষি এসে চৈতন্যের নির্দেশে শচীদেবীকে মহামন্ত্র দিলেন।

৫ অধ্যায়ঃ শচীদেবী মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্য তাঁর থেকে ক্ষীর ভক্ষণ করলেন নদীয়ার নরনারী আশ্চর্য হয়ে অদ্বৈতকে দর্শন করল।

৬ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের 'পঞ্চুআতি' শেষ হলে ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠীঘর মণ্ডন হল। সেদিন রাত্রে ষষ্ঠীদেবী এসে তাঁর কপালে লিখলেন যে—'চৈতন্যের আয়ু ৪৮ বর্ষ হবে, বারো বছরে তাঁর বিয়ে হবে ও সেইদিনই রাত্রে বৈষ্ণব হবেন এবং ম্লেচ্ছদের ভক্ত করে জগৎ উদ্ধার করবেন। জ্ঞানী হয়ে বৌদ্ধাবতারে বুদ্ধনামে পরিচিত হবেন। প্রাণীর চেতনা করান—এই জন্য চৈতন্য বলেও লোকে ডাকবে।' এই লিখে চৈতন্যকে নমস্কার করে যাবার সময়ে পথে অদ্বৈত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কি লিখেছেন; তিনি তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে অন্তর্ধান করলেন।

তারপর সপ্তম দিনে অদ্বৈত নিজ আশ্রমে যাবার জন্য উদ্যত হলে পুরন্দর তাঁকে নামকরণ দিন পর্যন্ত থাকবার অনুরোধ করলেন ও বৃহস্পতি—গোদাবরী বিপ্র নামে, নারদ—শ্রীনিবাস সন্ন্যাসী নামে, ব্রহ্মা—হরিদাস নামে, মহেশ—উদন্ত নামে এবং ইন্দ্র—গৌরদাস নামে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে বিভিন্ন রূপে নদীয়াতে মিলে স্তুতি গান করলেন, আর সৌরাষ্ট্র থেকে আগত কালীঞ্জন ঋষি নিমডাল নিয়ে আশিসমন্ত্র পাঠ করে একুশ দিনে নিমাই বলে নামকরণ করলেন এবং অদ্বৈত কর্তৃক নামগায়ন হল।

৭ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যথাক্রমে বাল্যলীলা প্রভৃতি বর্ণনা, চৈতন্যকে বিষ্ণু মনে করে নীলকণ্ঠ তার পাদতলে পড়লেন, গুরুজনের নমস্কার হেতু পুত্রের আয়ুক্ষয় হবে—এই ভয়ে পুরন্দর ও শচী দুঃখ প্রকাশ করলেন।

৮ ও ৯ অধ্যায় : জম্বুনদ মুনি দ্বারা শ্রীচৈতন্যের কর্ণবেধ সমাপন। দিনে চৈতন্যের কান্নায় পিতার 'হাউ'র নামে ভয় দেখানো; 'হাউ'-স্বরূপে চৈতন্যের অবিশ্বাস এবং পূর্বের অবতারগুলির কথা বলতে বলতে স্বাবিভূতি প্রকাশ। এতে পুরন্দর বিস্মিত হলে চৈতন্য মায়া অবলম্বন করে সামান্য মর্ত্ত্যবালকের ভাব দেখিয়ে তাকে মোহিত করলেন।

১০ অধ্যায় : পিতার সহিত চৈতন্যের ভোজন। খেলাধুলা। পথের উপর শিশুদের সঙ্গে ধূলিখেলার সময়ে শিবের ছদ্মবেশে ভিক্ষাথালী নিয়ে প্রবেশ ও চৈতন্যের কাছে ভিক্ষা-প্রার্থনা। চৈতন্য ভিক্ষাপাত্রে ধূলি অঞ্জলি দান করলে সে ধূলি অষ্টরত্নে পরিণত হল দেখে সকলের বিস্ময়।

১১ অধ্যায় : ক্রীড়াহেতু ধূলিধূসরিত চৈতন্যকে ধুইয়ে মুছিয়ে মা অন্নভক্ষণ করালেন। সিদ্ধ গোরেখ সন্ন্যাসীর মার্জাররূপে উপস্থিতি, তাকে চৈতন্যের আশ্বাসন। মায়ের তাড়নায় মার্জাররূপী গোরেখের অন্তরালে অন্তর্ধান।

পরিবেশিত অন্ন নষ্ট হবার স্থলে মার্জারকে ভয় দেখান উচিত নয়, চৈতন্য এই বলে মাকে উপদেশ দিলেন। গোরেখকে লক্ষ্য করে অন্ন ফেলে দিলে তিনি তা সানন্দে ভক্ষণ করে তিরোহিত হলেন। তারপর গোরেখ চউষঠি সিদ্ধমণ্ডলে প্রবেশ করে ঝোলাস্থিত মহাপ্রসাদ প্রদান করলেন, বিষ্ণুর জন্মসংবাদ তাদের জানালেন।

১২ অধ্যায় : নারদের মুখে বিষ্ণুর জন্মবিবরণ শুনে ব্রহ্মার নদীয়াপুরী আগমন ও নদীয়ায় বালমুকুন্দরূপী চৈতন্যকে দর্শন করে মনে মনে স্তুতিকরণ ইত্যাদি।

১৩ অধ্যায় : পুরন্দর গৃহে জম্বুনদ মুনির প্রবেশ। জম্বুনদ মুনিকে সসম্মানে আপ্যায়ন করে পুরন্দর ও শচী উভয়ে শুভলগ্ন ঠিক করে শ্রীচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ করালেন। এই সময়ে সেখানে সার্বভৌমাচার্য্য সশিষ্য প্রবেশ করলেন।

১৪ অধ্যায় : প্রথমদিন জম্বুনদ মুনি বিদ্যারম্ভ করিয়ে সার্বভৌমের উপর চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করলেন। শ্রীচৈতন্য অল্প সময়ে সমস্ত বিদ্যা পড়ে পিতা-মাতাকে শোনালেন।

১৫ অধ্যায় : নদীয়ায় জন্মাবার জন্য দেবতারা পঞ্চবটের তলায় প্রভুকে জানিয়ে প্রয়াগে ঝাঁপ দিলেন। মহেশ চৈতন্যের পিসতুতো (পিউসীপুত্র) ভাই হয়ে নেত্রাক্ষী গর্ভে বিষ্ণুমিশ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর ক্ষীরভক্ষণ না করায় শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুমিশ্রের ঘরে গমন করলেন।

১৬ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুমিশ্রের ঘরে গিয়ে তাঁর দারিদ্র্য মোচন করলেন। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বিষ্ণুমিশ্রের ঘর নির্মাণ করলেন। নেত্রাক্ষীকে শুচি করিয়ে বালককে ক্ষীর খাওয়ালেন এবং বালকের নাম উদদত্ত রেখে স্বগৃহে ফিরে গেলেন। নেত্রাক্ষী পুরন্দরের মামাতো বোন (মামুঁঝিঅ ভউনী) থিলে।

১৭ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে পঞ্চসখার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। দ্বাপরের পঞ্চসখা, দ্বাদশ গোপাল, বলভদ্র প্রভৃতি বটতলে বাঞ্ছা করে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং দ্বাদশ যোজনের ভিতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দাম—অনন্তরূপে শূদ্র (করণ) কুলে জাতিস্মর হয়ে জন্মালেন।

সুদাম—অচ্যুতরূপে মহাশিতকুলে জন্মগ্রহণ করলেন।

সুবাহু—যশোবন্তরূপে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিলেন।

সুবল—বলরাম রূপে ভাটিআনী সুত (বৈশ্য) কুলে জন্মালেন। তাঁর পিতার নাম সোমনাথ মহাপাত্র।

শ্রীবৎস—জগন্নাথ দাস রূপে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেন।

মহেশ—উদদত্ত। রাধা—অদ্বৈত। ব্রহ্মা—হরিদাস। তাঁর পিতা—জগন্নিবাস, মাতা গোমতী। পবন—অভিরাম। বৎস—গোপাল। কুবের—সুন্দরানন্দ। অর্জুন—গৌরদাস পণ্ডিত। ইন্দ্র—পুরুষোত্তম দাস। বিশ্বকর্মা—লবঙ্গ। বরুণ—পরমেশ্বর দাস। সূর্য—বিশ্বম্ভর দাস। চন্দ্র—সিন্ধবল। অগ্নি—সারঙ্গব্রহ্ম (তাঁতীকুলে জন্ম)। মার্কণ্ড—বক্রেশ্বর। গাগ্রব—বৃন্দাবন। কৃপাচার্য্য—বংশীবদন। নারদ—শ্রীনিবাসাচার্য্য। [ঋষি] সনক—গদি দাস। সনন্দ—বাসু দাস। সনাতন—রাঘোপণ্ডিত। হনুমান—মুরারি দাস। গরুড়—শঙ্কর ঘোষ (কায়স্থ জাতি)। ব্যাস—সার্বভৌমাচার্য্য। রাধা—অদ্বৈত ঋষি।

বলরাম—নিত্যানন্দ রূপে গউড় দেশে (পিতা-হাড়ু মিশ্র ও মাতা চন্দ্রকান্তি) মকর সংক্রান্তির দিন শুক্লসপ্তমী গুরুবার কৃত্তিকা নক্ষত্র-বৃষরাশি—রাত্রির অর্ধসময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষষ্ঠীর দিন দুর্গা বলরামের আশীর্বাদ গ্রহণ করে, কপালে 'এ সাত্ত্বিক বিষয়ে লিপ্ত থাকবে'—লিখেছিলেন।

একুশ দিনের দিন বিভাণ্ডক তাঁকে 'নিত্যানন্দ' নাম দিয়েছিলেন। চন্দ্রকান্তি পুরন্দরের ভগ্নি ছিলেন।

১৮ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার জন্য নিত্যানন্দের পুরন্দর গৃহে আগমন ও মৎস্যভোজনের প্রার্থনা। মৎস্য আনয়নের পর মৎস্য ত্যাগের ব্যবস্থা। মৎস্য আনয়নকারী কৃষ্ণদাসের নাম 'মীন কৃষ্ণদাস' হল। নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের গুরুর নিকটে অধ্যয়ন এবং চৈতন্যকর্তৃক সহপাঠীদের মধ্যে প্রভুর নামকীর্তন প্রবর্তন। তা দেখে গুরুর চৈতন্যকে তাড়না ও তাঁর পিতামাতার আগমন।

তারপর পাঠ্যপুস্তকে কেবল নামমাহাত্ম্য দর্শনে পিতামাতা ও গুরুর বিস্ময়ভাব। চৈতন্যরূপী বিষ্ণুকে গুরুর স্তুতিকরণ ও চতুর্ভুজ ভগবদ্রূপ দর্শন।

১৯ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের সপ্তমবর্ষে উপনয়নকর্ম বিভাণ্ডক কর্তৃক সমাপন।

২০ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ব্রতবিধি বর্ণনা ও ক্ষণসূত্র এবং নবগুণ উপবীতের আখ্যান।

২১ অধ্যায়ঃ কবি অগস্তিমুনির মুখে দুর্গামাধবের স্বরূপ শোনাচ্ছেন।

২২ অধ্যায়ঃ গঙ্গাধর দ্বিজের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাঁর স্ত্রী লীলাবতী সতী। গঙ্গাধর দুর্গামাধব-ভক্ত হলেও অতি দরিদ্র। নদীয়াতে শ্রীচৈতন্যের নারায়ণ রূপ দর্শন করায় তাঁর দারিদ্রমোচন। পতি ও পত্নী উভয়ে চৈতন্যের উপাসনা করলেন।

২৩ অধ্যায়ঃ শক্রাবতী বা চন্দ্রাবতীর শ্রীচৈতন্য দর্শন ও নামকীর্তনে মোক্ষ। ভানুমতীর শ্রীচৈতন্য দর্শন। ভানুমতী আদিকন্দ ব্রাহ্মণের কন্যা। শক্রাবতী আদিকন্দের পত্নী।

২৪ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও লক্ষ্মীনৃসিংহ পূজন এবং মরুল মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

২৫ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের গঙ্গাস্নান, আসনশুদ্ধি, তিলকধারণ ও নামগায়ন প্রভৃতি বর্ণনা।

২৬ ও ২৭ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্যের দর্শন নিমিত্ত কপিল ঋষির আগমন। নিজে বৃদ্ধ —এই অভিমানে চৈতন্যের কাছে সম্মান লাভ করবেন এই আশা-পোষণ করেছিলেন: শ্রীচৈতন্যকে তাঁর থেকে অত্যধিক বৃদ্ধ দেখে ভীত হলেন এবং শূন্যবাণী শুনে আশ্বস্ত। চৈতন্য কর্তৃক ব্রাহ্মণীদের উপদেশ দান ও মোক্ষ প্রদান এবং গঙ্গাকে উপদেশ দান বর্ণনা।

২৮ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্য কর্তৃক অর্ধরাত্রে অসংখ্য ব্রাহ্মণীর সম্মুখে স্বরূপ ধারণ এবং ভক্তিমার্গে উপদেশ প্রদান। ত্রিলোচন চণ্ডালের স্ত্রী তিলোত্তমাকে ধনধান্য বিপুল ঐশ্বর্য সহ সপ্তপুত্র দান। পুনশ্চ যুগে যুগে মৃদঙ্গ প্রস্তুত করা ও বিশ্বকর্মার অংশজাত রূপে গোচ্ছাইত উপাধি লাভের বর্ণনা।

২৯ অধ্যায় : পুরন্দরকে জানিয়ে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের নবদ্বীপ গমন। বহুদিন পর চৈতন্যকে দেখে বিষ্ণুমিশ্রের আনন্দ প্রকাশ। চৈতন্য কর্তৃক নবদ্বীপের সমস্ত স্থান পরিদর্শন।

৩০ অধ্যায় : অঙ্গভঙ্গ ঋষির চৈতন্য দর্শনে দেহত্যাগ ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি; এর কারণ চৈতন্য নারদকে জিজ্ঞাসা করলে নারদ কর্তৃক হস্তিকা ঋষির উপাখ্যান কথনে অঙ্গভঙ্গ ঋষির বিষয় নিরূপণ।

৩১ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্য চিত্রপট চিত্রিত করিয়ে মর্ত্যে নাম প্রকাশ করার নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করলেন।

৩২ অধ্যায় : বিশ্বকর্মা নির্মিত কৃষ্ণাদির মূর্তিকে চৈতন্যের পূজন। অশোক বৃক্ষমূলে খোল নির্মাণ ও পূজন এবং তাল লয়ের সর্জনা।

৩৩ অধ্যায় : সখাগণের সহিত সংকীর্তনে নামগান ও ভক্তগণের দশাবতার রূপ দর্শন, ষোড়শাক্ষর নাম ও মহিমাগানের বর্ণনা।

৩৪ অধ্যায় : কীর্তন মণ্ডলীতে অভিরামের নৃত্য। রতাই কাজীর কর্ণ বধিরতার কারণ ও শ্রুতিমোক্ষণ কথন।

৩৫ অধ্যায় : বিপ্রকেশব ও তাঁর পত্নী সুদন্তীর পুত্র অভিরামের রোমাই চক্রবর্তীর কন্যা মালেনীর সহিত বিবাহ। নীচ ব্রাহ্মণকুলে বিবাহ হেতু মাতা পিতা ও বন্ধু-কুটুম্বদের বিরাগ। চৈতন্য অভিরামের পত্নীহস্তে জ্ঞাতিবর্গ ও কীর্তন মণ্ডলীর ভোজন করালেন। যে ব্যক্তি ভোজন করল না, চৈতন্যের অভিলাষ অনুসারে সে গলৎ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হল। রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা অনুতপ্ত হলে মালেনী কন্যার হস্তে ভুক্ত ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বারা তাঁদের রোগমুক্তি। মালেনীর সঙ্গে অভিরামের পুনর্বিবাহ দিয়ে চৈতন্যের স্বগৃহে প্রত্যাগমন।

৩৬ অধ্যায় : নারদের বৈকুণ্ঠপুরী গমন। লক্ষ্মীর অঙ্গ থেকে জাত ছায়াকন্যা লক্ষ্মীর নিকটে শপথ করে প্রয়াগে লক্ষ্মীরূপ চিন্তাপূর্বক ঝাঁপ দিলেন এবং সত্য-

লক্ষ্মীরূপে শিরীষ মুনির কোলে জাত হলেন। বিভাণ্ডক কর্তৃক চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রস্তাব। শিরীষ মুনির সঙ্গে বিভাণ্ডকের নদীয়ায় প্রবেশ এবং পুরন্দর ও চৈতন্যের সঙ্গে শিরীষ মুনির সাক্ষাৎ।

৩৭ ও ৩৮ অধ্যায়ঃ নদীয়ায় সত্যলক্ষ্মীর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ। শ্রীচৈতন্যের সত্য লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহ ও একত্র ভোজন।

৩৯ অধ্যায়ঃ মধুশয্যা থেকে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস ও লম্বোদর নাপিত দ্বারা মস্তক মুণ্ডন এবং লম্বোদরের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কথন।

৪০ অধ্যায়ঃ অগস্তির নিকটে বৈবস্বত নৃপতির স্ববৃত্তান্ত কথন। চৈতন্যের কেশবভরতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ। চৈতন্যের অদর্শনে শচী, পুরন্দর, সত্য লক্ষ্মী আদির ক্রন্দন ও নিত্যানন্দের সান্ত্বনা দান। চৈতন্যের অন্বেষণে নিত্যানন্দের যাত্রা। মরুল মুনির কাছে চৈতন্যের সন্ন্যাসী হওয়ার সংবাদ পাওয়া এবং ব্রাহ্মণ পুত্রদের সঙ্গে চৈতন্যদর্শন। চৈতন্যকে সন্নাসের কারণ জিজ্ঞাসা করলে চৈতন্য কর্তৃক নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে তত্ত্বজ্ঞান কথন। তারপর নিত্যানন্দের সন্নাস ধর্ম গ্রহণ।

৪১ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের সারঙ্গদাসকে বরদান ও নগরভ্রমণ। পুরন্দর, শচী ও সত্যলক্ষ্মীর চৈতন্যের সন্ন্যাসবেশ দর্শন, পরে প্রাণত্যাগ। শেষে চৈতন্যের সশিষ্য অন্তর্ধান।

৪২ অধ্যায়ঃ পরিকর সহ শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন ও নগর পরিক্রমা। পথ শ্রান্তি দূর করার জন্য পরিকরদের পাদুকা মন্ত্র প্রদান। পুরুষোত্তম দাসকে 'নাগর' উপাধি দান এবং রাধারূপী ষড়্‌ভুজ চৈতন্য চৈতন্যরূপ দর্শন দান পূর্বক সীতা ও অদ্বৈতকে সেবা করান নিমিত্ত পুরুষোত্তম দাসের প্রতি আদেশ দান।

৪৩ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ এবং রায় রামানন্দকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি-উপদেশ প্রদান।

৪৪ অধ্যায়ঃ চৈতন্যচন্দ্রকে জগাই-মাধাইর আক্রমণ। জগাই-মাধাইকে চৈতন্যের— নরহত্যা দ্বারা কুটুম্বপালনে হত্যাকারীর পাপে কুটুম্বগণ ভাগীদার কিনা—এ প্রশ্ন। চৈতন্যের নির্দেশে জগাই মাধাইর চৈতন্যোদয় ও উপদেশ গ্রহণ।

৪৫ অধ্যায়ঃ ব্রহ্মার শ্রীচৈতন্যদর্শন ও বৈকুণ্ঠে গমনের অনুরোধ। শ্রীচৈতন্যের হিঙ্গুলা দর্শন। ব্রহ্মাকে বৈকুণ্ঠপুরে প্রেরণ।

৪৬ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের পঞ্চসখার সহিত মিলন ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশ।

৪৭ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে পরিক্রমা নিয়মানুযায়ী শ্রীজগন্নাথ দর্শন এবং জগন্নাথ দাস ও রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ।

শ্রীচৈতন্যর টোটা গোপীনাথ পূজন। হস্তীকে জগন্নাথের ভাণ্ডারে স্থাপনের নিমিত্ত অভিরামের প্রতি আদেশ প্রদান।

৪৮ অধ্যায়ঃ অগস্তি সম্পূর্ণ রাজাকে নীলাদ্রিমাহাত্ম্যের কথা বলে শেষে পঞ্চসখার স্বরূপ বর্ণনা করছেন। জগন্নাথ দাসের সহিত চৈতন্যের বরুণপুর দর্শন ও পঞ্চসখাকে শাড়ী প্রদান। অবতারাদি মঠে জগন্নাথ দাস প্রভৃতিকে থাকবার নির্দেশ এবং পুরাণাদি গীত রচনার আদেশ দান।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্য বীরসিংহ বৌদ্ধকে গোপনে অধ্যাত্মবাদ বর্ণনা করে নাম উপদেশ মাহাত্ম্য বললেন। বৌদ্ধগণও নৃসিংহের ধ্যান করে মুখে নামগায়ন করল।

৪৯ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের গোপীনাথ পূজা। গোপীনাথের আকস্মিক বৃদ্ধি দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর হল যে চৈতন্যকে দর্শন করায় প্রাণশক্তির প্রবল সঞ্চার ও চৈতন্যের অভিমতানুযায়ী উপবেশন এর কারণ। প্রতাপরুদ্র কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের ষড়ভুজ দর্শন ও তাঁর কাছে মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ।

৫০ অধ্যায়ঃ সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্যের জ্ঞান কথন। শ্রীরাধার প্রশস্তি; মহাপ্রসাদের লক্ষণ কথন।

৫১ অধ্যায়ঃ সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্যের মন্ত্ররাজ কথন ও চৌষট্টি সেবাবিধি, সেবিকাদের নাম এবং গোপীতত্ত্ব কথন। রাধার স্বদেহে স্থিতি নিরূপণ ও নিজের অবতারাদি কথন ইত্যাদি।

৫২ অধ্যায়ঃ সার্বভৌম্যাচার্যকে শ্রীচৈতন্যের নামসূত্র কথন।

৫৩ অধ্যায়ঃ অগাস্ত কর্তৃক বৌদ্ধকীর্তি কথন। নৃসিংহ পূজক বিনোদ মিশ্রের নৃসিংহের নিকটে বীরসিংহ আখ্যা প্রাপ্ত ও বরলাভ এবং বচন সিদ্ধিত্ব প্রাপ্তি। জমর, অমর, অগর—বিনোদের এই তিন ভাইয়েরও বরলাভ ও বাক্‌সিদ্ধিত্ব প্রাপ্তি। রাজা অনঙ্গভীমসেন ও রাণী পদ্মাবতী দ্বারা ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধদের মধ্যে পরীক্ষা কথন এবং চৈতন্যের শরীরে বীরসিংহের নৃসিংহরূপ দর্শন ইত্যাদি।

৫৪ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের শ্রীহস্তে রাজা ও পঞ্চসখাকে শাড়ী প্রদান ও রাজার নিকট পঞ্চসখাকে সমর্পণ করে স্বয়ং নবদ্বীপ গমন এবং নবম দিবসে নবদ্বীপে প্রবেশ।

৫৫ অধ্যায় শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে পিসে ও পিসীকে দর্শন এবং তাঁদের নিকট নবদ্বীপের সমস্ত বিষয় শ্রবণ। নিত্যানন্দের জনক-জননীকে দর্শন। পিসীর অনুরোধে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের বিবাহের আয়োজন করলেন এবং নিত্যানন্দকে রাজী করালেন। ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে চৈতন্যের অভিশাপে ব্রাহ্মণেরা মূক ও অন্ধ হল। শেষে ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের স্তুতি করায় ও কন্যা প্রদানে সম্মতি প্রদান করায় তাদের মূকত্ব ও অন্ধত্ব মোচন। বিভাণ্ডক মুনি অনন্ত চক্রবর্তীকে কন্যালাভের বর দান করায় চক্রবর্তীর জাহ্নবা ও বসুমতী নামে দুই কন্যা লাভ। বিভাণ্ডক কর্তৃক সেই দুজনের নিত্যানন্দের সঙ্গে বিবাহ প্রদান।

৫৬ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস ভাব দেখে সত্যলক্ষ্মী দেহত্যাগের সময় নিজ অঙ্গ থেকে এক পুরুষকে জাত করে তাকে লীলাবতীর গর্ভজাত হয়ে গদাধর নাম ধারণ করে চৈতন্যের সেবা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত ছায়ারূপী পুরুষের লীলাবতীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে 'গদাধর' নামে শ্রীচৈতন্যের সেবন ও চৈতন্যের নির্দেশে নদীয়া নগরস্থ গঙ্গাতীরে গদাধরের অবস্থিতি।

৫৭ অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের সমস্ত বৈরাগী ও পরিজনসহ নীলাদ্রিগমন। নয় মাসের মধ্যে পদ্মপুরে প্রবেশ। রাজা প্রতাপরুদ্রের কীর্তন শব্দ শ্রবণানন্তর চরপ্রেরণ। চর চৈতন্যকে দর্শন করায় শ্রীচৈতন্যের রাজার নিকট পত্রপ্রেরণ ও স্বপ্নে রাজাকে দর্শন দান পূর্বক অন্তর্ধান। রাজা ও রাণী উভয়ের চৈতন্যের নিকট প্রভাতে গমন।

৫৮ অধ্যায় : রাজা ও রাণীর সসৈন্যে পম্পপুরে শ্রীচৈতন্য দর্শন। শ্রীচৈতন্যের কটক বারবাটীতে প্রবেশ ও তুলসীপুরে অবস্থিতি। রাজা কর্তৃক সকলের আপ্যায়ন এবং ষোড়শ দিবসাবধি সঙ্কীর্তনের জন্য শ্রীচৈতন্যকে রাজার নিবেদন। শ্রীচৈতন্যের সম্মতিলাভ করে প্রতাপরুদ্রের গঙ্গাস্নানে গমন ও গদাধর দর্শন।

৫৯ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্য কর্তৃক অনন্তকে 'শিশু' নাম প্রদান ও জগন্নাথ দাসের সখাঙ্গ নামকরণ বিষয় কথন ও ভক্ত বলরাম দাস রচিত শ্রীজগমোহন রামায়ণ শ্রবণ।

৬০ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্যের অহোরাত্র কীর্তন নৃত্য ও গান।

৬১ অধ্যায় : গদাধরের স্বপ্নে শ্রীচৈতন্য দর্শন ও কীর্তনে যোগদানের নির্দেশ। কীর্তনের চতুর্থ দিবস প্রভাতে গদাধরের কটক নগর আগমন ও কীর্তন দর্শন।

৬২ অধ্যায় : খন্দে পতিত গদাধরের উদ্ধার। গদাধরের কিশোরীবেশ ও চৈতন্যের কৃষ্ণবেশ ধারণ। কিশোরীর নিকট শ্রীচৈতন্যের দধিকর্দমলীলায় দান প্রার্থনা।

৬৩ অধ্যায় : শ্রীচৈতন্যের দধিকর্দমলীলা ও রাজন্য প্রশংসা। গোপালমন্ত্র ভাষণ। যুধিষ্ঠিরের চেয়ে প্রতাপরুদ্রকে উচ্চস্থান প্রদান। শ্রীচৈতন্যের সমস্ত পরিবার এবং শিষ্য তথা রাজা ও রাণীর সহিত নীলাদ্রি প্রবেশ ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন।

৬৪ অধ্যায় : চন্দনযাত্রায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি ('নাবকেলি')। সিংহাসনের সম্মুখে অবস্থিত ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথকে চন্দন অর্পণের সময় স্বহস্ত থেকে চন্দন পাত্র পতন ও শ্রীজগন্নাথের বিস্তৃত শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ ও গর্ভে লীন হওয়া। শ্রীজগন্নাথের চৈতন্যরূপ ধারণ করে রাজা ও নিত্যানন্দকে সান্ত্বনা প্রদান এবং রাজা শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপ দর্শনের ইচ্ছা করলে জগন্নাথের চৈতন্যমূর্ত্তি ধারণের নির্দেশ। লীলাময় বিষ্ণুর মর্ত্যলীলা শেষে বৈকুণ্ঠপুরে গমন ও লক্ষ্মীসরস্বতী দ্বারা পরিচর্যা।

৬৫ অধ্যায় : তীর্থ ও বাজপেয়ীর মধ্যে জগন্নাথের গর্ভে শ্রীচৈতন্যের লীন হবার বিষয় নিয়ে আলোচনা ; মুক্তি মণ্ডপের সম্মুখে সমাসীন কবি ঈশ্বরদাসকে তীর্থ উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করায় ভক্তকবি ঈশ্বরদাসের উক্ত বিষয়ে উত্তর।

অগস্তির সম্মুখে বৈশম্পায়নকে তত্ত্বকথন ও ত্রেতাযুগ থেকে দ্বাপরযুগ পর্যন্ত বিষ্ণুলীলা কথন এবং চৈতন্যচন্দ্র ও জগন্নাথের একত্বভাব বর্ণন। জগন্নাথের আদেশে ক্ষেত্রপাল কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের মায়া শরীর অন্তরীক্ষমার্গে বহন করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ ও গঙ্গায় তজ্জীব প্রাপ্তি এবং লীনতা ইত্যাদির বর্ণন।

গ্রন্থপাঠ :

ঈশ্বরদাস গ্রন্থের সূচনায়—চৈতন্যবন্দনায়, শ্রীচৈতন্যকে জগন্নাথের সঙ্গে অভিন্নবোধে লিখেছেন—

'ভক্তবৎসল জগন্নাথ। অব্যয় অনাদি অচ্যুত।
মর্ত্যে মনুষ্য দেহধরি। অনাদিনাথ দেবহরি।
নদিয়া নগ্রে অবতার। পশুজন্মরু কলে পার।

কবি যে-কালের মানুষ, সেকালে শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী কেউ জীবিত নেই, দিব্য মানুষটিকে কবি তাই স্থাপন করেছেন পৌরাণিক পরিমণ্ডলে। কবি জানিয়েছেন, বিষ্ণু স্বয়ং তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য লীলা ব্যাখ্যান করতে বলেছেন।—

'শ্রীমুখে আজ্ঞা দেলে হরি। লেখ তু আদ্যপ্রান্ত করি।'

কবি বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে বলেছেন,

'ভো মাতা বাক্যদেবী আস। এ মোর হৃদয়রে বস॥
তুম্ভক পশিলি শরণ। স্ফুরণ হোউ মো হৃদেণ।

চৈতন্য অবতারের কারণ সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

পাষণ্ড নিস্তারিবা পাই। মানবরূপ ভাবগ্রাহী॥
আপণা নাম হৃদে চিন্তি। সুখে গোবিন্দ গুণ গান্তি॥
নিস্তারকলে পশুজন্ম। সদয়ে হরি শ্রীচৈতন্য॥

ভক্ত কবির দৃঢ় বিশ্বাস, চৈতন্য লীলাকীর্তন করেই তিনি জ্ঞান ভক্তি ও মুক্তিলাভ করবেন—

'তুম্ভর নাম জ্ঞান ভক্তি। শুনিন লভিবই মুক্তি।
জগত জীবে নারায়ণ। মাগই অভয় চরণ।
তো গুণ শুনিলা মাত্রকে। আনন্দঅশ্রু রোমপুতে।
মন আত্মারে নিমজ্জন্তি। স্বদেহ আদি পাসোরন্তি।...
চৈতন্য ভাগবত রস। সংসারে করিব প্রকাশ, [প্রথম অধ্যায়]

ঈশ্বর দাসের কাব্যে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি। আমাদের পরিচিত চরিত্রগুলিকে পৌরাণিক পরিচ্ছদে কখনও কখনও অপরিচিত বলে মনে হয়। কিন্তু বাংলা চৈতন্য চরিতের পাঠক সহজেই 'ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' অলৌকিকতার আচ্ছাদন সরিয়ে বাস্তব সত্যটি গ্রহণ করতে পারবেন।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম হ'ল ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, পূর্বা ফাল্গুনী নক্ষত্রে বৃহস্পতিবার অর্ধরাত্রে।

ফাল্গুন মাস যাত্রা দোল। গোবিন্দ খেল কুতূহল।
পৌর্ণমী অটে সে দিনর। পূর্বা ফাল্গুনী জীববার॥
সে দিন অটে পুণ্যতিথি। যামিনী নিশা অর্ধগতি॥

নবজাত শিশুকে দেখার আগ্রহে এক অন্ধ দৃষ্টি লাভ করল।

অন্ধ পশিলা অন্তঃপুরী॥
অন্তুরি ঘরে যাই' পশি। জন্মর কালে হৃষিকেশী॥
দেখিবি বোলি দেলা দৃষ্টি। অন্ধ পটল গলা ফিটি॥
দেখিন সমস্তে হরষ। বোলন্তি এ নহে মনুষ্য॥
এককু আরেক কহই। শচীনন্দন কৃষ্ণ সেহি॥

শিশু স্তন্য পান না করায় শচীমা কাঁদতে লাগলেন। বদ্রিকা আশ্রম থেকে অশ্বেত ঋষি এসে—

'বালক কর্ণে' মুনি কহি। ক্ষীর ন ভক্ষিলু কিম্পাই ॥...
বালক বোলই উত্তর ॥
শচীর গুরুকর্ণ নাহি'। কেহে ভক্ষিবি ক্ষীর মুঁহি' ॥

'অদ্বৈত শচীকে কাছে বসিয়ে একাক্ষর তারকমন্ত্র দান করলেন। এইভাবে শচীর গুরুকরণ হল—

'কম্বল পকাই বসি। অদ্বৈত বিজ্ঞ মহাঋষি ॥
শচীঙ্কু পাখরে বসাই। কর্ণেণ মহামন্ত্র কহি ॥
তারকমন্ত্র একাক্ষর। কহিলে শচী কর্ণর।
সকল পাপ গলা ধ্বংস। শচী হোইলে বিষ্ণু অংশ। [চতুর্থ অধ্যায়]

তখন— বালক ভক্ষিলেক ক্ষীর। দেখি আনন্দ হৃদয়র। [পঞ্চম অধ্যায়]

সপ্তম অধ্যায়ে 'শচীর আঙিনা মাঝে গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায়'। রূপবর্ণনায় ঈশ্বরদাস প্রধানুগ।— অপূর্বরস বাললীলা। শ্বেতপঙ্কজ নেত্রভোলা ॥...

রঙ্গ অধর অতি শোভা। নাসিকা তিল খুঁটি প্রভা ॥
অলকা অতি বিতপণ। ভ্রুলতা ইন্দ্র শরাসন ॥
প্রলম্ব ভুজ করীকর। চরণে কবাণ্ত নূপুর ॥
হেম কিঙ্কিনী কটিডোর। রণিং বঙ্কন ইন্দ্র ॥...
অখিল বন্ধু নারায়ণ। খেলন্তি শচীর প্রাঙ্গন ॥
... ... বেণী চরণেণ নূপুর ॥
চালন্তে রুণুঝুণু বাজি। রাতর পতিগর্ব গঞ্জি ॥

দশম অধ্যায়ে বালকদের সঙ্গে গেণ্ডুয়া খেলছেন বালক চৈতন্য—

গেন্ডু খেল পোএ ছাড়ি। চৈতন্য দেখন্তি উতারি ॥...
পুঅঙ্ক সঙ্গে ভাবগ্রাহী। চালন্তি চরণ হলাই ॥ [সপ্তম অধ্যায়]

পিতা পুরন্দর দেখে ডেকে বলছেন—'গোবিন্দ এস, তোমার পা ব্যথা হবে।

পুরন্দ্র দেখিন হরষ। বিপ্রে দেখিন বড তোষ ॥
ডাকন্তি আস হো গোবিন্দ। বথাউঠিব বেণিপাদ ॥
[একাদশ অধ্যায়]

বাৎসল্যের মধুর চিত্র—

পুরন্দ্র স্নেহে কোল কলে। মুখে চুম্বন শত দেলে।
কাখ করিণ পুরে যাই। রাণীর কোলে ছেলে নেই ॥
পুঅঙ্ক সঙ্গে বনমালী। খেলন্তি অঙ্গ যাক ধূলি।
দেখিন শচীদেবী উঠি। অঞ্চলে পোছি দেলে পিঠি।
গঙ্গার নীর বেগে আনি। অধর ধোই পাটরাণী ॥...
কুঙ্কুম হলদী আনিলে। সুগন্ধ তৈল বোলি দোলে ॥
চক্ষু কজ্জলরঞ্জি দেলে। সে ঠাবু যেনি কৃষ্ণ গলে ॥
ভোজন বিধি জনার্দন। সুবর্ণ থালী শালী অন্ব ॥
খণ্ড শাকর বেণি সর। বোলন্ত ভুঞ্জ দামোদর ॥
আনন্দে ভুঞ্জে চক্রপাণি। দেখি আনন্দ শচীরাণী ॥
[একাদশ অধ্যায়]

ঈশ্বরদাসের কাব্যে চৈতন্যের পিসতুতো দাদা নিত্যানন্দ, চৈতন্য নিত্যানন্দের মামাতো ভাই। নিত্যানন্দকে নিয়ে তার বাবা হাড়ুমিশ্র ও মা চন্দ্রকান্তি এলেন নবদ্বীপে।

শচীপুরন্দ্র হাড়ুকান্তি। সমস্তে পুচ্ছাপুচ্ছি হোন্তি ॥
চন্দ্রকান্তি বোলন্তি ভাই। মোহর পুত্র অটে এহি ॥
বিজয়ে কলে নিত্যানন্দ। দেখিব শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ॥
শচী সহিতে সর্বে গলে। পলঙ্কে চৈতন্য দেখিলে ॥
নিত্যানন্দকু দেখি হরি। উঠি কামোদী কর ধরি ॥
নিত্যানন্দকু কোল করি। চৈতন্য প্রভু নরহরি ॥
দোঁহে দুহিঙ্ক জাণি মন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
দোঁহে দুহিঁঙ্ক দণ্ডবত। দেখণাহারী কৃতকৃত।

এ কাব্যে গুরু সার্বভৌমের নিকট চৈতন্যের বাল্যশিক্ষা।—

গুরুঙ্কু দণ্ডবত করি। বিদ্যা পড়ন্তি নরহরি।
সর্ববালক ঘেনি সঙ্গ। বিদ্যা পড়ন্তি ষে শ্রীরঙ্গ ॥
পড়ন্তি রামকৃষ্ণ হরি। অনন্ত অচ্যুত মুরারি।
গোপাল গোবিন্দ শ্রীরাম। পরমানন্দ হরেশ্যাম ॥
পড়ুণছন্তি হরিগুণ। হস্তে করতাল দেইণ ॥
মধ্যে নাচন্তি বনমালী। সুবাহু বেণি ভুজ তোলি ॥

বালশিষ্যদের নর্তন কীর্তন সার্বভৌমকে ক্ষেপিয়ে তুলল।—

এ মন্তে দেখি সার্বভৌম। হৃদরে কলে মহাতম।
যষ্টি এ কলেক প্রহার। নেই শ্রীচৈতন্য উপর ॥

তখন,

কহন্তি ত্রৈলোক্য গোসাইঁ। শুন হে বিদ্যাগুরু মোর।
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে হোই। নিত্যগোলক বিহরই।
এ বিনু অন্যে নাহিঁ পার। য়ে শাস্ত্রে হরিগুণ সার।
য়ে শাস্ত্র নিন্দ কিস প্যাইঁ। নিন্দিলে ভল গতি নাহিঁ।
ত্রিগুণ পঞ্চতত্ত্ব জানি। নাম ন ভজে যেউঁ প্রাণী।
সে প্রাণী নর্কগত হোই। শাস্ত্রে কেবেহেঁ মোক্ষ নোহি।

সার্বভৌম তখন 'বোলন্তি শুহ হে চৈতন্য। নামে তারলে কেউজন।' বালক চৈতন্য একে একে অনেক উদাহরণ দিলেন। পাপী অজামিল মরণ কালে পুত্র নারায়ণকে ডেকে তরে গেল। বালক প্রহ্লাদ নাম করে বিপত্তি খণ্ডন করল। নামগুণ করেই অসুর বিভীষণ অজর অমর। নামের গুণে গজেন্দ্র মোক্ষণ। নামের গুণে পাঞ্চালীর লজ্জা নিবারণ—

আরতে পাঞ্চালী ডাকিলে।
উলঙ্গে কুরুসভা তলে।
হে কৃষ্ণ উচ্ছারিণ ধর।
লজ্জা সমুদ্র পারি কর।
তাহা শুনিলে জনার্দন।
দ্রৌপদী নোহে বিবসন।

এইভাবে, ধ্রুব, কুব্জা, সুদোমা, বিদুর, হনুমান, মৎস্যেন্দ্রনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, বিরূপাক্ষ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, তন্তীপা, কাহ্নপা, জাবালি, সায়ন্তনু, জনক, সনকাদি, হাস্যানন্দন শুক মুনি—

'সমস্তে নামে হেলে পার। প্রবেশ বইকুণ্ঠপুরে'।
য়েমন্তে বোলি শ্রীচৈতন্য। আনন্দে পুলকিত মন।
নাচন্তি নিত্যানন্দ হরি। বালক পুত্র সঙ্গ করি।
দেখন্তি সার্বভৌম মুনি। য়ে ত অটই ব্রহ্মজ্ঞানী।

সার্বভৌম বললেন, 'এত' দেখছি ব্রহ্মজ্ঞানী। মুনি যা লেশমাত্র পায় না, সে সব বালক প্রকাশ করেছে'।—'মুনি যা ন পাবন্তি লেশ। য়ে ত করই পরকাশ' [অষ্টাদশ অধ্যায়]
দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নিমাইয়ের কীর্ত্তন ও নিত্যানন্দের মাদল সঙ্গতের বর্ণনা।
কোকিলকণ্ঠে বরাড়ি বসন্ত গান্ধার প্রভৃতি রাগে গান করছেন নিমাই—

মৃদঙ্গর শব্দ পুরি। বরাড়ি বসন্ত গান্ধারী।
যে সনে কোকিলর স্বন। শবদ হেতু চইতন্য।

নানাবিধ তালে মাদল বাজাতে গিয়ে চন্দ্রকান্তি-তনয় নিত্যানন্দ মাদলটি ফাটিয়ে ফেললেন।

পুণি বাইলে পোএ তাল। অনন্ত ঘর্ষন্তি মর্দল।…
ঘর্ষাড়ি ঘাতেন মর্দল। বাইলে চন্দ্রকান্ত বাল।
·কাটলা বেণিখণ্ড হোই। সে কি পারিব ঘাত সহি।

তখন শচীদুলাল নিমাই গঙ্গামাটি দিয়ে খোল তৈরী করলেন।—

গঙ্গামৃত্তিকা কলে খোল। আপণে শচীর দুলাল।…
দেখিণ গঙ্গানদীতট। নন্দন বেলাবলি ঘাট।
গোখির চর্ম অছি পড়ি। দেখি আনন্দ নরহরি!
দেবঙ্ক দেব বনমালী। আপনা ভুজে চর্মতোলি।…
নির্মল করি ধোই চর্ম। অনাদি চইতন্য ব্রহ্ম।
অশোক বৃক্ষতলে হরি। গোখির চর্ম করে ধরি।
অলতা রঙ্গ পাণি দেলে। রূপেন নবতন কলে।…
লোহতা ঘেনি চর্ম কাটি। যেবন স্থানে যেতে ঘোটি।
গঙ্গামৃত্তিকা খোল আনি। উপরে চর্মর ছাএনি।
বন্ধন চউরাশী হাত। ভিআণ কলে কন্দুনাথ।…
দুর্লভ রূপ নবতন। রচিলে শচীর নন্দন।[১]

গৌরাঙ্গ চন্দ্র সেই খোলে হরিসোহাগী নাদ তুললেন, তারপর নিত্যানন্দের হাতে তুলে দিলেন সেই খোল।—

১. 'গৌড়দেশী বা নদীয়া বাদ্যরত্নাবলী' (সংকীর্তন বাদ্যশিক্ষা) গ্রন্থে (১৯৭২ খ্রীঃ) ব্রজবাসী শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস গোস্বামী লিখেছেন—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গই মর্দল থেকে মৃদঙ্গ বা খোল সৃষ্টি করেছেন—"মর্দলরু মৃদঙ্গ বা খোলের সৃষ্টি হোই অছি। এহি মৃদঙ্গ যন্ত্রটি কেবল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কল্পনা করি নির্মাণ করাই অছন্তি।"

বিষ্ণুকমল ভৃঙ্গ লাগি। সে নাদ হরির সোহাগী।
গৌরাঙ্গ চন্দ্র পীতবাস। বোলন্তি নিত্যানন্দ আস।
নিত্যানন্দ হি আসি দেখি। আনন্দে ঘনঘন আঁখি।

সুরমুনি নারদ এসে পুজো করলেন, মৃদঙ্গের নাম দিলেন 'মন মৃদঙ্গ'। শ্রীচৈতন্য দুটি তাল সৃষ্টি করলেন। তখন পরম প্রেম যেন রূপ ধারণ করল এবং নিত্যানন্দের মৃদঙ্গবাদনে শূন্য থেকে অমৃত ঝরে পড়তে লাগল।—

মন মৃদঙ্গ নাম দেলে। চৈতন্য তাল বেণি কলে।...
প্রেম পরম রূপ হোই। শূন্যরু অমৃত ঝরই। [দ্বাত্রিংশ অধ্যায়]

গৌর অবতারে আনন্দিত নিত্যানন্দ মহাদেবের মত তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠলেন, নবদ্বীপ পরিণত হল বৈকুণ্ঠে।

অমর স্বর্গ নবদ্বীপ। অনাদি সিদ্ধ যোগরূপ।...
শ্রীনিবাস যে অভিরাম। গৌরদাস পুরুষোত্তম।
এ চারি ধইলেকি তাল। অদ্বৈত ধইলে মর্দল।
আব মৃদঙ্গ সংকর্ষণ। মৃদঙ্গ কান্ধরে পাড়িণ।
তাণ্ডব নৃত্যে সদাশিব। ভৈরব রূপে মহাদেব।
তেসন নিত্যানন্দ দিশি। বৈকুণ্ঠ লীলা মঞ্চে আসি।
তারিবে মণ্ডুপুর লোক। সুজনে জ্ঞানপথে দেখ।
[ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়]

তখন গৌরাঙ্গও নৃত্য আরম্ভ করলেন। ভক্তরা নৃত্যরত গৌরাঙ্গের শরীরে বিবিধ অবতার প্রত্যক্ষ করলেন—

সকল লোকে দেখুছন্তি। শচীনন্দন শিরীপতি।
মীন স্বরূপ রূপে হরি। নাচন্তি চৈতন্য শ্রীহরি।
কূর্মরূপে চইতন্য। ডাকন্তি চিন্তি ভক্তজ্ঞান।
শূকর রূপে নৃত্য করি। উচে ডাকন্তি বোল হরি।
নৃসিংহরূপে ভগবান। নাচন্তি ত্রৈলোক্য মোহন।
বামনরূপে শিরীপতি। গড়ন্তি পড়ন্তি যে ক্ষিতি।
ধনুর্রাম রূপে ব্রাহ্মণ। নাচন্তি আদি নারায়ণ।
শ্রীরাম রূপে শরাসন। নাচন্তি শচীর নন্দন।
কৃষ্ণ স্বরূপে রসকেলি। নাচন্তি প্রভু বনমালী।
গড়ন্তি পড়ন্তি ভূমির। গাবন্তি হসন্তি মধুর।
লোতক বহে ঝরঝর। কি অবা অমিয় সাগর।
[ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়]

এরপর ৩৫ তম অধ্যায়ে ঈশ্বরদাস একটি কাহিনী পরিবেশন করেছেন, যাতে জাতিভেদ ও কৌলীন্য কণ্টকিত সমাজে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—

বিপ্র কেশব ও তাঁর পত্নী সুদন্তীর পুত্র অভিরাম রোমাই চক্রবর্তীর কন্যা মালেনীকে বিয়ে করলেন। রোমাই ছিলেন ব্রাহ্মণকুলে পতিত। সুতরাং মাতাপিতা বন্ধু কুটুম্বরা অভিরামকে ত্যাগ করলেন।

রোমাই চক্রবর্তী পতিত বলে 'নগ্র বাহারে তার স্থিতি'। কিন্তু তিনি ছিলেন 'সকল বিদ্যারে বরিষ্ঠ'।—নানাভাষায় তিনি সুপণ্ডিত—সম্ভবত ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ কাজী'—

'ওড়িয়া নাগিরী ফারসী। তেলঙ্গী বঙ্গলাহি আসি।...
এমন্ত পতিত ব্রাহ্মণ। বুঝই সর্বন্যায় পুণ।
ব্রাহ্মণ কাজী সে বোলাই। সকল ন্যায় সে বুঝই।
[পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়]

সম্ভবত মুসলমান শাসনে কাজী বা বিচারকের পদে আসীন ছিলেন তিনি। রাজদরবারে প্রতিপত্তি থাকার কারণেই, সমাজ তাকে পতিত করলেও, তার কোন কাজে বাধা দিতে পারে নি। রোমাই একদিকে বেদপাঠ করতেন, অপরদিকে অভ্যক্ষদ্রব্য ভক্ষণও করতেন—

ঋকবেদরে পরিপূর্ণ। সাম যজুরে বিদ্যামান।...
স্নাহান সন্ধ্যা তেড়ে নাহি। অভক্ষ্য দ্রব্যহি ভক্ষই।

এহেন পতিত ব্রাহ্মণের কন্যাকে যেচে বিয়ে করলেন অভিরাম।—

অভিরাম বলে ঠাকুর। কন্যাটি অছই তুম্হর।
রোমাই কাজী এহা শুণি। বোলই কন্যা মোর পুণি।
মালেনী নামেণ যুবতী। সুন্দরপণে কিবা রতি।
সত্যকু কর মো আগর। কন্যা মু দেবই নিকর।
এহা শুনিণ অভিরাম। বহন্তি বচন উত্তম।
শুন হো রোমাই ব্রাহ্মণ। বিবাহ কর ততক্ষণ।

বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে এলেন অভিরাম। তাঁর মা বললেন

এ বুদ্ধি তোতে কেহু দেলা। মো বংশ নাশিবু বোইলা।
এবে মুঁ করিবই কিস। পতিত হইলা মো বংশ।
যা অরে যাঅ অভিরাম। না থাহ এহু নদীগ্রাম।
নগ্রু বাহার হোই যাঅ। কুলে কলঙ্ক ন লাগাঅ।

অভিরামের পিতাও বললেন—রোমাই-ঝিকে বিয়ে করেছ, জাননা সে পতিত ব্রাহ্মণ? পারসী ভাষায় কথা বলে, সে অথর্ববেদী, বড় মন্দ, ষণ্ড বধ করে। এমন চণ্ডালের মেয়েকে বিয়ে করেছ তুমি! তুমি আমার ঘরে এলে, তোমাকে গ্রহণ করলে ঘর ডুবে যাবে। অতএব

যাঅ তু যাঅ বেগ তোই। তোবে মোহর কার্য্য নাহি'।

অভিরাম চলে এলেন পুরন্দর মিশ্রের আলয়ে। চৈতন্যচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমিত হোই। কান্দই কোহ কোহ হোই।
উঠিণ গলে চইতন্য। কোলে ধইলে অভিরাম।
বোইলে উঠ হো কুমর। বিরস কিম্পা তো মনর'।

অভিরাম সব খুলে বললেন এবং বললেন 'তোমার নিকট বিদায় নিয়ে আমি দেশান্তরী হব। তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি নেই। তুমি আমাকে উদ্ধার কর, লজ্জাসমুদ্র থেকে পার কর'।

ছামূর্ন মেলানি হোইবি। দেশান্তরি হোইণ ষিবি।
তোহর বান্ধকে গোসাইঁ। মোহর শাখা অন্য নাহিঁ।
পারিলে উদ্ধারিণ ধর। লজ্জা সমুদ্র পারি কর।

অভিরামের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য হেসে বললেন, 'মো নাম পতিতপাবন। সে কন্যা তোর জীবনধন।' আমার নাম পতিতপাবন, সে কন্যা তোমার জীবনধন, আমি যাব সেখানে। তখন নিত্যানন্দ, উদদত্ত, হরিদাস, সুন্দরানন্দ, শ্রীনিবাস, গোরদাস, বক্রেশ্বর, সার্বভৌম সকলকে নিয়ে—

অভিরামকু ঘেনি সঙ্গ। বিজয় কলে সিনীরঙ্গ।

সকলে নগরের বাইরে রোমাই চক্রবর্তীর বাড়ীর সামনে আসতেই রোমাই বেরিয়ে এসে পথের উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। চৈতন্যকে তিনি দেখলেন চতুর্ভুজ বিষ্ণু। চৈতন্য বললেন 'তোমার মেয়েকে আমরা নিতে এসেছি'।—

বোইলে শুন হে ব্রাহ্মণ। মালেনী কন্যা বেগে আন।
ঘেনিণ যিবু আম্ভ পুর। সুচিত্তে অনুগ্রহ কর।

রোমাই অনেক রত্ন অলঙ্কারে ভূষিতা কন্যাকে হান্দোলায় চাপিয়ে দিলেন। চৈতন্য সকলকে নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। তারপর পুরন্দর মিশ্রের আলয়ে নয় সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। চৈতন্য বিপ্রদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন এবং নিবেদন করলেন—'তুম্ভে সমস্ত বিপ্রগণ। কন্যা করিব উদ্ধারণ'॥

তখন ৮৮ সহস্র বিপ্র এসে 'মালেনী কন্যা পরশিলা। অভিরাম হিঁ অন্ন দেলা'। এইভাবে অভিরাম 'একঘরে' হওয়া থেকে রক্ষা পেলেন। শ্রীচৈতন্য নিজে মালিনীকে তার পতিগৃহে নিয়ে এলেন এবং অসমাপ্ত বিবাহ কার্য্যাদি সম্পন্ন হল—

মালেনী কন্যাকই ঘেনি। পঞ্চ শবদি বাদ্য পুণি।
ঘেনিণ বিজে ভগবান। প্রবেশ সুন্দরী পুরেন।
বিবাহ কর্ম বিধি সারি। গলেক যে যাহা নগরী। (৩৫শ অধ্যায়)

এ কাহিনী কতটা সত্য আমরা জানি না। এ যদি কাল্পনিকও হয়, কল্পনার মূলে আছে শ্রীচৈতন্যের 'সামাজিক পতিতোদ্ধার';—ওড়িয়া সমাজ-ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামীরা যে জাতপাত হীন মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, এ কাহিনী তারই প্রমাণ। ঈশ্বরদাসের কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়েছেন সত্যলক্ষ্মী। জয়ানন্দের কাব্যে আছে, দারুমূর্তি 'জগন্নাথ'কে বিয়ে করেছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্নের কন্যা সত্যবতী (প্রকাশ ৩—৪), তত্ত্বের দিক দিক শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ এক হলে বিষ্ণুপ্রিয়ার সত্যবতী হওয়াও স্বাভাবিক। ঈশ্বরদাসের কাব্যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর অঙ্গ থেকে জাত ছায়া কন্যা লক্ষ্মীর নিকট শপথ করে লক্ষ্মীরূপে চিন্তা করতে করতে প্রয়াগে ঝাঁপ দেন এবং শিরীষ মুনির কন্যা সত্যলক্ষ্মীরূপে জাত হন। বিভাণ্ডক চৈতন্যের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করেন (৩৬শ অধ্যায়) এবং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সত্যলক্ষ্মীর বিবাহ হয় (৩৭ অধ্যায়)।

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সারথি মাতলি ইন্দ্রের রথে আকাশ পথে সত্যলক্ষ্মীকে নিয়ে এলেন নদীয়ায়; তখন পুরন্দর মিশ্রের অন্তঃপুরিকারা রথে উঠে কন্যার রূপ থেকে চমৎকৃত হলেন।

শচী মা— 'সুবর্ণ' থালি অর্ঘ্য ঘেনি। সংগতে অনেক কামিনী।
নেত্রাক্ষী ব্রাহ্মণী সহিতে। সকলে অর্ঘ্য ঘেনি হাতে।
মাতলি রথ পরে উঠি। আনন্দ হোইণ বিম্বোষ্ঠী।
কন্যা স্বরূপকই চাহিঁ। বোলন্তি পরিমুণ্ডা যাই। [১৪৭/৩৭অ]

ঈশ্বরদাসের কল্পনা এইভাবে মর্ত্যের সামগ্রীতে স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করতে গিয়ে অবাস্তব অলৌকিক উপাদানের আমদানী করেছে। কিন্তু কবির পারিপার্শ্বিক চেতনাও যথেষ্টই ছিল। সত্যবতী বরণ অনুষ্ঠানে সেকালের স্ত্রী আচার—

বহুত দ্বিজনারী মিলি। আনন্দে দ্যন্তি হুলহুলি।
গোময় কপোলে লগাই। অন্ন মুঠা এ নিউ ছাই।
বন্দাই কোল করি নেলে। ভিতরে বিজে করাইলে।
[৩৭শ অধ্যায়]

পরবর্তী অধ্যায়ে (৩৮শ) বিবাহ বর্ণনা। গৌরাঙ্গ-বিবাহের সুন্দর বাস্তব চিত্র। এই বিবাহ উৎসবে পুরন্দর মিশ্রের ঘরে চণ্ডীমঙ্গল গীত গাওয়া হল। ব্রাহ্মণীরা সবাই মিলে শচীরাণীকে সঙ্গে নিয়ে বাসেলী (বাসুলী=চণ্ডী) র পুজো দিয়ে এল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতেও একথা আছে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত ক'রে উলুধ্বনি দিয়ে, সত্য- লক্ষ্মীর গায়ে হলুদ দেওয়ান হল। শচীরাণীর মুখে হলুদ লেপে দেওয়া হল—

গৌরাঙ্গ বিভা কথা শুনি। আনন্দে সকল ব্রাহ্মণী।
পুরন্দ্র মিশ্র ঘরে মিলি। মঙ্গলগীত গাই বালী।
চণ্ডিকা পূজা অর্থে গলে। শচী রাণীঙ্কু সঙ্গে নেলে।..
বাসেলি পুজাবিধি সারি। বাঞ্ছী আসন্তি সুন্দরী।
শচী দ্বারেণ পূর্ণকুম্ভ। শ্রীফল চূতপত্রারম্ভ।...
শচী রাণী কি কোল কলে। মুখে হলদী বোলি দেলে।
ব্রাহ্মণী মানে খেল করি। শচীদেবীর কর ধরি।
বোলন্তি মায়ে তুম্ভ নাচ। যুবতী মানঙ্কর পাশ।
এ মন্তে আনন্দে তরুণী। সতলক্ষ্মী কি ধরি আনি।
কুঙ্কুম হলদী বোলন্তি। আনন্দে হুলহুলি দ্যন্তি।...
ভিতর পুরকুই নেলে। কৃষ্ণ চৈতন্যকু আণিলে।

রঙ্গ রসিকতা থেকে গৌরাঙ্গও রেহাই পেলেন না—

রত্নবেদীরে বনমালী। কুঙ্কুম বোল দেলে বালী।
...ব্রাহ্মণী মানে সর্বে মিলি।
কহন্তি কোমল বচন। শুণ হে প্রভু চইতন্য।
পরিহাসরে রসকেলি। শুণি হসন্তি বনমালী।
শর্মরে ন কহন্তি কিছি। স্নেহরে যেহু যাহা পুচ্ছি।
হলদী বোলিণ স্নাহান। শ্রী অঙ্গ পোছিলে বহন।...
বিজ্ঞ পণ্ডিত মুনিবর। সতলক্ষ্মী চৈতন্য কর।
কুশবন্ধন কলে মুনি। ব্রাহ্মণে কলে বেদধ্বনি।...
ব্রাহ্মণে লজা হোম কলে। পূর্ণ আহুতি বড়াইলে।

অনুষ্ঠানের শেষে স্ত্রী আচার—'পঞ্চগ্রাসী'—বরকনের একত্র ভোজন।

সুবর্ণ থালী ক্ষীরবিড়া। গ্রাসকু যেতে বিধি লোড়া।
শাল পত্রেক পারি দেলে। বিগলে বেণি ধাব কলে।
দক্ষিণ পত্রে সত্যবতী। সতীর বামে শিরীপতি।...
সত্যবতী যে লাজ করি।
কেবে হেঁ ন করন্তি গ্রাস, মন নিবেশী পীতবাস।

অনেক কথা বলার পর—

শুনি হাসিলে মহাসতী। অধক ভুঞ্জি ছাড়ি যান্তি।

এরপর—

যুবতী মিলি পরিহাস। বোলন্তি চইতন্য আস।...
লক্ষ্মী প্রিয়াঙ্কু কোলে ধর। দেখিণ পাপ যাউ দূর।
এমন্তে বোলন্তি সুন্দরী। শুণি হসন্তি কম্বুধারী।

বাসরের চিত্রটি কাল্পনিক হলেও নিতান্ত মানবিক। বিধাতাকে স্মরণ করে গৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে ডান হাতখানি সত্যবতীর গায়ে রাখলেন—

ভো বিহি বিধাতা সুমরি। দক্ষিণ ভুজ তোলি করি।
সতীর পরে দেলে নেই। সন্তোষ দেবী বইদেহী।

সত্যবতী মনে মনে আনন্দিত হলেও চুপ করে রইলেন। গৌরাঙ্গের দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিলেন তিনি। এবার ভরসা পেয়ে ঘনিষ্ঠ হলেন গৌরাঙ্গ।

ভরসা পাইলে গোসাঁই।...
বদন লেউটাই কোল। হৃদে লগান্তি আদিমূল।
চুম্বিলে মধুর বদন। শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য।

তখন সত্যবতী একটি সাহসের কাজ করলেন। (সেকালের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের মনে যে বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই প্রকাশ পেয়েছে এখানে।) সতীন নিয়ে যেন ঘর করতে না হয়—এই ব্যাকুল কামনায় সত্যবতী গৌরাঙ্গকে দিয়ে গঙ্গাজলে শপথ করিয়ে নিলেন।

তেজিণ লজ্জা মহাসতী। বোইলে শুণ হে শ্রীপতি।...
মুহিঁ যে অভাগিনী নারী। শরণ পশিলি মুরারি।
মোরে তজিণ অন্য স্তিরী। বিভা নোহিব কম্বুধারী।
আম যুবতী সঙ্গে সঙ্গ। ন পূণ করা শিরীরঙ্গ।
মোতে হোইব সপত্নী। ন পূণ করা কম্বুপাণি।
শুনি আনন্দে নরহরি। বোইলে সত্য থিবা করি।
সত্য বোইলে দেব হেউ। শুনি উঠিলে মহাবাহু।...
আনন্দে মহাসতী উঠি। করে ধরিণ শঙ্খ গোটি।
শঙ্খেণ জল ভরি থিলে। শিলারে শঙ্খে জল দেলে।
মোহর পতি নারায়ণ। এ দেহেঁ নোহিবি দুষণ।
পতি দর্শনে প্রাণ থিব। যুগ যুগান্তে কথা থিব।
পতি পত্নী যে সত্য কলে। আনন্দে কোল করি নেলে।

[৩৯ অধ্যায়]

কিন্তু হায়, বাসর রাত্রেই এল নিদারুণ বিচ্ছেদের লগ্ন। মধ্যরাতে সত্যবতী যখন ঘুমে অচেতন, তখন—

এ মন্তে অর্ধ হোএ নিশি। শয্যা ছাড়িলে হৃষীকেশী।
গঙ্গার কূলে যাই মিলি। চৈতন্য প্রভু বনমালী।
বোলন্তি গঙ্গাদেবী শুণ। ঝিবি মুঁ কাটুআ নগ্রেণ।
পারি হইলে শ্রীচৈতন্য।...
গৌরাঙ্গ চান্দ বিজে কলে। নাপিত দ্বারেণ মিলিলে।..
কহন্তি প্রভু নিরঞ্জন। মুণ্ডন কর মোতে তুহি।
সন্ন্যাস হোইবইঁ মুহিঁ।
শুনিন লম্বোদর দাস। তক্ষণে উড়িলা সাহস।

এই নাপিতের নাম বিভিন্ন চৈতন্য জীবনীতে বিভিন্ন। নাপিত লম্বোদর দাস বলল, আজ সবে বিয়ে হল, আজই মস্তক মুণ্ডনের কারণ কি? গৌরাঙ্গ ছলনা করে বললেন—'আমার উপর অভিশাপ আছে'।—

'পূবেন আছি শাপ মোর।
তেনু মুঁ হোইবি সন্ন্যাস। তেনু উদ্ধার মোর বংশ।
কুল মো পবিত্র করিবি। জননী বংশ উদ্ধারিবি।
যে প্রাণী আপণা কুলর। সন্ন্যাস হেব দিগম্বর।
তাহার পুণ্য লেখা নোহি। বিষ্ণু সমান সে অটই।...

রাত্রিকালে দীপ জেলে নাপিত তাঁর মস্তক মুণ্ডন করল।

এমন্তে সাতবেল পুণ। মুণ্ডন হেলে নারায়ণ।
লেউটি গঙ্গারে প্রবেশ। স্নাহান সারি হৃষীকেশ।..
কেশব ভারতী যে নাম। বিপ্রকুলরে সে উত্তম। [৩৯ অধ্যায়]

মস্তক-মুণ্ডনের পর গঙ্গাস্নান করে সেইরাত্রেই গৌরাঙ্গ কেশবভারতীর নিকট এসে প্রার্থনা জানালেন—

শুনহে সন্ন্যাস গোসাইঁ। পরমহংস দীক্ষা মুহিঁ।
তুম্ভর তহুঁ মুঁ বুঝিবি। এ দেহেঁ গুরু মুঁ করিবি।...
এতেক কহি শ্রীচৈতন্য। প্রণাম কলে পুণ পুণ।

তখন কেশব ভারতীও মনে মনে প্রভুকে প্রণাম করলেন।

'মানসিকরে প্রণমিত। সন্ন্যাসী কলেক বহুত'।

তিনি উঠে এসে গৌরাঙ্গকে আসনে বসালেন। শিষ্যদের বললেন দীক্ষা দানের দ্রব্য-সামগ্রী যোগাড় করতে। [৩৯ অধ্যায়]

চত্বারিংশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণের বর্ণনা। দশনামী সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস দেখতে এলেন। সন্ন্যাস-বিধিমতে হোম করা হল। ত্রিদেবের নাম নিয়ে অনেক তিল ঘৃত জেলে সন্ন্যাসদীক্ষা দেওয়া হল।

পইতা-পোড়িণ ভাঙ্কিলে। কপালে বিভূতি বোলিলে।
কণ্ঠেণ রুদ্রাক্ষর মাল। হস্তে রুদ্রাক্ষ আদিমূলে।

হৃদে রুদ্রাক্ষ মাল দেলে। তুলসী করমালা গলে।
রঙ্গ বসন আভরণ। বিভূতি সর্বাঙ্গে লেপন।
দন্ড কমন্ডলাহি দেই। সন্ন্যাস বেশ ভাবগ্রাহী।...
প্রণাম কলেক সন্ন্যাসী। উঠি চাহান্তি হৃষীকেশী।
উঠান্তি প্রভু শ্রীচৈতন্য। নমো নারায়ণ বোলিণ।

জীবের একটা রূপ আছে, নামও আছে। নামতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে, গুরু কেশব ভারতী বললেন—ওঁ-কার একাক্ষর, মধ্যে অ-উ-ম এই ত্রিতত্ত্বের অধিষ্ঠান। এই ত্রিতত্ত্বের উপরে আছেন যোগমায়া—চতুর্বেদ চারপাশে রেখে স্থূল, শূন্য ব্যেপে অনাহত অক্ষরকে স্থাপন করলেন। সেই অক্ষর থেকে ক্ষরিত হয় সর্ব সম্পদ—সর্বজীবকে তা সম্পন্ন করে! সর্বজীবের মধ্যে সেই একাক্ষর নামের বন্দনা করেন জ্ঞানীরা। পঞ্চভূত যেমন একটি জীব দেহের উপাদান, শ্বেত পীত হরিৎ নীল-লোহিত এই পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপতঃ যেমন এক, তেমনি সব কিছুর মূল একাক্ষর নাম (ওঁ)—ব্রহ্মান্ড তার পদসেবা করে। যুক্ত হয়েও বিযুক্ত সে, বিমুক্ত অনাসক্ত সে। এই অক্ষরের উপর অণাক্ষর—তার কোন নাম রূপ নেই। সেখানে রাত্রি দিন নেই। তার উপরে জনার্দন, তার উপরে নিরাকার। পরমহংস দীক্ষা এই নিরাকারের দীক্ষা।

গোসাই (কেশবভারতী) চৈতন্যকে এসব কথা বললে ভাবগ্রাহী চৈতন্য হেসে বললেন, 'আপনি জ্ঞানতত্ত্ব যা বললেন, তাতে আমি যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এই জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে আমাকে বলুন'। সন্ন্যাসী (কেশব ভারতী) বললেন—'হে হৃষীকেশ চৈতন্য, শোন, এ দীক্ষা বড় গুপ্ত ব্যাপার—বললে প্রত্যয় আসে না। দিনে রাতে একুশ হাজার ছ'শো বার শ্বাস চলাচল করে। প্রতি শ্বাসে নাম উচ্ছলিত হয়, নাসাগ্রে চলে হংস। স কার সুনাদে মূর্ধায় প্রবেশ করে; সেখানে বিরাজ করে অখন্ড জ্যোতি—দিব্যদৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয় তা। নাসাম্বারে নাম ক্ষরিত হয়ে নাসাগ্রে বিহার করে। রূপ প্রকাশিত হয়ে নীলকন্দরে বিহার করে। 'নাসাহরি, লোচন রাম। এ দুই নীলগিরি ধাম'॥ নামরূপ দুই এক হয়ে ভুবনে প্রকাশিত। অরূপ অরেখ অবর্ণ—এই হল অণ অক্ষর। এর ধ্যানে মন লয়-মার্গে গমন করে। মনকে অমনে ভরলে তবেই অখন্ড অগ্নির সাক্ষাৎ পাবে। এই জ্ঞানের আগুনে পাপ দগ্ধ হয়, নির্মল আত্মা প্রকাশিত হয়। জপযজ্ঞ তপহোম, বেদশাস্ত্র বিহিত ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পর মুক্তি, মুক্তির পর ভক্তি। 'হরির ভক্তি যে গরিষ্ঠ'।

ভারতী এইভাবে বুঝিয়ে শ্রীচৈতন্যকে হংসদীক্ষা দান করলেন এবং তাঁর হাতে লক্ষ্মীনৃসিংহ শিলা (শালগ্রাম) সমর্পণ করে তাতে ইষ্টস্থাপনা করে পুজো করতে বললেন।

ষড়গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস স্বরচিত 'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' বলেছেন—'উরাগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্ধন শিলাং দদৌ মে গৌরাঙ্গো'—গৌরাঙ্গ স্বীয় বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্ধন শিলা আমাকে দিয়েছিলেন। এই শিলা মালা সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা॥ অন্ত্য ৬/২৮৮

সুতরাং, চৈতন্য অর্চিত দুটি শিলার উল্লেখ পাওয়া গেল—একটি গোবর্ধন শিলা—শঙ্করানন্দ এটি বৃন্দাবন থেকে এনে চৈতন্যকে দিয়েছিলেন; অপরটি লক্ষ্মীনৃসিংহ শিলা—এটি দিয়েছিলেন সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী।

গরুড় পুরাণোক্ত 'ব্রহ্মজ্ঞান' (২৪০ অধ্যায়) বিষয়ক উপদেশের সঙ্গে কেশবভারতীর এ উপদেশের যথেষ্ট মিল আছে (শব্দকল্পদ্রুম—৮৪১ পৃ. দ্রষ্টব্য)।

'পরমহংস' সম্পর্কে 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে বলা হয়েছে—নির্দ্বন্দ্ব, নিরাগ্রহ, ব্রহ্মজ্ঞানী, প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষা আচরণকারী, লাভালাভে সমদর্শী, অনিকেত, ধ্যান-পরায়ণ অধ্যাত্মনিষ্ঠ—সন্ন্যাসীই পরমহংস (শব্দকল্পদ্রুম—৫৮৯ পৃঃ

সন্ন্যাস বিধি সম্পর্কে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—বৃদ্ধ পিতামাতা শিশু পতিব্রতা ভার্যা বা অসমর্থ বন্ধুকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিলে নারকী হতে হবে। গৃহকর্ম সম্পাদন করে নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে বন্ধু স্বজন গ্রামীণ প্রতিবেশীদের প্রীতিপূর্ণ অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। তাঁদের অনুমতি পেলে পরমেশ্বরকে প্রণাম করে, গ্রাম প্রদক্ষিণ করে সংসারপাশ থেকে মুক্ত হয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, 'হে পরব্রহ্মণ, গৃহাশ্রমে আমার এত বছর কেটে গেছে, অনুগ্রহ করে আমাকে সন্ন্যাস দিন। 'গুরু বিধিবৎ বিচার করে দীক্ষাকামীকে শান্ত ও বিবেকবান দেখতে পেলে সন্ন্যাস আশ্রমের আদেশ দেবেন। তখন শিষ্য স্নান করে আহ্নিক সমাপন করে দেব; ঋষি ও পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁদের অর্চনা করবেন। বিধিবৎ অর্চনা করে পিণ্ডদান করে পিতৃদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করবেন। ঋণত্রয় মুক্তির পর নিজের শ্রাদ্ধ করতে হবে 'ঋণত্রয় বিনির্মুক্তমাত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ।' পরমব্রহ্মের ধ্যান করে, বিরজাহোম করে নিজের দেহকে মৃতবৎ চিন্তা করতে হবে। তারপর 'ঐং ক্লীং হুং স্বাহা, মন্ত্রে ঘৃতাক্ত যজ্ঞসূত্র অনলে নিক্ষেপ করতে হবে। এইভাবে শিখাসূত্র ত্যাগ করে দেহী ব্রহ্মময় হন এবং এইভাবে দ্বিজদের সন্ন্যাস হয়।

তখন গুরু শিষ্যকে উঠিয়ে কানে কানে বলবেন—'তুমিই সেই মহাপ্রাজ্ঞ হংস, 'তিনিই আমি' এরূপ ভাবনা কর। মমতাশূন্য হয়ে নিরহঙ্কার হয়ে স্বভাবে সুখে বিচরণ কর।'

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞহংসঃ সোহহং বিভাবয়।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখংচর ॥

শিষ্য তখন ঘটঅগ্নি বিসর্জন দিয়ে আত্মস্বরূপ মনে করে গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন। প্রণামের মন্ত্রে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে—

তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার, তোমাকে আমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি এবং তুমি-রূপ আমার এই বিশ্বরূপকে নমস্কার। ধাতু প্রতিগ্রহ (টাকা পয়সা গ্রহণ), নিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রীসঙ্গ, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া সন্ন্যাসীর বর্জনীয়। সন্ন্যাসী দেবতায় নরে কীটে সমদর্শী হবেন, সর্বকর্মে সব কিছুর মধ্যে তিনি ব্রহ্মকে দেখবেন। বিপ্রের অন্ন, চণ্ডালের অন্ন যেখান থেকে আসুক না কেন—দেশ কালের কোন বিচার না করেই তিনি ভোজন করবেন।

সর্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দৈবে তথা নরে।
সর্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট সর্বকর্মসু ॥

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাৎ তস্মাৎ সমাগতম্‌
দেশকালং তথা চাম্বুমশীয়াদবিচারয়ন্‌ ।

সন্ন্যাসীর দেহ সৎকার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেন্বাপসু মজ্জয়েৎ ।।

সন্ন্যাসীদের মৃতদেহ কখনও দাহ করতে নেই। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুজো করে ভূগর্ভে সমাধিস্থ করতে হবে অথবা জলে ডুবিয়ে দিতে হবে।

ঈশ্বরদাসের বর্ণিত সন্ন্যাসদীক্ষায় মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনেকটাই মানা হয়েছে। তবে পৈতে পোড়ানর কথা থাকলেও মহানির্বাণতন্ত্রে সেই পোড়া পৈতে খাওয়ার কথা নেই। ঈশ্বরদাস কিন্তু বলেছেন—'পৈতা পোড়িণ ভক্ষিলে'।

ঈশ্বদাস আরও একটু নতুন কথা বলেছেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত ও উদন্ত আদি অনেকেই মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাস নিলেন।

পরবর্তী (৪১) অধ্যায়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে—

কান্দি কহই শচীরাণী। অজ্ঞানে লোটই ধরণী।
বোলই শুন চইতন্য। তুম্ভে মো অম্বর লোচন।
ভক্তর বন্ধু দুঃখীজন। নদীয়া নগ্রর জীবন।
কি সুখভোগ কলু তুহি। বৈরাগী হেলু কাহিঁ পাইঁ।
গড়ই পড়ই উঠই। ক্রোধ তা ধরি ন পারই।
বোলই ভারতী এ শুণ। সন্ন্যাস কল কি কারণ।

কেশবভারতীকে শচীমা বললেন, 'আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও, তার বদলে আমার যা কিছু সব নাও।'—

এবে মো পুত্র লেউটাঅ। মোর সম্পদ সর্ব নিঅ।
এতেক বলি কর তাড়ি। সন্ন্যাসী গৌড়তলে পড়ি।

ভারতী শচীমাকে বুঝিয়ে বললেন তোমার পুত্র পৃথিবী পর্যটন করে আবার ফিরে আসবে। শচীমা প্রবোধ মানলেন না, উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন—

শুণিণ গৌতম দুলালী। উচ্চ কান্দি করে বোবালি।
বোলই শুন গোরাচান্দ। নিরেখ ন কর গোবিন্দ।
অনেক ভরসা যে তোতে। নির্মায়ি ন করসি মোতে।···

তাছাড়া তুমি যে বিবাহ করেছ—

তু ত হোইলু সইন্যাস।
সে স্তিরী করিবটি কিস।

শচীমা এই বলে কেঁদে মাটিতে লোটাতে লাগলেন।

চৈতন্য বললেন—'মাগো, শোন, আমি কেবল তোমার পুত্র নই। পতিত নিস্তার করার জন্য আমার জন্ম তোমার কোলে। পৃথিবী মোক্ষ করে আমি ফিরে আসব নবদ্বীপে।'

পতিত করিবি নিস্তার। তেনু জনম তোর কোল।
পৃথিবী মোক্ষ করি মুহিঁ। আসিবি নবদ্বীপ ভূইঁ।

এই বলে মাকে প্রবোধ দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে চৈতন্য অন্তর্ধান করলেন।

এই খবর পেয়ে পুরন্দর (জগন্নাথ) মিশ্র শিরে করাঘাত করে 'হা চৈতন্য' 'হা চৈতন্য' করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন।

পুরন্দ্র মিশ্র মুণ্ড কোড়ি। উচ্চেণ ছাড়ে দীর্ঘ রড়ি।
হা চইতন্য চইতন্য। কেনে মো গলু দুঃখী ধন।...
পঞ্চভুতরু নেই মন। চৈতন্যে দেই মনে ধ্যান।..
চৈতন্য চৈতন্য চৈতন্য। পঞ্চভুতরু ছাড়ে প্রাণ

কবি এখানে জগন্নাথ মিশ্রের দেহাবসানে দশরথের অন্তিমকালকে আরোপ করেছেন। তখন একে একে শচী ও সতীলক্ষ্মী ও প্রাণত্যাগ করলেন—

কান্দই শচী হৃদ কোড়ি। কেনি কি গলু কৃষ্ণ ছাড়ি।...
কৃষ্ণচৈতন্য সুমরিলা। তক্ষণে জীবন ছাড়িলা।

সতীলক্ষ্মী অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ডাক দেই। পথে ছাড়িলা সতী দেহী।

[একাত্মারিংশ অধ্যায়]

প্রামাণিক চৈতন্যচরিত অনুসারে সন্ন্যাসের পর চৈতন্য শান্তিপুরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে শচীমায়ের আদেশ মত নীলাচলে যাত্রা করেন; অন্তর্হিত হন নি, সাধারণের মত পায়ে হেঁটেই গেছেন পুরী, তাছাড়া নিমাই সন্ন্যাসের অনেক আগেই জগন্নাথ মিশ্র দেহত্যাগ করেন। নিমাই সন্ন্যাসের পরেও দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া নিমাইর সন্ন্যাসের অনেক আগেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

এই তথ্যবৈষম্য থেকে মনে হয় ঈশ্বরদাস এমন এক কালে এ গ্রন্থ লিখেছেন, যখন ওড়িষ্যায় কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির প্রচার একেবারেই ছিল না। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর দুই পুত্রকে পর পর হত্যা করে, বিশ্বাসঘাতক বিদ্যাধর পাত্র যে বংশের পত্তন করে, সেই বংশের রাজত্বকালে গৌড়ীয়াদের সঙ্গে ওড়িয়া ভক্তদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্যের একটা কারণ বোঝা যায়।

নিমাই সন্ন্যাসী হবার জন্য গৃহত্যাগ করলে তাঁর গৃহপরিজনদের অবস্থা কি হল?

সতীলক্ষ্মী উঠিলে পুণ,
ন দেখি চৈতন্য গোঁসাই। কামোদী ধাই হকরাই।
বোলান্ত শুন পরিজন। কেণিকি গলে শ্রীচৈতন্য।

কামোদী ধাই ধেয়ে গিয়ে শচীকে বলল।

শচী শুণিণ বেগে ধাই। পুরন্দ্র মিশ্র আগে কহি।
শুণহে বিপ্র শিরোমণি। চৈতন্য গলে কেনে পুণি।

সে কথা শুনে নিত্যানন্দ মনে মনে হর্ষিত হলেন।

তাহা শুণিণ নিত্যানন্দ। মনেণ হরষ আনন্দ।

তিনি বললেন, 'বিপ্রবর, আমি আপনার পুত্রকে ফিরিয়ে আনব। আপনারা সকলে স্থির হয়ে থাকুন'। এই বলে নিত্যানন্দ সব বালকদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। এই বালকদের মধ্যে কারা কারা ছিলেন?

হরিদাস যে উদদত্ত। গউর দাস যে পণ্ডিত।
সুন্দরানন্দ বিশ্বম্ভর। পুরুষোত্তম পরমেশ্বর।

অভিরাম মুখরি দাস। বক্রেশ্বর শঙ্কর ঘোষ।
শ্রীনিবাস বংশীবদন। রাঘো পণ্ডিত বিদ্যমান।
বাসুদাস তন্তী সারংগ। আনন্দ গোপাল শ্রীরঙ্গ।
কৃষ্ণমিশ্র যে বৃন্দাবন। সার্বভৌম যে নবঘন।
সমস্ত বালকঙ্কু ঘেণি। উচ্চে করন্তি হরিধ্বনি।

পথে অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও চললেন নিত্যানন্দের সঙ্গে।• শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসবেশ দেখে, 'সমস্তে মোহে মূর্চ্ছা গলে।' চেতনা পেয়ে নিত্যানন্দ বললেন—

শুন হে চৈতন্য গোসাইঁ, সন্ন্যাস হেল কি কারণ।

চৈতন্য বললেন,

'পৃথিবী পর্য্যটন করি। দেখিবু যাইঁ নীলগিরি।
দ্বাপরে মথুরাতে জাত। বড়িলি গোপীঙ্ক সংগত।
গমন মথুরা নগ্র। ঘেনিণ যাস্তেন অক্রূর।
গোপী এ মোতে না ছাড়িলে। অনেক কাষ্ঠা পূর্ণ কলে।
প্রেমরে সত্য ভাস্কু কলি। লেউটি আসিবি বোইলি।
পচ্ছেণ পেষিলা উদ্ধব। কহিণ গুপ্তজ্ঞান ভাব।
গোপীঙ্ক কহিব বুঝাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ দেখাই।
দ্বাপর অন্তে কলিযুগ। জন্মিব নবদ্বীপ লাগ।'

এরপর—'সন্ন্যাস রূপে ভগবান। পথে চালিলে জনার্দন।'

ঈশ্বরদাস যথেচ্ছ কল্পনাবলে নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যকে প্রয়াগে নিয়ে গিয়ে অদ্বৈত ও তাঁর পত্নী সীতার আতিথ্য গ্রহণ করিয়েছেন। প্রামাণিক চৈতন্যচরিতে নবীন সন্ন্যাসী নিমাই অদ্বৈত সীতার অতিথি হয়েছেন ঠিকই, তবে সে প্রয়াগে নয় শান্তিপুরে।

ঈশ্বরদাস (৪২ অধ্যায়ে) লিখেছেন—

গঙ্গার কূলে গলে চালি। প্রয়াগ দেশে বেগে মিলি।
দেখিলে নগ্র পরিমল। সর্বস্থান রে শিব আল।
... ...
অদ্বৈত ঠাকুর স্বপত্নী। সীতা সমেতেণ কামিনী
যে যাহা যতি সেবা করি। বৈরাগব্রত স্থিরী ধরি।
চৈতন্য কিশোর কিশোরী। লক্ষ্মী নৃসিংহ পূজা করি।
মনোহি ফলমূল দেলে। চৈতন্য হরষ হোইলে।
বাণ্টিন দেলে শ্রীনিবাস। যেহু করই যে গ্রাস।
পচ্ছেন প্রভু বিপ্রবর। নিত্যানন্দ ঘেণি সংগর।
অদ্বৈত হরিদাস ঘেনি। উদদন্ত হুঁ এপোধনী।
পঞ্চঙ্কু ঘোন চইতন্য। কন্দে ফলমূল ভোজন।

ভোজনের পর বিশ্রাম। সেখানে রাত কাটালেন চৈতন্য। অভিরাম গান্ধার কৌরি রাগে হরির নাম গান করতে লাগল। নাম গানেই রাত কেটে গেল—'পূর্বেণ অরুণ প্রকাশ।' গঙ্গাতীরের এক নগরে তিনদিন থেকে আবার পথ চলতে লাগলেন।

সঙ্গী বালকদের পথশ্রমের কষ্ট জানতে পেরে চৈতন্য তাদের পাদুকা মন্ত্র দিলেন। সকলে সেই মন্ত্র স্মরণ করে দ্রুত গোমতী তীর্থে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গোমতী তীর্থ পুরী জেলার প্রাচী নদীর তীর্থ।

সেখানে—অশোক বৃক্ষতলে হরি ! বসিলে মৃগছাল পরি।

সে তীর্থে রাত কাটিয়ে সকালে যাত্রা।—চন্দ্রকানন মহীতট, কশ্যপগিরি একঘাট। এখানে 'মুরলী সিংঘানাদ' ও চারশ' শঙ্খধ্বনি করে চৈতন্যকে বরণ করা হল।

হরি হরি শব্দ শুনে কশ্যপ মুনি এলেন চৈতন্যের নিকট। রত্নঝরায় জল এনে হরির (চৈতন্যের) পা ধুইয়ে দিলেন। রত্ন পালঙ্কে বসতে দিলে চৈতন্য বললেন, আমি অতিথি, 'কুশ কম্বল ব্যাঘ্রাম্বর। এমান আসন মোহব।' কশ্যপ ঋষি তখন বললেন, আমি তোমার পূর্বলীলার মার্কণ্ড। সেখানে একরাত কাটিয়ে আবার পাদুকামন্ত্র স্মরণ করে পবনবেগে চলে গেলেন—গোতমী নদীর তীরে সনাতন নগরে। সেখানকার লোকেরা বলল—'আস্ত নগ্রেণ তুম্ভে থাঅ। আম্ভংকু হরিনাম কহ।' তখন চৈতন্যের সঙ্গী যাঁরা নাম করতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণ, অভিরাম, অদ্বৈত, হরিদাস, উদদত্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীনিবাস, বক্রেশ্বর, সুন্দরানন্দ, বংশীধর। এঁরা সবাই মিলে—

হরির গুণ নাদ কলে।	শুনি সকলে মোহ গলে।
কীর্তন রস ময়ে মত্ত।	লোচনু হুএ অশ্রুপাত।
সমস্তে লোটন্তি ধরণী।	প্রেম সমুদ্র তরঙ্গণী।

এই নাম গানের সঙ্গে নানা নৃত্যবিভঙ্গে সবাইকে মোহিত করলেন নিত্যানন্দের সেবক পুরুষোত্তম—

নৃত্যরে নাচই বিভঙ্গ।	ত্রিভঙ্গ তালর তা অঙ্গ।
এমন্তে চৈতন্য গোঁসাই।	নাগর বোলি আজ্ঞা দেই।
নাগর পুর্ষোত্তম দাস।	স্নেহে ডাকন্তি হৃষিকেশ।

এরপর নাগর পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গ। অদ্বৈত আচার্য্য তাঁকে চেয়ে নিলেন চৈতন্যের কাছ থেকে। ন্যগর চৈতন্যকে বললেন,

চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত।	তিনি মূর্তি যে এক তত্ত্ব।

এই অভিন্ন মূর্তিতে অদ্বৈতকে দেখতে পেলে তবেই তাঁর সেবক হব। একথা শুনে চৈতন্য তাঁকে সেই অভেদ মূর্তি দেখালেন—'তিনি মূরতি এক বর্ণ',

যেসনে জগন্নাথ রাম।	মধ্যে সুভদ্রা অনুপাম।
রাধাঙ্গ হোই শোভা দিশি।	নিন্দই কোটি কোটি শশী।
পারুশে শোভা হরিদাস।	যেসনে শোভা ব্রহ্ম শেষ।
উদদত্ত যে সুদর্শন।	কোটি-এ সূর্য্য তেজবর্ণ।
চক্রর প্রায়ে হস্তে শোহি।	দেখি নাগর মন মোহি।
সাষ্টাঙ্গে হোই দণ্ডবত।	শিরে যোড়ুণ বেণি হস্ত।
বোলই হোইলি নিস্তার।	উদ্ধরি ধর কম্বুধর।

তখন অদ্বৈত নাগরকে নিয়ে পত্নী সীতাদেবীর হাতে সমর্পণ করলেন। সীতার জঙ্গলী নন্দিনী নাম্নী দুই কন্যা পতিরূপে নাগরকে বরণ করলেন—

সীতা দেখিন হসহস। জঙ্গলী নন্দিনীকি বেশ। ১০১
উত্তম স্ত্রিবীবেশ করি। কন্যা নাগরে বর বরি।
নন্দিনী ঠাকুরানী নাম। জঙ্গলী নামে অনুপাম।
নিত্যরে দুই সখী সঙ্গ। নাগর নাচে অঙ্গ ভঙ্গ। ১০৪

এইভাবে একবছর সেই নগরে রসোল্লাসে কেটে গেল।

ধন্য সে নগ্র পুরজন। দিশন্তি শ্রীচৈতন্য বর্ণ। ১০৬

গৌতমী নদীর পারে কোন এক নগরে এসব ঘটনা ঘটেছে বলে ঈশ্বরদাস জানিয়েছেন। তবে ঘটনাস্থল যাই হোক, এখানে সীতাদেবীর 'দুই-কন্যার' ব্যাপারে কবি বিপর্যয় কাণ্ড বাঁধিয়েছেন। নন্দিনী জঙ্গলী—এঁরা দুজনে সীতাদেবীর স্ত্রীবেশধারী দুই পুরুষ শিষ্য। নন্দিনীর প্রকৃত নাম ছিল নন্দরাম সিংহ, জঙ্গলীর নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী [চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ. ৫৮৭]।

লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্রে' আগে নারীর বেশ ধারণ করে সখীভাবে ভজন করতে করতে এঁদের পুরুষদেহ স্ত্রীদেহে রূপান্তরিত হয়।

এঁদের বিষয়ে ড. বিমানবিহারী মজুমদার জানিয়েছেন—

'জঙ্গলী (বিজয়া) সীতাদেবীর শিষ্য; বুকানন হ্যামিলটনের পূর্ণিয়া রিপোর্ট (পৃ. ২৩৭) মতে ব্রাহ্মণ, গৌড়ের নিকট বাস করিতেন। অদ্বৈতমঙ্গল (৭২ পৃ.) অনুসারে 'পুরুষ শরীর স্ত্রী প্রকট হইলা।' নবদ্বীপের ললিতা সখীর ন্যায় পুরুষের স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে ভজন করার প্রথা হয়তো ষোড়শ শতাব্দীতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই মত স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য চরিত গ্রন্থে ও বৈষ্ণব বন্দনায় জঙ্গলীর নাম পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, জঙ্গলীর পূর্বনাম রাজকুমার বা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। তিনি সীতার নিকট দীক্ষা লওয়ার পর মালদহের অন্তর্গত জঙ্গলী টোটা নামক স্থানে যাইয়া সাধনা করেন। (উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-১৮৭) [চৈতন্য চরিত্রের উপাদান, পৃ. ৬৫০]

"নন্দিনী (অ) [জয়া] সীতার শিষ্য—কায়স্থ, নাটোর। গৌড়ীয় মঠের চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় ইহাকে কি প্রমাণ বলে অদ্বৈতের কন্যা বলা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। ১৮০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হামিলটন লিখিয়াছেন—

In the territory of Gour, at a place called Janggalitala is the chief seat of the Sakhibhab Vaishnavas who dress like girls, and act as religious guides for some of the impure tribes. The order is said to have been established by Sita Thakurani wife of Adwaita; The two first persons who assumed the order of Sakhibhava were Jangali, a Brahman and Nandini, a Kayastha. Jangali was never married and it is only his pupils that remain in this dirtrict, and there are all Vaishnavas who reject marriage. [Purnea Report. p 273]

লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্রে' আছে—

ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম নন্দরাম। শ্রীকৃষ্ণ অনুসংগতে হয় গুণধাম ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, এই নন্দরামের উপাধি ছিল সিংহ এবং তিনি উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। নন্দিনী গোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকান্ড, তৃতীয়খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়)। [চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃ:-৬৫৪]

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করতে হয়, ঈশ্বরদাস ভুল করে নন্দিনী জংগলীকে সীতার কন্যা ভেবে নিয়ে কল্পনার আতিশয্যে তাঁদের বিয়ে পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন।

এরপর ৪১ অধ্যায়ে চৈতন্যের তীর্থপর্যটন প্রসংগ ফিরে এসেছে। গৌতমী নদী পার হয়ে চৈতন্য কটকে এলেন। সেখান থেকে সরস্বতী তীরে রোমানগর, কাবেরী ভুবন, গণ্ডকীকূল, বেলাবলি ঘাট পেরিয়ে ১২ দিন কাটালেন।—

'সে তীর্থে দ্বাদশ দিবব। রহিলে প্রভু হৃষীকেশ ॥'

কোনদিন ফলমূল, কোনদিন অন্নজল জুটত, কোনদিন কিছুই জুটত না।

'কেউ' দিবস ফলমূল। কেউ' দিবস অন্নজল ॥
কেউ' দিবস উপবাস। করন্তি প্রভু হৃষকেশ ॥

এরপর "পথে গমিলে শ্রীচৈতন্য। মিলিলে কূর্ম মহীস্থান ॥
সে নগ্রে সুধর্মা রাজন।···

এখানে আবার কবি বাস্তব থেকে সরে গেছেন—সুধর্মা রাজার ছেলে করেছেন রূপ আর সনাতনকে। এই তীর্থযাত্রায় সংগে রয়েছেন নিত্যানন্দ, মরুণ মুণি এবং চারশতাধিক বৈরাগী, রাজা নিজে রূপসনাতনকে চৈতন্যের পায়ে সঁপে দিলে চৈতন্য আজ্ঞায় নিত্যানন্দ দুই রাজপুত্রকে দীক্ষা দিলেন।

সংগে সমস্ত বইরাগী। ভুঞ্জি আনন্দ সুখভোগী ॥ ৩১···
চারিশ শঙ্খধ্বনি পুরি। সর্বে বোলান্তি হরি হরি ॥ ৪৭···
সুধর্মা কর আছি যোড়ি চৈতন্য পদ্মপাদে পাড়ি ॥ ৫০···
সে নগ্রে রূপ সনাতন। অটন্তি রাজার নন্দন ॥···
রাজন বোলন্তি গোসাই'। পুত্র সমার্প দোল মুহি। ৫৫
এহাকু সংগে ঘেনি যিব। মোহর ভকাত ঘেনিব। ৫৬
পুত্রকু কর উপদেশ। মুঁ তুম্ভ চরণে বিশ্বাস। ৫৭
শুনি হসন্তি কম্বুধর। নিত্যানন্দর ধরি কর। ৫৮
বোলন্তি শুনিমা বচন। দীক্ষা তু দিঅ সনাতন। ৫৯
রূপকু দীক্ষা দিঅ যথা। ভক্তিবিষয় যথা পোথা। ৬০
দিক্ষ তু রূপ সনাতন। হরষ নিত্যানন্দ মন। ৬১
চৈতন্য আজ্ঞা শিরে ঘেনি। দীক্ষা দেইণ পুত্র বেনি। ৬২

সে নগরে চৈতন্য রইলেন ন মাস।—

সে নগ্রে চৈতন্য মঙ্গল। শুভই অনুক্ষণে খোল।
ন মাস রহিলে গোসাই। তীর্থ অনেক কলে তঁহি ॥

তারপর মরূল মুনি চৈতন্যকে বৃন্দাবন যাবার কথা বললেন। চৈতন্য সেখান থেকে উত্তর মুখে চলে মথুরা বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন।

মরূল মুনি কর যোড়ি। চৈতন্য পাদতলে পড়ি।
শুনিয়া শচীর ক্রন্দন। যমুনা কূলে বৃন্দাবন।
এহি পথেন চাল যিবা। সে নগ্র কেমন্ত দেখিবা।...
মথুরা দেখি গোপ গলে। নগ্র অভ্যন্তরে রহিলে।
যমুনাকূলে বৃন্দাবন। দেখিণ শচীর নন্দন॥

ঈশ্বরদাস লিখেছেন বৃন্দাবনে গিয়ে চৈতন্য কৃষ্ণকথা ও গোপীভক্তি বিষয়ক পুঁথিপাঠ করেছিলেন—

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণকথা। গোপীঙ্ক ভক্তির বারতা॥
পুরাণ পুস্তক লেখন। পঢ়ন্তি শচীর নন্দন॥

এ তথ্য চৈতন্য চরিত্রের স্বাধ্যায় ও গ্রন্থানুরাগের দিকটি প্রকাশ করেছে। অন্যান্য চৈতন্য চরিতেও—কবিকর্ণপুরের নাটকে, গোবিন্দ কর্মকারের করচায়, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতেও—চৈতন্যের গ্রন্থ পাঠে আগ্রহের কথা আছে। এই (৪৩) অধ্যায়েই বারাণসীর রাজা রামরায়ের বৃত্তান্ত আছে। রামরায় অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী, নিজেও বিদ্বান। তিনি ভবিষ্যপুরাণে কৃষ্ণচৈতন্য অবতারের কথা শুনলেন।—

ভবিষ্য পুরাণ শুণই। কৃষ্ণচৈতন্য রূপ হোই।
নবদ্বীপরে হেবে জন্ম। পতিত পাবন তা নাম॥
কারুণ্য সিন্ধু অবতার। বউধরূপে কম্বুধর॥
আপনা নাম দীক্ষা দেই। তারিবে চৈতন্য গোসাই॥
পশুজন্মরু হেব পার। চৈতন্য আপে নিরাকার॥

এতে বোঝা যাচ্ছে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালেই ভবিষ্যপুরাণের পুঁথিতে চৈতন্য অবতার প্রসঙ্গ লিখিত। যাই হোক, রামরায়ের বৃত্তান্ত অভিনব। তিনি রঘুরায়কে আদেশ করলেন 'তাড়াতাড়ি, নবদ্বীপে যাও, সেখান থেকে তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস। আদেশ পেয়ে রঘুরায় নবদ্বীপে এসে দেখলেন 'চৈতন্য সন্ন্যাস বেশ।' চৈতন্যের উপদেশ শুনে রঘুনাথ অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নিলেন। এতে–'চৈতন্য হরষ হোইলে। রঘুরায়ঙ্কু কোল কলে।' রঘুদাসকে নিয়ে চৈতন্য বৃন্দাবনে গেলেন, 'রহিলে অষ্টম বরষ।' রঘুরায়ের আমন্ত্রণে চৈতন্য 'পাদুকামন্ত্র সুমরিলে। বারাণসীরে বিজে কলে।' সঙ্গে ছিলেন—

অদ্বৈত নিত্যানন্দ দত্ত। হরিদাস যে কৃষ্ণগীত।
শ্রীনিবাস সুন্দরানন্দ। কেশব গোবিন্দ আনন্দ।

আর ছিলেন শঙ্কর ঘোষ, অভিরাম।

এই নগরে পণ্ডিত শিলা চক্রবর্তী চৈতন্য-মহিমা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। অভিরাম গিয়ে তাঁকে বললেন, 'শিলা তুমি পাথর হয়ে আছ, শিলাপাথর অচ্ছু হোই।' আমার প্রভু আদি ভগবান। যত লোক সবাই তাঁকে দেখে দৃষ্টিক্ষুধা মেটাচ্ছে—বিষ্ণুর সমান অনন্তরূপী শ্রীচৈতন্য।

'মো প্রভু আদি ভগবান। তাহার অটই সেবক। দেখণাহারী যেতে লোক।
সমস্তে বিষ্ণুর সমান। অনন্তরূপী শ্রীচৈতন্য'।

একথা শুনে ব্রাহ্মণ অভিরামের পায়ে পড়ে বিহ্বল হয়ে
বোলই—কৃতকৃত্য হোই। দেখাঅ গৌরাঙ্গ গোঁসাই।

এইভাবে বারাণসীর 'সর্বে হইলে উপদেশ। চৈতন্য চরণে বিশ্বাস।' বারাণসীর রাজা রামরায় ব্রাহ্মণ। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'এত বড় আশ্চর্য্য। সন্ন্যাসীর কোন বিকার নেই। চণ্ডালকে পর্যন্ত নমস্কার করে কোল দিচ্ছেন।—

'চণ্ডাল নমস্কার করি। কোল দিঅই নরহরি।
আজি মুঁ গোষ্ঠী করিবই। বোলি উঠই বিপ্রসাঁই। ১২৬

আজ আমি আলাপ করবই সন্ন্যাসীর সঙ্গে। রামরায়ের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ শুনে চৈতন্য সন্তুষ্ট হলেন, নিজেও 'জ্ঞান বখানই নির্গুণ।'

'এমন্তে সপত দিবস। গোষ্ঠী করিলে পীতবাস'।
প্রেমর ভক্তি ন মানই। নির্গুণ ভাব বখাণই।
চৈতন্য আপে নিরঞ্জন। প্রেমে মোহিলে তার মন।
রাজার প্রেম জাত হোই। সাষ্টাঙ্গে ঢলিন পড়ই।
চৈতন্য উঠি কোল কলে। সর্বপণ্ডিতে দেখুথিলে।
চৈতন্য অঙ্গ লাগি তার। লোতক বহে ঝরঝর।
প্রেমে সে ভূমিরে পড়ই। সবুর চরণ ধরই।

এই রামরায় পূর্বে অদ্বৈতের নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন। তখন অদ্বৈতের ছিল বৃদ্ধ শরীর। কিন্তু চৈতন্যের কৃপা পেয়ে অদ্বৈত 'এ বয়সে নব যুবা।' তাই রাজারাম রায় তাকে চিনতে পারলেন না। তখন—

থোকে কহন্তি বিপ্রজন। শুণ বারাণসী রাজন।
অদ্বৈত তোহর গোসাইঁ। চিহ্নি ন পারু কিস পাইঁ।
চৈতন্য দর্শনের যুবা। যে বে পয়রে কর সেবা।
শুণিণ রাম রায়ে রাণ। অদ্বৈত চরণে শরণ।
প্রেম রসরে মত্ত ভোল। তেজি সকল জাতিকুল।...
প্রেমলহরী উচ্ছুলই। কান্দন্তি চৈতন্য গোসাই।
রামরায়ঙ্কু করি ক্রোল। বোলন্তি শুণ মহীপাল।
তোহর নাম অটে রাম। নইলুঁ দেব অনুপাম।
দ্রবিলু মোর প্রেম শুনি। আনন্দ হেলু নৃপমনি।
যেণু তে নাম রামানন্দ। প্রসঙ্গে কহিলে গোবিন্দ।
সেঠারু রামানন্দ হোই। বৈরাগ্যবেশ সে ধরই।

অদ্বৈতশিষ্য বারাণসীরাজ রামরায় সম্পর্কে অন্য কোন চৈতন্যজীবনীতে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে চৈতন্যের প্রেমভক্তি বিতরণের ধরনটি লক্ষণীয়। রাজা রামরায় প্রেম ভক্তি না মেনে নির্গুণ ভাবের ব্যাখ্যান করতে থাকলে চৈতন্য মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। 'নির্গুণ গোষ্ঠী বখাণই। চৈতন্য শুণি তোষ হোই। যিনি

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী, অভেদের মধ্যে ভেদ মানেন, তাঁর কাছে নিগুর্ণও সত্য, সগুণও সত্য, সগুণেই-হোক, নিগুর্ণেই হোক, সকলকে তাঁর সমান প্রশ্রয়। তিনি যে জানেন, 'এই নাও প্রেমভক্তি' বলে কাউকে প্রেমভক্তি দানের আগে ঘোষণার প্রয়োজন নেই। কাউকে তর্কের দ্বারা কারো মানসভূমি থেকে উৎখাত করারও প্রয়োজন নেই, কোন কথা না বলে কেবল বুকে জড়িয়ে ধরলেই হল, কথার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি সেই দিব্যস্পর্শের, কথা দিয়ে যা বোঝান যায় না। স্পর্শের যাদুকাঠিতে খুলে যায় কথার অতীত সেই প্রেম ভক্তির দিব্যভাবের জগৎ।

চৈতন্যের অঙ্গস্পর্শে রামরায়েরও তাই হল।—

চৈতন্য অঙ্গ লাগি তার। লোতক বহে ঝরঝর।
প্রেমে সে ভূমিরে পড়ই। সবুর চরণ ধরই।
কম্পণ করই রোদনু। হরি বোলই অবিচ্ছিন্ন।

চৈতন্যের প্রেমদানের এই ছিল স্বকীয় রীতি। চৈতন্য সখা নরহরি সরকার ঠাকুর বলেছেন, চৈতন্য কেবল 'অশ্রুধারয়ৈব' মানুষের আসুরীভাব দূর করতেন। চৈতন্য পার্ষদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন,

> 'দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দু সংশীতলো'…'দূর হইতে কুতর্করূপ পতঙ্গ দহনকারী, কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও শীতল…'।

৪৪ অধ্যায়ে ঈশ্বরদাস জগাই মাধাই উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, এখানেও কবি রামায়ণ কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত। ইতিপূর্বে আমরা চৈতন্য সন্ন্যাসের পর জগন্নাথ মিশ্রকে 'হা চৈতন্য হা চৈতন্য' বলতে বলতে প্রাণত্যাগ করতে দেখেছি। রামচন্দ্রের বিষয়ে রাজা দশরথের ব্যাকুল আর্তি ও মৃত্যু বৃত্তান্তের সঙ্গে মিল রেখে কবি এই কল্পনা করেছিলেন। এখানে আবার রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির দস্যুজীবনের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি জগাই মাধাইকে নরঘাতী দস্যুতে পরিণত করেছেন। বাস্তবের ধার না ধরে নবদ্বীপবাসী জগাই মাধাইকে কবি কর্ণাটের বাসিন্দা করেছেন। বারাণসী থেকে চৈতন্য 'অনেক দিন পথ বহি। কর্ণাট দেশে হেলে যাই।' সেখানে জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা হল।—

দেখি হসন্তি ভগবান। বহন্তি কোমল বচন।
বোলন্তি শুণহে জগাই। মনুষ্য মার কহিঁ পাই।

'এ পাপ লাগই কাহাকু।…শুণিন কহই জগাই। এ পাপ কুটুম্বে লাগই। শুনি হসন্তি চইতন্য। পচারি আস যা বহন।' পিতামাতা পত্নী কেহই তার পাপের ভাগ নিতে রাজী হল না। তখন জগাইয়ের পূর্বস্মৃতি মনে পড়ল। লক্ষ্মী তাদের অভিশাপ দিলে—

হসি বোইলে দামোদর। চারি জন্মরে হেবু পার।
পঞ্ম হিরণা হিরণাক্ষ। নৃসিংহরূপ দেখি মোক্ষ।
এনিকি দ্বিতীয় জনম। রাবণ কুম্ভকর্ণ নাম।
শ্রীরামরূপে অবতার। জন্মিবি অযোধ্যা নগর।
দশরথের কোলে জাত। অসুর করিবি নিপাত।…

তহুঁ দ্বাপর অবতার। জন্মিবি দেবকী উদর।...
তু জন্ম কাল্ব শিশুপাল। বাঢ়িবি দুষ্ট রাজা মেল।
মোহর সঙ্গে বাদী হোই। চক্রেণ শির ছেদিবই।
তদপ্রান্তেণ কলি আদ্য। পাপ প্রবেশ মণ্ড মধ্য।...
তু জন্ম কর্নাট দেশর। জাণন্তা রাজপুত ঘর।
জগাই যে মাধাই সিংহ। সিংহর প্রাক্রমর অঙ্গ।...
তুম্ভঙ্কু হরিদীক্ষা দেই। সর্বকলুষ ছেদিবই।

জগাইয়ের মনে পড়ল নারায়ণ বলেছিলেন—

সত্যরে ধন লয়ে করি। তেবে প্রসন্ন নরহরি।
ত্রেতয়ারেন যজ্ঞযাগ। তেবে লভন্তি বিষ্ণুঅঙ্গ।
দ্বাপরে বিপ্রপুজা করি। তেবে প্রসন্ন দেব হরি।
কলিবে একতত্ত্ব মান। করিণ ন পারিবে জন।
নাম মহিমা মোর থিব। ন ভজি প্রাণী পশুজীব।
তেণু মুঁ শ্রীচৈতন্য হোই। নাম প্রকাশ করিবই।

জগাই বলল, মাধাই আমার সব মনে পড়েছে।'

রাত পোহালে গোমতী নদীতে স্নান করে 'চৈতন্য লক্ষ্মীনৃসিংহ পুজো সারি, পুজন্তি কিশোর কিশোরী।' এই সময় দুইভাই এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ে।

চৈতন্য হেসে বললেন—

'কালি বিচাব প্রাণহত। আজ ত কল দণ্ডবত।
এথি বিষয় মোতে কহ। হৃদবে ন বাখি সন্দেহ।।

জগাই-মাধাই তখন দামোদরের সব কথা খুলে বলল। চৈতন্য তখন সানন্দে তাদের দীক্ষা দিলেন। ভিক্ষাবিধি শিখিয়ে তাদের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহে পাঠালেন—

বহুত দেলে নেব নাহিঁ। তেবে এ ধর্মকু আসই।
ভিক্ষা যে ন পাইলা দ্বার। কল্যাণ কবিব অপার।
তেবে সুফল হেব কর্ম। লভিব শ্রীচৈতন্য ধর্ম।

তখন জগাই মাধাই কর্ণাট নগরের দ্বারে ভিক্ষা করতে লাগল।

চৈতন্য গুণ কীর্ত্তি গাই। নাচন্তি উন্মত্ত হোই।
নয়নু বহে অশ্রু জল। ভাববে হোইণ ব্যাকুল।

নরঘাতী দস্যুদের রূপান্তরে চমৎকৃত হল নগরের লোকেরা—

এ মন্তে নগ্রলোকে দেখি। নির্মল কলে বোন আখি।

তিনমাস নগরে থেকে সকলকে উপদেশ দিলেন চৈতন্যসঙ্গী নিত্যানন্দ—

নগ্র জনঙ্কু উপদেশ। কহিলে নিত্যানন্দ দাস।।
সে নগ্রে তিনমাস থিলে। তহুঁ বিজয় করি গলে।। [৪৪ অধ্যায়]

এইভাবে প্রেমভক্তি বিতরণ করতে করতে চলেছেন চৈতন্য। তাঁর আগে আগে চলেছেন অদ্বৈত, পিছে নিত্যানন্দ, পাশে উদ্দণ্ড, হরিদাস, অভিরাম। শ্রীনিবাস গান গেয়ে চৈতন্য কীর্তন করছেন। শঙ্করঘোষ 'বাহা' 'বাহা' নাদ করছেন, শঙ্কর ও সুন্দরানন্দ দুজনে তাল দিচ্ছেন। বক্রেশ্বর, বৃন্দাবনও সঙ্গে আছেন, সবার পিছে

জনতা। আকাশ দেবতারা 'দেখন্তি গৌর কলেবর। সকল জন্তুংক ঈশ্বর॥ সকল জীবের ঈশ্বর গৌর।

চৈতন্যের ইচ্ছা হল হেংগুলা দর্শন করবেন। দেবলোকে ব্রহ্মা বললেন নরশরীরে সেখানে যাওয়া যাবে না। চৈতন্য তখন দেবীকে স্মরণ করলেন। তখন 'বোলন্তি হরি হরি বোল। দেবী পড়িলে পাদতল।' তারপর নর্মদায় স্নান করে চৈতন্য দ্বারকায় গেলেন।—

নর্মদা নদীরে স্নাহান। সারিণ দেব ভগবান। ১৮১
পথে গমন করি গলে। মুরলি বেণুনাদ কলে।
শঙ্খ স্ফুরই ঘন ঘন। মিলিলে দ্বারকা ভুবন।
রাত্রেণ তরুতলে বাস। আসন কলে শচী শিষ্য।
প্রভাত কালু নিদু উঠি। ধোইলে পদ্ম মুখ গোটি।
বাম ভুজর কমণ্ডল। হরি থোইলে মহীস্থল।
রঙ্গুআ বস্ত্র বনমালী। বাম দক্ষিণে বেগে চোলি।
কটিরে ডোরর বন্ধন। চলিলে শচীর নন্দন।
দ্বারকা লোকে মুখ চাঁহি। এমন্ত দেখিলাত নাহিঁ।
১৮৯ [৪৫ অধ্যায়]

এখানে যদুবংশের উগ্রসেনকে চৈতন্য পরমহংস দীক্ষা দিলেন—

হরি শবদে চলে পথ। পুরন্দ্র সুত গোপীনাথ।
পথেন করন্তি গমণ। যদুবংশর উগ্রসেন।
বনর ফলমূল আনি। চৈতন্য চরণে দয়িনী।
হরি সুদয়া তাকু কলে। পরমহংস দীক্ষা দেলে।

এখান থেকে চৈতন্য গেলেন বদরিকাশ্রমে।—

'সন্ন্যাস পথে বনমালী। বদ্রিকা আশ্রমেণ মিলি।
সেখানে 'অনেক দেশু' জনে আসি। দেখন্তি প্রভু ব্রহ্মরাশি।
সমস্তে হোই একমন। চৈতন্যে দেইথান্তি ধ্যান।
[৪৫ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে একটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যার সমর্থন মেলে প্রবোধানন্দের চৈতন্য-চন্দ্রামৃতে ও গোবিন্দ কর্মকারের করচায়। পথে চলতে চলতে চৈতন্য স্খলিতবাস বা 'দিগম্বর' হয়ে পড়তেন।—

ব্রহ্মা হোইলে কম্বুধারী। কিম্পা পথেণ দিগম্বরী···১৯/৪৫ অধ্যায়
তীর্থে গমন দিগম্বরী। কষা বসন দণ্ডধারী। ৪৩/৪৬ অধ্যায়।

প্রবোধানন্দ লিখেছেন—

'স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয়নামাবলীনাং
মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূত বিস্রস্তগাত্রঃ'।

'যিনি হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি স্বীয়নাম সমূহের অতিশয় মাধুর্য্যাবাদনে প্রমত্ত হইয়া অনির্বচনীয় রূপে বিবশ ও স্খলিত গাত্র হইয়াছেন'...ইত্যাদি [চৈতন্যচন্দ্রামৃত]।

গোবিন্দ কর্মকার লিখেছেন—

'হরহর বলি প্রভু উচ্চারণ করি।
আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি।
প্রেমে গদগদ হয়ে গড়াগড়ি যায়।
বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায়॥ [পৃ· ৩৮, ১ম সংস্করণ]

বদ্রিকাশ্রম থেকে ফল্গুনদী পেরিয়ে চৈতন্য সঙ্গী নিত্যানন্দ অদ্বৈত, বংশীবদন ও মরুন্দ মুনিকে বললেন—

তীর্থে গমন দিগম্বরী। কষা বসন দণ্ডধারী।
দক্ষিণে নীলগিরী শ্রেষ্ঠ। ক্ষেত্রক পরেণ বৈকুণ্ঠ।
এ দেহ ঘেনি যেহু থাই। সন্ন্যাস ধর্ম সেহু পাই।
দর্শন পরং ব্রহ্ম রূপ। ছাড়িব কোটি জন্ম পাপ।
অতএব, পুছন্তি অচ্যুত। ওড় রাষ্ট্রকু কেউ বাট।
যে জাণ হুঅ আগুসার। ৪৩-৪৯ [৪৬ অধ্যায়]

পাদুকামন্ত্র স্মরণ করে তাঁরা এসে পড়লেন বৈতরণী নদীর তীরে।
বৈতরণী পার হয়ে যাজনগব—

চলিলে দেব দয়ানিধি। পশিলে বৈতরণী নদী। ৭১
আনন্দ শচীর দুলাল। পারি হইলে এনীকুল॥
যাজনগরেণ পশিলে। নদীর কূলরে রহিলে।
বৃক্ষমূলেবে দীনবন্ধু। যা নাম গোপীজনইন্দু॥
তিরণ পাড়ি শয্যা করি। উপরে ব্যাঘ্রছাল পাড়ি।
আসন কলে শ্রীচৈতন্য। সঙ্গে বালক সর্বজন॥
এমন্তে বঞ্চিলে তিমিরি। প্রভাতে শঙ্খণাদ স্ফুরি।...
দক্ষিণ মুখে পথ গলে। [৭৮/৪৬ অধ্যায়]

এরপর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে একে একে বলরাম, যশোবন্ত, অচ্যুত ও অনন্তের দেখা হল, তাঁরা চারজনই চৈতন্যের শরণ নিলেন। এই চারজন এবং জগন্নাথ দাস—মোট পাঁচজন—এঁরাই ওড়িআ সাহিত্যের বিখ্যাত পঞ্চসখা।

আমরা আগেই জেনেছি, ওড়িষী বিদ্বদ্‌সমাজের একাংশের ধারণা চৈতন্য সাক্ষাৎকারের পূর্বেই পঞ্চসখা তাঁদের সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন; আচার্য সুনীতিকুমারও লিখেছেন—Most of these writers had already been engaged in their literary labours before they met Chaitanya. [*The Delhi Sultanate* : Oriya p. 521]

ডক্টর মায়াধর মানসিংহ লিখেছেন—পঞ্চসখাদের মধ্যে প্রধান দুইজন বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাস, নিজ নিজ শ্রেষ্ঠগ্রন্থ চৈতন্যের ওড়িষ্যা আগমনের পূর্বেই লিখে ফেলেছিলেন—"পঞ্চসখ মানঙ্ক মধ্যরু মুখ্য দুই জন, বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাস, নিজেদের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ সবু চৈতন্য ওড়িশাকু আসিবা পূর্বরু হিঁ লেখি সারিথিলে⋯"। (ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস, পৃ· ১৪৪]

এই ধারণা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ ঈশ্বরদাসের কাব্যে পঞ্চসখা প্রসঙ্গে পরিবেশিত

তথ্য। ঈশ্বরদাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, মর্ত্যে অবতীর্ণ হওয়া স্থির করে বিষ্ণু গরুড়কে ডেকে বললেন নিত্য সখাদের ডেকে আনতে। তাঁরা এলে বিষ্ণু তাঁদের পতিত উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে জন্মাতে বললেন।—

"পুছন্তি সকল বারত। অনাদি অব্যয় অচ্যুত। ১১২
পঞ্চসখাঙ্কু রাই পাশ। তুম্ভে মো অত্যন্ত বিশ্বাস।
তুম্ভে জন্মিব মণ্ডপুরে। পতিত করিব উদ্ধার।" ১১৪

নিত্যসখা দাম, সুদামা, সুবাহু, সুবল ও শ্রীবৎস যথাক্রমে অনন্ত, অচ্যুত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ দাস রূপে জন্মগ্রহণ করলেন।—

দাস গোপাল যে অনন্ত। শূদ্র জাতিরে সে উদিত। ২৩…
সুদামা অচ্যুত হোইণ। জন্মিলে মহান্তি কুলেণ। ২৫…
সুবাহু অবতার হেলে। ক্ষত্রিয় কুলেণ জন্মিলে। ২৭
নাম বহিলে যশোবন্ত। শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞার উদিত। ২৮
সুবল ভাটীআনী সুত। পিতা তাহাঙ্ক সোমনাথ। ২৯
তাঙ্কর নাম বলরাম। জগতে প্রসিদ্ধি উত্তম। ৩০…
শ্রীবৎস জগন্নাথ দাস। ব্রাহ্মণ কুলেণ প্রকাশ [৩২/সপ্তদশ অধ্যায়]

চন্দ্রপুরের রাজার পাত্র সোমনাথের পুত্র রূপে জন্মালেন বলরাম। মালাতিলক ধারণের আগেই তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবভাব দেখা দিল। তিনি ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর চৈতন্যের সন্ন্যাসরূপ দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। (এতে বোঝা যায় পুরীতে চৈতন্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পরবর্তী কোন সময়ের এ ঘটনা)। ঘটনাচক্রে চৈতন্য চন্দ্রপুরে এলেন এবং বলরাম তাঁর পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন। ত্রৈলোক্য গোঁসাই শ্রীচৈতন্য তাঁর কানে 'রামতারক পরংব্রহ্ম' নাম দিলেন।

চন্দ্রপুরর সোমনাথ। রাজার অটে সেহু পাত্র। ৮২
তাহার পুত্র পুত্র জাত। বলরাম নাম বিখ্যাত।…
মালা তিলক তার কাহিঁ। বৈষ্ণব ভাব সে কহই।
চৈতন্যরূপে অবতার। সে প্রভু ব্রহ্মাণ্ডঠাকুর।
সন্ন্যাসরূপ স্বামী হোই। দর্শন করিবইঁ মুইঁ।
এমন্ত বিচারি মনর। রহি অছই চন্দ্রপুর।
এমন্তে চৈতন্য গোসাইঁ। সন্ন্যাস বেশ প্রভু হোই।
সে নগ্রে পশিণ গমন। দেখিলা প্রভু শ্রীচৈতন্য।
গত বাসনা হেতু ফুটি। চৈতন্য পাদপদ্মে লোটি।
দেখি আনন্দ শ্রীচৈতন্য। সুবলে কলে সম্ভাষণ।
প্রেমরে জরজর হোই। কোহন্তি ত্রৈলোক্য গোসাইঁ।
রামতারক পরমব্রহ্ম। কহিলে কর্ণে শ্রীচৈতন্য।
শুনি সুবল রামদাস। মনরে হোইলে হরষ। ৯৬
আনন্দ হোইলে মনর। হৃদে সুমরে চক্রধর। ৯৭
কে কহু তাহার আনন্দ। আনন্দে হোই গদগদ। [৯৮/৪৬ অধ্যায়]

এখানে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যের নিকট মন্ত্রপ্রাপ্তির কথা বলা হলেও ৪৮ অধ্যায়ে বলরাম দাসকে বলা হয়েছে বৃন্দাবন ঠাকুরের শিষ্য।—প্রেমন্তে বলরাম দাস। বৃন্দাবন ঠাকুর শিষ্য। [১৯৮/৪৮ অধ্যায়]।

যশোবন্ত দরিদ্র পিতার ঘরে জন্মালেন।—

'দুঃখেন পোষন্তি উদর। চিন্তুন থাণ্ডি চক্রধর। [১৩৪/৪৬ অধ্যায়]

ত্রৈলোক্য গোঁসাই মায়ারচনা করলেন। যশোবন্ত ধানগাছ মুঠোয় ধরে কাটতে গেলেন। ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে গাছে 'হরি' 'হরি' শব্দ হতে লাগল।

কাটন্তি ধান্যগাছ ধরি। শব্দ শুভে হরি হরি। ১৩৭

তখন আনন্দে বিহ্বল যশোবন্তকে প্রভু আজ্ঞা দিলেন।—

'শূন্য শব্দ যে শুভই। পদগায়ন কর তুহি। ১৪২
সে আজ্ঞা শুনি যশোবন্ত। মন আনন্দে কৃত কৃত।
বোইলে কে কেণে গোসাইঁ। শবদ দিঅ কিস পাইঁ।
মো ছাব পাপী দুরাচার। কাহিঁ ভেটিব পদসার।
কি গীত গাইবঁ মুহিঁ। কহ মো আগে উভা হোই।
এ বাণী শুনি দীনবন্ধু। করুণা কলে কৃপাসিন্ধু।
নিজ স্বরূপে দেখা দেলে। প্রসন্ন হোইণ কহিলে।
চৈতন্য অবতার মোর। সেবিব তাঙকর পয়র।
চৈতন্য দীক্ষা হৃদে বহি। তারিব পাপীজন দেহী।
এহি ঠাবরে পদ কব। মোহর গুণ কীর্তিসার।
এতেক কহিন গোসাইঁ। শুন হো যশোবন্ত তুহি।
মো রূপ দেখিলু তু যহু। স্বরূপ নাম তোর হেউ। ১৫৩
এতেক আজ্ঞা দেই হরি। অন্তর হোইলে মুরারী। ১৫৫
সুবাহু নাম যশোবন্ত। পদ বান্ধিন গান্তি গীত। ১৫৫

কুণ্ডবলদা গ্রামে আনন্দ মহান্তি (করণ কুলে জাত) রাজার নিকট 'খুন্টিআ' উপাধি পেয়েছিলেন। আনন্দ মহান্তির ছেলে অচ্যুতানন্দ। কুণ্ডবলদা গ্রামে প্রবেশ করে সুবাহু যশোবন্ত 'গায়ন কনে গীতরস'। অচ্যুত সেই 'গীত শুণিন পুলকিত।' হৃদয়ে বিষ্ণুচিন্তা করে অচ্যুত নীলকন্দরে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে শূন্যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। জগন্নাথ কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'আমার বৌদ্ধ রূপ চৈতন্য'। তুমি তাঁর কাছে পরমহংস দীক্ষা গ্রহণ কর।

এরূপ দেখি দিব্যজ্ঞান। শূন্যে শ্রীকৃষ্ণ দরশন। ১৭৬
দর্শনে প্রসন্ন হোইলে। এক স্বরূপ দেখাইলে। ১৭৭
বোলন্তি প্রভু ভগবান। বউদ্ধ রূপ সো চৈতন্য। ১৭৮
তাঙক চরণে সেবা কর। ভক্তর পথকু আবোর। ১৭৯
এহি স্বরূপে শ্রীচৈতন্য। পরম হংস দীক্ষা ঘেন। ১৮০
চৈতন্য গুরু অঙ্গ হোই। নাম প্রকাশ করিবই। ১৮১
শুণ অচ্যুত মো বচন। চৈতন্যঠারু দীক্ষা ঘেন।

সে নাম প্রকাশ তু কর। সুদাম সখা অংশ তোর।
গোকুল কুল উধারিবু। চৈতন্য দীক্ষা আদরিবু।
মুখরে কর তু প্রকাশ। সুদাম অচ্যুত যে দাস। ১৮৫/৪৬ অধ্যায়

যশোবন্ত ও অচ্যুত দুই সখা 'চৈতন্য পথরে দেখিলে'। ১৯০

দর্শন কলে শচীসুত। গোরাঙ্গ আগে জগন্নাথ।
পতিত পাবন গোরাঙ্গ। অত্যন্ত শোভা যে শ্রীরঙ্গ॥
চৈতন্য পদ্মপাদে পড়ি। উঠিণ শিরে কর যোড়ি।
অনন্ত মূর্তি ভগবান। দর্শনে পাপ বিমোচন।
যশোবন্তকু কোল কলে। স্বরূপ তীর্থ নাম দেলে।
দীক্ষা যে দেলে হরিনাম। সুবাহু নান তা উপাম।
অচ্যুত হরিদীক্ষা দেই। প্রকাশ নাম তীর্থ বহি॥
সুদাম অঙ্গে অবতার। সেবন্তি চৈতন্য ঠাকুর। [১৯৮/৪৬]

সেখান থেকে চৈতন্য গোসাই কোণার্কে এলেন। সেখানে শূদ্রকুলজাত কপিল মহান্তির পুত্ররূপে জন্মালেন অনন্ত।

দ্বাপর অন্তে বলরাম কশ্যপসুতকে ডেকে বললেন। গৌড় দেশে নিত্যানন্দ নামে আমার জন্ম হবে। কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়ে সন্ন্যাসীরূপে পতিতকে মুক্ত করে ঘুরে বেড়াবেন। তখন তিনি কোণারকে এলে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে অনন্ত দশশত ভবিষ্য শ্লোক রচনা করবেন।

মু জন্ম গউড় দেশর। নিত্যানন্দ যে ন ম মোর। ২০২
কৃষ্ণচৈতন্য অবতরি। সন্ন্যাসরূপ ধরি ফেরি।
ভ্রমণ করিবে অচ্যুত। মুকত করিবে পতিত। ২২২

কশ্যপসুত ছায়াপতি সেকথা অনন্তকে জানালেন। কিছুদিনের মধ্যেই শচীনন্দন কোণার্কে এলেন। অনন্ত তাঁর দিব্যকান্তি দেখে কৃতার্থ হয়ে তাঁর শরণ নিলেন।—

দেখিলে চৈতন্য মঙ্গল। কি এ অনাদি শূন্য ঠুল। ২৫৯
কি অবা নিরাকার রূপ। সন্ন্যাস রূপে নাম জপ।
প্রেমরে অশ্রুজল বহি। অমৃত নিধি উচ্ছুলই।
সভি এ সমান সাদৃশ্য। কিবা প্রত্যক্ষে পীতবাস। ২৬২
দেখি অনন্ত কর যোড়ি। চৈতন্য পদ্মপাদে পড়ি। ২৬৪
বোলন্তি কৃতার্থ হোইলি। এ জন্ম সুফল মুঁ কলি।
দর্শন তোহর চরণ। নিস্তার কর নারায়ণ।
তখন— চৈতন্য প্রভু আজ্ঞা দেই। শুণ নিত্যানন্দ মো ভাই। ২৭০
অনন্ত উপদেশ কর। হরির নাম দীক্ষাসার। ২৭১
এ বানী শুনি নিতানন্দ। হৃদরে হোইলে আনন্দ। ২৭৫
অনন্ত উপদেশ কলে। কর্ণে মহামন্ত্র কহিলে।২৭৬/৪৬ অধ্যায়

এই মহামন্ত্র হল সূর্যের একাক্ষর মন্ত্র—

'কর্ণেণ মহামন্ত্র কহি। সূর্য একাক্ষর ভজই।' ২৭২

৪৮ অধ্যায়ে আছে, পঞ্চ সখাকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন। নাম প্রচারের জন্য গ্রন্থাদি রচনায় আজ্ঞা দেবার প্রার্থনা জানালেন।—

প্রবেশ হেলে সিংদ্বার।	কীর্ত্তন শবদ গম্ভীর।	১৪৫···
ভিতরে প্রবেশ গোসাই।	বট দর্শন কলে যাই।	১৪৮
দেউল প্রদক্ষিণ করি।	গরুড় পৃষ্ঠে কম্বুধারী।	১৪৯
তহুঁ বিজয়ে শ্রীচৈতন্য।	শ্রীজগন্নাথ দরশন।	১৫০
অনেক স্তুতি স্তোত্র পড়ি।	আপে আপকু করযোড়ি।	১৫১
জগন্নাথঙ্ক মুখ চাহিঁ।	কহন্তি চৈতন্য গোসাই।	১৫৩
পঞ্চসখাঙ্কু আজ্ঞা কর।	পুরাণ যেতে গ্রন্থ সার।	১৫৪
ন জানি প্রাণী পশুজণ।	পাপরে হইলে দহন।	১৫৫
এ ঘেনি অবতার মুহিঁ।	নাম বিখ্যাত করিবই।	১৫৬
পঞ্চসখা এ অবতার।	মোহরি অঙ্গরু বাহার।	১৫৭
পুরাণ গীত রস করি।	গাইবে মুখে রামহরি।	১৫৮
লেখিবে মোহরি চরিত।	শুণিণ প্রাণী হেবে মুক্ত।	১৫৯
পুরাণ গীত রসসার।	লেখ শ্রীমুখে আজ্ঞা কর।	১৬০
এতেক কহি শ্রীচৈতন্য।	শুনি হাসিলে ভগবান।	১৬১
[শ্রীমুখে জগন্নাথ কহি।	শুণ চৈতন্য মোব দেহী।	১৬২
মু জগন্নাথ তু চৈতন্য।	তুম্ভ মোহর নাহিঁ ভিন্ন।	১৬৩
মুঁ বুদ্ধসাঁই কৃপা কর।	য়ে অঙ্গু সর্ব অবতার।	১৬৪
করুণা সিন্ধু অবতার।	নাম তার চৈতন্য ঠাকুর।	১৬৫
তু অটু বইকুণ্ঠ বাসী।	জন্মিল নবদ্বীপে আসি।	১৬৬
তো মুখে কেউঁ আজ্ঞা দেই।	মোহর প্রমাণ অটই।	১৬৭
শুণ হে পঞ্চশাখা মোর।	পুরাণ করি গীতসার।	১৬৮
চৈতন্য মোর আজ্ঞা দেই।	সে আজ্ঞা পাল মোর মহী।	১৬৯
যেতেবেলেণ যেউঁ ভাব।	মোর ছামুরে জণাইব।	১৭০
নির্ভয়ে হোই গীতকর।	ভগতি উদে গ্রন্থসার।	১৭১
গ্রন্থ বাহারে যেউঁ গীত।	শ্রীমুখ আজ্ঞা সে উকত।	১৭২
তাঁহিকি শাস্ত্র নোহে সম।	সে পদ আপে পরম ব্রহ্ম।	১৭৩
শ্রীমুখ আজ্ঞা মোর পদ।	এথিরে নাহিঁ না প্রমাদ।	১৭৪
এতেক কহি জগন্নাথ।	চৈতন্য হস্তে দেই হস্ত।	১৭৫
বোলন্তি চৈতন্য গোঁসাই।	পঞ্চসখা এ মোর দেহী।	১৭৬
লেখিব জগন্নাথ গুণ।	অবতারঙ্ক শাস্ত্রমান।	১৭৭
নির্ভয়ে হোইন লেখিব।	মনেণ শঙ্কা ন ধরিব।	১৭৮
হৃদ পদ্মরে মুঁহি থাই।	গ্রন্থ মোর দেউ থিব কহি।	১৭৯

ঈশ্বরদাসের পরিবেশিত এইসব তথ্য থেকে নিঃসংশয়ে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের পুরী আগমনের পরবর্তীকালেই রচিত হয়েছে পঞ্চসখা সাহিত্য এবং তা চৈতন্য-অনুপ্রাণিত।

শ্রীচৈতন্যের পুরী আগমনের পর প্রথম বড় ঘটনা সার্বভৌম উদ্ধার। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমর সঙ্গে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দার্শনিক বিচারের কথা কবিকর্ণপুরের কাব্যে নাটকে আছে। কবি ঈশ্বরদাস লিখেছেন সার্বভৌম-শ্রীচৈতন্য তত্ত্ববিচারের কথা।—

'য়েক দিনেক সার্বভৌম।	বোলন্তি শ্রীপুরুষোত্তম।	২৮
কোটিএ কল্পেণ সুভাগ্য।	তোতে দর্শন মুঁ শ্রীরঙ্গ।	৩১
তুম্ভে যে পরম পুরুষ।	তত্ত্ব প্রকাশ ব্রহ্ম দৃশ্য।	৩৩
তুম্ভর পদ্মপাদে শির।	যুগযুগান্তে থাউ মোর।	৩৫
সর্বভূতয়ে জগন্নাথ।	ভুঞ্জন্তি রসোদয় তত্ত্ব।	৪২
মোতে সুকৃপা কর তুহি।	ত্রৈলোক্য রক্ষক গোসাই।	৪৪
সার্বভৌম এ তত্ত্ব কহি।	হরষ চৈতন্য গোসাইঁ।	৪৫
কহন্তি প্রভু ভগবান।	শুন সার্বভৌম বচন।	৪৬
তুহি ত অটু জ্ঞানবন্ত।	সার্বভৌম শুন সুচিত্ত।	৯৬
শ্রীরাধা অধর যে পান।	শ্রীকৃষ্ণ করি আস্বাদন।	৯৭
মন্ত্র যে চতুর্দশাক্ষর।	দেই মহাপ্রসাদ কর।	৯৮
ক্ষেত্র যে শেষদেব হোই।	পাঞ্চকোশ যে শোভা পাই।	৯৯
তথি উপরে সুভদ্রিকা।	পর্যঙ্ক হোই শোহে একা।	১০০
তথিরে বিজয় গোসাইঁ।	রাধাঙ্ক রূপে কৃষ্ণ শোহি।	১০১
য়ে ভাবে যে জন বিচার।	প্রেম সমুদ্রে জরজর।	১০২…
প্রেমভক্ত যে প্রাপ্ত হোই।	শ্রীপাদপদ্মে নিমজ্জই।	১০৫
সেবই শ্রীগুরু চরণ।	করই নাম সংকীর্তন।	১০৬
বৈষ্ণব জনে প্রীতিভাব।	তেবে প্রাপত ভক্তিনাব।	১০৭
এহা শুনিন ভৌমাচার্যী।	পুলক হুএ রোমরাজি।	১০৯
বোলই কৃতকৃত হোই।	শুন হে চৈতন্য গোসাইঁ।	১১০
নাম মহিমা মোতে কহ।	শুনি কহন্তি শচী পুত্র।	১১১
কৃষ্ণনাম দুই অক্ষর।	ভজিলে ভবসিন্ধু পার।	১১২
নাম উপরে তত্ত্ব নাহিঁ।	নাম যে নিরাকার হোই।	১১৩..
চণ্ডালু ব্রহ্ম আদি যেতে।	বর্ণসংকর পরিযন্তে।	১২৫
শ্রদ্ধা হেলারে যেউঁ প্রাণী।	শাঠ্য বা পরিহাস মণি।	১২৬
মুখে বোলই কৃষ্ণনাম।	দুষ্কৃতি ছেদি আপে ব্রহ্ম।	১২৭
পাপমনে যেতেক যাই।	সকল দহন পুড়ই।	১২৮..
শ্রীরাধা ন সেবিন প্রাণী।	ভক্তির তত্ত্বটি ন জানি।	১৩০
রাধা সুকৃপা যেবে হোই।	প্রেম ভকতি সে লভই।	১৩১
য়েমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য।	শ্রীরাধা শ্রীরাধা ভজন।	১৩২

প্রেমন্তে সার্বভৌম শুনি।	পদ্মচরণে নমে পুনি।	১৩৩
পুনি ইচ্ছুই ভৌমাচার্য্য।	শুন হে প্রভু দেবরাজ।	১৭১
শ্রীরাধা কৃষ্ণ যে অভেদ।	আত্মা দেহ যে বিন্দুনাদ।	১৭২
সম্পূর্ণ ইন্দু যে কিরণ।	তদ্বত রাধাকৃষ্ণ গুণ।	১৭৩
গোকুলে গোপগোপী হোই।	রাধাকৃষ্ণ রূপে বিহরি।	১৭৫
হাহা শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলি।	অভিসারিকা গোপবালী।	১৭৭
শ্রীকৃষ্ণ রাধানামে বাই।	মুরলী রন্ধ্রে স্ফুরই।	১৭৮
হাহা রাধা সদাগায়ন।	ত্বমেব মম যে জীবন।	১৭৯
এমন্ত হোই কি ব্যবস্থা।	কহ হে প্রভু ব্রহ্মবেত্তা।	১৮০
ত্বমেব করুণা যে সিন্ধু।	ত্বমেব দুঃখীজন বন্ধু।	১৮২
ত্বমেব সর্বশাস্ত্র পার।	ত্বমেব শরণ সোদর।	১৮৩
ত্বমেব সর্ব সিদ্ধিদায়ী।	ত্বমেব ভক্তিভাব গ্রাহী।	১৮৪
ত্বমেব পরম পুরুষ।	ত্বমেব সর্বপাপ ধ্বংস।	১৮৫
ত্বমেব প্রেমরূপ হোই।	ত্বমেব সর্বরক্ষকই।	১৮৬
ত্বমেব সর্বমন্ত্রপর।	ত্বমেব নরকু উদ্ধর।	১৮৭
ত্বমেব সর্বসুখদায়ী।	ত্বমেব সর্বদ্রব্য হোই।	১৮৮
ত্বমেব ভক্তজনে দৃঢ়।	কৃপা যে কর মুহিঁ মূঢ়।	১৮৯
য়েতেক কহি সার্বভৌম।	চৈতন্যে করই প্রণম্য।	১৯০
দেখিন চৈতন্য গোসাইঁ।	মধুর প্রেমরস কহি।	১৯১

শুন হো সার্বভৌম দাস। /৫০ অধ্যায়

কৃষ্ণ চৈতন্য এক হোই।	যুগল তনু ভেদ নোহি।	১১৯...
এ মোর অত্যন্ত গোপন।	শুন হে সার্বভৌম মুন্য।	১২৪
নব জলধর শ্রী কৃষ্ণ।	সচ্চিদানন্দ বংশ কৃষ্ণ।	১২৫
কনক রুচির সুকান্তি।	দিব্য চৈতন্য সুধামূর্তি।	১২৬
অবিরতরে চিত্ত ধার।	শ্রীরাধা নাম জপ করি।	১২৭
হৃদয়ে চিন্তি সখীরূপ।	চৈতন্য রাধা আপে আপ।	১২৮
শ্রীজগন্নাথ কৃষ্ণদেব।	রাধা গোপনীয় য়ে ভাব।	১২৯
প্রকাশ রাধারূপ হোই।	চৈতন্যরূপ মু বহই।	১৩০
নিরঞ্জন যে নিরাকার।	নির্গুণ ব্রহ্ম অবতার।	১৩১
আনন্দরূপ শূন্য ঠুল।	রাধা আস্বাদ ভাব মূল।	১৩২
য়ে বাণী শুনি ভৌম কহি।	শুনিমা ত্রৈলোক্য গোসাইঁ।	১৩৫
রাধার কাহিঁ স্থান স্থিত।	অঙ্গে দেখাঅ শচীসুত।	১৩৬
য়ে বাণী শুনিন গোসাইঁ।	কহন্তি প্রেম ভর হোই।	১৩৭
শুন হে সার্বভৌম মুন্য।	যাহা পুচ্ছিল গোপ্যস্থান।	১৩৮
রাধা মো নয়নে অচ্ছই।	প্রেম অমৃতময় হোই।	১৩৯
প্রেম আনন্দে মুঁ বিভোল।	নয়নুঁ বহে অশ্রুজল।	১৪০
প্রেমে অশ্রু ধারা বহই।	ওলটি রাধানাম হোই।	১৪১

রাধার অটে নিজ স্থান। বিলাসী প্রেম মো নন্দন। ১৪২
এ ভার তোতে কহিলই। মোহর গোপ্য অটে এহি। ১৪৩...
শুণিণ সার্বভৌম মন্য। আনন্দে হরষ বদন। ১৫৩
প্রণম্য করি পুণ পুণ। স্তুতি করই শ্রীচৈতন্য। ১৫৪/৫১ অধ্যায়

পাঁচ বছর নীলাচলে কাটিয়ে শ্রীচৈতন্য নদীয়া যেতে উদ্যত হলে প্রতাপরুদ্র বিচ্ছেদ-আকুল হয়ে পড়লে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, তুমি রাজা, রাজ্য ধারণ করে থাক, তোমার অনুপস্থিতিতে রাজ্য যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। চিন্তা করনা, কিছুদিন নদীয়ায় থেকে ফিরে আসব। রাজা গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য করলেন।

য়েমন্তে গলা কিছিদিন। নীলকন্দরে শ্রীচৈতন্য। ৯
রহিলে পঞ্চম বরষ। নদিয়া থিবাকু উদ্দেশ্য। ১০
প্রতাপরুদ্র হকরাই। কহন্তি প্রভু ভাবগ্রাহী। ১১
নদিয়া যিবা আগমন। মেলানি দিঅ হে রাজন। ১২
শুনিন কহই নৃপতি। সাষ্টাঙ্গে শোইলাক ক্ষিতি।১৩
উঠিন হোই কৃতকৃত। মুঁ যিবি তুম্ভর সঙ্গত। ১৪
এহা শুনিন কম্বুধর। শুন সুমনে নৃপবর। ১৫
রাজ্যকু তু অটু ধারণ। তো গলে রাজ্য রণভণ। ১৬
কিছি দিন নদিয়া যাই। পুনি প্রসন্ন হেব মুহিঁ। ১৭
মনে তু কিছি ন বিচার। যিবইঁ নদিআ নগর। ১৮
গুরু বচন ন ভাঙিগলে। হৃদে সম্মত রায়ে কলে। ১৯/৫৪ অধ্যায়

রাজার পট্টমহাদেবী (প্রধানা মহিষী) অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাকে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়ে প্রণাম করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা ভূলুণ্ঠিত হলেন।

সমস্ত জনঙ্কু বুঝাই। হরষে চৈতন্য গোসাইঁ। ৩৮
বাহার হোইলে সমস্ত। জন জনকে নৃপনাথ। ৩৯
অনেক বস্ত্র অলঙ্কার। মেলাণি কালে নৃপবর। ৪০
রাজার পাট মহাদেঈ। সীতাঙ্কু অলঙ্কার দেই। ৪১
অনেক পাট পটাম্বর। যাহাকু যে বিধি বিচার। ৪২
দেইন রাজা পাটরাণী। প্রণম্য করি পুন পুনি। ৪৩
সর্ব দাসীঙ্ক নমস্কার। লোতক বহে গঙ্গাধার। ৪৪
আকুল হোই সর্বরাণী। মোহেন পড়ন্তি ধরণী। ৪৫/৫৪ অধ্যায়

গৌড় যাত্রার আগে পঞ্চসখাকে সমাদর করে চৈতন্য গোসাইঁ ভক্তি গ্রন্থরচনার নির্দেশ দিয়ে তাঁদের সাংসারিক ভরণপোষণের ভার দিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রকে।

জন জনরে শাড়ী দেই। কহন্তি চৈতন্য গোসাই। ৫৪
পুরাণ গীত রস কর। যাহা লেখিব গ্রন্থসার। ৫৫
অবতারিক যেতে কথা। লিখন কর শাস্ত্র পোথা। ৫৬
প্রতাপরুদ্র রাজা কইঁ। পঞ্চ শাখাঙ্কু সমর্পই। ৫৭
স্নেহাঙ্ক কুটুম্ব পোষণ। তুম্ভঙ্কু লাগই রাজন। ৫৮

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা অনুসারে পঞ্চসখা নীলগিরি বা নীলাচলে থেকে ভক্তি গ্রন্থাদি রচনা করলেন।

পঞ্চশখা এ নীলগিরি। সেবা করন্তি দেবহরি। ৯৬
পুরাণ কলে গীতরস। অবতার গীত প্রকাশ। ৯৭।৫৪ অধ্যায়

গৌড় থেকে ফিরে এলেন মহাপ্রভু।

কটকে প্রবেশ চৈতন্য। পঞ্চসখাঙ্ক দরশন। ৯
জণ জণকে কোল কলে। সমস্তে হরষ হোইলে। ১০।৫৯ অধ্যায়

মহাপ্রভু জানতে চাইলেন, পঞ্চসখা কে কি গ্রন্থরচনা করেছেন। পঞ্চসখা জানালেন তাঁদের গ্রন্থরচনা বৃত্তান্ত।

কটকে চৈতন্য গোসাইঁ। আনন্দে হরষিত হোই। ১২৮
পঞ্চ সখাঙ্কু আজ্ঞা দেলে। কি গ্রন্থ করিছ বোইলে।
মোতে শুনাই মোক্ষ কর। তুম্ভে ত অট জাতিস্মর।
য়ে আজ্ঞা শুনি বলরাম। চিন্তিণ শ্রীপুরাষোত্তম।
বাল্মিকঙ্ক কলা গ্রন্থ। শ্রীরামায়ণ যে উকত।
সপত কাণ্ড গীতরস। শুণিণ সমস্ত হরষ।
লক্ষেক পদ যেহু গীত। পদপদকে রস জাত।
পুণি ভাগবদ্‌গীতা গীত। অষ্টাদশ অধ্যা প্রাকৃত।
বিপ্রঙ্ক ছলে ভাবগ্রাহী। ব্রহ্ম বিদ্যা উক্ত করাই।
শুণিণ চৈতন্য হরষ। আপণা নামে মহারস। ১৩৭
হরষে হোইণ গদ্‌গদ। নাচন্তি হোইণ আনন্দ। ১৪০
শ্রীমুখে চৈতন্য গোসাইঁ। হরি শব্দ উচ্চে কহি।
সর্বে বোলন্তি হরি হরি। যে সনে সমুদ্রলহরী। ১৪২।৫৯ অধ্যায়
অনন্ত শিশুকু পুচ্ছন্তি। আনন্দ চিত্তেণ শ্রীপতি। ১৫৪
ভবিষ্য পুরাণ উকত। আগত লেখিছন্তি গীত।
অচ্যুত যশোবন্ত কই। পুচ্ছন্তি চৈতন্য গোসাইঁ।
কি শাস্ত্র করিঅছ গীত। শুণিণ মুকত পতিত।
এ আজ্ঞা শুণি দুই দাস। গীতরে নাম পরকাশ।
নানাদি গীত রসময়ে। শুণি আনন্দ দেবরায়ে।
পুণি ডাকন্তি সখী আস। শুন হে জগন্নাথ দাস।
নাম মহিমা গীতরস। কি শাস্ত্র করিছ প্রকাশ।
শুণি কহন্তি নাতি সখী। নাথে মু অটই নির্মাক্ষী।
ভজন করি গলা দিন। শাস্ত্রে মো কিস প্রয়োজন।
নিত্য স্থলর যে বারতা। উদ্ভব পাদুকা সংহিতা।
চৌষঠি অধ্যা ভাগবত। যে অটে পুরাণ উকত।
শুণি হরষ শ্রীচৈতন্য। গোলোক প্রেম রসস্নান।
সমস্ত ব্যাখ্যান উকত। হরষ শুনন্তি সমস্ত।
য়েমন্তে সভা নিশবদ। চৈতন্য প্রেমে গদগদ [১৬৮।৫৯ অধ্যায়]

ঈশ্বরদাসের এই স্পষ্ট বিবৃতির পর আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, পঞ্চসখা সাহিত্য বিশেষতঃ জগন্নাথ দাসের ভাগবত অনুবাদ শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞাতেই হয়েছিল। ঈশ্বরদাস শ্রীচৈতন্যের এ বিষয়ে সক্রিয়তার আরও একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, কাশী থেকে শ্রীচৈতন্য নিয়ে এসেছেন বেদান্তসার এবং সকলকে শুনিয়েছেন ভাগবতের ব্যাখ্যা।

ধর্মার্থ কাম মোক্ষ চারি। স্বগুণ নির্গুণ বিচারি। ১৪৬
নাগান্ত যোগান্ত বিচার। সিদ্ধান্ত বেদান্তর সার।
য়ে শাস্ত্র লেখি জগন্নাথ। বারাণসীরে প্রাণ হত।
য়ে শাস্ত্র চৈতন্য গোসাইঁ। সঙ্গতে অছন্তি অণাইঁ। ১৪৯
সমস্ত বসাই গায়ন। শুনি হরষ সর্বজন।
আনন্দে পুলকিত হোই। শ্রীভাগবতে জ্ঞান দেই। ১৫১।৫৯ অধ্যায়

ঈশ্বরদাসের কাব্যে জগন্নাথ ধর্ম ও চৈতন্যধর্মের মধ্যে এক শুভ সমন্বয়ের স্পষ্ট পরিচয় আছে। অগস্তি মুনি সম্পূর্ণ নৃপতিকে বলেছেন—জগন্নাথের পঞ্চধারূপ ও চৈতন্যের স্বরূপতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর। চতুর্ধারূপে অবতার। ২
ওমিতি সিংহাসন হোই। ত্রিগুণাত্মকে বিরাজই।
তথি উপরে হলধর। পরা বীজরে শোভা কর।
অনন্ত শেষদেব হোই। সমস্ত শিরে ছন্তি বহি।
তথি উপরে সুভদ্রিকা। বিহার করিছন্তি একা।
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গ বহি। অনন্ত যুগ্ম ছন্তি বহি।
শেষ শয্যাপরে বিহার। অনন্ত রূপী চক্রধর। ১০
ওঁকার পঞ্চরূপ হোই। শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে শোহী। ৩৩
যে প্রাণী ভেদান্তি এ তত্ত্ব। তাঙ্কু শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপত। ৩৪
ওঁকার রূপে শচীসুত। পঞ্চধা স্বরূপ একত্ব।
চৈতন্য নিত্যানন্দ দুই। হরিদাস উদন্ত হোই।
অদ্বৈত ঘেনি পঞ্চভূত। য়ে পঞ্চ চৈতন্য স্বরূপ।
য়েক স্বরূপ শ্রীচৈতন্য। শ্রীরাধা শ্রীরাধা ভজন।
সুজনে শ্রীচৈতন্যরস। চৈতন্য আপে পীতবাস। ৩৯।৬০

ঈশ্বরদাস ওড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রকে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত সেবকরূপে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে আসার পর পঞ্চম বরষে নদীয়া যেতে উদ্যত হলে রাজা রত্ন পালঙ্ক নিয়ে এসে মহাপ্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, বললেন, প্রভু, অনুগ্রহ করে পালঙ্কে চড়ে গমন করুন। মহাপ্রভু বললেন, সন্ন্যাসীর ভোগ ইচ্ছা থাকলে সর্বনাশ হয়, লোকে উপহাস করে। তবে রত্নপালঙ্ক যখন এনেছ, তাতে নন্দনন্দন গমন করুন। প্রভুর কথা শুনে রাজা গোপীনাথকে পালঙ্কে চড়িয়ে পাঠালেন। নৃপতি বললেন, আমি আপনার সেবক। শিষ্য তার জীবন সমর্পণ করে গুরুর চরণে। অতএব আমার প্রতি দয়া করুন। এই বলে রাজা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তা দেখে চৈতন্য তাঁকে কোল

দিয়ে বললেন, তোমার বংশ নির্মল হল। রাজা সচেতন হয়ে শ্রীগুরুর চরণে পড়লেন। রাজাকে প্রবোধ দিয়ে ভাবগ্রাহী প্রভু প্রস্থান করলেন।

প্রেমন্তে বিজয়ে চৈতন্য।	প্রেমন্ত বেলেণ রাজন। ৬১
রত্নপলঙ্ক আগে নেই।	থোইলে পায়ে পড়ি শোই। ৬২
পলঙ্কে বিজে প্রভু কর।	সয়রে গমন ন কর। ৬৩
য়ে বাণী শুনি শ্রীচৈতন্য।	অতিথ হোই যেউঁ জন। ৬৪
তাহার সুখ কি কারণ।	শুন হো প্রতাপ রাজন। ৬৫
তাহার ভোগ ইচ্ছা নাহি।...	
সন্ন্যাসকুলে এহু নশে।	সর্বে করিবে উপহাস। ৬৯
য়েবে তু দেলু হো রাজন।	বিজে করন্তু নন্দকাহ্ন। ৭০
য়ে বাণী রাজন শুনই।	গোপীনাথঙ্কু বেগে নেই। ৭১
পলঙ্কে বিজে করাইলে।	নৃপতি সন্তোষ হোইলে। ৭২
সুদন্তী হস্তী অছি বহি।	দেখন্তি চৈতন্য গোসাইঁ। ৭৩
বৃপতি রাই আজ্ঞা দেলে।	হস্তী যে নিঅসি বোইলে। ৭৪
শুণিণ কহে নৃপবর।	সেবক অটই ভুম্ভর। ৭৫
শিষ্যর জীবন গোসাইঁ।	গুরু চরণে সমর্পই। ৭৬
য়েথকু মো ছার পামর।	দয়া তু ছাড়ু কম্বধর। ৭৭
য়েতেক বোলি মূর্ছা হোই।	ভূমিরে পড়িলাক শোই। ৭৮
দেখি চৈতন্য কলে কোল।	বংশ তা হোইলা নির্মল। ৭৯
সচেত হোই নৃপবর।	শ্রীগুরু ধরই পয়র। ৮০
রাজাকু প্রবোধনা কহি।	বিজয়ে কলে ভাবগ্রাহী। ৮১/৫৪ অধ্যায়

আবার ওড়িষ্যায় ফিরে এসে মহাপ্রভু রাজাকে কীর্তন যাত্রামহোৎসবের ব্যবস্থা করতে বলায় রাজার আদেশে কটকের তুলসীপুরে মহাপ্রভু নির্বাচিত স্থানে কীর্তন স্থল রচিত হল, বারবাটীতে মণ্ডপ তোলা হল। এই রাজকীয় ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কবি। চৌষট্টি সম্প্রদায়ের কীর্তনে গৌড়ীয়া ওড়িয়া সব ভক্তদের পুণ্যসঙ্গমের বর্ণনায় এবং সর্বসম্প্রদায়-কর্তা মহাপ্রভুর নৃত্য ও যাত্রাভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় আনন্দময় প্রকটলীলার উপযুক্ত উপসংহার করেছেন কবি ঈশ্বরদাস।—

রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করলেন, 'আগামীকাল শ্রীপঞ্চমী, গোসাইঁর কি আজ্ঞা?' হেসে প্রভু বললেন, 'কাল থেকে যাত্রার আয়োজন কর।—

পঞ্চমী বৃহস্পতিবার।	কালি ঠাবরু যাত্রা কর। ১৭৭
সম্প্রদা আইলে কেতেক।	বুঝিণ কহ নৃপ হাক। ১৭৮
শ্রীমুখ আজ্ঞা রাজা শুণি।	পাত্রঙ্কু পুচ্ছে ততক্ষণি।১৭৯
তক্ষণে সুবুদ্ধি করণ।	জণান্তি নৃপতি পাশন।১৮০
চৌষঠী খোরী সঙ্কীর্তন।	কটকে প্রবেশ বাজন। ১৮১
শুণিণ রাজন জনাইঁ।	হরষ চৈতন্য গোসাইঁ। ১৮২
তুলসীপুরে সঙ্কীর্তন।	স্থল রচিলে শ্রীচৈতন্য। ১৮৩
বারবাটী যে আরম্ভিলে।	য়ে স্থান মণ্ডাস বোইলে। ১৮৪/৫৯

শ্রীগুরুর আজ্ঞা অনুসারে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জন পিঠাপানার আয়োজন করলেন রাজার পাত্রঅমাত্যের।—

সমস্তে সত শান্ত হোই।	কার্য করাঅ নৃপসাই। ৫৩
সাত্ত্বিক পদার্থ লগাঅ।	বৈষ্ণবে সেবা করি খাঅ। ৫৪
যে যেতেবেলে যাহা ইচ্ছি।	তো লোকে দেউথিবে পুচ্ছি। ৫৫
পাণি পইড় পণা যেতে।	অমৃতপাণি পঞ্চামৃতে। ৫৬
অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা সর।	নানাদি প্রকারে আহার। ৫৭
ব্রাহ্মণে খন্দা করি থিবে।	সমস্তে খন্দাবে ভুঞ্জিবে। ৫৮/৬০ অধ্যায়

তখন রাজা তাঁর পাত্রদের ডেকে বললেন, কীর্তনস্থল তৈরী কর, সকলে তৎপর হও।'

পাত্র অমাত্যেরা তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। সহস্র শাল স্তম্ভ পোতা হল। স্তম্ভের গায়ে নানা মূর্তি (সুন্দরী নারী মুনির ধ্যানভঙ্গ করছে ইত্যাদি) খোদিত হল। অষ্টরত্ন খচিত চাঁদোয়া খাটান হল। মধ্যে মধ্যে কদম্বের মালা ঝুলতে লাগল। পুষ্প সমারোহ চারদিক আমোদিত হল। ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা যেতে লাগল। শুক-সারী উড়তে লাগল। ছত্রিশ পাটের যথাযথ স্থান নির্দিষ্ট হল। বৈষ্ণব বৈরাগী সন্ন্যাসী যোগী ঋষি বেদজ্ঞ বিপ্র সকলে এসে উপস্থিত হলেন। আকাশে যেমন জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর শোভা, চাঁদোয়ার নীচে তেমনই এঁদের উপস্থিতিতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বলতা দেখা দিল। নানা প্রদীপ, ফুলের ঝাড় সাজানো হল। গৌড়ীয়া সেবকেরা ভাণ্ডারীর কাজ করতে লাগলেন, খাদ্যপানীয় সরবরাহ করতে লাগলেন।

অভিরাম, নিত্যানন্দ, হরিদাস, উদদত্ত, শ্রীনিবাস, অদ্বৈত,—এঁরা সকলে এসে গেলেন। শুভক্ষণ দেখে চারশ শঙ্খ, শিঙ্গা অগণিত মুরলি বেজে উঠল, মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ আরম্ভ হল। মহাপ্রভু কীর্তন স্থলের সব কিছু দেখে রাজার প্রশংসা করলেন। তিনি দ্বাপরের কৃষ্ণলীলা আলাপ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা ব্যাখ্যা করলেন। রসের আখর দিয়ে তিনি বললেন, সংসার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে যে প্রভু আদিপুরুষের কথা ভাবেনা, মৃদঙ্গ তাকে ধিক্কার দেয় 'ধিক্‌তা' 'ধিক্' 'ধিক্' বলে।

মেলাণি হোইন নৃপতি।	পাত্রঙ্কু হকরাই কতি। ৬২
কীর্ত্তন স্থলকু মণ্ডাঅ।	সমস্তে তৎপরে যাঅ। ৬৩
আগহুঁ পাত্র মন্ত্রীমানে।	কীর্ত্তন যে বিধি বিধানে। ৬৬
সহস্রে শালগজা কম।	নানাদি পিত্তুলা উত্তম। ৬৭
চিত্রবিচিত্র জউশাল।	অষ্টরত্নাদি যে প্রবাল। ৬৮
কন্যা দিশন্তি রূপবন্ত।	চাহান্তে তপী তপহত। ৬৯
য়েমন্তে স্তম্ভমান পোতি।	চান্দুআমান টানুছন্তি। ৭০
চান্দুআ নানাকর্ণে সার।	আলট চামর অপার। ৭১
অষ্ট রত্ন যে পুঞ্জি পুঞ্জি।	নানাদি প্রকারেণ খঞ্জি। ৭২
শোলকী কদম্বর মাল।	লম্বন্তি দ্রোণাঙ্ক মধ্যর। ৭৩
অমৃত পাণি গঙ্গারাণ।	গুআ শাল মুআঁ বিধান। ৭৪
নানাদি রত্নেন প্রসজ।	নানাদি পুষ্পেণ নির্মল। ৭৫

ভ্রমরমানে রমুছন্তি । কোকিল কুহু শবদান্তি । ৭৬
আবর সারি শুআ হংস । রড়িকি ভ্রমন্তি আকাশ । ৭৭
য়েমন্তে কুটুণি ভিআণ । উড়ি খেলান্তি পক্ষিগণ । ৭৮
ছতিশ পাটকঙ্কু স্থান । যাহাকু যে বিধি বিধান । ৮২
বৈষ্ণব বৈরাগী সন্ন্যাসী । যোগীন্দ্র সিদ্ধ তপীঋষি । ৮৩
যোগী স্বপী যে কলিন্দর । চারি বেদরে বিপ্রবব । ৮৪
যে যাহা খঞ্জামূলে রহি । মধ্যে কীর্ত্তণ স্থলে হোই । ৮৫
যেসনে আকাশে চন্দ্রমা । তেসনে কি দেবা উপমা । ৮৬
চন্দ্র সূর্য্য কি এক হোই । কিরণে জ্যোতি বিকাশই । ৮৭
নক্ষত্র যেহ্নে পন্তি পন্তি । চান্দুআ তলে দিশুছন্তি । ৮৮
নানাদি প্রকারে প্রদীপ । দ্বীপ দিহুড়ি চন্দ্রাতপ । ৯৪
চাল মহতা চম্পাবাণ । ফুলঝাড়ি যে ত্রয়কোণ । ৯৫
নানাপ্রকারে নির্ভা করি । সেবক নউড় ভণ্ডারী । ৯৬
পাণিআ গউড় অপার । পাণি দিঅন্তি তৎপর । ৯৭
অভিরামকু প্রভু চাহিঁ । নিত্যানন্দকু আণ যাই । ১০৭
হরিদাস যে উদদত্ত । শ্রীনিবাসাদি যে অদ্বৈত । ১০৮
সমস্ত ঘেনি আস যাইঁ ।…

সমপ্রদা ঘেনিণ বাহার । দর্শন কলে কম্বুধর । ১১২
চৌষঠি খোরি সংকীর্ত্তন । দর্শনকালে শ্রীচৈতন্য । ১১৫
শঙ্খ স্ফুরই চারিশত । সিংহামুরলী নাহিঁ অন্ত । ১১৬
বীণা যে বংশী নানা বাদ্য । গম্ভীর শুভু আছি নাদ । ১১৮
ভাটে করন্ধি কয়েবার । বেদ পড়ান্তি বিপ্রবর । ১১৯
তপী মঙ্গল শাস্ত্রমান । পঢ়ন্তি যে বিধি বিধান । ১২০
য়েমন্ত সময়ে গোসাইঁ । আসন ছাড়ি উভা হোই । ১২১
চৌষঠী সম্প্রদা ভিতাই । মধ্যে বিজয়ে ভাবগ্রাহী । ১৩৩
আলাপ করে হরি দাস । দ্বাপরলীলা কৃষ্ণবেশ । ১৩৪
শুণ সুজনে সর্বপ্রাণী । তরিব ভব তরঙ্গিনী । ১৩৫
যে প্রাণী শ্রীকৃষ্ণর লীলা । বতি লালসে নানা খেলা । ১৩৬
সাদরে কর্ণেন শুণই । গোপীঙ্ক ভক্তি ন ভাবই । ১৩৭
শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় গুণমান । জিহ্বা ন করে সঙ্কীর্তন । ১৩৮
জলদ শ্যাম ন দেখি । ন চাহেঁ পুণ বেণি আখি । ১৩৯
শ্রীকৃষ্ণ পদ্মপাদে রতি । যে প্রাণী নোহই ভগতি । ১৪০
শ্রীকৃষ্ণ পাদর তুলসী । অত্যন্ত সউরভ-বাসী । ১৪১
যে প্রাণী ন করে আঘ্রাণ । সে প্রাণী অত্যন্ত দারুণ । ১৪২
শ্রীকৃষ্ণ দেখি যেউঁ প্রাণী । প্রণম্য ন করন্তি পুণি । ১৪৩
শুণি শ্রীকৃষ্ণনাম গুণ । যে প্রাণী ন করে গমন । ১৪৪

সংসার মায়ামোহে ভোল। ন চিন্তে প্রভু আদিমূল।
মূদঢ়া সে প্রাণী নিশ্চই। ধিকতা বোলিণ কহুই।
ধিক ধিক তার জীবন। সে প্রাণী পশুর সমান।
দেবকী সুত রূপ বন্দি। আনন্দ হরষিতে কান্দি।
পুণি বর্দান্তি শ্রীচৈতন্য। গৌরাঙ্গচন্দ্র ভগবান। ১৪৯/৬০
অধ্যায়

রাজা প্রতাপরুদ্রের উদ্যোগে এই ভাবে ষোল দিন ব্যাপী মহোৎসব চলল। এখানে নানা অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কবি ঈশ্বর দাস। শ্রীকৃষ্ণচরিত বিষয়ক পদ গান করে কীর্তনে নর্তনে মাতোয়ারা হলেন মহাপ্রভু। সন্ধ্যা হলে তিনি কটক থেকে অন্তর্হিত হয়ে পুরী চলে গেলেন। সেখানে জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে স্তব স্তুতি করলে ত্রৈলোক্য ঠাকুর জগন্নাথ শচীর কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ এত বিলম্ব হল, কি কাজে ব্যস্ত ছিলে? শচীনন্দন বললেন, প্রতাপরুদ্র নৃপবর ষোল দিনের মহোৎসবে আমাকে বরণ করেছেন। একথা শুনে জগন্নাথ চৈতন্যের হাতে হাত দিয়ে বললেন, তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই। চল সংকীর্তন দেখা যাক। এই বলে জগন্নাথ চৈতন্যের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন।

এ সব ব্যাপার হল সবার অলক্ষ্যে, কেননা পরক্ষণেই দেখা গেল কীর্তন স্থলে নৃত্যরত বনমালী কখনও কৃষ্ণরূপ কখনও গৌররূপ ধারণ করছেন। কীর্তনরসের প্রেমামৃতে মগ্ন হয়ে সকলে আলস্য নিদ্রা, দিবস-রজনী ভুলে গেলেন।

বিশ্বম্ভর যে উভা হোই। হরি শব্দ উচ্চারই। ১৮১
সর্বে বোলন্তি হরি হরি। হরি শবদে দিগ পূরি। ১৮২
চৈতন্য ত্রৈলোক্য গোসাইঁ। কীর্তন রসে ভোল হোই। ১৮৩
কীর্তন রসে ভাবগ্রাহী। আনন্দে অশ্রুজল বহি। ১৮৫
বাচা গদ্‌গদে গান্তি গীত। গোপর শ্রীকৃষ্ণ চরিত। ১৮৬
নৃত্য করন্তি বনমালী। নাচন্তি বেণি ভুজ তোলি। ১৮৭
সর্বে হোইলে অগিআন। নৃত্য দেখিণ শ্রীচৈতন্য। ১৯৫...
সমস্তে হোইণ উন্মত্ত। গাবন্তি চৈতন্য চরিত। ১৯৮...
প্রেমে কান্দন্তি সর্বজন। লোতক বহে অবিচ্ছন্ন। ২০৭...
চৌষঠী সম্প্রদায়ে হরি। চৈতন্য স্বরূপে বিহরি। ২০৯...
য়েমন্তে সন্ধ্যা কাল হোই। কীর্তনে চৈতন্য গোসাইঁ। ২১৪...
চৈতন্য হেলে অন্তর্ধান। প্রবেশ নীলাদ্রি ভুবন। ২১৯...
আপণা নাম স্তুতি স্তোত্র। পঢ়িণ হুঅন্তি পবিত্র। ২২১
শুনিণ ত্রৈলোক্য ঠাকুর। পুচ্ছন্তি শচীর কুমর। ২২২
আজ ত বিলম্বে অইল। কি কি বিষয়ে তুম্ভে থিল। ২২২
এ বাণী শুণি গোরাচান্দ। আনন্দে কহন্তি গোবিন্দ। ২২৪
শুণ হে ত্রৈলোক্য ঈশ্বর। প্রতাপরুদ্র নৃপবর। ২২৫
মহোৎসা ষোল দিবসকু। বরণ করিছি আম্ভঙ্কু। ২২৫...

। য়ে বাণী শুণি জগন্নাথ। চৈতন্য হস্তে দেই হস্ত। ২৩৬…
তোহ্ম মোহর নাহিঁ ভিন্ন। চাল দেখিবা সংকীর্তন। ২৩৮
য়েতেক কহিণ সোসাইঁ। চৈতন্য রূপে লীন হোই। ২৩৯
শ্রীজগন্নাথ শ্রীচৈতন্য। দুহেঁ দিশন্তি য়েক বর্ণ। ২৪০
কীর্তন মধ্যে বনমালী। নাচন্তি দুই বাহু তোলি। ২৪২…
ক্ষণ ক্ষণকে আন মূর্তি। চৈতন্যপ্রভু দিশুছন্তি। ২৫০
ক্ষণকে দিশে গৌরবর্ণ। পুণি ক্ষণকে শ্যামঘন। ২৫১
দিশন্তি জলধর রূপ। গৌরাঙ্গ রূপ করি গোপ্য।২৫২
ক্ষণকে গৌররূপ ধরি। দুই স্বরূপ নরহরি। ২৫৩
দেখিণ নিস্তরন্তি জন। চৈতন্য চন্দ্র ভগবান। ২৫৪…
সমস্তে প্রণমিত হোই। বোলন্তি হরি ত্রাহি ত্রাহি।২৫৯
কীর্তন রসে সবে মত্ত। জাত হোইছি প্রেমামৃত। ২৬২
ন জাণে দিবস রজনী। আলস্য নিদ্রাহিঁ ন জানি। ২৬৩/
৬০ অধ্যায়

ঈশ্বরদাস নৃত্যরত মহাপ্রভুর বর্ণনায় বলেছেন 'ক্ষণকে দিশে গৌরবর্ণ। পুণি ক্ষণকে শ্যামঘন।' বৃন্দাবন দাস একই কথা বলেছেন চৈতন্য ভাগবতে—

যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। পৃথিবী কম্পিত হয় সভে পায় ডর ॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর। যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥…
গৌরবর্ণ দেহ ক্রমে নানা-বর্ণ দেখি।

মধ্যখণ্ড/অষ্টম অধ্যায়

আনন্দিত চৈতন্য গোসাইঁ প্রতাপরুদ্রকে ডাক দিয়ে বললেন, 'ষোল দিন সংকীর্তনের পর দধি খেলা হবে'। কোন্ সম্প্রদায়ের পর কোন্ সম্প্রদায় কীর্তন করবেন তা মহাপ্রভু ঠিক করে দিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে বত্রিশ সম্প্রদায় কীর্তনে মাতোয়ারা হলেন। এই সব সম্প্রদায় বা মণ্ডলীর কীর্তনেরও সময় বেঁধে দিলেন মহাপ্রভু।—

আনন্দে চৈতন্য গোসাইঁ। প্রতাপরুদ্রঙ্কু হকাই। ১১১
বোলন্তি শুণ হো রাজন। য়ে বড় সম্ভার কীর্তন।…
য়ে মন্তে ষোল দিন যিব। তদন্তে দহি খেল হেব। ১১৭
য়েতেক কহিণ গোসাইঁ। সম্প্রদা বাণ্টি পুণ দেই। ১১৮

গৌড়ীয়া ওড়িআ সব ভক্তই যোগ দিলেন এই মহাসংকীর্তনে। ঠিক হল প্রাতঃকালে কীর্তন করবেন পঞ্চসখা। তারপর একে একে কীর্তন করবেন রাঘোরাম, সীতা, বংশীবদন, উদদত্ত বা উদত্ত, অদ্বৈত, হরিদাস, সংকর্ষণ বা নিত্যানন্দ, রামানন্দ, নানক-সারঙ্গ, রূপ-সনাতন, জগাই-মাধাই, শ্রীবাস বা শ্রীনিবাস এবং মুরারি দাস (গুপ্ত)-এর গোষ্ঠী।

পঞ্চ সখাঙ্ক প্রাতকাল। কীর্তনে অতি কুতুহল। ১২৬
তদ উপ্রান্তে রাঘোরাম। সম্প্রদা অত্যন্ত উত্তম। ১২৭
সীতাঙ্ক সম্প্রদা মণ্ডলী। দেখন্তি প্রভু বনমালী। ১২৮

নাগর পুরুষোত্তম দাস। দুই কিশোরী বেণি পাশ। ১২৯
জঙ্গলী নন্দিনী এ বেনি। নাচন্তি নাগরকু ঘেনি। ১৩০
সেঠার শোভা কি কহিবা। স্বর্গর প্রায়ে পাৱ শোভা। ১৩১
তদ অন্তরে সংকীর্তন। নাচন্তি বংশী যে বদন। ১৩২
চৈতন্য বোলে হরি হরি। হরি শবদে স্বর্গ পুরি। ১৩৩
সর্বে বোলন্তি হরি ঘোষ। শবদ শুভে চতুর্দ্দশ। ১৩৪
পুণি কীর্তন উদদন্ত। মহান্তরূপে করে নৃত্য। ১৩৫
নানা প্রকারে নৃত্য করি। সমস্ত প্রাণী মন হরি। ১৩৬
দেখি হরষ শ্রীচৈতন্য। উদন্ত কোল সম্ভাষণ। ১৩৭
পুণি অদ্বৈত সম্প্রদারে। কীর্তনে শঙ্খ নাদ করে। ১৩৮
কীর্তনে কিশোরী সুবেশ। দেখি হরষ শচী শিষ্য। ১৩৯
হরিদাস কীর্তনে ভোল। গাবই চৈতন্য মঙ্গল। ১৪০
চৈতন্য গুণ কীর্তি গাই। আনন্দে মহা সুখী হোই। ১৪১
তদন্তে প্রভু সংকর্ষণ। কীর্তনে করন্তি ভ্রমণ। ১৪২
নাচন্তি নিত্যর গোসাই। আনন্দে অশ্রুজল বহি। ১৪৩
গড়ন্তি পড়ন্তি আনন্দ। চৈতন্য য়েকা পদ্মপাদ। ১৪৪
বিলাপে কৃষ্ণনাম গাই। নানা চরিত বখাণই। ১৪৫
য়েমন্তে হোএ সন্ধ্যাকাল। দর্শন চৈতন্য মঙ্গল। ১৪৬
দিবসে বত্রিশ সম্প্রদা। কীর্তনে নাহিঁ তৃষ্ণা ক্ষুধা। ১৪৭
তদন্তে রামানন্দ গোষ্ঠী। শুণি হরষ পরমেষ্ঠি। ১৪৮
নানক সারঙ্গ এ দুই। রূপ সনাত্ন দুই ভাই। ১৪৯
জগাই মাধোই একত্ব। কীর্তনে করন্তি এ নৃত্য। ১৫০
শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর। কীর্তন মধ্যে এ বিহার। ১৫১
মুরারি দাস গোষ্ঠী করি। কীর্তন রসরে বিহরি। ১৫২

'য়েমন্তে রাত্র গলা পাহি। বত্রিশ সম্প্রদা সরই।' ১৫৩/৬১ অধ্যায়। এইভাবে দিনে বত্রিশ সম্প্রদায় ও রাত্রে বত্রিশ সম্প্রদায় মোট চৌষট্টি সম্প্রদায় বা মণ্ডলী মিলে এই মহা সংকীর্তন করতে লাগলেন।

সর্ব মণ্ডলীতে নৃত্য করে বেড়াতে লাগলেন শচীনন্দন। ভক্তরা নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যের মধ্যে দশ অবতারকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন।—

কীর্তন মধ্যে নৃত্যরস। শচীনন্দন পীতবাস। ৫২
য়েমন্তে নানা নৃত্য করি। সুবাহু টেকি নরহরি। ৫৩
শ্রীঅঙ্গ ত্যজিণ বিভোল। গৌরাঙ্গ চন্দ্র আদিমূল। ৫৪
পুণি নবীন শ্যামঘন। গোপাল কিশোর নবীন। ৫৫

রঙ্গ অধরে মন্দ হাসি । অখিলনাথ হৃষীকেশি । ৫৬
পুণি শ্রীরাম রূপ ধরি । তীর কমাণ নরহরি । ৫৭
নৃত্যে নাচন্তি শ্রীচৈতন্য । পুণি স্বরূপ শ্রীবামন । ৫৮
বামন রূপে বনমালী । নাচন্তি দুই বাহু তোলি । ৫৯
মৎস্য যে কূর্ম অবতার । ধরি নাচন্তি কন্ধুধর । ৬০
বরেহা নৃসিংহ স্বরূপ । নাচন্তি হরি গোরা রূপ । ৬১
পশুরাম রূপে বিহরি । নৃত্য করন্তি চক্রধারী । ৬২
হয় গ্রীবাদি শুক্র যাএ । বেঢ়িণ অবতার হোএ । ৬৩
অনন্ত রূপী শ্রী চৈতন্য । দেখন্তি ত্রৈলোক্যমোহন । ৬৪
সমস্তে দেখিণ হরষ । ক্ষণ ক্ষণকে নানা বেশ । ৬৫ ..
চৌষঠী সম্প্রদা একত্ব । কীর্তনে শ্রী চৈতন্য নৃত্য । ১৮৬/
৬২ অধ্যায়

গদাধর রাধার বেশ ধারণ করে এলেন, শ্রীচৈতন্যের দানলীলার আবেশ হল, তিনি বললেন, 'দান দিঅ কিশোরী মোতে। তেবে মু ছাড়িবই তোতে।' রাধা বেশী গদাধর প্রত্যুত্তরে অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য তাতে কর্ণপাত করলেন না। এই ভাবে আড়াই প্রহর ধরে সেই রসকীর্তন চলল।

গদাধর স্ত্রীবেশ হোই । চৈতন্য গহণে অছই । ২০৭
নৃত্যরে হোই সাবধান । দান মাগন্তি শ্রীচৈতন্য । ২০৮
গোপর লীলারস গাই । চৈতন্য প্রভু ভোল হোই । ২০৯
দান দি অ কিশোরী মোতে । তেবে মুঁ ছাড়িবই তোতে । ২১০
রাধা প্রতি উত্তর দেই । অনেক আকুলে কহই । ২১১
বোধ ন ঘেনে শচীসুত । প্রতক্ষে অনাদি অচ্যুত । ২১২
নানাদি রসময়ে করি । দেখন্তি সর্ব নরনারী । ২১৩
চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ । দিশন্তি নটবর রূপ । ২১৪
গোপাল মূর্তি শ্রীচৈতন্য । সমস্তে করন্তি দর্শন । ২১৫
য়েমন্তে অঢ়াই পহর । কীর্তনে অত্যন্ত মধুর । ২১৬/৬২
অধ্যায়

এই ভাবে সংকীর্তন মহাযজ্ঞ শেষ হলে মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করে রাজার কাছে বিদায় নিয়ে পুরী চলে এলেন। জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে গরুড় মূর্তির পিছনে থেকে দর্শন করলেন। তখন জগন্নাথ বললেন, 'সংসারে পতিতরা মুক্ত হয়েছে, এবার বৈকুণ্ঠে গমন কর।' শচীসুত সানন্দে ওই আজ্ঞা পালনে সম্মত হলেন।—

শ্রীমুখে ত্রৈলোক্য মোহন । চৈতন্যে কহন্তি বচন । ১৬৭
বোলন্তি শুণ শচীসুত । সংসারে পতিত মুকত । ১৬৮
সমস্ত করি পরিত্রাণ । মহামন্ত্র কর্ণে দেইণ । ১৬৯
য়েবে বৈকুণ্ঠে বিজে কর । শুণি হসন্তি কন্ধুধর । ১৭০
য়ে আজ্ঞা পালিবা নিয়ত । হরষে কহে শচীসুত । ১৭১/৬৩
অধ্যায়

অদ্বৈতকে সামনে পেয়ে চৈতন্য গোসাই বললেন, 'মোহর জন্মর বারতা, বয়স কেতেক গণ তা।' শুনে অদ্বৈত নিত্যানন্দ গণনা করে বললেন, 'বয়স হল সাতচল্লিশ বছর এগার মাস বাইশ দিন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল হতে আর আট দিন বাকি। তখন তোমার আটচল্লিশ বছর পূর্ণ হবে।' শুনে শ্রীচৈতন্য হরষিত হয়ে বললেন, 'আমার আয়ু আটচল্লিশ বছর—দোলযাত্রায় শেষ হবে।'

অদ্বৈত ছামুকু হকাই। পুচ্ছন্তি চৈতন্য গোসাই। ৩০...
মোহর জন্মর বারতা। বয়স কেতেক গণ তা। ৩২...
শুণি অদ্বৈত নিত্যানন্দ। কহন্তি শুণ হো গোবিন্দ। ৩৪...
বয়স সপত চালিশ। উপরে এগার যে মাস। ৪৪
বাইশি দিন পূণ হোই। শুণ হো ত্রৈলোক্য গোসাই। ৪৫
বাকী রহিলা আঠ দিন। উপরে দোল যে ফাল্গুণ। ৪৬
অষ্ট চালিশ পূর্ণ হেব। শুণ সুমনে বাসুদেব। ৪৭
শুণি হরষ শ্রীচৈতন্য।...
কহন্তি ত্রৈলোক্য গোসাই। প্রেমরে জরজর হোই। ৪৯...
অঠ চালিশ মো আয়ুষ। দোলযাত্রারে হেব শেষ। ৫৫...

একথা শুনে সকলে আকুল হয়ে বলল, 'হে ভাবগ্রাহী, আমরা তবে কার মুখ চেয়ে দিন কাটাব? তোমার সঙ্গে দেশান্তরী হলাম বাবা-মা ভাই বন্ধু ছেড়ে, সে কি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে বলে?' এই বলে প্রভুর গুণ কীর্তন করে সকলে কাঁদতে লাগল।—

কাহার মুখ আম্ভে চাহিঁ দিন হরিবু ভাবগ্রাহী। ৬২
কাহার চরণ চাহিবু। রজনী কেমন্তে বঞ্চিবু। ৬৩
তোতে দেখিণ শচীসুত। ছাড়িলু ভ্রাত পিতামাত। ৭০
বন্ধু সুহৃদ ত্যজ্ঞ করি। তো সঙ্গে হেলু দেশান্তরী। ৭১
নানা প্রকার গুণাগুণ। কহি কান্দন্তি সর্বজন। ৭২/৬৪ অধ্যায়

চৈতন্য গোসাই ভক্তদের প্রবোধ দিলেন। তারপর নিত্যানন্দকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি বৈকুণ্ঠে যাব। তুমি যাবে নবদ্বীপ, সকলকে নিয়ে যাবে। নদীয়ায় গেলে বসুমতীর গর্ভে তোমার ঔরসে বীরভদ্রের জন্ম হবে। তার সাত বছর বয়সে তুমিও বৈকুণ্ঠপুরে গিয়ে আমাকে দর্শন দেবে।—

'আপন চৈতন্য গোসাই। উঠিণ প্রবোধনা কহি। ৭৩...
এমন্তে চৈতন্য গোসাই। নিত্যানন্দকু পাশে রাই। ২৩৫
মুঁ যিবি বৈকুণ্ঠ ভুবন। তুম্ভে নবদ্বীপ গমন। ২৫৪...
বীরভদ্র জন্ম হোইব। ২৫৭
তাহার সপ্ত বরষেণ। সমস্ত যোনিণ গহণ। ২৫৮
বৈকুণ্ঠ পুরকই যিব। মোতে দর্শন সর্বে দেব। ২৫৯

অলৌকিক ঘটনা উদ্ভাবনে কবি ঈশ্বর দাসের অক্লান্ত অনুরাগ। মহাপ্রভুর

লীলাবসানের প্রস্তুতিও অলৌকিক। মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে গোপনে আদেশ করলেন, তারা যেন বৈকুণ্ঠে গিয়ে লক্ষ্মীকে জানায়—

বৈশাখ তৃতীয়ার দিন। বিজয়ে প্রভু ভগবান। ১৩৮

মহাপ্রভু বললেন কীর্তনে নৃত্য করতে করতে আবেশে তারা দেহত্যাগ করবে।—

আজ কীর্ত্তনে নৃত্য কর। আবেশে ছাড়িব শরীর। ১৪০

চৈতন্য চৈতন্য বলতে বলতে নৃত্য করতে করতে দুই ভাই শরীর ছাড়ল। মহাপ্রভু বললেন, 'জগাই মাধাইঙ্কি নিঅ। সমাধি স্বর্গদ্বারে দিঅ'। ১৬২

শরীর ছেড়ে জগাই মাধাই জয় বিজয় রূপে বৈকুণ্ঠ সাজাতে বললেন। তদনুসারে সাজসজ্জা হল। (২০৮-৩২৫)

এদিকে চন্দনযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুর সপার্ষদ কীর্তন নর্তন আরম্ভ হল।

চৌষঠী খোরী সংকীর্তন। তাল মর্দল বেণু স্বন। ২৭৫
বীণা যে বংশী সিংঘানাদ। চারিশ শঙ্খর শব্দ।...
নানা রসেণ নানা বাদ্য। বাজই মধুর স্বনাদি।
এমন্তে গোষ্ঠী সংকীর্তন। মধ্যে বিজয় শ্রীচৈতন্য। ২৭৯

নৃত্যসঙ্গী পার্ষদদের বর্ণনা দিয়েছেন কবি—

শঙ্কর ঘোষ সংগতর। নৃপতি অছন্তি সঙ্গর। ২৮৭
শ্রীগুরু গতাগত বাণী। সঙ্গে অছন্তি নৃপমণি।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দাস। উদত্ত হরিদাস পাশ।
রামানন্দ সারঙ্গ দুই। রূপ সনাত্ন দুই ভাই।
সার্বভৌম যে বক্রেশ্বর। হৃদয়ানন্দ গদাধর।
গৌরদাস যে পুরোত্তম। মুরারি দাস অভিরাম।
সুন্দরানন্দ আদি যেতে। মীন কৃষ্ণদাস সহিতে।
নাগর পুরুষোত্তম দাস। জঙ্গলী নন্দিনী তা পাশ।
নানক সহিতে গ্রহণ। গোপাল গুরু সঙ্গে পূণ। ২৯৫
সঙ্গতে মত্ত বলরাম। বিহার নীলগিরি ধাম।
পঞ্চসখা এ সঙ্গতর। তাঙ্ক সঙ্গতে বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সঙ্গতে ছন্তি। আনন্দে নৃত্য করিছন্তি।
ছামুরে জগন্নাথ দাস। বলরাম দাসহিঁ পাশ।
অচ্যুত দাস যশোবন্ত। নাম যা শিশু যে অনন্ত। ৩০০
কীর্ত্তন রসে মত্তভোল। গায়ন চৈতন্যমঙ্গল।
সর্বে উন্মত্তে নৃত্য করি। নৃত্য করন্তি দেব হরি।

৩০২/৬৪ অধ্যায়

তারপর এল চন্দনযাত্রার দিন। হাড়ি হাড়ি চন্দন গোলা হল। জগন্নাথ মন্দিরে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরকে দর্শন করলেন। সিংহাসনের

নীচ থেকে চৈতন্য চুয়া চন্দন কর্পূর ইত্যাদি শ্রীভুজে নিয়ে জগন্নাথের অঙ্গে লেপন করলেন। শ্রীজগন্নাথ আনন্দিত হয়ে শ্রীচৈতন্যকে কোলে নিলেন, শ্রীমুখ বিস্তার করে তিনি চৈতন্যকে গ্রাস করলেন। সকলে দেখল জগন্নাথ চৈতন্য রূপ ধারণ করল।—

রেমন্তে সপ্তঘড়ি বেল।	চন্দন যাত্রা অনুকূল। ৩০৩
অঙ্গে চন্দন লাগি করি।	গোবিন্দ যেনি দণ্ডধারী। ৩০৪
নরেন্দ্র শোচে নাবকেলি।	চন্দন হাণ্ডি হাণ্ডি গোলি। ৩০৫
সেঠারু চৈতন্য গোসাই।	জগন্নাথ ছামুরে যাই। ৩২৩
নৃপতি করে দেই কর।	দর্শন ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর। ৩২৪…
সিংহাসনর তলে যাই।	চৈতন্য দিঅন্তি বঢ়াই। ৩২৭
চন্দন চুআ গন্ধসার।	মিশাইছন্তি শ্রীকর্পূর। ৩২৮
চৈতন্য শ্রীভুজে ঘেনিণ।	লেপন্তি প্রভু অঙ্গে পুণ। ৩২৯
সর্বাঙ্গে শ্রীচন্দন বোলি।	আনন্দে প্রভু বনমালী। ৩৩০…
আনন্দে শ্রীচৈতন্য কোল।	কলেক প্রভু আদিমূল। ৩৩২…
শ্রীমুখ বিস্তারি গোসাই।	গর্ভে চৈতন্য লীন হোই। ৩৩৪
শ্রীজগন্নাথঙ্ক স্বরূপ।	দিশন্তি শ্রীচৈতন্যরূপ। ৩৩৫
দর্শন পাইলে সকল। ৬৪ অধ্যায়	

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানে রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্রুদ্ধ হলেন। জগন্নাথ বললেন, হৃদয় থেকে ক্রোধ দূর কর। চন্দনযাত্রা শেষ কর। আমি কথা দিচ্ছি, যখন ইচ্ছা করবে, তখনই চৈতন্যরূপে আমি তোমাকে দর্শন দেব। তখন রাজা নিত্যানন্দকে গুরুর মত মান্য করে প্রস্থান করলেন।—

	নৃপতি অত্যন্ত ব্যাকুল। ৩৩৬
রাজন ক্রোধ কে কহিব।	তাহা জানিলে বাসুদেব। ৩৩৭
শ্রীমুখে আজ্ঞা দেলে হরি।	শুণ সুমনে দণ্ডধারী। ৩০৮
তো হৃদু ক্রোধ দূর কর।	চন্দন যাত্রা মোর সার। ৩৩৯…
চৈতন্য দর্শন তোহর।	যেবে ইচ্ছিবু নৃপবর।৩৪২
চৈতন্য রূপে তোতে মুহিঁ।	প্রত্যক্ষে দর্শন দেবইঁ। ৩৪৩
যে কথা মোহর প্রমাণ।	শুণি হরষ নৃপরাণ। ৩৪৪…
নৃপতি নিত্যানন্দঙ্কর।	শিরে ধরিণ নৃপবর। ৩৪৬
শ্রীগুরু প্রায়ে মান্য করি।	বাহার বেজে দণ্ডধারী। ৩৪৭…

চৈতন্য তিরোভাবের এই অলৌকিক বর্ণনা দিয়ে কবি ঈশ্বরদাস তাঁর কাব্য শেষ করলেন। কিন্তু তা শেষ হয়েও শেষ হল না। চিরকালই কিছু লোক থাকেন যুক্তিবাদী, তাঁরা নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করেন না। কবি ঈশ্বরদাস এমনই একজনের তাড়নায় তাঁর কাব্য প্রকাশের পরবর্তীকালে বাধ্য হলেন আরেকটি অধ্যায় সংযোজন করতে। এই ৬৫তম অধ্যায়ে যুক্তিবাদী সন্ন্যাসী বাসুদেব তীর্থ কবিকে চেপে ধরেছেন, কেন তিনি অলৌকিক ঘটনা সাজিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে গেছেন।

এই বাসুদেব তীর্থ কে? ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী পার্ষদদের অন্যতম। 'গৌর-

গণোদ্দেশ' ও বৈষ্ণব বন্দনা গুলিতে তাঁর উল্লেখ আছে। শ্রীজীবগোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—'বন্দে বাসুদেবং তীর্থং শ্রীলানন্তপুরীং ততঃ'।

ঈশ্বরদাস তাঁর গ্রন্থের শেষে পরবর্তীকালে বাসুদেবতীর্থের প্রসঙ্গটি সংযোজিত করেছেন। সুতরাং তাঁর মূলগ্রন্থ [৬৪ অধ্যায় পর্যন্ত] বাসুদেব তীর্থের জীবদ্দশায় রচিত। বাসুদেব তীর্থের বিস্তারিত পরিচয় জানা না গেলেও তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। মহাপ্রভুর সমবয়সী এবং একশ বছরের পরমায়ু ধরলে বাসুদেব তীর্থের জীবৎকালের শেষ সীমা ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ ধরা যেতে পারে। এ হিসাবে ওড়িআ চৈতন্য-ভাগবতের রচনাকাল ধরতে হয় ষোড়শ শতাব্দী।

যা হোক, ৬৫ অধ্যায়ে ঈশ্বরদাস লিখেছেন, জগন্নাথ মন্দিরের মুক্তি মণ্ডপে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত' পাঠ করে কবির প্রশংসা করছেন, এমন সময় কবি এবং বিদগ্ধ সন্ন্যাসী বাসুদেব তীর্থ উভয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। গ্রন্থে চৈতন্য-তিরোভাবের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাসুদেব তীর্থ সরাসরি কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের অঙ্গে লীন হয়েছেন—এ কথা লিখলে কেন? কবি মনে মনে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, নারায়ণ শ্রীমুখে যা আজ্ঞা দিয়েছেন, তদনুসারে ওকথা লিখেছি'। তীর্থ ছাড়বার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত অগস্তি মুনি ও সম্পূর্ণ নৃপতির প্রশ্নোত্তরের ছলে কবি একটি গোপন সংবাদ প্রকাশ করলেন।

শ্রীচৈতন্যের মায়া শরীর পড়েছিল মন্দিরে। সিংহাসন থেকে ত্রৈলোক্যমোহন জগন্নাথ তা দেখে ক্ষেত্রপাল (মন্দিরের এক দেবতা)-কে আদেশ করলেন, 'এ পিণ্ড শরীর অন্তরীক্ষ-পথে বেগে বহন করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও'। ক্ষেত্রপাল জগন্নাথের আজ্ঞাপালন করলেন।

অগস্তি মুনি সম্পূর্ণ নৃপতিকে বললেন, 'এ বড় গোপন কথা কোন শাস্ত্রে পুথিতে লেখা নেই, ভক্তদের মুখেই প্রকাশ পেয়েছে একথা'।

এ শাস্ত্র মুক্তমণ্ডপেণ।	শুনন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।	২৮
য়েমন্ত সময়রে মুঁহি।	শ্রীপুরুষোত্তম গলইঁ।	২৯
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী।	আগে সরস্বতী প্রকাশি।	৩০
তাঙ্ক ছামুরে পুণি গ্রন্থ।	প্রকাশকলে বৈষ্ণবন্ত।	৩১
অনেক বিপ্র তপীজন।	শুণন্তি মুক্ত মণ্ডপেণ।	৩২
সমস্তে আনন্দে শুণন্তি।	গ্রন্থকর্তাঙ্কু প্রশংসন্তি।	৩৩...
শুনন্তি আনন্দিত হোই।	কাহারি অহংগুণ নাহিঁ।	৪১
প্রভু অঙ্গে চৈতন্য মিশি।	তীর্থঙ্ক মনকু ন আসি।	৪২
বৈষ্ণবে প্রমাণ করন্তি।	সন্যাসী কেভেঁ ন মানন্তি।	৪৩
মুঁ বসিথিলি সভারেণ।	শুণি ত উচ্চবাচ পুণ।	৪৪
সন্যাসী মোতে দেলে চাঁহি।	মনরে হস হস হোই।	৪৫
তীর্থে যে কহন্তি মধুর।	বোলন্তি শুন হে ঈশ্বর।	৪৬
পূর্বে এ শাস্ত্র শুণা নাহিঁ।	য়েবে এ শাস্ত্র শুনি লই।	৪৭
ভক্তিযোগর এহু কথা।	চৈতন্যমঙ্গল বারতা।	৪৮

শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।	কাহঁ লেখিল এ বচন। ৪৯
তাহা সম্পাপি তুম্ভে কহ।	অন্যকু একথা সন্দেহ। ৫০
ভাষা প্রবন্ধে এহা কহি।	শুনি মো হৃদয় কম্পই। ৫১
মুখরু ন আসে বচন।	চাহিঁলি তীর্থংক বদন। ৫২
বোইলি শুনিমা গোসাইঁ।	শ্রীমুখ আজ্ঞারু লেখই। ৫৩
যাহা কহন্তি নারায়ণ।	সে আজ্ঞা লেখই প্রমাণ। ৫৪
য়ে বাণী শুণিণ সন্যাসী।	পুণি কহন্তি মনে হাসি। ৫৫
শ্রীমুখ আজ্ঞারু লেখিল।	মত্তেঁা এ গ্রন্থ প্রকাশিল। ৫৬
আস্তর ন আসে মনকু।	প্রবোধ দি অনি আম্ভকু। ৫৭
য়ে বাণী শুণি মোর মন।	হৃদে চিন্তিলি ভগবান। ৫৮
বোলই শুণিমা গোসাইঁ।	চিত্তকু বোধ যাউ নাহিঁ। ৫৯

ঃহিঁ কি প্রবোধ কহিবি। চৈতন্য অঙ্গে লীন হোই। অগস্তি শ্রীমুখঁ শুণই। ৬৬

য়ে বাণী শুনি নৃপনাথ।	অগস্তি পাদে দেই মাথ। ৬৬
কাপুর্ণ্যে বোলে নৃপসাইঁ।	আশ্চর্য্য কহিলে গোসাইঁ। ৬৮
চৈতন্য চন্দন লিপন্তি।	শ্রীঅঙ্গে লীন এ হুঅন্তি। ৯৫
কহিলে চৈতন্য ঠাকুর।	শ্রীজগন্নাথ কলেবর। ৯৬
অন্তুতে হইলে নির্ণয়।	মোতে সে লাগিলা সন্দেহ। ৯৭
য়েহা সম্পাপি মোতে কহ।	মনু ছড়াঅ মায়ামোহ। ১০০
য়ে বাণী শুণিণ অগস্তি।	কহন্তি সম্পূর্ণ নৃপতি। ১০১
তিলরে তৈল যেহ্নে থাই।	ক্ষীররে ঘৃত লোপ হোই। ১১৭
কাষ্ঠে যেসনে হুতাশন।	দেহে শবদ যেহ্নে লীন। ১১৮
সেহি স্বরূপে শ্রীচৈতন্য।	লীন এ নীলাদ্রি ভুবন। ১২১
শ্রীজগন্নাথ কলেবর।	একাত্মা একাঙ্গ শরীর। ১২২
সমস্তে এমন্ত দেখন্তি।	মায়া শরীর ন জাণন্তি। ১২৩
চৈতন্য পিণ্ড সিংহাসন।	দেখন্তি ত্রৈলোক্য মোহন। ১২৪
ক্ষেত্রপালংকু আজ্ঞা দেই।	এ পিণ্ড ণিঅ বেগ কইঁ। ১২৫
অন্তর্ক্ষে নেই গংগাজল।	মেলিণ দিঅ ক্ষেত্রপাল। ১২৬
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই।	অন্তর্ক্ষে নেলে শব বহি। ১২৭
গংগারে মেলি দেলে শব।	সে শব হইলাক জীব। ১২৮
চৈতন্যরূপ প্রকাশিলে।	গংগারে লীন হোই গলে। ১২৯
কেহু ন জানে এহু রস।	ভক্তংক মুখরে প্রকাশ। ১৩০
লেখন নাহিঁ শাস্ত্র পোথা।	অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা। ১৩১...
তহিঁকি গোপ্য কথা মুহিঁ।	তো আগে প্রকাশ কলইঁ। ১৩৫...
শুণি হরষ নৃপণাথ।	মুনি চরণে দেই মাথ। ১৩৮...
য়েমন্তে শুণ হে সুজন।	তীর্থংকু প্রবোধ বচন। ১৪৫
শ্রীমুখ আজ্ঞারে লেখিলি।	এ গীত সভারে গাইলি। ১৪....
সমস্তে কলে হরিধ্বনি।	চৈতন্য ভাগবত শুনি। ১৫৮

শ্রীচৈতন্য ও পঞ্চসখা

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের ওড়িআ সাহিত্যে ও ওড়িষ্যার জনজীবনে 'পঞ্চসখা' বিখ্যাত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চসখার মাত্র দু'জনের [বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাসের] সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

বন্দেহি জগন্নাথং যদ্‌গানাৎ তরবো রুদন্‌ বিবশা ইহ।
বলরামমোড্রিনং করুণং যশবশো বলজগন্নাথৌ চ॥ [চৈ. চ. উ. ৭২২ পৃ.]

দেবকীনন্দন তাঁর বৈষ্ণব বন্দনায় বলেছেন—

'জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত।
যাঁর প্রেমরসে জগন্নাথ বিমোহিত'।

কিন্তু অপর তিন সখা অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত দাস সম্পর্কে কোন উল্লেখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই।

এই স্বল্প উল্লেখ ও অনুল্লেখের কারণ সাম্প্রদায়িক বা সম্প্রদায়গত। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের ভজনে কৃষ্ণপ্রাধান্য, বঙ্গদেশে নবদ্বীপে, শ্রীখণ্ডে, শান্তিপুরে, কাঞ্চনপল্লীতে গোর প্রাধান্য—এই ভজন পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিলই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অদ্বৈত-নিত্যানন্দের বংশধরদের মধ্যে শাখাগত কলহ। চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে নানা শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয় এবং সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবও এসে যায়। এর ফলে এক শাখার গ্রন্থে অন্য শাখার বিখ্যাত গৌর পরিকরের নাম বাদ পড়তে থাকে। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থে নিত্যানন্দের উল্লেখ নেই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে রঘুনাথ দাসের উল্লেখ নেই। বৃন্দাবনের 'ছয় গোস্বামী'র মধ্যে কবিকর্ণপুরের ঠাঁই হল না। কবিকর্ণপুরের কাব্যে নাটকে এবং বৃন্দাবন দাস লোচন দাস জয়ানন্দের কাব্যে 'ষড়গোস্বামী'র অন্যতম গোপাল ভট্টের কোন প্রসঙ্গ নেই।

সুতরাং গৌড়ীয় সাহিত্যে পঞ্চসখার অনুল্লেখে তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। অথচ পঞ্চসখার কথা না জানলে চৈতন্য জীবনের একটা প্রধান দিক অন্ধকারে থেকে যায়।

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' এবং কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য—বৃন্দাবনের ভক্তরা এইভাবে দেখলেন মহাপ্রভুকে। গৌরই স্বয়ং ভগবান—'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'—এইভাবে অদ্বৈত—নিত্যানন্দ—শিবানন্দ—প্রবোধানন্দ প্রমুখ ভক্তরা বললেন তাঁর কথা। আবার গৌরগতপ্রাণ মুরারি গুপ্ত রাম ভক্ত ; চৈতন্যদেব তাঁর কপালে লিখে দিলেন 'রামদাস'—মুরারির চোখে গৌর রামাবতার। ওড়িষ্যায় চৈতন্যদেবকে জগন্নাথ ও বুদ্ধের সঙ্গে এক করে দেখেছেন পঞ্চসখা। বৃন্দাবন সমগ্র উত্তর ভারতের কেন্দ্র—কৃষ্ণনাম সেখানকার জলে স্থলে মিশে আছে ; তাই কৃষ্ণগৌর সমীকরণের মধ্য দিয়ে রূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামীরা এগিয়েছেন। নবদ্বীপ গৌরের আবির্ভাব ক্ষেত্র—এখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবদেবী একদিকে, আর একদিকে বড় নিকটের বড় আপনার জন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ—সুতরাং এখানে গৌরই

সব। প্রবোধানন্দ যদি দ্রাবিড় দেশেই থাকতেন, তাহ'লে তিরুমল্ল তিরুপতির সঙ্গে চৈতন্যকে এক করে দেখা কিছু অসম্ভব ছিল না। একই কারণে ষোড়শ শতকের ওড়িষ্যায়—যেখানে জগন্নাথ-বুদ্ধ সমীকরণ আগে থেকে হয়ে আছে,—ওড়িশাবাসীর মননে জগন্নাথ-বুদ্ধ-চৈতন্য সমীকরণও একান্ত স্বাভাবিক। পঞ্চসখা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের এই পরিচয় বিধৃত।

কোন শাখানদীর আবর্তে আটকে গেলে সাগরে পৌঁছানো কখনও সম্ভব হবে না; অথচ সেই সাগরে অবগাহন করলে বোঝা যাবে সব নদীর জলকেই গ্রহণ করে সাগর। চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে জোয়ারের আশীর্বাদ ভরিয়ে দিয়েছে সব নদীর বুক। পঞ্চসখাও গৌরপরিকর, গৌরমূর্তি দর্শনে তাঁরা ধন্য, গৌরকথা শ্রবণে তাঁরা কৃতার্থ, গৌরপ্রেম সমুদ্রের অগণিত ঢেউয়ের পাঁচটি ঢেউ তাঁরা।

পঞ্চসখা ঠিক কোন্ পথের পথিক ছিলেন, তা নিয়ে বঙ্গীয় ও উৎকলীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে পঞ্চসখার সাধন পদ্ধতি নাথ সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি প্রভাবিত। তিনি বলেছেন, "প্রায় সমসাময়িক কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যায়ও 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায় বলিয়া একটি ভক্ত বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। ইঁহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হইলেও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা লইয়া ইঁহাবা কাব্য কবিতা রচনা করেন নাই, ইঁহাদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হইলেন 'শূন্যমূর্তি' 'শূন্যপুরুষ', ইঁহাদের সাধন পদ্ধতিতে দেখিতে পাই নাথ সম্প্রদায়ের সাধনার অনুরূপ কায়া সাধনার উপরে জোর।"

[শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ২৮৫ পৃ.]

এ মতের বিরোধিতা করে বিশ্বভারতীর ওড়িআ ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন—" 'যন্ত্র বিন্যাসি তন্ত্র কহ, যেমন্তে রহিব এ দেহ'—ব্রহ্ম শাঙ্কুলীর এহি পদকরু ডাক্তার শশিভূষণ দাশগুপ্ত ওড়িশার বৈষ্ণব এহি পঞ্চসখাঙ্কু যোগীপন্থী কায়া সাধন বোলি কহিছন্তি (**Obscure Religious Cults** : পৃ. ২৬২)। তাঙ্কর মত যে গোরখ সম্প্রদায় বা নাথ পন্থী মানঙ্ক পরি ওড়িশার বৈষ্ণব মানে মধ্য শরীরব অমরত্বলাভকু সাধনার চরম উদ্দেশ্য বোলি মানুথিলে। কিন্তু পরখি দেখিলে এহি মত একদেশী বোলি প্রমাণিত হুএ।" ['অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখাধর্ম'—প্রথম পীঠি]

অর্থাৎ 'যন্দ্র বিন্যাসি তন্ত্র কর, যেমন্তে রহিব এ দেহ'—ব্রহ্মশাঙ্কুলীর এই পদটি ধরে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ওড়িষ্যার বৈষ্ণব এই পঞ্চসখাকে যোগীপন্থী কায়াসাধন-মার্গী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গোরখ সম্প্রদায় বা নাথ পন্থীদের মত ওড়িষ্যার বৈষ্ণবগণ-ও শরীরের অমরত্ব লাভকে সাধনার চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু পরখ করে দেখলে এই মত একদেশী বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়।"

আরেকটি মত আছে যে পঞ্চসখা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেছেন, "**...though they outwardly professed the Vaishnava faith and propagated the Chaitanya cult, yet in their heart**

of hearts they were but sincere and staunch pioneers and champions of the long neglected and almost forgotten religion of the Mahayana school". [Modern Budhism in Orissa, p. 39]

অর্থাৎ "বাহ্যিক আচারে তাঁরা চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের অনুগত বলে মনে হলেও মূলতঃ তাঁরা ছিলেন দীর্ঘ অবহেলিত ও বিস্মৃতপ্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রথম অগ্রণী।"

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন—'যে পুঁথি গুলো থেকে বসু মহাশয় শূন্যমূলক অংশ সমূহ উদ্ধার করে তাঁদের বৌদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন, সেই পুঁথিগুলিরই নানা-স্থানে পঞ্চসখা-ধর্মের অন্যান্য নানা দিকের স্পষ্ট পরিচয় মেলে'।—"যেউঁ পোথিমানঙ্কর সে শূন্য মূলক অংশমান উদ্ধার করি সেমানঙ্কু বৌদ্ধ বোলি প্রমাণিত করিছন্তি, সেহি পোথির নানাস্থানরে পঞ্চসখাধর্মর আহুরি অনেক দিগর স্পষ্ট পরিচয় মিলুছি।
[অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখা, প্রথম পীঠি]

আরেকটি মতে পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলাপরিকর এবং সেকালের ওড়িষ্যায় যে মধুর প্রেমলীলার কল্লোল উত্থিত হয়েছিল, তার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরবৃন্দ। পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা।...লীলারসের বিকাশে তাঁরা চৈতন্যের পরিকর।—"পুণ্যভূমি উৎকল খণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহিত হোইথিলা, তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাঙ্কর পরিকরবৃন্দ। ...পঞ্চসখা তথা পঞ্চশাখা প্রভুঙ্কর অন্তরঙ্গ সখা।...লীলাঅঙ্গরে সেমানে চৈতন্যেঙ্কর পরিকর'। [অচ্যুতানন্দ দাসের 'ব্রহ্মাশাঙ্কুলী ও অনাকার সংহিতা'র মুখবন্ধ : অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি]। অধ্যাপক আর্তবল্লভের এই মতের বিরোধিতা করে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন, 'পঞ্চসখা সাহিত্যে যে শূন্য, অনাকার ও অক্ষর উপাসনা আছে, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব সাহিত্যে তা কোথায় দেখা যায়? ওড়িষী বৈষ্ণবদের যোগ, মন্ত্র ও যন্ত্রকে কিভাবে বাংলার বৈষ্ণব মতের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যাবে? গৌড়ীয় বৈষ্ণব বর্গের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে চৈতন্যদেব তান্ত্রিকদের 'পাষণ্ডী' বলে আখ্যাত করেছিলেন। দ্বৈতধর্মের প্রেমসাধনা চৈতন্যের বিশিষ্ট পন্থা, দ্বৈতাচার্য্য হলেন চৈতন্য ধর্মের দার্শনিক গুরু। পঞ্চসখাধর্মে এ দ্বৈতবাদ বা প্রেমধর্ম কোথায়? রাধাভাবে ভগবানকে মাধুর্য্য রূপে ধ্যান করে আপনাকে লীন করে দেওয়াই হল বৈষ্ণব সাধনার মূল সূত্র; ওড়িষ্যায় সে গৌড়ীয় মার্কা রাধা সাধনা কোথায়?
[অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখাধর্ম : প্রথম পীঠি]

অধ্যাপক দাসের এই মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বর্তমান ওড়িষী বিদগ্ধজনের এক বৃহদংশের মত এখানে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গড়ে উঠেছে 'সখাহীন পঞ্চসখা' জাতীয় মতবাদ—যার মূল কথা হল, পঞ্চসখা চৈতন্য দ্বারা প্রভাবিত নন, বরং তাঁরাই প্রভাবিত করেছেন চৈতন্যকে। ড. মায়াধর মানসিংহ যেমন বলেছেন—

"পঞ্চসখা ওড়িষ্যায় প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব বা সাধারণ ধর্মচেতনার পুণ্য পুষ্পপুঞ্জ। তাদের সৌরভে পুরীর তৎকালীন বাতাবরণ পুণ্য গন্ধময় হয়ে উঠেছিল, যা বোধ হয় চৈতন্যকে সে স্থানে বিশেষভাবে টেনে রেখেছিল।"

"পঞ্চসখা ওড়িশারে প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব বা সাধারণ ধর্মচেতনার পদ্মপদ্মে। সাহিমানঙ্ক সৌরভরে পুরীর সেতেবেলর বাতাবরণ পুণ্য গন্ধময় হোই উঠিথিলা। যাহা বোধ হুএ চৈতন্যঙ্কু সে স্থানরে বিশেষ ভাবরে টানি রাখিলা"

[ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস, পৃ. ১৪৩]

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস ও ড. মায়াধর মানসিংহের মন্তব্যের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। তার আগে এ বিষয়ে আচার্য্য সুনীতিকুমার ও অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য জেনে নেওয়া যাক।

আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিশুদ্ধ ভক্তিবাদী রামানন্দ যেমন, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমার্গের পঞ্চসখাও তেমনই, চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর।—"**In Orissa, Chaitanya came to have a number of intimate disciples and friends—e.g. Rāya Rāmānanda Dāsa who followed pure Bhakti and also the five religious teachers and poets who followed Bhakti with Jnana, namely Balarāmadāsa, Jagannāthadāsa, Yosovanta, Ananta and Achyutānanda'.**

[from 'The Delhi Sultanate. p. 520-21]

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—পঞ্চসখা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। শূন্যের আরাধনা তাঁরা করেছেন বটে, কিন্তু এই শূন্যকে তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মেরই অঙ্গ রূপে গ্রহণ করেছেন।—"**Achyutananda and his associates were pious and sincere Vaishnavas. They exalted the worship of the Void no doubt, but they took it to be a feature of Vaishnavism.**"

[The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—p. 112]

স্পষ্টতঃ পঞ্চসখা সম্পর্কে নানা মত। নানা মতের গোলোক ধাঁধায় না ঘুরে এ বিষয়ে সত্য নির্ণয়ের সহজ পন্থা হল পঞ্চসখা রচিত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

পঞ্চসখা সাহিত্যই বলে দেবে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের কি ধরনের সম্পর্ক ছিল, তাঁরা মহাপ্রভুকে কি চোখে দেখতেন, তাঁরা মহাপ্রভুকে প্রভাবিত করেছেন, অথবা মহাপ্রভু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের আগে অথবা পরে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্পর্কে কিছু বলতে হলেও তাঁদের ধর্মের ভিত্তিমূলক গ্রন্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় 'সখাহীন পঞ্চসখা' মতবাদ প্রচারে যাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁরা দ্রুত মন্তব্য প্রকাশে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যতটা পটু, স্বাধ্যায়ে ততটা আগ্রহী নন।

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন প্রশ্ন করেছেন, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব সাহিত্যে শূন্য, অণাকার ও অক্ষর উপাসনা কোথায় দেখা যায়! সনাতন গোস্বামীর 'কৃষ্ণলীলাস্তব' পড়া থাকলে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন। সনাতন পরমতত্ত্ব কৃষ্ণের বন্দনায় লিখেছেন—
'নির্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ নিরঞ্জন। অব্যক্ত সত্য সম্মাত্র পরম জ্যোতিরক্ষর' ॥৪

পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যদি এই নিরঞ্জন জ্যোতিরূপ ও অক্ষর পরম

তত্ত্ব থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে থাকে, তার জন্য দুঃখ বোধ করা চলে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব সাহিত্যে শূন্য, অনাকার ও অক্ষর উপাসনা নেই। সনাতন গোস্বামী নিশ্চিত চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব!

অচ্যুতানন্দ বলেছেন—

'দেখিলে যে শূন্য ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই।
ঘটে ঘটে বিজে এ হি শূন্য কায়া সেহী॥'

[শূন্যসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।]

সনাতন গোস্বামীর উক্ত কৃষ্ণবন্দনার পরিপ্রেক্ষিতে অচ্যুতানন্দের এই শূন্য ও জ্যোতি-উপাসনার ব্যাপারটি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা চলে; এবং অচ্যুতানন্দ শূন্য ও জ্যোতি-উপাসক, অতএব চৈতন্যপন্থী নন, একথা আর বলা যাবে কি করে?

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস ওড়িষী বৈষ্ণবদের যোগ, মন্ত্র ও যন্ত্রের সংগে বাংলার বৈষ্ণব মতের অমিলের কথা বলেছেন। পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেই তা চৈতন্য অনুমোদিত নয় এরকম সিদ্ধান্ত করা চলে না। জয়ানন্দের চৈতন্যমংগলে শ্রীচৈতন্য যোগ সাধনারও উপদেশ দিয়েছেন ;—

'আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার। তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার॥
একাদশ চোর তাহে দস্যু পাঁচজন। গঙ্গা যমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ॥
হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে ইংগলা পিঙ্গলা নাড়ী সুষুম্নার মূলে॥'

[জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি সং, পৃ. ৭৭]

আসলে এই দেহতত্ত্বের কথা আছে ভাগবতে (১১শ স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়) এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপর যে-পুরাণের প্রভাব ভাগবতের পরেই, সেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণ যশোদাকে বলেছেন—'যোগাত্মক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমত ক্ষুধাতৃষ্ণা রোধ করিয়া অন্তঃশরীর শোধন আবশ্যক। তৎপরে ইড়াদি নাড়ীর শোধন করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়। তাহার পর কুলকুণ্ডলিনী শক্তিযুক্ত পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে হয়।'

[১১০ অধ্যায়/৯-১০ শ্লোক]

সুতরাং যোগ বা তন্ত্র কোন কিছুর সংগে শ্রীচৈতন্যের বিবাদ ছিল না। যে ব্যভিচারী তান্ত্রিকেরা শ্রীবাস প্রমুখ বৈষ্ণবদের উপর অত্যাচার করত, তাদেরই বিশেষভাবে 'পাষণ্ডী' বলেছেন শ্রীচৈতন্য। [শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৭/৩৭-৫৩।]

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস ওড়িষ্যায় 'গৌড়ীয় মার্কা রাধা সাধনা' দেখতে পাননি। অথচ পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাস নিজেকে রাধার অবতার বলে জানতেন এবং 'জগন্নাথ চরিতামৃতে' গৌড়ীয় রাধা সাধনার প্রভাব যথেষ্টই আছে। ওড়িষ্যার রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকে ত গৌড়ীয় মার্কা রাধাই আছেন!

অচ্যুতানন্দের কাব্যেও রাধা সগৌরবে বিরাজিতা। তাঁর 'নিত্যরাহাস' কাব্যে রাধা, গোপী ও সখীদের যে তত্ত্বমূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাকে 'ব্রহ্মসংহিতা' (৫ম অধ্যায়)-এর রসভাষ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং চৈতন্য চরিতের পাঠক মাত্রেই জানেন 'ব্রহ্মসংহিতা' শ্রীচৈতন্যের নিকট কতটা সমাদৃত গ্রন্থ।

পঞ্চসখার অন্যতম যশোবন্ত দাস রচিত 'প্রেমভক্তিব্রহ্মগীতা'য়ও শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্মেরই প্রকাশ ঘটেছে।—

'গউর রূপ অটে সেহি সে রূপ পরম অটই।
য়ে মিশি রাধাকৃষ্ণ থিতি জীব পরমহিঁ বোলান্তি।...১০
শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভক্তি লভে জীব পরম ভাব ভাবে। ১০৫
তু রাধা জীব মোর দেহী মুঁ তোর পরম অটই।
সকল জীবে এহি ভাব কহিলু প্রেম ভক্তিভাব। [২য় অধ্যায়]

প্রেম ভক্তির সাধনায় জীব শেষে নিত্যরাসলীলার অন্তর্গত হয়।—

প্রেম ভগতি যে করই সে প্রাণী নিত্যরে বসই।
অন্তে পশই রাসগতে রাধিকা শুণ য়েকচিত্তে।
প্রেমর মহিমা অপার প্রেমলক্ষণ মো শরীর।
প্রেম ষোড়শী যে ভজই ষোল অক্ষর মন্ত্র যহিঁ। [১১০/৩য় অধ্যায়]

এই প্রেমভক্তির উপাস্য দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ।—

য়েমন্ত ভক্তিরে নির্বাণ মুক্তির অটই নির্গুণ।
য়েমন্ত দারু ব্রহ্ম গোপ্য ওঁকার জগন্নাথ রূপ।
গোপী মোহোর নিজ দেহী যে তাকু ভগতি করই।
মোতে মিশাই স্তুতি করে অন্তে বসই গোলোকরে।

এই প্রেমভক্তির চেয়ে উচ্চতর কোন ভক্তি মার্গ নেই—এই প্রেমভক্তিরই বশ সেই পরমতত্ত্ব।
—'প্রেমভক্তির ভক্তি নাহিঁ প্রেম নিকটে থাই মুহিঁ। ১১৫/৩য় অধ্যায়

আমরা দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ চরিতামৃত' পাঠ কালেই দেখেছি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আদিপর্বে বৃন্দাবনধাম ও পুরুষোত্তম ধাম নিয়ে কোন বিবাদ ছিল না, জগন্নাথ ও কৃষ্ণকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখার তত্ত্বজ্ঞানেরও অভাব ছিল না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে' শ্রীজগন্নাথের স্তবে বলা হয়েছে—"হে শ্রীজগন্নাথ! নীলাচল শিরোমণি! হে দারুব্রহ্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ! হে লবণ সমুদ্রতটের অমৃত! হে গুটিকোদর, নানা ভোগ-বিলাসিন্! আমাকে পালন কর। তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন: তুমি সুভদ্রার লালনে ব্যগ্র, হে রামানুজ! তোমার চরণে নমস্কার।...হে গুণ্ডিচা রথভূষণ! তোমাকে বন্দনা করি" ইত্যাদি। মহাপ্রভু গেয়েছেন 'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'। সুতরাং পঞ্চসখা-সাহিত্যে জগন্নাথ ধর্মের সঙ্গে গোপীভাব সাধনার যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় তা নিঃসন্দেহে চৈতন্য প্রভাবিত এবং যোগ-মন্ত্র-যন্ত্র-অবাড় অক্ষর ইত্যাদির কথা বললেও তাঁরা চৈতন্যপন্থী নন একথা বলা যায় না।

পঞ্চসখার মধ্যে বড় সখা বলরাম দাস 'বেদান্ত সার গুপ্তগীতা'য় বলেছেন—

'আত্মাকু স্ত্রীবেশ করি। শ্রীরাধা অঙ্গরে বিহরি।
কৃষ্ণে আস্বাদ রস দেই। এহাকু প্রেমভক্তি কহি।
তেবে পাইধু ভাবগ্রাহী। নোহিলে পশি ন পারই।
পুরুষ অঙ্গে ন লভন্তি। এমন্ত বেদতত্ত্ব স্থিতি। [২৪ অধ্যায়]

অন্যত্র— 'সেহি প্রকারে রাধা অঙ্গে। প্রবেশ হুঅ চিত্ত সঙ্গে।
কিশোরী রূপ হুঅ বীর। মনকু চেতনারে তর।
নবীন যুবতী সঙ্গরে। কিশোর পুরুষ বিহরে।
দিনকু দিন নবরস। যেমন্ত করন্তি উল্লাস।
সেহি প্রকার ভজ মাতে। কোহিলি উপদেশ তোতে'। [৯ অধ্যায়]

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস যাকে বলেছেন 'গৌড়ীয় মার্কা রাধা-সাধনা,' একি তাই নয়?

যশোবন্ত দাসের 'প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা'র (প্রাচীসমিতি প্রকাশিত) মুখবন্ধে অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তি লিখেছেন, 'প্রেমভক্তির অধিকারী হতে হলে রাধাভাবের ভজন বা নারীসুলভ অনুরাগে জীবনকে জড়িত করে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া ভক্তের পরম কর্তব্য।...উৎকলীয় ধর্মমতে এই গোপনবাদ (mysticism) বহু পুরাতন কাল থেকে প্রচলিত ('প্রেমভক্তির অধিকারী হেবাকু হেলে রাধাভাবর বা নারীসুলভ অনুরাগরে জীবনকু জড়িত করি সাধনার পথরে অগ্রসর হেবা ভক্তর পরম কর্তব্য।...উৎকলীয় ধর্মমতরে এহি গোপনবাদ বহু পুরাতন কালরু প্রচলিত')। কবি যশোবন্ত বলেছেন—

'যাহার পূর্বভাগ্যবলে। সেবই গোপীগণ মেলে।
অষ্টনায়িকা মধ্যকরি। য়েক গোপিনী অঙ্গ ধরি।
সে গোপীপ্রায়ে বেশ করি। বস্ত্র আলট করে ধরি।
সেবিব শ্রীকৃষ্ণ পয়র। মন ন থিব অন্যঠার।
বোলিব দেব জগন্নাথ। গোপীঙ্ক পতি গোপীনাথ।
মুহিঁ গোপীজনঙ্ক দাসী। শরণ রখ ব্রহ্মরাশি।
য়েমন্তে সমর্পিব অঙ্গ। অনলে যেসন পতঙ্গ'।

শ্রীচৈতন্য ও পঞ্চসখা সম্পর্কে ড. আর্তবল্লভ মহান্তি বলেছেব, "এমানে নিজ নিজকু চৈতন্যচন্দ্রঙ্কর শিষ্য বোলি কহি অছন্তি। এমানঙ্কর উক্তিরে সন্দেহ করিবার কৌণসি কারণ নাহিঁ। এহি পঞ্চসখা চৈতন্যচন্দ্রঙ্কর সখা থিলে,—তাহা স্থানবিশেষরে পূর্বে কুহা যাই আছি। চৈতন্য যে কেবল শুদ্ধাভক্তির প্রচার করিথিলে, তাহা নুহেঁ। পরন্তু সে সমস্ত ভক্তির আশ্রয়ভূত হেতু ও সকল ভক্তির পরিণতি একভাব হেতু পাত্র বিশেষরে ধর্মমতর বিশেষত্ব সমর্থন করি জগতরে প্রকৃত ধর্মভাবর সংস্থাপনা করি যাই অছন্তি"।—অর্থাৎ, এঁরা নিজেদের চৈতন্য চন্দ্রের শিষ্য বলে স্বীকার করেছেন। এঁদের উক্তিতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। এই পঞ্চসখা চৈতন্যচন্দ্রের সখা ছিলেন,—তা স্থানবিশেষে পূর্বে বলা হয়েছে। চৈতন্য যে কেবল শুদ্ধাভক্তির প্রচার করেছিলেন, তা নয়। পরন্তু তিনি সমস্ত ভক্তির আশ্রয়ভূত হওয়ার জন্য এবং সকল ভক্তির পরিণতি এক হওয়ার জন্য পাত্রবিশেষে ধর্মমতের বিশেষত্ব সমর্থন করে জগতে প্রকৃত ধর্মভাবের সংস্থাপনা করে গেছেন। [ভূমিকা, 'প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা' প্রাচী সমিতি প্রকাশিত]

নানা ভক্তিমার্গ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, নানাদিক থেকে এই মতটিই সত্য বলে মনে হয়।

অচ্যুতানন্দের রচনাবলীতে এর প্রচুর প্রমাণ আছে। 'গুরুভক্তি গীতায়' অচ্যুতানন্দ বলেছেন বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য, রামানন্দ, নিম্বার্ক (নিমানন্দ) এই চার বৈষ্ণব ধর্মাচার্য একেরই চার অংশ, ভিন্ন ভিন্ন নন—

বিষ্ণুশ্যাম মাধবাচার্য্য এনুটি মুণ্ডল। রামানন্দ নিমানন্দ অটন্তি এ মেল। ২০
কলি আদ্যে রামানন্দ নাম বোলাইলে। ২২
নিমানন্দ বিষ্ণুশ্যাম মাধবাচার্য্য কহি। এ চারিহেঁ এক অংশ ভিন্ন ভিন্ন নোহি। ২৩

অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও অচ্যুত যথাক্রমে রামানন্দী, মাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক-পন্থী বৈষ্ণব।—

অনন্ত শিশু যে রামানন্দ বইষ্ণব। যশোবন্ত দাস মাধবাচার্য্য বইষ্ণব। ২৬
বলরাম দাস বিষ্ণুদাস হোই নিমানন্দ বইষ্ণব অচ্যুত অটই। ২৭

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে অচ্যুতানন্দ একথাও বলেছেন যে তাঁরা চারযুগেই ভগবানের লীলাপার্ষদ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। কলিযুগে যখন কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে জাত হলেন, তখন কৃষ্ণসখা সুবল-সুবাহু-দাম-সুদাম নবদ্বীপে ও ওড়িষ্যায় যথাক্রমে হলেন গৌরীদাস পণ্ডিত-বলরাম দাস, উদ্ধব (?) দত্ত-যশোবন্ত দাস, অভিরাম গোস্বামী-শিশু অনন্ত এবং সুন্দরানন্দ-অচ্যুত।—

সুবল সখা অটন্তি বলরাম দাস। সুবাহু সখা যে যশোবন্ত পরকাশ। ২৮
দাম সখা-অনন্ত যে শিশু পুণ জান। সুদাম সখা গোপরে অচ্যুত মুঁ পুণ। ২৯
অনন্ত শিশুনারদ মুনি সত্যে-হোই। যশোবন্ত গাগ্রব যে মুনি বোলি কহি। ৩০
মারকণ্ড ঋষি বলরাম দাস হোই। অচ্যুত দাস যে কৃপাজল, ঋষি মুঁই। ৩১
ত্রেতায়াযুগরে রামচন্দ্র সঙ্গে জাত। বলরাম দাস যে সুসেণ হোই খ্যাত। ৩২
জাম্বব হোইণ যশোবন্ত হেলে নাম। অনন্ত শিশু ধইলে নীল বোলি নাম। ৩৩
নল বোলি অচ্যুত যে নাম হোএ তঁহি। চারিযুগে চারি অবতার সার হোই। ৩৪
সত্যে নারায়ণ ত্রেতয়ারে রামচন্দ্র। দ্বাপররে নাম হোএ শ্রীকৃষ্ণ যে চন্দ্র। ৩৫
শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত। তাঙ্ক সঙ্গে চারিসখা হোইলু যে জাত। ৩৬
অনন্ত যে শিশু অভিরাম পুণ হোই। গউরীদাস পণ্ডিত বলরাম কহি। ৩৭
সুবাহু অটন্তি পুণ উদ্ধব যে দত্ত। সুন্দরানন্দ যে মুহিঁ অটই অচ্যুত। ৩৮

[গুরুভক্তিগীতা, প্রথমখণ্ড, দ্বাত্রিংশ ছান্দ]

অবাড় (জ্যোতি) অণাক্ষর (নিরাকার) ভজন পদ্ধতির সঙ্গে কৃষ্ণমন্ত্র রাধামন্ত্র চৈতন্য-মন্ত্রের সমন্বয় করেছিলেন পঞ্চসখা এবং অচ্যুতানন্দ বলেছেন ওঁকার অক্ষরভেদ ইত্যাদি গীতাভাগবত কাব্য পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়েছে (শ্রীচৈতন্য গীতা ভাগবতের নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন. বাংলা চৈতন্য চরিত কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে)।—

অবাড় হেজিবা হেতু দয়া দরশন। পঞ্চাক্ষর অণাক্ষর করন্তি ভজন। ৯৭
অষ্টাক্ষর ষোড়শ যে ছড়াক্ষর জপি। কৃষ্ণমন্ত্র ঠাকুরাণী মন্ত্র হৃদে স্থাপি। ৯৮
চইতন্য মন্ত্র কামগায়ত্রী ভজন। পঞ্চনাম হৃদয়রে করন্তি সাধন। ৯৯
গীতা ভাগবত কাব্যপুরাণে রখানি। ওঁকার অক্ষরভেদ পারন্তি যে জাণি।' ১০১

['গুরু ভক্তিগীতা' প্রথমখণ্ড পঞ্চচারিংশৎ ছান্দ।]

রাগানুগা সাধনের আভাস দিয়ে অচ্যুতানন্দ বলেছেন—

'শ্রীকৃষ্ণ সেবারে সখী সখাছন্তি রহি। মূঢ় শিষ্য বুঝিলে যে মুকতি লভই। ৭৫
কৃষ্ণরাধে কৃষ্ণরাধে নিরন্তরে ভজ। সকল কলুষ যাউ পাদপদ্মে মজ।' ৯১

সুতরাং ব্রজের প্রেমধর্ম পঞ্চসখা গ্রহণ করেন নি,—এ কথা ঠিক নয়।

অচ্যুতানন্দ তাঁর গুরুপরম্পরায় চৈতন্য সম্প্রদায়ে তাঁর দীক্ষার কথা বলছেন।

'মাধবেন্দ্রদেব শিষ্য শ্রীঈশ্বরদেব। ঈশ্বরদেবঙ্ক শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। ৩৮
শ্রীচৈতন্য শিষ্য হেলে সারঙ্গ গোসাই। সারঙ্গ গোসাই শিষ্য শ্যাম ঘোষ হোই। ৩৯
শামঘোষঙ্কর শিষ্য রামকৃষ্ণ দাস। রামকৃষ্ণ ঠারু নবকিশোর যে শিষ্য। ৪০
নবকিশোরঙ্ক শিষ্য শ্রীচরণ গোসাই। শ্রীচরণ গোসাই শিষ্য অচ্যুত মুহি। ৪১

['গুরুভক্তিগীতা', প্রথমখণ্ড, ত্রিংশ ছান্দ]

অচ্যুতানন্দ অন্যত্র বলেছেন, চৈতন্য গোসাই যখন পুরীতে বিরাজ করছেন সেই সময় তিনি ছ'সাত বছরের বালক ; পিতা মাতার সঙ্গে গিয়ে চৈতন্যমহাপ্রভুকে দর্শন করলেন। তখন শচীসুতের আজ্ঞায় শ্রীসনাতন গোসাই অচ্যুতানন্দকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

'চৈতন্য গোসাই বিজে করিছন্তি বড়দাণ্ডরে সে আসি।
পিতাঙ্ক সঙ্গরে দর্শন কলি মুঁ চরণে পড়িলি যাই
বাসনা হেতু মো অঙ্গে বাজে তেণু প্রকাশিলা তহিঁ।
কর্ণ উপদেশ করিবাকু সোতে প্রভুঙ্ক আজ্ঞা হোইলা
শ্রীচরণে পড়ি মাতা-পিতা মোর সণ্ঢা গোটিএ থোইলা।
শিরী সনাতন স্বামীঙ্ক চাহিঁণ আজ্ঞা দেলে শচীসুত।
অচ্যুতনন্দঙ্কু তুম্ভে উপদেশ করহে যাই ত্বরিত।
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাই সঙ্গে সুখে ঘেনি গলে
দক্ষিণ পারুশ বটমূলে বসি কর্ণে উপদেশ দেলে'।

['জন্ম বিবরণ' অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখা, পৃ. ১০]

এই সনাতন গোসাইকে অনেকে ভেবেছেন বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীসনাতন গোস্বামী। অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন, 'সে চৈতন্যশিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামীঙ্ক ঠারু দীক্ষাগ্রহণ কলে'। [অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখা, পৃ. ২০৪]

কিন্তু অচ্যুতানন্দ 'গুরুভক্তিগীতায় তাঁর গুরুর পরিচয় দিয়ে বলেছেন, তাঁব গুরুব পিতৃদত্ত নাম ছিল সনাতন, গুরুদত্ত নাম শ্রীচরণ দাস।—

মাতাপিতা দেলে নাম সনাতন পুণ। গুরু আজ্ঞা দিলে শ্রীচরণ শুণ। ৬৫

[গুরুভক্তিগীতা, প্রথমখণ্ড, ত্রিংশ ছান্দ]

নদীয়ার ঠাকুরের নাম স্মরণ করে রাধাকৃষ্ণ কীর্তনই হল কৃষ্ণচরণ প্রত্যাশী অচ্যুতানন্দের ব্রত।—

শ্রীকৃষ্ণ করুণা কলে ঠাকুর নদীআ। ২৩
তাঙ্ক নাম সুমরিণ কৃষ্ণরাধা ঘোষ। পামর অচ্যুত কৃষ্ণচরণকু আস।' ১৪

[তদেব, ষট্‌ত্রিংশ ছান্দ]

এর সঙ্গে পঞ্চসখার আরেকটি কর্তব্য হল শূদ্রকুল উদ্ধার।—

'এহু পঞ্চসখা মোর অটে নিজ অংশ। তারিব গোপাল কুল ওড়িশা যে দেশ ॥ ২২

[গুরুভক্তিগীতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ষোড়শ পটল]

এবং, শিশু যে অচ্যুত যশোবন্ত বলরাম। শূদ্রকুল উদ্ধারিবু আম্ভে চারিজন। ১২৮

[তদেব, প্রথমখণ্ড, ত্রয়োত্রিংশ ছান্দ]

অচ্যুতানন্দ 'শূন্যসংহিতা' গ্রন্থেও বলেছেন ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাঁর লীলাসঙ্গীরূপে তাঁর জন্ম। শ্রীচৈতন্য তাঁকে গোপালকুল উদ্ধারের আজ্ঞা দেন।—

মোতে জাত কলে প্রভু করুণা সাগর। 'জনম হোইলে আসি নব যে দ্বীপ ॥
শ্রীচৈতন্য গোসাই যে ব্রহ্মাণ্ডর পতি। নিত্যানন্দ সঙ্গে বোলি জন্ম হেলে ক্ষিতি ॥
তাহাংক সঙ্গরে মোতে জনম যে কলে। বৈরাগ্য বেশরে পৃথিবি ভ্রমণ সে কলে ॥
ভ্রমি নীলাচলকু সে কলেক গমন। সঙ্গতে ঘেনিণ যে যে পঞ্চ মহাজন ॥
রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীব গোসাই। গোপাল যে ভট্ট রঘুনাথ দাস তহিঁ ॥
সঙ্গে ঘেণি বিজে প্রভু সখাবৃন্দ যেতে। শ্রীমুখরে আজ্ঞা দেলে চাহিঁণ যে মোতে।
ওড়িআ দেশরে তুম্ভে রাসকু রচিব। গোপাল কুলকু তার আপণে তরিব ॥

[শূন্য সংহিতা, প্রথমভাগ, পৃ. ২। প্রকাশক-ধর্মগ্রন্থষ্টোর, কটক-২]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সখাবৃন্দ নিয়ে উদিত হলেন। তখন পঞ্চসখার বারো সহস্র ভক্ত খোল-করতাল ধরে নামকীর্তন করে সকলকে উদ্ধার করল। খোল করতালের ধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছলিত হল। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ পশুজন্তু সকলেই তা শুনে উদ্ধার পেল।—

শ্রীকৃষ্ণ উদয় হেলে সখাবৃন্দ ঘেনি। বারসহস্র ভক্ত উদে হেলে বোলি শুণি ॥
পঞ্চসখা মূলে বারসহস্র ভক্ত কুলে। খোল করতাল ধরি তারিলে সকলে ॥
আপণে চৈতন্য প্রভু সখাবৃন্দ ঘেনি। পঞ্চসখা মূলে বারসহস্র ভক্ত মুনি ॥
খোল কবতালরে ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছুলাই। শ্রবণে শুণন্তে নাশ কর ভয় নাহিঁ ॥
চণ্ডালু ব্রাহ্মণ আদি পশুজন্তু যেতে। হরিনামে তারিলে সংশয় নাহিঁ চিত্তে ॥

[তদেব, পৃ. ৭৮]

"বিনা ধনে প্রেম দেন মহাপ্রভু। অকিঞ্চন পতিতকে উদ্ধার করতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর কৃপা মাধুরী লাভ করে কত লোক তাঁর চরণে লোটায়। খোল করতালের ধ্বনিতে যেন সমুদ্র লহরী নিনাদিত হয়। নয় সহস্র সখার মধ্যে তিন সহস্র সখা যোগ পন্থা গ্রহণ করলেন এবং তার সংগে মাধুর্য ভাবের সমন্বয় ঘটালেন।'—

'বিনা ধনে প্রেম দিএ যেউঁ মহাপ্রভু। পতিত উদ্ধারে প্রকটিত হেলে সেহু।...
চরণে লোটে মাধুরী উপদেশ পাই। উদবেগ প্রভু যে যিবাকু নীলাচল ॥
খোল করতাল নাদ বাজই চহল। চলন্তি যেসনে সঙ্গে সমুদ্র লহরী।...
আম্ভে গলু প্রভু সাথে গহণ লগাই। নবসস্র সখাবৃন্দ সঙ্গে ছন্তি রহি ॥
রহিলে যে তিনি সস্র যোগ ধারণারে। ধ্যাইলে নিমগ্ন স্থানে রহি নিরাহারে।
জ্যোতি কলা ধ্যায়ে করি চিন্তি দিব্যরূপ। সাধিলে যোগ সাধন তিনি সস্র সন্থ ॥
মাধুরী কুটীর করি যোগ আরম্ভিলে। ত্রিবেণী ত্রিকূট ধয়ে চিত্তস্থির কলে' ॥

[তদেব, পৃ. ৭৯-৮০]

যোগ পন্থার সঙ্গে মাধুর্যপন্থার এই সমন্বয় যে মহাপ্রভু সমর্থিত তার প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল। পরবর্তীকালে শ্রীহট্ট চট্টগ্রামের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গৌরভক্ত মুসলমান কবিরা যখন গাইলেন—'ত্রিপুন্নিয়ার ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজায় বাঁশি', তখন পঞ্চসখা সাহিত্যের এই সমন্বয় পন্থারই অনুবর্তন ঘটেছে।

এই সমন্বয়ের চমৎকার নিদর্শন অচ্যুতানন্দের 'নিত্যরাহাস' (নিত্যরাস) রচনাটি। রাধাকৃষ্ণলীলার অনুভবকে কবি এখানে যোগ সাধনার অভীষ্টরূপে উপস্থাপিত করেছেন। নিত্যরাসস্থলীতে রাত্রিদিন নেই, স্ত্রীপুরুষ নেই, একাঙ্গরূপে যুগল মূর্তি শোভা পায়। কোটি কোটি রূপ তা থেকে সৃষ্ট হয়। সেখানে রাধা-কৃষ্ণযুগে মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। সেখানে গোপীদের নিত্য লীলা চলে। সেখানে কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকীরণ করেন কালা কানু। কালোমেঘে বিজলীর মত শোভা পায় রাধাতনুজ্যোতি। কোটিচন্দ্রের শোভা রাধার শ্রীমুখে। গোপীরা তাঁদের বেষ্টন করে আছেন। রাধা কৃষ্ণের চরণ চুম্বন করছেন আর সেখান থেকে সুধা নির্গত হয় ত্রিধারায়। কবি বলছেন, 'চল সখি, সেই ত্রিবেণীতে স্নান করে নিত্য রাধা দর্শন করবে। অষ্ট সখী-বত্রিশ নায়িকা-দ্বাদশ গোপাল-বিরাজিত সেই ক্ষেত্রে চল, বেদের অগম্য সেই স্থানে, চল সখি, গিয়ে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করবে। তাড়াতাড়ি সেজে নাও তুমি।

প্রথম ছান্দ

উঠ উঠ সখি বহন যিবা।	নিত্যরাহাস দর্শন করিবা।
বিজে করিছন্তি জগদ্‌গোসাইঁ।	নিত্যরাহাসরে অছন্তি রহি।
চালগো সখি বহন যিবা।	গোপীমানঙ্কু দর্শন করিবা॥
যেউঁ ঠারে রাত্রদিবস নাহিঁ।	নবীন রূপে ছন্তি উদে হোই।
লীলা নিমন্তে সে অনন্ত খেল,	অশেষ রূপ তুলনা সেঠার।
সখি গো রাত্র যাউছি পাহি,	চাল বহন যিবা সজ হোই॥
যেউ ঠাঁরে স্তিরীপুরুষ নাস্তি,	একাঙ্গ রূপে যুগল মূরতি। ইত্যাদি

সেখানে নিত্যরাধিকার চলে নিত্যরতি। সেই রাধা অঙ্গ থেকে সব কিছুর জন্ম। কোটি কোটি রূপেও তার তুলনা হয় না, সে রাধা অরূপানন্দ! আদি মহিমা চতুর্ধারূপী-যোগনিদ্রায় চারমূর্তি একাঙ্গ হয়, আবার লীলা অবতারে রাধাকৃষ্ণ এবং লীলাক্ষেত্র চরাচর বৃন্দাবনের আবির্ভাব ঘটে। চল সখি, সেই খেলা দেখবে।—

দ্বিতীয় ছান্দ

'সখিগো নিত্য রতি সেঠারে,	রাধা উদে হোইঅছি কমলে॥
নিত্য রাধিকা বোলি তার নাম,	কোটি কোটি রূপ নুহই সম।
সেহি রাধা অঙ্গু সকল জন্ম।	বিষ্ণু মহিমা অতি গূঢ়তম।
সখিগো লক্ষ্য দেবাকু নাহিঁ,	অরূপানন্দ রাধা অঙ্গ সেহি॥
ললিতা বিশাখা চন্দ্রমা সখি,	আদি মহিমা চতুরঙ্গ রূপী।
সখিগো লীলারস ভিআণ,	সেহি রসটি অটে আদিস্থান॥
তহিঁরু পূর্ণি যোগনিদ্রা কলে,	চারি মূরতি একাঙ্গ হোইলে।
বলিণ লীলা অবতার ঘেনি,	রাধাকৃষ্ণ পূর্ণি হোইলে জানি।

সেহি রূপ গোটি সচরাচর, রাধাকৃষ্ণ লীলা বৃন্দাবনর।
সখিগো খেল লাগিছি দেখ, অচ্যুতানন্দ তাহিঁরে বিমুখ ॥ ইত্যাদি

রাধা অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লুকিয়ে পড়েছেন, প্রেম সুধাসিন্ধু উচ্ছলিত হয়ে উঠছে—সেইত ভক্তের সম্পদ। সেই লীলাকলা থেকেই সব কিছু জাত। দীন অচ্যুত তারই (সেই রাধাকৃষ্ণেরই) ভৃত্য। সখি, চল সেই নিত্যকে দেখবে, সেই নিত্যরাস দর্শন করবে।

চতুর্থ ছান্দ

'সখি গো সুধা বহি পড়ুছি, রাধা অঙ্গরে শ্রীকৃষ্ণ লুচিছি ॥
প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিঅছি তহিঁ, ভকতঙ্কর সে ধন অটই]
সেহি কলারুটি সকল জাত, দীন অচ্যুত যার অটে ভৃত্য।
সখিগো চাল নিত্য দেখিবা, নিত্যরাহাস দর্শন করিবা। ইত্যাদি

সাতটি ছান্দে রচিত 'নিত্যরাহাস'-এর মধ্যে ব্রহ্মসংহিতা, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, এবং সখীভাব ও যোগসাধনার সমন্বয় ঘটেছে। অচ্যুতানন্দ তাঁর 'অণাকার সংহিতা'র মধ্যে বলেছেন, অণাকারের ভজনা করে তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় পেতে চান।—

'সাধুজনমানে দোষ মো ন ধর শ্রীকৃষ্ণ ভকতি হেউ।
পামর অচ্যুত অণাকার ভজি শ্রীকৃষ্ণ চরণে রহু'। ১৬১

অচ্যুতানন্দ বলেছেন, অণ অক্ষর হল 'ব্রহ্ম সংহিতা'র সার]—

'অণ অক্ষর এ শ্রীব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থ মানঙ্করে সার।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ পশিলা দীন অচ্যুত পামর'। ১৫৬

'ব্রহ্ম সংহিতা' (৫ম অধ্যায়) এবং তার জীবগোস্বামীকৃত ভাষ্য যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা একথার সারবত্তা উপলব্ধি করবেন। এই 'ব্রহ্মসংহিতা', কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতে, মহাপ্রভু কর্তৃক সংগৃহীত হয়। নিরাকার পন্থী হলেও পঞ্চসখাকে কেন চৈতন্যপন্থী বলতে হবে, সে রহস্যের চাবিকাঠি এখানেই।

ওড়িষ্যায় চৈতন্য ধর্মের প্রসার : উত্তরকাল

চৈতন্য অনুগত ওড়িআ বৈষ্ণবেরা নিত্যানন্দ, গদাধর, গোপালগুরু ও শ্যামানন্দের শাখাভুক্ত।

চৈতন্য শিষ, বক্রেশ্বরের শিষ্য ছিলেন গোপালগুরু। গোপালগুরুর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র। গোপালগুরু প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত মঠের আটটি শাখা-মঠ আছে গঞ্জাম ও পুরী জেলায়।

শ্যামানন্দ বা দুখী মণ্ডল মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কালনায় হৃদয়ানন্দ ও বৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব তাঁর ‘শ্যামানন্দ’ নামকরণ করেন। হৃদয়ানন্দ তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন,—“উৎকলে বৈষ্ণব কর সর্ব ঘর ঘর” (‘রসিক মঙ্গল’, প্রথম ভাগ, ২য় অধ্যায়)। ধারেন্দার অধিবাসীরা তাঁর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। ধারেন্দার মুসলমান ফৌজদার তাঁর নিকট বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে ‘চৈতন্যদাস’ নামে বিখ্যাত হন। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ। শ্যামানন্দ শূদ্র হলেও তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— “শ্যামানন্দের প্রভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত শূদ্র সমাজে চৈতন্যধর্ম প্রসারিত হলো ও ব্রাহ্মণের গুরু শূদ্র হলেন। গোঁড়া ওড়িয়া ব্রাহ্মণেরা চৈতন্য সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর জেলার বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য পূজিত হন। ব্রাহ্মণেরা রাধাকৃষ্ণ পূজা করেন। কিন্তু প্রত্যেক জাতের অব্রাহ্মণ পুরোহিত চৈতন্য পূজা করে থাকেন। তাঁদের ‘অধিকারী’ বলা হয়। নিম্নবর্ণের কণ্ড্রাদেরও অধিকারী আছেন। কণ্ড্রা বৈষ্ণবদের বালেশ্বর জেলায় ‘শালন্দী’ বৈষ্ণব বলা হয়। কটক জেলার আরেক নিম্নবর্ণ ‘পানো’দের মধ্যে চৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণবও দেখা যায়।” [শ্রীচৈতন্যাষ্টক, পৃ. ৮৪]

শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দ ময়ূর ভঞ্জের মহারাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে দীক্ষা দেন। ‘রসিক মঙ্গল’ কাব্যে (২/৭) রসিকানন্দের সাতজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উল্লেখ আছে। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে রেমুনায় রসিকানন্দের মৃত্যু হয়।

মারাঠা আমল থেকেই অনেক বাঙালী চাকরী ও অন্যান্য সূত্রে ওড়িষ্যায় এসে বাস করতে থাকেন। তাঁরা চৈতন্য নিত্যানন্দ পূজা প্রবর্তন করলেন। কোরাপুট জেলার জয়পুরের জমিদারেরা নবদ্বীপের গোস্বামীদের শিষ্য হলেন। ঊনিশ শতকে পুরীর রাজবংশ ও গঞ্জাম জেলার বড়খেমেদির জমিদার বংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় এবং বিশ শতকের গোড়ায় রাধারমণ বাবাজী ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রামদাস বাবাজীর চেষ্টায় ওড়িষ্যায় নিত্যানন্দ পূজা লোকপ্রিয় হয়। ওড়িআ বৈষ্ণবেরা ওড়িআ ও বাংলা ভাষায় ‘নদীয়া কীর্তন’ করেন।

চৈতন্যপন্থী কিছু ওড়িআ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধর থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরা নির্ণয় করেন।

এই সব শাখায় এবং অন্যান্য শাখায়ও অনেকেই চৈতন্যকরুণা আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। ঐতিহ্যের ধারা অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে ওড়িষ্যার জনগণের মানস মৃত্তিকাকে সরস ও ভাবসমৃদ্ধ করে রেখেছে। এর কিছু নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হল।

'শ্রীহরিদাস' নামে এক উৎকলীয় গৌরভক্ত ষোড়শ শক শতাব্দীতে 'ময়ূরচন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি রায় রামানন্দকে গুরু বলে অভিহিত করেছেন।

'কহন্তি গুরুদেব রায় রামানন্দ। শুণন্তি আনন্দে শচীসুত গোরাচান্দ!' ২ ছান্দ।

কবি বলেছেন, কৃষ্ণ তাঁর শ্যামবর্ণ গোপন করে রাধার বর্ণ নিয়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন (১৪ ছান্দ)। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি জগন্নাথের মধ্যে নিহিত (১২ ছান্দ)। মহাপ্রভুর বন্দনায় কবি বলেছেন—

শ্রীরাধা সুবর্ণকু করি স্বীকার। অদ্ভুতে কলিযুগে হেলে প্রচার গো ॥
গৌরবর্ণ কোটি সূর্য্য সমান। সঙ্গতে সপার্ষদ সং অস্ত্রগণ ॥
অঙ্গ উপাঙ্গ যেনি কীর্তনারম্ভে। নাম প্রকাশ কৈলে অত্যন্ত দম্ভে ॥
স্থাবর জঙ্গমাদি কীট পতঙ্গ। দ্রবিলে দেখি শুনি গৌরাঙ্গ রঙ্গ গো ॥

[২০ ছান্দ]

কবি অদ্বৈত-নিত্যানন্দেরও বন্দনা করেছেন।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক সার্ধ অষ্টাদশ শক শতাব্দীতে শ্রীগোপালকৃষ্ণপদ্যাবলী রচনা করেন। এতে 'মনঃ শিক্ষা' শিরোনামায় কবি লিখেছেন—

শ্রীগৌরচন্দ্র পদ বন্দরে মানস। এ একা শ্রীরাধাগোবিন্দরে ॥
ব্রজবিধু শ্রীমতী হোই গুটিয়ে মূর্তি জন্মিছন্তি শ্রীশচীতুন্দরে ॥ ১
স্ব স্ব কল্পনাবধি দয়া সদ্গুণনিধি সদাবেষ্টিত ভক্তবৃন্দরে ॥ ২
মহাভাব উজ্জ্বল রসপীত শ্যামল পরতত্ত্ব হেলার স্বচ্ছন্দরে ॥ ৩
জগন্নেত্র সম্প্রতি বদান্য চক্রবর্তী যা নামামৃত সর্বশব্দরে ॥ ৪
এ কৃপা পারাবার প্রত্যক্ষ হোইবার দেখিছন্তি শ্রীরামানন্দরে ॥ ৫
গোপালকৃষ্ণ ভণে শ্রীরাম অনুক্ষণে কীর্ত্তন করুথা আনন্দরে ॥ ৬

এই গ্রন্থে [৯৪ পৃষ্ঠায়] সংস্কৃত ভাষায় একটি গৌরবন্দনা আছে—

সত্যে দৈত্য কুলাধিনাথ মথনে সূর্যেন্দুভঃ কেশরী।
ত্রেতায়াং দশকণ্ঠ কণ্ঠ হরণে রামোঽভিরামাকৃতিঃ।
গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজকুলে ভারাহরো দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে কৃষ্ণঃ শচীনন্দনঃ ॥

সম্বলপুরের শত্রুঘন মাঝী ৪৪৮ গৌরাব্দে (১৯৩৩ খ্রীঃ) প্রকাশ করেছেন স্বরচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুঙ্ক চউতিশা':

কি কহিবি আহে ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ কথা,
কহিত নপারে কোটী ব্রহ্মাণ্ড দেবতা ১।
খল লোক মানঙ্কর অটন্তি সে যম,
খেলা কেতে করিছন্তি এ সংসারে জাণ। ২
গরব গঞ্জন বানা অটে তাহাঙ্কর,
গরব সে ন সহন্তি গর্বলোককর। ৩
ঘরে ঘরে প্রেম দেলে গউর অমর;

ঘড়ি ঘড়ি তাঙ্ক নাম উচ্চারণ কর । ৪
উদ্ধার হেবাকু যেবে হুএ তুম্ভ মন ।
উর্দ্ধবাহু হোই কর নাম সংকীর্ত্তন । ৫
চরিতার্থ হেব যেবে চিন্ত গৌর নাম :
চইতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান । ৬
ছপন কোটী জীবঙ্ক প্রভু দেবরাজ,
ছল কিছি ন করি স্বচ্ছন্দে তাঙ্কু ভজ । ৭
জগত জনঙ্ক অর্থে প্রভু বিশ্বম্ভর,
জন্ম নেইছন্তি জগন্নাথ মিশ্র ঘর] ৮
ঝলমল করে রূপ সুবর্ণরু জিনি
ঝক ঝক করি নিন্দে কেতে নীলমণি । ৯

নুআঁ নুআঁ ভাব তাঙ্ক হুএ প্রতিদিনে, নুআঁ ভাবকু জানন্তি প্রেমী ভক্তমানে ।১০
টেকি টেকি নিজমুখে গাঅ গৌর গুণ, টেকি গাইলে শুনিবে স্থাবর জঙ্গম । ১১
ঠাকুরানী গৌরঙ্কর লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, ঠিকে শত্রুঘন মাগে দিঅ পদছায়া । ১২
ডরিবি নাহিঁ কেবে খল লোকমানঙ্কু, ডরুথিবি মাত্র প্রভুঙ্ক ভক্তবৃন্দঙ্কু । ১৩
ঢলি পড়িবি মুহিঁ গউর নাম গাই, ঢলি ঢলি নাচিবি প্রেমে উন্মত্ত হোই । ১৪
অতি আর্ত্তে ডাকিবি মুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি, অবশ্য আর্ত্ত ফেড়িবে গৌর বংশিধারি । ১৫
তমগুণ ছড়াই সাত্ত্বিক গুণ দেবে, তমগুণে মহাদুঃখ জানি থাঅ সর্বে । ১৬
থিবে বেণি প্রিয়া নব নাগর সংগতে, থয়করি পঞ্চপ্রাণ সেব অবিরতে । ১৭
দম্ভ কপটাদি মো মনরু সবু যাউ, দয়া কর দীনবন্ধু তুম্ভে মহাবাহু । ১৮
ধন আদি বিষয়রু মন সে নগলা, ধন্দ হেউঅছিঁ রক্ষা কর শচীবলা । ১৯
নবীন কিশোর গৌর গোবিন্দ মোহন, নবদ্বীপ অন্তঃপুরে থাউ মোর মন । ২০
পতিত পাবন প্রভু শ্রীশচীনন্দন, পরাপর তুম্ভর নাহিঁ বিচারণ । ২১
ফলুঅছি প্রেমফল তাঙ্ক নাম গুণে, ফল খাই ক্রমে ক্রমে যাঅ পুষ্পোদ্যানে । ২২
বনে বা গৃহ মধ্যরে সুখে দুঃখে রহি, বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ ডাক আরে ভাই । ২৩
ভরসা কেবল মোর গৌর বিশ্বম্ভর, ভাবুথাউ মোর মন সে রঙ্গ পয়র । ২৪
মর্যাদার ক্ষণশিক্ষা কেতে দেইছন্তি, মর্মী ভক্তমানে এহা রক্ষা করিছন্তি । ২৫
যোগেশ্বর ভূতেশ্বর যোগাসন ছাড়ি, যোগ তুচ্ছ জ্ঞান তুচ্ছ বোলন্তি হরঘড়ি । ২৬
রস মধ্যে প্রধান অটে মধুর রস, রসিক ভক্তে আস্বাদি হুঅন্তি সন্তোষ । ২৭
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী জাণন্তি এ রস, লক্ষে জন্মে ন মিলে ন কলে তাঙ্কু আশ । ২৮
বংশীধর এ রসর অটন্তি বিষয়, বেণি প্রিয়া অস্বাদন্তি হইএ সদয় । ২৯
শ্রীশচীঙ্ক নন্দন ইষ্টদেব মোহরি, শচ্চীদানন্দ মুরতি অটন্তি সে হরি । ৩০
ষড়ভুজ চতুর্ভুজ দ্বিভুজ মোহন, ষড়ানন্দ আদি দেব করুছন্তি ধ্যান । ৩১
সবুবেলে গাউথাঅ প্রাণনাথ গুণ, সম্পর্ক ন রখ নিন্দুকাদি দুষ্টগণ । ৩২
হরষে ভাব গউর গোবিন্দঙ্ক গুণ, হতাশ ন হেব নিশ্চে ষিব পুষ্পোদ্যান । ৩৩
ক্ষমানিধি পাদপদ্মে রহু মোর মন, ক্ষণে শত্রুঘন মাগে যুগল চরণ । ৩৪

ওড়িষ্যায় সংকীর্তন ও মৃদঙ্গ বা খোলবাদ্যশিক্ষার ধারাতেও এই ঐতিহ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে কটক বালুবজার থেকে প্রকাশিত ব্রজবাসী শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস গোস্বামী প্রণীত 'গৌড়দেশী বা নদীয়া বাদ্যরত্নাবলী' থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল।—

জয়গীত

(রাগ—মঙ্গল গুর্জরী)

জয় জয় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পাদপদ্ম।
যাহাঙ্க কৃপারে মিলে ভক্ত-রস-পদ্ম হে। ১
অজ্ঞান অন্ধার নাশ হুএ যা সদয়ে।
যেহু প্রেম-তত্ত্ব দাতা রাগ মার্গে কহে হে। ২
জ্ঞানাঞ্জন দানে যেউঁ গুরু দয়াবান।
তাহাঙ্ক পাদাবুজে মুহিঁ করুছি বন্দন হে। ৩
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু দুহিঙ্ক চরণে।
এ মোর মানস-ভৃঙ্গ থাউ অনুক্ষণে হে। ৪
আহে গুরুদেব এ দীনরে হুঅ সাহা।
লেখিবইঁ সংকীর্ত্তন বাদ্য অছি যাহা হে। ৫
নদীয়া ঢঙ্গে গ্রন্থিবি বাদ্য রত্নাবলী।
নবীন শিক্ষার্থীঙ্কর হেব কণ্ঠমালি হে। ৬
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পূর্ণ কর অভিলাষ।
কৃতাঞ্জলি পুটে কহে বইষ্ণব দাস হে। ৭

বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ

প্রথমে মৃদঙ্গর আঠগোটিআটিকু সমস্বরে মেলাই সম্মুখরে রখি করি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবঙ্কু মনে মনে স্মরণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তর কনিষ্ঠ, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলিকু একত্র করি খোলর কিরণ মধ্যস্থলরে আঘাত কলে 'দিঙ' শব্দ হুএ।…ইত্যাদি

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রঙ্ক জন্মবাদ্য

ঝুলা তালরে প্রশ্ন

তা থিনি থেই (৩) তা তাথিড় খিড় তা থিনি থেই তা (৩)
তা থিনি থিনি থিনি তা, তা থিনি থিনি থিনি তা!
ঘোর কলিকাল অতিহিঁ প্রবল দেখিয়াঁ অদ্বৈত দঃখিতা,
গঙ্গার জলে তুলসী দলে ধ্যানে চরণ পূজিতা।
গোলক বিহারী মোহন বংশীধারী ভকতের ভাব জানিতা,
ব্রজের তিনি বাঞ্ছা সুধাইতে ইচ্ছা রাধিকার ভাবে ভাবিতা।
নবদ্বীপে উদে পূর্ণিমার চান্দে চন্দ্রে তে যে রাহু গ্রাসিতা,
শচীগর্ভসিন্ধু গৌর পূর্ণ ইন্দু জনমিল কলি গ্রাসিতা॥

ওড়িশী নর্ত্তন-বাদ্য
(পহপট তালে)

ধ্রীমি ধ্রীমি তা তা থীটা বাজত মৃদঙ্গ।
থেই থেই গৌরাঙ্গ নাচত রঙ্গে। ১
শিরপরে শোভিত মালতীর গভা।
হেরইতে কুলবতী সতী মনলোভা। ২
তা ধ্রীমি তা ধ্রীমি মৃদঙ্গ বাজে।
নৃত্যাতি রঙ্গে নট নাগর রাজে। ৩
ধ্রীমি ধ্রীমি তা তা খীটা মৃদঙ্গ ডাকে।
ভাসত প্রেমজলে নীলাচল লোকে। ৪
ভাবে ভকতবৃন্দ করতহি গান।
ধ্রীমি তা তা খীটা তাক উঠত তান। ৫

পূর্ব্বরাগ বাদ্য
(ধিনি কিটা ধিনি ধিনি ধিনি ধিনি ধিনি তাধিনি তাধিনি ধিন্দা)
নন্দনন্দন কান্তি নবঘন অখন শ্রী শচীনন্দন।
দন্ড কমন্ডল বেশ বৈরাগী জানিয়া করত ধ্যান।
শমন দন্ড খন্ড বিখন্ড তাপ তিমির নাশন।
গৌর নিতাই এই দুটি ভাই অধম পতিত তারণ॥

এইভাবে, ওড়িষ্যার জনগণের ধর্মজীবনে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যপ্রভাব ওত-প্রোতভাবে মিশে গেছে। কতিপয় বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধ প্রচারে তা মুছে যাবার নয়।

পঞ্চম অধ্যায়
দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়ে নিমাই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' রূপে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পুরী গেলেন। সেখান থেকে এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে তিনি ভারততীর্থ পরিক্রমায় বার হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন—'বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন' (মধ্য। ৭ মপঃ)। গোবিন্দ কর্মকারের করচাতেও আছে—

'তারপরে বৈশাখের সপ্তমদিবসে,
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে' ॥ [২য় সং, পৃ. ২১]

দক্ষিণে যাত্রা করে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী হয়ে শ্রীচৈতন্য পশ্চিম উপকূলভাগে কেরল-কর্ণাটক-কুর্গ-মহারাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে উত্তরমুখো হয়ে বরদা-আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে দ্বারকা পর্যন্ত যান। সেখান থেকে ফেরার পথে নর্মদা নদীর তীর বরাবর পূব মুখো হেঁটে এসে আবার দক্ষিণমুখো হয়ে গোদাবরীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। এখান থেকে তিনি পুরীতে ফিরে আসেন। এই ভারত পরিক্রমায় তাঁর সময় লেগেছিল দু'বছর। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের হিসাবে '১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ২০)।

শ্রীচৈতন্য যখন ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে বার হলেন, তখন দক্ষিণ ভারতে এমনকি বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদ প্রচণ্ডরূপে বর্তমান। T. Rajagopalachari তাঁর *The Vaisnavite Reformers of India* গ্রন্থে লিখেছেন (p. 143)—'দক্ষিণ ভারতে শাস্ত্রাচার ও প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মোটেই শিথিল করতে পারে নি এবং তাঁদের শূদ্র অনুগামীদের তো কোনই গুরুত্ব ছিল না। সমাজে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী কখনও জোরের সঙ্গে করতে পারেনি।' দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ সম্পর্কে রাজাগোপালাচারীর মন্তব্য—'রামানুজ কখনই কঠোর শাস্ত্রবিধান থেকে এতটুকুও সরে আসেন নি।' (Ramanauja in no place countenances the slightest departure from strict shastric injunction)। শূদ্র ও নারীকে রামানুজ বেদপাঠের অধিকার দেন নি। এ অধিকার মধ্বাচার্যও দেন নি। শ্রীচৈতন্য এই কঠোর শাস্ত্রাচারের বাইরে সহজ ভক্তিমার্গের পথ নির্দেশ করেছিলেন বলেই দক্ষিণভারতের ও পশ্চিমভারতের সাধারণ মানুষের উপর তাঁর ভ্রমণের প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। [He (Ramanauja) is uncompromising in denying the privilege of Vedic study to Sudars and women.…In the South,…the grip of the Shastra and established social rules, was too strong to be shaken by the Brahmin Vaishnavites, and the Sudra followers

were generally inferior in importance and never asserted themselves.…the respect for the Brahmin as Brahmin…was never forgotton.]

দক্ষিণভারতে জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের অন্যতম কারণ শ্রীচৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তির প্লাবন। *A History of Kanarese Literature* গ্রন্থে E. P. Rice লিখেছেন—"মোটামুটি ১০০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে জৈন ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। এর মূলে একাধিক কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব…দ্বিতীয়তঃ, Talkad-এ গঙ্গরাজ্যের পতন (১০০৪ খ্রীঃ) এবং জৈনধর্মের প্রতি বিরূপ চোলরাজাদের আধিপত্য—তৃতীয়তঃ, বল্লাল রাজার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ (আঃ ১১০০ খ্রীঃ)। চতুর্থতঃ কল্যাণের বাসবাচার্য্যের নেতৃত্বে বীর শৈব ধর্মের পুনরুত্থান (আঃ ১১৬০ খ্রীঃ)। পঞ্চমতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবধর্মে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার। ষষ্ঠতঃ, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরে শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। এবং সবশেষে—ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তিবাদের প্রভাবে বৈষ্ণব ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধর্মের কৃচ্ছ্রতা থেকে জনচিত্তকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে আনল।"

"And finally, in the sixteenth century, a wave of Vaishnava enthusiasm, inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishnabhakti, swept over the peninsula, and completed the alienation of the people from the austere teaching of the Jainas. [*A History of Kanarese Literature*, p. 21]

Charles E. Gover তাঁর *Folk Songs of Southern India* গ্রন্থে Popular Devotional Songs শিরোনামায় লিখেছেন—"বৈষ্ণবদাসেরা বা ভিক্ষুক গায়কেরা ত্রিপদী ছন্দে গান রচনা করে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে। এঁরাই কৃষ্ণ উপাসনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন মধ্বাচার্য্য ও চৈতন্য। চৈতন্য ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ভারতের সব বিখ্যাত মন্দির দর্শন করেছিলেন। সর্বত্র মানুষকে শিখিয়েছিলেন হরিনাম নিতে।"

"The worship of Krishna was popularised by short songs in ragale metres by Vaishnave dasas, or mendicant singers, who wandered from village to village. They received thier inspiration from Madhvacharya, to whom they all express indebtedness, and from Chaitanya, who about 1510, visited all the chief shrines of South India, teaching men everywhere to chant the name of Hari,…" (p. 59).

এই একই কথা লিখেছেন ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী—"popular songs in 'ragale' metre by 'dasas' (mendicant singers) was another form

of Vaishnava literature in Kannada in this period. These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaray and the visit of Chaitanya to the south in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song." *A History of South India*—page 393.]

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভ্যুদয়ে প্রেমভক্তির বাঁধভাঙা বন্যায় যখন দক্ষিণ ভারত প্লাবিত হল, তখন তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাদিত এক মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ; কেননা চৈতন্যদেব তাঁদের দিলেন কঠোর ও অবোধ্য শাস্ত্রাচারের দাসত্বের পরিবর্তে সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময় ধর্মজীবন ; জাতিভেদজনিত হীনমন্যতা বর্জন করে সমাজে মর্যাদা-সম্পন্ন জীবনযাত্রার সুযোগ পেলেন তাঁরা।

দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষদের উপর চৈতন্যদেবের এই জাতিভেদবিরোধী অভিযানের প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল, সে ইতিহাস আজ প্রায় লুপ্ত। কিন্তু দুটি একটি তথ্য বিস্মরণের মেঘাচ্ছন্নতায় বিদ্যুৎচমকের মতো আজও ঝলসে ওঠে।

মহীশূর-কুর্গ অঞ্চলে ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান সাতানি' সম্প্রদায়ের। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার প্রকাশিত Imperial Gazeteer-এ বলা হয়েছে যে,'সাতানি'রা বৈষ্ণব, কৃষ্ণোপাসক এবং চৈতন্যের অনুগামী। বর্তমানে এঁরা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন এবং 'হোলিয়া' প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের পৌরোহিত্য করেন। বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে এঁরা সাধারণতঃ পুষ্পচয়ন, মশালবহন ও নগর সংকীর্তনের কাজে বা ভ্রাম্যমান গায়কের কাজে নিযুক্ত থাকেন।

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ শতাব্দীর গোড়াতেই বলেছেন, তারা চৈতন্যের অনুগামী এবং বাংলা দেশের বৈষ্ণব।

Imperial Gazetteer of India—'Mysore and Coorg' (1908) গ্রন্থে জানানো হয়েছে—"The 'satani' are the next most numerous religious sect. They are regarded as priests by the Holeya and other inferior castes…They are Votories of Vishnu, especially in the form of Krisnna, and are flower-gatherers, torch-bearers, and strolling musicians. They call themselves Vaishnavas, the Baishnabs of Bengal"- page-48.

১৫১০-১২ খ্রীস্টাব্দে ভারত ভ্রমণের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধ করতে আসতেন। সেকালের রীতিই ছিল তাই। পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌমকে 'কৃষ্ণপদাবুজবাদী' বা ভক্তিবাদী করার পর শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণে বার হলেন, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন, এটা স্বাভাবিক। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-

চরিতামৃতে মাধ্ব সম্প্রদায়ের মঠাধীশের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ববিচারের ঘটনার বর্ণনা থাকলেও অদ্বৈতবাদী কোন তাত্ত্বিকের সঙ্গে অনুরূপ বিচারের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। অথচ গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় দেন 'মাধ্বগৌড়ীয়' বলে।

দক্ষিণ ভারতে শঙ্করপন্থীদের প্রচারিত অদ্বৈতমত খণ্ডন করে শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে গোবিন্দ কবি প্রণীত 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়' কাব্যে :—

'পয়স্বিনীরোধসি বোধসাগরঃ ক্রমাদ্বিশশ্রাম চ শঙ্করাশ্রমে ॥ ২৮
স শাঙ্করীয়ৈঃ সহস্রং বদন্ মুদাতদাতদদ্বৈতমতং বিখণ্ডয়ন্।
সমাদধে ভক্তিমতং স্বযুক্তিভিস্তদীয় সূত্রার্থমপি প্রকাশয়ন্ ॥ ২৯, দশম সর্গ।

ঠিক এই কথাই আছে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণভ্রমণের সঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার প্রণীত 'করচায়'—

"শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা। সেইখানে গিয়া প্রভু করিলেন মেলা ॥
শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া। বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া ॥
বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয় ॥ [প্রথম সং, পৃ ১১৫-৬।]

শ্রীচৈতন্য সাধারণতঃ দার্শনিক বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন। যাঁরা আসতেন তর্কস্পৃহ নিয়ে, তারা কখনও তাঁর দু'একটি কথায়, কখনও তাঁর অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের দিব্যস্পর্শে বিজিত হয়ে ফিরে যেতেন। পরমতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের সামান্যতম আভাসেই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এমন এক দিব্য উন্মাদনার স্ফুরণ হত যে, তার সামনে পণ্ডিতদের পণ্ডিতাভিমান লজ্জা পেত। বিদ্যাগর্বের মূল উপড়ে ফেলে মহাপ্রভু তাঁদের হৃদয়ে উপলব্ধির বীজ বপন করতেন। পণ্ডিতাভিমানী পরিণত হত দিব্যপ্রেমের দীন ভিক্ষুকে।

এইসব পণ্ডিতদের কয়েক জনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে গোবিন্দ কর্মকারের 'করচায়'। এঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে এখনও ব্যক্তিপরিচয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব। কেননা, এঁদের রচনা-নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায়। গোবিন্দ কর্মকারের করচা-গ্রন্থটির প্রামাণিকতার এ একটা বড় প্রমাণও বটে।

'গোবিন্দ কর্মকারের করচা' অনুসারে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ঢুণ্ডিরাম তীর্থের দেখা হয়েছিল তুঙ্গাভদ্রা নদীর তীরে। করচায় আছে—

"প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী। তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি ॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলে বেদান্ত দর্শন। সর্বশাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন ॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুঁহি কিছু নাহি জানি। বারবার তোমার নিকটে হারি মানি ॥
ইতি উতি চেয়ে ঢুণ্ডি প্রভুর চরণে। লোটাইয়া পড়িলেন অতি শুদ্ধ মনে ॥
ঢুণ্ডিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হয়। কাণাকাণি পাষণ্ডেরা কত কথা কয় ॥
[করচা ২য় সং, পৃ. ২৩—২৪]

এই 'ঢুণ্ডিরাম'ই কি কৃষ্ণদেব রায়ের সভাসদ 'হরিদাস'? ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন—"হরিদাস ছিলেন বিজয়নগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভাসদ

এক বৈষ্ণব কবি। তিনি 'ইরুমময়-বিলক্কম্' নামে এক কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে তিনি শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এতে সুস্পষ্ট।" [*A History of South India*, page-347]

রূপ গোস্বামী সংকলিত 'পদ্যাবলী'র একটি শ্লোকের (১০২ সংখ্যক) রচয়িতাও এক হরিদাস। শ্লোকটিতে কবি হরিদাস বলেছেন—'স্বর্গে আমার প্রয়োজন নেই, শ্রীসম্পদেই বা কি হবে? জীবচক্র থেকে নিবৃত্তিও আমি চাই না। আমার মন হারিয়ে গেছে যমুনা পুলিনের নিকুঞ্জে, নব তমালের নীল জ্যোতির মধ্যে'।

'অলং ত্রিদিববাতয়া কিমিতি সার্বভৌমশ্রিয়া
বিদূরবর্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।
কলিন্দ-গিরিনন্দিনী-তট-নিকুঞ্জ-পুঞ্জোদরে
মনো হরতি কেবলং নবতমাল নীলং মহঃ।

এই হরিদাস, বিজয় নগরের হরিদাস এবং গোবিন্দ কর্মকার-উল্লেখিত হরিদাস (ঢুণ্ডিরাম) একই ব্যক্তি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

গোবিন্দ কর্মকার এরপর বেঙ্কটনগরের রামানন্দ স্বামীর কথা বলেছেন।

"তাবপর প্রভু মোর বেঙ্কটনগরে। উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে॥
সেইখানে ছিল এক পণ্ডিত গোঁসাই। বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই॥
বিচার করিতে চাহে পণ্ডিত প্রবর হারিলাম বলি প্রভু কবয়ে উত্তর॥
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে। বদন বিকাসি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায়॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাঁধিল। ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল॥
রামানন্দ নাম তার বড়ই পণ্ডিত। হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত॥
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া। পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া॥
[করচা, ২য় সং. পৃ. ২৮]

এই রামানন্দ স্বামী সম্ভবতঃ রামানন্দ তীর্থ স্বামী। হরিদাস দাস সংকলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' গ্রন্থে (১৬৬০ পৃ.) 'রামানন্দ তীর্থ স্বামী' সম্পর্কে বলা হয়েছে—ইনি 'প্রেমভক্তি স্তোত্র' রচয়িতা—গদ্যে পদ্যে রচিত এই সংস্কৃত গ্রন্থে ৯৪টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—"হৃষ্টচিত্তে সুন্দরী গঙ্গা যাঁর পাদপদ্মে শতদল অর্পণ করেন, সেই প্রেমবীজ বালার্ক-সদৃশ-কান্তি শ্রীচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।'

'হৃষ্টা গঙ্গোত্তমাঙ্গা ক্ষিপতি শতদলং যস্য পাদারবিন্দম্।
তং চৈতন্যাখ্যরূপং তরুণবররুচিং প্রেমবীজং ভজেহহম্॥'

এছাড়া গোবিন্দ কর্মকারের করচায় এক 'ভট্ট-ব্রাহ্মণের' কথাও বলা হয়েছে। তাঞ্জোরের সন্নিকটে শ্রীচৈতন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন—

"সেইখানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর। প্রভুরে লইয়া গেল আপনার ঘর ॥
কৃষ্ণনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল। দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে করিল ॥
হরিনামে সদা মত্ত ভট্ট মহাশয। লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয় ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে। তাহা হেরি ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে ॥"

[করচা, ২য় সং, পৃ. ৩৫]

এই 'ভট্ট' ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ 'প্রবোধানন্দ ভট্ট সরস্বতী'—বিখ্যাত গোস্বামী গোপাল ভট্টের পিতৃব্য এবং গুরু। প্রবোধানন্দ সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্য চন্দ্রামৃত' নামে স্তোত্র-বাক্য রচনা করেছিলেন। এতে বারোটি বিভাগে মোট ১৪৩টি শ্লোক আছে।

প্রবোধানন্দ লিখেছেন—"তীব্রবীর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ আমার লৌকিক আচার নিষ্ঠা বৈদিক ব্যবহার উচ্চ কীর্ত্তন, প্রহসন ও নাট্যোৎসবে আমার লজ্জা, আমার সব হরণ করে নিয়েছেন—'গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ' (চৈতন্য চন্দ্রামৃত, ৬০)।

১০৫ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন, দূর থেকে মহাপ্রভুকে দেখলেই তাঁর দিব্য-প্রভাবে বিচার মল্লদেব হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যেত।—"দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দুসংশীতলো"—কোটীচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ তাঁর আবির্ভাব—দূর থেকেই কুতর্করূপ পতঙ্গদের দগ্ধ করত।

ড. সুশীলকুমার দে তাঁর *'Studies in Bengal Vaishnavism'* গ্রন্থে লিখেছেন—'এ গ্রন্থটি (চৈতন্য চন্দ্রামৃত) বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে তেমন প্রচারিত না হলেও এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ……চৈতন্যের যুগল অবতার সম্পর্কে গ্রন্থকার সচেতন। ১৩ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন যে চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের সৌন্দর্য্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। [পৃ. ১৩৮]

প্রবোধানন্দ নামগান রত গৌরহরিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য-গর্ব প্রকাশ করে লিখেছেন—"যাঁরা গৌরকে একবারও চোখে দেখেননি, ভক্তি তাঁদের দুর্ঘট।"—গৌরো দৃষ্টঃ সকৃদপি ন যৈঃ দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ (শ্লোক-৩৮)।

১১৪ সংখ্যক শ্লোকে তিনি লিখেছেন—"গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে প্রতিটি গৃহ হরিসংকীর্তনের ধ্বনিতে পরিপূরিত"—'অভূদ্ গেহে গেহে হরি সংকীর্তনরবো।'

'বেদান্তসার' প্রণেতা সদানন্দের সঙ্গেও মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়েছিল। গোবিন্দের করচায় আছে,—'সেই তীর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয়। বড়ই পণ্ডিত তেঁহ হইল পরিচয়।'

তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দপুরী। এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল জারি জুড়ি ॥
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া। ভক্তিভরে প্রভুপদে পড়ে লোটাইয়া ॥

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে (পৃ. ৭২৪) বলা হয়েছে—

"সদানন্দের অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।" [করচা, ১ম সং, পৃ. ৩৩]

দক্ষিণভারতে বৈরাগী 'দাস' গায়কেরা তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্ ভাষায় বৈষ্ণব গীত রচনা করেছিলেন। রেভারেণ্ড ড. মোগলিং (Moegling) কানাড়ী ভাষায় এ ধরনের ৪০২ টি ধর্মীয় গীত সংগ্রহ করেন। ১৮৫৩ সালে এর ১৭৪টি গীত "দাসর পদগলু" নামে ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত হয়।

"Folk Songs of Southern India" (১৮৭১ খ্রীঃ) গ্রন্থে Charles E. Gover এই ধরনের ২৮টি গীতের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—বিয়েবাড়ী, ভোজবাড়ী, ব্রত উপবাস—শ্রাদ্ধ-শান্তি, বীজবপন, ফসলকাটা, পূর্ণিমা সংক্রান্তি—প্রতিটি উপলক্ষে 'দাস' গায়ককে ডেকে গান শোনা এবং তাকে ভেট দেওয়া ছিল অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।···দাসদের আচরণীয়—প্রথমতঃ দারিদ্র্য (আকাশবৃত্তি), দ্বিতীয়তঃ ভজন, তৃতীয়তঃ জাতিভেদ বিস্মরণ।···
দাসদের ক্ষেত্রে জাতের প্রশ্ন মোটেই উঠত না। হরিদাসদের ঘৃণা করার সাহস কারো ছিল না। [No question of caste entered into the mattter······None dared to despise the 'slave of God'—Introduction.]

গোভার অনূদিত ৪নং কবিতাটি এই জাতীয় রচনার একটি চমৎকার নিদর্শন—

If we look through all the earth,
Men, we see, have equal birth,
Made in one great brotherhood,
Equal in the sight of God.
Food or caste or place of birth,
Cannot alter human worth,
Why let caste be so supreme ?

যখন তাকাই সারা পৃথিবীর দিকে,
জন্মসূত্রে সমান ত দেখি যত নর ও নারীকে।
সহোদর শিশুদের পানে চেয়ে র'ন বিশ্বমাতা
সমান প্রসন্ন দৃষ্টি ; অন্তর্যামী আছেন বিধাতা।
খাদ্য-জাতি জন্মস্থান
মানুষের মূল্যটুকু করিতে পারে না কভু ম্লান।
তবে কেন জাতি অভিমান ? [লেখক কৃত অনুবাদ]

এই গীতটি তেলুগু ভাষায় রচিত। রচয়িতা কবি 'বেমন'। গোভার ভূমিকায় জানিয়েছেন— "বর্তমান কালের তেলুগু গবেষকদের অগ্রণী Mr. C. P. Brown-এর মতে 'বেমন' ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।' সেক্ষেত্রে বেমন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এ পদ রচনা করেছিলেন।

E. P. Rice লিখেছেন, "কানাড়ী সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগের ধর্মচিন্তা-প্রভাবিত বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।······বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের অভ্যুত্থান হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য্যের সময়। সেই ধারা মধ্বাচার্য্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চৈতন্যর সময় পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল।

(*A History of Kanarese Literature, page-12-13*)।

ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী এই অধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন—"কানাড়ী সাহিত্যে

এই প্রথম ষট্‌পদী ও ত্রিপদী এবং ধ্রুবপদ বা ধুয়াপদ যুক্ত গীতিকবিতার আবির্ভাব হল (The period forms a definite transition marked by some notable changes……new metres distinctive of Kannada like Shatpadi and Tripadi, verses with six and three lines respectively, and ragales, lyrical poems with refrains, came into vogue'—*A History of South India,* page-389)।

গোভার অনূদিত নবম পদটি কানাড়া ভাষায় রচিত একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এর শিরোনামা 'আমি কেন হাসি' (why I laugh), এর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

I. One night I saw a man
Kissing a harlot's lips,
Next morn to bathe he ran
And prayed on fingers-tips!
Chorus : Oh, how I laugh! I laugh out loud
It makes me laugh to see the Crowd,
Such tricks, they do. I oft have vowed
I'd laugh no more : with it I'm bowed

একদিন রাতে আমি দেখিলাম তারে
চুম্বিতেছে হর্ষভরে বারাঙ্গনারে;
পরদিন প্রাতে দেখি পুণ্যস্নান তরে
ধাবমান সেইজন জপমালা করে।
হো-হো-হাসি পাচ্ছে বেজায়
কাণ্ড দেখে দম রাখা দায়
ভাবছি যত হাসব না আর
দমকা হাসি পেটটা নাচায়॥ ধ্রু॥

2. A woman left her house — এক নারী ঘর ছাড়ে রাতের আঁধারে
And joined a man as mean, — গুটি গুটি চলে উপপতির আগারে
She made a thousand vows — প্রাতে তিনি করেন গো হাজারটা ব্রত,
And washed at holy stream! — পবিত্র গঙ্গায় নিত্য পুণ্যস্নান-রত!
Chorus:—Oh, how I laugh! — হো-হো-হাসি পাচ্ছে বেজায়… ॥ ধ্রু ॥

গোভার অনূদিত ষোড়শ পদটি বিদ্যাপতির 'তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম' পদটিকে মনে করিয়ে দেয়। পদটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত হল—

1. A weary and broken man — ক্লান্ত পথিক আমি ভগ্ন তনুমন
With sorrow I come to they feet — তোমার চরণতলে লইনু শরণ।
Subdued by the fate and the ban — অদৃষ্টের চক্রপিষ্ট, নয়ন আঁধার…
That hides the long future I meet… — ভবিষ্যৎ অন্ধ। হায়, সম্মুখে আঁধার

2. I counted as dearest on earth
Fair women, great wealth and wide land :
And saw not the joy and the worth
of merited grace from thy hand.

ভেবেছিনু আর কিছু নাই এ ধরায় ।
সুন্দরী রমণী-বশে কাটানু বিষয় রসে জীবন বৃথায়
তোমার আশিস পূত আনন্দ অদ্ভুত
না পাইনু হায় ॥ [লেখক কৃত অনুবাদ]

গোভার অনূদিত একটি মালয়ালম গানে দেখা যায়, কৃষ্ণের কপটতায় রাধা মান করে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে বসে আছেন, কৃষ্ণ নানারকমভাবে নিজের নিরপরাধের কথা বলে দ্বার উন্মুক্ত করার অনুরোধ করছেন। গানটি আংশিক উদ্ধৃত হল—

Radha : How many lies a God can tell
I will not open the door, for I
Can smell perfumes, can see the ash
Telling of thy sin.
Krishna : I tell you but the truth, yet you
Think me a liar. I am pained
That you should doubt me, Open then ;
Let me enter now !

রাধা : ভাবছি বসে দেবতা কতই মিথ্যা কথা কয় ।
দরজা আমি খুলছি নাকো । ভাগ্য জানি মন্দ ।
পাচ্ছি তোমার অঙ্গবাসে অন্য নারীর গন্ধ—
পাপ কি চাপা রয় ?
কৃষ্ণ : সত্যি কথাই কইছি তোমায়, তবুও তুমি হায়
ভাবছ আমায় মিথ্যাবাদী ; হায় নিঠুরা প্রিয়া
তোমার বৃথা সন্দেহটা ঘোচাই যে কী দিয়া,
কী করি উপায় ? [লেখক কৃত অনুবাদ]

গোভার তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানিয়েছেন যে, এই ধরনের গান "আজও মালাবার উপকূলে লোকের মুখে মুখে শোনা যায় এবং এ কারণে এ গুলি নিঃসন্দেহে লোকগীতি। তবে এদের ভাষা এমন পুরানো যে মনে হয় এগুলি অতীতের এক অপসৃয়মান কাব্যধারার ভগ্নাবশেষ—নিঃসন্দেহে এক শতাব্দীর আগে এগুলি আজকের তুলনায় অনেক বেশী পরিচিত ছিল। এই প্রাচীনতা সত্ত্বেও এগুলি মূলতঃ দ্রাবিড় রচনা নয়। এগুলি স্পষ্টতঃ পৌরাণিক……সম্পূর্ণ ভাগবতভিত্তিক।…এগুলি কোন বহিরাগত বিষয়ের ভাষান্তরিত ও লোক প্রচলিত রূপ…"

[They are antique in language, probably the remnants of a fading class of poetry, and are evidently less known now than they were a century ago. Not withstandihg their age, they are not Dravidian, for, as will be seen, they are purely puranic and are based altogetaer on the Bhagavatam···They are popular adaptions of a foreign theme."—page 241 ।]

আমরা অনুমান করতে পারি দ্রাবিড় দেশে এই কাব্যধারা কোথা থেকে এসেছিল; কেননা শ্রীচৈতন্য যেখানেই গেছেন সেখানেই ভাগবত পাঠে উৎসাহ দিয়েছেন। ধ্রুবপদযুক্ত গীতি কবিতার ধারাটি স্পষ্টতঃ বাংলা পদাবলীর অনুকরণ। যেহেতু দ্রাবিড় সাহিত্যে এ ধারাটি ষোড়শ শতাব্দীর সংযোজন, সুতরাং এক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কেননা চৈতন্য শুধু বৈষ্ণব ধর্মই প্রচার করেন নি, প্রচার করেছেন বৈষ্ণব সাহিত্যও—জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং 'চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি।' এই রচনাগুলি সবই ধ্রুপদযুক্ত গীতিকবিতা।

বিস্তারিত তথ্য পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন দক্ষিণী লেখকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে যে, দক্ষিণে কৃষ্ণচেতনার নবউত্থানের মূলে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কেরলের সাহিত্যে বিশেষতঃ ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতার মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি:

"This was the period when the Vaishnava poets were enriching most literatures of India with their mystic outpourings ;···there were in the north Kabir, Surdas and Tulsidas writing in the various earlier forms of Hindi. The tide of devotional literature was steadily rising in the South as well. The sojourn of Srikrishna Chaitanya—he came to Kerala also—heralded a renaissance in the cult of Krishna worship." [*History of Malayalam Literature.* P. K. Parameswaran Nair, Chap. VI. p. 64.]

অর্থাৎ—"এ কালে প্রায় সর্বভারতীয় সাহিত্যই মরমী বৈষ্ণব কবিদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। উত্তরে কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস প্রমুখ কবিরা লিখেছিলেন আদিযুগের হিন্দী ভাষায়। ভক্তিসাহিত্যের ঢেউ দক্ষিণভারতকেও প্লাবিত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এদেশে আগমনের ফলে—তিনি কেরলেও এসেছিলেন—কৃষ্ণ উপাসনার ধারায় এক নব-উত্থান সূচিত হল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই নিবিড় সংযোগ বর্তমান। এ সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে (৩ মে) পুণায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণে বলেন—

"ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্তমান যুগ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে এই দুই প্রদেশের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল। কথিত আছে যে জিহ্বা দাদা ও লক্বা দাদার মতো বিচক্ষণ সেনাপতি, নরোরাম এবং মলহাবের মতো দক্ষ প্রশাসক। যাঁরা গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, বহুদিন পূর্বে বাংলা হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন ষষ্ঠীপূজা আছে, সারস্বতদের মধ্যে তেমনি ষষ্ঠীপূজা রহিয়াছে এবং উভয় প্রদেশবাসীই দুর্গাপূজা করেন। মারাঠীদের প্রধান তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ। বাঙালীদের তেমনি তীর্থস্থান চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ। বাংলার ঋষিতুল্য রাজা গোপীচাঁদ এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর কথা বাংলাদেশের একমাত্র পুরাতত্ত্ববিদরাই বোধহয় মনে রাখিয়াছেন কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাঁহাদের কথা অনেকেই মনে রাখিয়াছেন এবং মারাঠী কবি মহীপতি বাবা জানিতেন যে তাঁহারা গৌড় বাংলা হইতেই মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন।···

লোকপরম্পরায় শোনা যায় বাংলার সন্ত চৈতন্যদেব মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন এবং সেখানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। কথিত আছে, মহীপতি যেমন মহামতি তুকারামের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তেমনি তুকারামও চৈতন্যদেব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।"

[সুভাষ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃ. ১৩৩-৩৪]

এখানে উল্লেখিত গোপীচাঁদ বা ময়নামতীর গান নাথ ধর্মকে আশ্রয় করে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাথ ধর্ম প্রভাবিত কাহিনী লোর চন্দ্রানী বা সতী ময়নার প্রচলন যে পশ্চিমভারতে যথেষ্টই ছিল, তার প্রমাণ বাংলা লোর চন্দ্রানী কাব্যের রচয়িতা কবি দৌলত কাজি নিজেই বলেছেন যে 'গুজ্রাতী গোহারী ঠেট ভাষায়' লেখা মিএগ্র সাধনের 'মৈনা কো সৎ' নামক রূপকথা থেকে তিনি এই কাহিনী সংগ্রহ করেন। গুজরাতের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মহারাষ্ট্রেও এককালে এই নাথ ধর্মের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সাধক-কবি জ্ঞানেশ্বর (১২৭১-১২৯৬) এবং ভক্তকবি নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খ্রীঃ) এই নাথ সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা অবশ্য দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম দ্বারাও প্রভাবিত হন এবং আলোয়ারদের নামসংকীর্তনের ধারাটি গ্রহণ করেন।

জ্ঞানেশ্বর মাত্র উনিশ বছর বয়সে (১২৯০ খ্রীঃ) মারাঠী ভাষায় ভগবদ্গীতার টীকা রচনা করেন। এই টীকা পরে 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে বিখ্যাত হয়। অদ্বৈততত্ত্ব ও যোগ-দর্শনের সঙ্গে ভক্তিরস মিশিয়ে জ্ঞানেশ্বর মারাঠী বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি রচনা করেন।

জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের প্রভাবে মহারাষ্ট্রে 'বারকরী' সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। বারী (বারবার যাত্রা) করী (করে যে) অর্থাৎ নিয়মিত যাত্রী। বছরে কয়েকবার পংঢরপুরের বিট্ঠলকে দর্শন করার জন্য যাত্রা করতেন বলে বৈষ্ণবভক্তদের নাম হয় 'বারকরী'। পংঢরপুরের বিট্ঠলের আর দুটি নাম বিঠোবা ও পাণ্ডুরঙ্গ।

নামদেবের গুরু ছিলেন খেচরনাথ নামে এক নাথপন্থী যোগী। নামদেব মুক্তির চেয়ে ভক্তিকে গরীয়সী মনে করতেন। বিট্ঠল নাথকে ভক্তহৃদয়ের আকুতি জানিয়ে তিনি বলেছেন—

> ন লগে বৈকুণ্ঠ না বাঞ্ছু কৈলাস।
> সর্বস্বাচী আস দেবপায়ী ॥
> ন লগে সন্ততি ন লগে ধনমান।
> পুরে এক ধ্যান বিঠোবা চেঁ ॥

'আমি বৈকুণ্ঠ চাইনা, কৈলাস চাইনা; আরাধ্য দেবতার চরণে আমার সকল আশা। আমি সন্তান চাইনা, ধনমান চাইনা, বিঠোবার ধ্যানই আমার সব কিছু।'…
নামদেবের এই পদের সঙ্গে তুলনীয় শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোক—

> 'ন ধনং ন জনং সুন্দরং বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে
> মম জন্মনি জন্মনি ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।'

'হে জগদীশ! ধনজন সুন্দরী বণিতা—কিছুই চাইনা; এই শুধু প্রার্থনা—জন্ম জন্ম ধরে তোমার প্রতি যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'

নামদেব উত্তর ভারতের সন্ত সমাজে প্রচলিত ভাষা 'সধুক্কড়ী খড়ীবোলী' আয়ত্ত করেন। বৃন্দাবনের 'ব্রজভাষা' বা 'ব্রজ্ভাখা'ও তার আয়ত্ত হয়। ফলতঃ তিনিই প্রথম 'হিন্দী ভক্তি সাহিত্যের বীজ বপন করেন।

নামদেবের পর উল্লেখযোগ্য ভক্তকবি একনাথ (১৫৩৩-৯৯ খ্রীঃ)। 'অভঙ্গ' গাথা ও ভাগবত (একাদশ স্কন্ধ) এর পদ্যে টীকা রচনা করে একনাথ বিখ্যাত হন।

মারাঠী ভক্তিসাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন তুকারাম[১]। তিনি শূদ্রঘরে জন্মেছিলেন ১৬০৮ (?) খ্রীস্টাব্দে। তাঁর জন্মগ্রাম ছিল 'ডেহু'—পুণার প্রায় ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রামটি। তুকারাম সম্পর্কে বলা হয় তুকারামের পদে মারাঠী ভক্তি সাহিত্যের মাধুর্য ধরা দিয়েছে। 'জ্ঞানেশ্বরী' বিদগ্ধজনের আস্বাদ্য, তুকারাম আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের জন্য।

---

১. তুকারামের জন্মকাল নিয়ে মতভেদ আছে। 'ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য' গ্রন্থরচয়িতা শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতে তুকারামের জন্ম ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে। নয়াদিল্লী সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত 'তুকারাম' গ্রন্থে তুকারামের জন্মকাল ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দ। Nicol Macnicolও ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দেরই উল্লেখ করেছেন।

Psalms of Maratha Saints (1919) গ্রন্থের ভূমিকায় Nicol Macnicol বলেছেন—

"মারাঠা নবজাগরণের কাল খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতক। এই সময় মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত কবি সন্তদের উদ্ভব। এই সাহিত্যিক উদ্দীপনার পিছনে ছিল ধর্মীয় জাগরণ। এই পর্বের কবিদের ভক্তিগীতি রচয়িতা বললেই ঠিক বলা হয়। তাঁদের অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনা ধর্মীয় আবেগ-উপলব্ধিকে ভিত্তি করে রচিত—এই সংক্ষিপ্ত গীতিকবিতাগুলিকে বলা হয় 'অভঙ্গ'। অভঙ্গ রচয়িতাদের অধিকাংশই ছিলেন বৈষ্ণব। বিভিন্ন বিগ্রহের উপাসক হলেও তাঁরা সকলেই ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। এঁদের অধিকাংশ ছিলেন পংঢরপুরের বিঠোবা বা বিট্ঠলের একনিষ্ঠ ভক্ত। পণ্ডিতদের মতে বিট্ঠল বা বিঠোবা বিষ্ণু শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ, কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি অভিন্ন। যুগ যুগ ধরে ভক্ত ও তীর্থযাত্রীরা পংঢরপুরে এসে বিঠোবার সামনে নতিস্তুতি করেন।

বিঠোবার মন্দিরে পুজার্চনা অন্য হিন্দু মন্দিরের মতই হয়। এখানকার বৈশিষ্ট্য হল তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কীর্তন ভজন ও ধর্মীয় আলোচনা। 'হরিদাস' উপদেষ্টা, সন্তকবি জ্ঞানদেব, একনাথ অথবা তুকারামের গান গেয়ে আলোচনাকে মধুর করে তোলেন, তীর্থযাত্রীরা ঘন্টার পর ঘন্টা অধীর আগ্রহে বসে শোনেন।······

মারাঠা ভক্তকবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হলেন তুকারাম।··একটি 'অভঙ্গে' তিনি বলেছেন, স্বপ্নের মধ্যে গুরু তাকে 'রামকৃষ্ণহরি' মন্ত্র দান করেন এবং ভগবান পাণ্ডুরঙের আশ্রয় নিতে বলেন। এই রহস্যময় গুরুকে বলা হয়েছে 'বাবাজী' —তিনি ছিলেন রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতন্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। সম্ভবতঃ এর অর্থ হল এই যে, ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব কোন সময় তুকারামের উপর পড়েছিল।[১]

চৈতন্য সম্প্রদায়ে শূদ্র ও মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বঙ্গদেশে এই মহাত্মাকে নিয়ে গান গাওয়া হয়—"তোরা দেখে যারে ভাই, হেথায় জাতের বালাই নাই।" ······মারাঠা সন্তরা ছিলেন ব্রাহ্মণ-অচ্ছুৎ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর। নামদেবের জীবনী ও রচনায় দেখা যায়, শূদ্র হিসাবে তাঁকে ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল, কিন্তু বিঠোবার করুণাই ছিল তাঁর আশ্রয়। একনাথ ছিলেন দেশস্থ ব্রাহ্মণ, প্রচারে ও আচরণে তিনি জাতিভেদবিরোধী অভিযান চালিয়ে যান। এর ফলে তাঁকে একঘরে করা হয় এবং তাঁর কবিতার পুথি ফেলে দেওয়া হয় গোদাবরীর জলে। তুকারামকেও অনুরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়।

---

১. সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত 'তুকারাম' গ্রন্থে Bhalchandra Nemade বলেছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রাঘব চৈতন্য ছিলেন গুলবর্গার রাজাদের গুরু। তিনি গিরণারে জন্মগ্রহণ করেন তারপর মহারাষ্ট্রে কিছুকাল থেকে তেলেঙ্গানায় চলে আসেন। The Chaitanyas, in the line of Babaji, were a very famous cult. It originated with Raghab Chitanya (15th century)

এই সন্তকবিরা স্থূল পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। এঁদের অধিকাংশ বিঠোবা বিগ্রহের উপাসনা করতেন, কিন্তু সাধারণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল।

তুকারাম যখন বলেন—

রক্তরাগ রঞ্জিত প্রস্তরাবতার
শিশু আর নারীদের পান নমস্কার।

তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি এবং তাঁর সতীর্থ অন্যান্য কবিরা বিঠোবার সাকার বিগ্রহের চেয়ে তার নিরাকার মহিমার দিকটিই বড় করে দেখতেন।······চতুষ্পার্শ্বে যে তামসিক পূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাঁর সঙ্গে তাঁদের কোন আপোষ ছিল না। মধ্যযুগের ইউরোপে লুথার ও ইরাসমাস (Erasmus) যেমন তদানীন্তন খ্রীষ্টীয় চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাও তেমনি খাণ্ডোবার তামসিক উপাসক সম্প্রদায়, লোভী ভিক্ষুক, শাস্ত্রধ্বজী শঠ পুরোহিত, বাজিকর—এদের সকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

তুকারাম একটি অভঙ্গে বলেছেন, যারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে জীবচক্র থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, তারা তাঁর প্রেরণায় ফিরে এসেছে জীবনের বন্ধন মেনে নিতে, কেননা এখানে আছে, নির্বিকল্প নিশ্চেতন নয়, সচেতন অনুভবের আনন্দ।

তুকারাম 'নিঃশব্দ সমুদ্রে একটি শিশিরবিন্দুর মত' নিরুপাধি ব্রহ্মে বিলীন হতে চাননি। জীবনের ব্যথাবেদনায় উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক একেই পরম লক্ষ্য বলে মনে করলেও, এ লক্ষ্যের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না তুকারামের।······

তাঁরা পারলৌকিক স্বর্গের আনন্দ চান নি। তাঁরা চেয়েছেন ঐহিক জীবনানন্দ, ভক্ত সন্তদের সান্নিধ্য এবং আরাধ্য দেবতার গুণকীর্তন। জ্ঞানেশ্বর একটি পদে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন ভক্তের কামনা। তুকারামও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে লয় সমাধিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেননা লয় মার্গে ঈশ্বরের স্তুতি-নতির আনন্দ নেই। তাই তিনি বলেছেন, 'অদ্বৈত দেয় না শান্তি······'।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে নয়, বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের অনুতীর্য ব্যবধানেও নয়, এ উভয়কে মিলিয়ে নিয়ে এবং ছাড়িয়ে গিয়েই মিলবে শান্তি।—

কেননা— যেথায় আছে একের দ্বিভেদ,
দুই পুনঃ হয় নিত্য অভেদ,
সেইখানেতে সত্য বিরাজিত।

['The period of the Maratha renaissance, during which the great poets & saints of Maharastra flourished, extends from the thirteenth to the seventeenth century. This literary revival found its impulse in a religious awakening. It is indeed appropriate to call the poets of this period psalmists, because their most charac-

teristic, certainly their most popular, work consisted of short lyrical utterances, called 'abhangs', which usually express religious longing or describe religious experience. All those whose work is represented in this volume were Vaisnavites, adherents of the Bhakti sect, whose members, while they are to be found at many different periods and in many different districts of India, and while they worshipped a variety of deities, are united in seeking to reach God by the path of Bhakti, or loving devotion. Most of these saints were at the same time, according to the tradition, ardent devotees of Vithoba of Pandharpur,…It is sufficient to say that around it and its god, Vithoba or Vithhal, whose name is believed by some scholars to be a corruption of Visnu and who is identified with Krisna, has gathered for many centuries the devotion of a great company of worshippers, who come there on pilgrimage singing songs of praise,··

The worship is that which is commonly performed in any Hindu temple. What gives it its distinctive character is the special song services, the Kirtans and bhajans that are conducted for the instruction of pilgrims, and in which their deep religious emotion finds its fullest utterance. Great numbers of pilgrims sit for hours at Pandharpur and the other village centres of the cult, listening to the exhortation of some famous preacher or Haridas, who bases his discourse upon verses from such poet-saints as Jnandev or Eknath or Tukaram. With the teaching is skilfully combined the singing of a choir. These Kirtans have a profound emotional effect upon the multitudes gathered in eager expectation at the holy place.···

But of all the Maratha bhaktas the greatest in the popular estimation, certainly the widest in the extent of his influence is Tukaram.

…In another abhang he tells us how a 'King of gurus' came to him in a dream, and giving him the mantra or sacred formula, 'Ram Krisna Hari' pointed him to 'the ship of Pandurang'. The mysterious teacher is called Babaji, and he was of the spiritual line of Raghab Caitanya and Kesav Caitanya. This may possibly indicate that Tukaram came at sometime under the influence

of teachers belonging to the Vaisnavite sect founded by Chaitanya in Bengal at the beginning of the sixteenth century.

The sect of Caitanya admitted to its ranks even Sudras and Mahammadans and they are said to sing of the saint himself in Bengal : "Come see the godman who does not believe in caste." ···The Maratha saints were of all castes, from Brahmans to out-castes. There is evidence too, both in the traditions of Namdev's life and in his verses, that as a Sudra he had to face Brahman contempt, but was sustained by the sympathy of Vithoba. Eknath, too, who lived at Paithan towards the close of the sixteenth century and was himself a Desasth Brahman, continued the struggle and opposed caste both by precept and example. As a consequenee he is said to have been out-casted and his poems publicly thrown into the river Godavori. Tukaram, as we have seen, was punished in the same way, according to the story, and he certainly had to endure much petty persecution because of his denunciation of caste exclusiveness.···

The message of these poets was opposed to a gross idolatry ; it frequently denounced immorality and superstition ; it was generally sincere and earnest and spiritual. No doubt there are qualifications that have to be added to each of these statements if we are to avoid misunderstanding. Most of these saints were worshippers of the idol, Vithoba, but they distinguished between their attitude to this God and that of the superstitious multitude.

A stone with red-lead painted o'er
Brats and women bow before.

When Tukaram says this he implies that he and those like him looked beyond ths idol-Vithotba, "standing on the brick", as he so often describes him—to something greater that the idol symbolized and signified.···They also will make no terms with the impure and degrading worships that they see around them. The evil cult of Khandoba, the greedy mendicant, the formal and hypocritical priest, the magic worker, all these they deal within much the same fashion as did Luther and Erasmus with their counterparts in the Christian church of Europe.···

Tukaram in one of his poems describes how those who had chosen the path of Brahma knowledge and looked forward to

deliverance from re-birth and to final absorption turn back under his guidance to the bondage of life, because with it they can have conscious experience. (See No LXXXVII) He does not wish to be merged in the unconsciousness of Brahman, "like the dew drop in the silent sea." This goal, that so fascinated the Brahman philosopher wearied with the sorrows of existence had no charm for him.···They do not desire even the joys of heaven Best of all it seems to them to be to remain on earth, in the fellowship of the saints, singing the praises of the god of their devotion. Jnaneswar in one passage describes such a Bhakta and his supreme desire Tukaram is no less emphatic in his rejection of a union that means unconsciousness and an end to the joy of serving and praising his divine Master: "Adviat", he says, "contents me not". [No. LVI]···

Not in the monism of Sankaracarya, nor in the dualism that is quite satisfied to remain two, but in a spiritual experience that transcends and includes both is peace to be found.

For only where the one is twain,
And where the two are one again—
Will truth no more be sought in vain"

কালবিচারে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রাক্‌চৈতন্য এবং একনাথ ও তুকারাম চৈতন্যোত্তর কালের কবি। চৈতন্যচরিতকাব্যে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্যাস গ্রহণ করে 'শঙ্করারণ্য' নাম নিয়ে পঁঢরপুরে এসে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট এই সংবাদ পান।—

'তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র। বিট্‌ঠল ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ।। ২৮২
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন। তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।। ২৮৩
মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গ-পুরী' নাম। সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিল বিশ্রাম।। ২৮৫
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল। দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে ভাসিল।। ২৯২
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান। গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম।। ২৯৪
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ-পুরী। পূর্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া নগরী।। ২৯৫
জগন্নাথমিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল। অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল।। ২৯৬
তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস। 'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স।। ২৯৯
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল। প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল।।' ৩০০
(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য/৯)

চরিতামৃতের গোড়ীয় মঠ সংস্করণ অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বলা হয়েছে—

"পাণ্ডরপুর—ভীমা নদীতীরে 'পাণ্ডুপুর' বা 'পাণ্ডরপুর' নগর। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এইস্থানে মহাপ্রভু তুকারামাচার্য্যকে হরিনাম দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন— ইহা তুকারামকৃত 'অভঙ্গে' তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে প্রদেশে মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে।" [পৃ.৪৯৬]

এ ধরনের কিংবদন্তী একেবারে অমূলক নয়। তুকারাম মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ না পেলেও সম্ভবতঃ বৈষ্ণব বাবাজীদের মাধ্যমে চৈতন্যপন্থার সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আমরা আরেকটি চৈতন্যচরিতে প্রদত্ত মহাপ্রভুর মহারাষ্ট্রে ভ্রমণ প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

গোবিন্দ কর্মকারের করচায় আছে, কাবেরীর জন্মস্থান পার হয়ে শ্রীচৈতন্য চণ্ডপুরে ঈশ্বর ভারতী নামক এক সন্ন্যাসীকে কৃপা করেন। মনে হয় মারাঠী সন্ত নামদেবের গুরুর মত ইনিও ছিলেন কানফাটা যোগী।—

চণ্ড পুরে থাকে এক বিরক্ত গোঁসাই। লোকমুখে শুনি তারে ভেটিল নিমাই ॥
পণ্ডিত গোঁসাই বটে নানা শাস্ত্র জানে। সোনার কুণ্ডল তাঁর দোলে এক কানে ॥
যোগীর হইল ভক্তি প্রভুর পরশে। মজিল তাঁহার মত কৃষ্ণ ভক্তিরসে ॥
[করচা, প্রথম সং. পৃ. ১১৮-১২১]

মহারাষ্ট্রের পুণায় এসেছিলেন মহাপ্রভু। জ্ঞানেশ্বর নামদেবের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণসঙ্গী গোবিন্দ কর্মকার এই ভ্রমণের জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

'ক্রমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আইলা। বহুত পণ্ডিত তথা আসি ঝাঁকি দিলা ॥
বহুলোক করে হেথা শাস্ত্র অধ্যয়ন। ক্রমে ক্রমে বহুলোক দিলা দরশন ॥
অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে। বসিলা নিমাই মোর গিয়া তার কাছে ॥
বিস্তৃত বকুল বৃক্ষ শোভে তদুপরি। মোর প্রভু বৈসে তার তলে আড্ডা করি ॥
শত শত পণ্ডিত বিরাজে এইখানে। রাত্রিদিন নানা শাস্ত্র পন্ডিতে বাখানে ॥ পৃ.১৩৩
গীতা আর ভাগবত যেই নাহি জানে। তাহারে পন্ডিত বলি কেহ নাহি মানে ॥
একই পন্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে। তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥
একজন ব্রহ্মবাদী পন্ডিত আইলা। তার সব তর্কবাদ প্রভু খন্ডাইলা ॥ পৃ. ১৩৫

এখানে এক ব্যক্তি কৌতুক করে বলে, 'সন্ন্যাসী তোমার কৃষ্ণ জলে লুকাইয়া'। মহাপ্রভু তখন প্রেমাবেশে কাঁদছিলেন।—

এইবারে মহাপ্রভু শুনি তার বাণী। প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন অমনি ॥
সরোবর মধ্যে পড়ি বহুতর লোক। ডাঙ্গায় প্রভুরে তুলি করে নানা শোক ॥
যেইজন বলেছিল কৃষ্ণ আছে জলে। সমস্ত পন্ডিত তারে মন্দ কথা বলে ॥' পৃ. ১৩৬

এরপর স্থানীয় এক বিপ্রের কথায় মহাপ্রভু গেলেন ভোলেশ্বরে।

তুম্বু নামে বিপ্রবর বড়ই পণ্ডিত। তাহার কথায় প্রভু হইলা বিদিত ॥
তম্বু বলে ভোলেশ্বর আছে সেইখানে। শুনিয়া চলিলা প্রভু শিব বিদ্যমানে ॥
প্রকাণ্ড মন্দির আছে পর্বত উপরে। তার মধ্যে দেখিলাম প্রভু ভোলেশ্বরে ॥
পৃ. ১৩৯

তারপর মহাপ্রভু এলেন খাণ্ডবায়। মহাপ্রভুর সঙ্গীসেবক গোবিন্দ কর্মকার লিখেছেন—

খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে। প্রভুর সহিতে যাই খাণ্ডবা দেখিতে ॥
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে। তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা প্রসাদে ॥
খাণ্ডবার কাছে কন্যা পিতামাতা আনি। খাণ্ডবারে কন্যা দেয় বহুভক্তি মানি ॥
খাণ্ডবারে পতি ভাবি কত শত নারী। ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী।
প্রতারিত হযে সবে খাণ্ডবার স্থানে। বেশ্যাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে।
খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপকর্ম করে। তাহ দেব বড়ই দুর্গতি হয় পরে ॥
তীর্থ করিবারে এথা আসে বহুজন। কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন ॥
ইহাদের ভকে দেখি ব মুরারি বলে। প্রভুর হৃদয় গলে দুর্দশা দেখিয়া ॥ পৃ. ১৪০

খাণ্ডবার এই তান্ত্রিক পাবণে কথাই বলেছেন Nicol Macnicol—'impure and degrading worships' 'the evil cult of Khandoba, the greedy mendicant, the formal and hypocritical priest' ইত্যাদি।

লোকের মুখে মহাপ্রভু 'মু, ' দের দুর্দশার কথা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। তমসাময় পল্লী আলোকিত হল তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাবে। সঙ্গী গোবিন্দ লিখেছেন—

মুরারি বলি সে স্থানে গিয়া কাঁদিতে।
না শুনিলা মানা শচী চৈতন্য গোসাঁই ॥
মুরারির পল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া ॥ পৃ. ১৪১

মহাপ্রভুর মহারাষ্ট্র ভ্রমণের প্রভাব মরাঠী সাহিত্যে পড়া স্বাভাবিক।

সন্ত একনাথ নবধা ভক্তিমার্গের প্রশস্তি গেয়েছেন। সন্ত তুকারামের নানা গীতে বা অভঙ্গে প্রেমভক্তির যে রমণীয় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যে ভাবে তিনি নামের মহিমা ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদে তাঁর আস্থা প্রকাশ করেছেন, তাতে মনে হয় তাঁর গুরু বাবাজী গোসাই চৈতন্যপন্থীই ছিলেন। সাহিত্য একাডেমী প্রকাশিত 'তুকারাম' গ্রন্থে পৃ. ২৬) তুকারামের গুরুপরম্পরা বাবাজী কেশবচৈতন্য—রাঘবচৈতন্য পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। স্পষ্টতঃ বিবরণীটি অসম্পূর্ণ।

তুকারামও যে ভাবে গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন তা কেমন রহস্যময়।

কয়েকটি অভঙ্গে তুকারাম গুরু বাবাজীর উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখস্থলগুলির ইংরাজীতে অনুবাদ দিয়েছেন Bhalchandra Nemade—

'Tuka says, my tie is broken
By the great Guru Babaji'.
'Tuka says, such was done by Babaji,
That he placed me perennially on his own seat'.

তুকারাম Otur-এ বেড়াতে গেলে ভাবাবিষ্ট হন; সেই আবেশের মধ্যে তিনি বাবাজীর আশীর্বাদ পান। তুকারাম লিখেছেন—

চৌ দেহাচে মাথা ঠেবুনিয়া হাত। উন্মনী সাক্ষাত দাখবিলী ॥
উন্মনীচো মুদ্রা চেপোনিয়া দিলে। অবধী তো ঝালী সুনীল প্রভা ॥
রক্তশ্বেত পীত নীল আণি কৃষ্ণ। রঙ্গ উমটতী নানা পরী ॥
রঙ্গ টাকোনিয়া অরঙ্গাত গেলে। নির্মল রাহিলে নিজ তেজ ॥

লেখককৃত
অনুবাদ

ললাটে রাখিলা হাত—
ভাবোল্লাসের বন্ধ দরজা খুলিল অকস্মাৎ।
দিব্যপরশে তার
উন্মনা হয়ে হেরিনু বিশ্ব নীলিমায় একাকার।
হেরিনু সারাটি বেলা
রক্তিম শ্বেত পীত নীল কালো—কত রঙ করে খেলা।
রঙের ফাগুয়া শেষ হলে দেখি অ-বর্ণ সব ঠাঁই;
চির অমলিন জ্যোতি-উদ্ভাস—আত্মার জ্যোতি তা-ই।

তুকারাম তাঁর গুরু-সম্প্রদায় সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। নেমাড়ে ও নিকল দু'রকম মত ব্যক্ত করেছেন। নেমাড়ে রাঘব চৈতন্যের গুরুপরম্পরা সম্পর্কে কোন তথ্য পান নি। নিকল বলেছেন, 'The mysterious teacher is called Babaji, and he was of the spiritual line of Rāghab Caitanya and Kesav Caitanya. This may possibly indicate that Tukaram came at some time under the influence of teachers belonging to the Vaisnavite sect founded by Caitanya in Bengal at the beginning of the sixteenth century.'

এই দ্বিমতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একনাথ ও তুকারামের কয়েকটি অভঙ্গের উদ্ধৃতি (লেখককৃত অনুবাদ) দিচ্ছি। চৈতন্যপন্থার সঙ্গে এই অভঙ্গগুলির মর্মগত সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়।—

একনাথ

(নববিধা ভক্তি নব আচরতি)

ভক্তির নবধাপথে যাঁরা অনুগামী,
তাঁদের প্রশস্তি গীত গাহিতেছি আমি।
প্রাতঃস্মরণীয় তাঁরা, সে নাম কীর্তন
সর্বত্র করিবে সর্ব পাপ বিমোচন।

ভক্তিভরে যে ভূপতি করিল শ্রবণ,
সপ্ত দিবসেই তাঁর বন্ধন মোচন।
ভক্তিভরে শুনিল সে ভগবত-কথা
শ্রবণেই ভবতাপ ঘুচিল সর্বথা।

শ্রীশুক কীর্তন মার্গে করি বিচরণ
ভগবৎ কৃপারসে হল নিমগন।
নামগান করি আহা ভক্ত প্রহ্লাদ
সত্যের লভিয়া জ্যোতি পাইল আহ্লাদ।
নামের টানেতে আহা মর্ত্যে অবতরি
দৈত্য বধ করিলেন ভগবান হরি।

বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মীপতি নারায়ণ
রমা করিলেন তাঁর চরণ বন্দন।
পাদপদ্মে শ্রীহস্তের কোমল পরশে
দ্রবময় ভগবান চিত্তের হরষে।

রাখালরাজার পদচিহ্ন দেখি ভূমে
অক্রূর লুটায়ে পড়ে, তখনি তা চুমে;
আনন্দে বিস্ময়ে আহা হয়ে নিমগন
আত্মহারা হয়ে করে প্রভুর স্তবন।

দাস্যভক্তি মারুতির—দাস আচরণ,
নম্র দীনতায় করে প্রভুর সেবন।
মাতা জানকীর সেবা করে ধন্য মানি,
চিরারাধ্য শ্রীরামের চরণ দুখানি।

তারপরে অর্জুনের লইতেছি নাম,
সখ্যরসে হইলেন যিনি আপ্তকাম।
সখারূপে ভগবান শেখালেন তায়
জীবচক্র হতে মুক্তিলাভের উপায়।

ত্রিপাদভূমির লাগি স্বয়ং শ্রীহরি
বলি-দ্বারে দাঁড়ালেন ভিক্ষাপাত্র ধরি।
দাসরূপে খাটিলেন বলির দুয়ারে—
প্রভুর মহিমা আহা কে বর্ণিতে পারে?

ভক্তির নবধা পথ দেখে সর্বজন
যে পথে বিখ্যাত নব সন্ত পুরাতন।

পরিশেষে বলি আমি,—'আত্মনিবেদন
ভক্তির চরম লক্ষ্য—প্রীতি অতুলন'।

তুকারাম

স্মরণ

(আণিক দুসরে মজ নাহী)

পাণ্ডুরঙ্গকে বরিয়াছি আমি, তিনিই আমার পতি,
স্মরণে মননে ঘুমে জাগরণে তিনিই আমার গতি।
হৃদয় আমার সদাসর্বদা তাঁরেই করে প্রণতি,
ভাবে নিমগণ তুকা বলে, 'তাঁর রূপ দেখ সম্প্রতি'

আত্মসমর্পণ

(দিলা জীব ভাব)

আমি সঁপেছি তোমার পায়ে
আমা হতে কেড়ে দিয়েছি আমায় ;
তোমারি সমুখে রয়েছি দাঁড়ায়ে
যদি কিছু বলো,—প্রতীক্ষায় ।

আমি হয়েছি যে আমি-হারা
তুমিই আঁধারে ধ্রুবতারা,
আমার আমাকে হারিয়েছি আমি
তোমারি পায় ।

'প্রেম সূত্র ডোরী'

প্রেম সূত্র ডোরে বেঁধেছে আমায় শ্রীহরি,
কায় মনোবাক্ তাঁহারি স্মরণে আচরি ।
এ জীবননাথ প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া
রেখেছে আমারে—আমি তাঁর মুখ চাহিয়া ।

তোমারি চরণে ('প্রেম-জড়লে')

প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছি তোমার শ্রীচরণ ;
বাসনাবন্ধ শান্তি সায়রে নিমগন ।
নিশিদিন মান সহস্রকাজে
তোমারেই স্মরি এ হৃদয় মাঝে
তোমার ও নামে আমারেই চিনি আমরণ,
তুকা আশ্রিত তোমারি ওপদে অনুক্ষণ ।

সবখানে তুমি ('জেথে জতো তেথে তু')

হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা সবখানে
চলিতে চলিতে হে বঁধু আমার
তোমারেই সঁপি এই দেহভার
তুমি সহজেই বয়েছ সেভার প্রেমদানে ।
কতবার হয়ে বিবশ ব্যথায়
অনুচিত কথা কয়েছি তোমায়
আমার সে লাজ ঘুচিয়েছ তুমি প্রেমদানে ।

নবীন আশায় নবীন জীবন সন্ধানে
জীবনের পথে চলে যতজন
সকলেরে ভাবি বন্ধু স্বজন
তুমিই আমারে শিখায়েছ সবে মান দানে।
আমি আজ সুখী শিশুর মতন
তোমার বিশ্বে ক্রীড়ায় মগন
তুকারাম 'নাথ, তোমার আশিস সবখানে।

নামের আনন্দ

(নামা আঠবিতা)

যেন আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে এ প্রেম আমার
তোমার নামে।
যেন নীরব সুখে মৌন হয়ে ওষ্ঠ কাঁপে
তোমার নামে।
যেন অঙ্গে অঙ্গে অথিরতার কাঁপন লাগে
তোমার নামে।
যেন অশ্রুজলের জোয়ারে মোর বুক ভেসে যায়
তোমার নামে।
যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে তনুর সায়র
তোমার নামে।
যেন দেহে আমার শিহর লাগে আনন্দময়
তোমার নামে।
যেন এ গান আমার হয় গো অশেষ অবিরত
তোমার নামে।
গাইছে তুকা মত্ত হতে সবার সেরা
তোমার নামে।
যেন সন্তগণের চরণতলে পায় গো শান্তি
তোমার নামে।

প্রেমের পথ

('ঘোট বিনা লাল')

নির্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ যে জন
তারও মনে জ্বেলে দেব বাসনা নূতন ;
মুক্ত যেই, হাসিমুখে চাহিবে বন্ধন,
ব্রহ্মানন্দ পাবে তারা শুনিয়া কীর্তন।

দেব ঋণে মুক্ত আজি, এ সুখ প্রবল—
ভক্তঋণে বাঁধা আহা ভকত বৎসল ;
কীর্তন শুনিয়া যোগী হইবে পাগল,
তীর্থ পথিকের ক্লান্তি নাশিবে বিট্‌ঠল।

জীবনের পরমার্থ এ প্রেমভকতি ;
ব্রহ্মানন্দ সহোদর আমার এ গীতি—
সকলে বলিবে, 'তুকা অক্ষয় কীরতি,
তোমার পেয়েছি মোরা সুবিমলা প্রীতি,'।

এক নয়, দুই

('অদ্বৈতী তো মাঝে নাহি সমাধান')
দ্বৈত হৃদয় না শান্তি, প্রিয় মোর
তব পদসেবা,
তোমার গানেই শান্তি, নামে মত্ত
নাচে মহাদেবা !
প্রীতম্ প্রণতি-হৃদে বাসনে
যে আনন্দ জাগে,
জগদীশ ! [illegible] তাহা [illegible],
তুকা তাই মাগে।

Ekanath

The Ninefold Path of Bhakti
(Navavidha bhakti nava acarati)

Now hearken while we sing their praise
Who follow bhakti's ninefold ways.
But name them with the rising sun,—
Thy sins are burned up everyone.

The hearing ear saved Bhupati ;
In seven days was he set free.
The mighty Bhagavat to hear
He made himself one listening ear.
Sri Suka tried the Kirtan so
He, too, was saved, as all men know.

The name was chanted by Pralhad
Till truth shone forth and made him glad.
Hari himself came down to men.
And slew the demon, Daitya, then
Rama was dear unto the Lord,
For she the feet divine adored.
Her soft hands tend with ceaseless care
Those lotus feet, so fine, so fair.
When he the cowherd's foot prints sees
Akrura falls upon his knees,
And prostrate thus he sings his praise.
Lost in a rapture of amaze.
Sita exalted Maruti,
Seeking his master lowlily,
The humble service of a slave
To Sita's lord he gladly gave.
Next Arjun, of the Lord's own Kin.
Whom to his heart he gathered in
And taught the Gita's way of peace,
To find from birth and death release.
Krisna, himself when Bali gave,—
Before his door served as a slave ;
Three paces all the land he sought,
Contented with a beggar's lot.
Now Bhakti's ninefold path behold,
By which nine saints attained of old.
Say I, to render up the soul,
Yea that is bhakti's highest goal.

Tukaram

LX. Complete Surrender
(I. P. 702. Anika dusare maja nahi)

Now. Pandurang, I've chosen for my part.
None, none but his to be.
In all my thoughts he dwells, dwells in my heart.
Sleeping and waking he

Yes, all my being's powers before him bow ;
None other faith is aught.
See, Tuka says, mine eyes behold him now,
Standing all wrapt in thought. (p. 70.)

LXXXI. Self Surrender
(I. P. 3474 Dila Jiva bhava)

My self I've rendered upto thee ;
I've cast it from me utterly.
Now here before thee, Lord, I stand,
Attentive to thy least command.
The self within me now is dead,
And thou enthroned in its stead
Yes, this I, Tuka, testify,
No longer now is "me" or "my". (p. 79.)

LXI. To Thy Dear Feet !
(I. P. 4161. Prema Jadale)

To thy dear feet my love I bind ;
No longer longing stirs my mind.
I think of thee through days and nights,
And so discharge my holy rites.
Nought know I but thy name alone ;
Thus to myself myself am known.
When comes at last the hour of death
O save me, save me, Tuka saith. (p. 70-71.)

LXII. He Leadeth Me
(I. P. 2000 Jethe Jato Tethe Tu)

Holding my hand thou leadest me,
My comrade everywhere.
As I go on and lean on thee,
My burden thou dost bear.

If, as I go, in my distress
I frantic words should say,
Thou settest right my foolishness
And tak'st my shame away.

Thus thou to me new hope dost send,
A new world bringest in ;
Now know I every man a friend
And all I meet my Kin.
So like a happy child I play
In thy dear world, O God,
And everywhere—I, Tuka say,—
Thy bless is spread abroad.

LXIII. The Joy of the Name
I. P. 818. Nama Athavita

Lord, let it be that when thy name
Into my thoughts shall come,
My love to thee shall mount like flame,
My lips with joy be dumb.
Filled are my eyes with happy tears ;
With rapture every limb ;
Yea, with thy love my frame appears
Filled to the very brim.
Thus all my body's strength I'll spend
In hymns of joyful praise ;
Thy name I'll sing nor ever end
Through all the nights and days.
Yea, Tuka says, for ever so
I'll do, for this is best,
Since at the feet of saints, I know,
Is found eternal rest. (p. 71-72.)

LXIV. Love's Captive
(I. P. 783. Premasutra dori)

Bound with cords of love I go,
By Hari captive led,
Mind and speech and body, lo,
To him surrendered.
He shall rule my life for he
Is all compassionate.
He is sole authority,
And we his will await.

LXXXVIII. The Way of Love
(I. P. 1589. Ghotavina lala)

The learned in Brahma I shall make too long
With new desire ; those ones so safe and strong,
Set free, I bring back glad to bondage. so,
They are made one with Brahma by a song.*

(* By a song, that is, by the Kirtan, the method of celebrating the praise of the God by music and singing. This is one of the chief methods of Bhakti, as followed by Tukaram, and he praises it as more effective than the way of knowledge followed by the philosopher than any other way.)

God is their debtor now, O glad release
I'll hid the weary pilgrim take his ease.
The proud ascetic may forsake his pride.
Away with offerings and charities !
By love and true devotion life's high goal
I'll help men to attain—yea, Brahma's soul,
"O, happy we, who Tuka's face have seen"—
So men will say and Tuka they 'll extol. (p. 81-2.)

LVI. Not One But Two

(I. P. 3753. Advaiti to majhe nahi samadhana)
Advait contents me not, but dear to me
The service of thy feet.
O grant me this reward ! To sing of thee
To me how sweet !
Setting us twain, lover and Lord, apart,
This joy to me display.
Grant it to Tuka Lord of all thou art
Some day, some day.

[Psalms of Matatta Saints, Nicol Machicol]

সপ্তম অধ্যায়

গুজরাতী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

পরম ভাগবত অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু বহু ভাষাবেত্তা অধ্যাপক ড তারাপুরওয়ালার কাছে গুজরাতী ভাষার পাঠগ্রহণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসু হয়েছিলাম, সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের তীর্থ পরিক্রমা ব্যপদেশে দ্বারকা গমনের কোনও ঐতিহ্য বা কিংবদন্তীর পরিচয় প্রাচীন গুজরাতী সাহিত্যে মিলে কিনা। আচার্যপাদ বলেছিলেন,—সাহিত্যে সরাসরি কোনও উল্লেখ নেই, তবে তদঞ্চলের ভক্ত স্মৃতিতে ঘটনাটি ছাপ রেখে গিয়েছিল। মহাত্মাজীর জন্ম গুজরাতের একটি বৈষ্ণব পরিবারে। মহাপ্রভুর কিছু পূর্বে, প্রায় চণ্ডীদাসের সমকালে, ভক্ত কবি নরসিং মেহতা গুজরাতী ভাষায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতা অবলম্বন করে সুললিত পদাবলী রচনা করেন। এর কিছু পরেই মীরাবাঈয়ের মধুর ভজন পদাবলীতে পশ্চিম রাজস্থানী ও গুজরাতী সাহিত্য প্লাবিত হয়েছিল।

একথা ইতিহাস-সম্মত যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় ও নির্দেশে কৃষ্ণস্মৃতির ও বৃন্দাবনের লুপ্ত মহিমার পুনরুদ্ধার ঘটেছিল।· ছ'জন বৈষ্ণবাচার্য সাধন-ভজন-সমৃদ্ধ জীবন দিয়ে বৃন্দাবন গড়ে তুলেছিলেন।·· এঁদের কারো কারো সাথে মীরাবাঈয়ের সাক্ষাৎকার ও আত্মিক যোগ ঘটেছিল, একথা মনে করবার হেতু আছে।· মোগল রাজদরবারের দৃঢ়স্তম্ভ মহারাজ মানসিংহের অন্তরেও প্রেমভক্তির ফল্গু বয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণের ব্যয় ভার মহারাজ-মানসিংহ বহন করেছিলেন, ইংরাজের লেখা মথুরার ইতিহাসে একথা পাওয়া যায়।· আমাদের মনে হয়, মহামতি আকবরের ধর্ম সমন্বয় মূলক দীন্ এলাহির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ও বৃন্দাবনীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র আবিষ্কারের ঐতিহাসিক প্রয়াসের অবকাশ রয়ে গিয়েছে।"

['মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী' গৌড়ীয় বিশেষ সংখ্যা ১৯৬৯, পৃ. ২২]

কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর *'Gujarata And Its Literature'* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে নানা তথ্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন, মীরাবাঈ ও নরসিং মেহতা উভয়েই চৈতন্যোত্তর কালের—মীরাবাঈয়ের জন্ম ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এবং নরসিং মেহতার জীবৎকাল মোটামুটি ১৫০০-১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ।

"Miranbai, the greatest poetess of Western India, was born about the year 1500." [p. 130]

"The date of Narasinha, therefore, can reasonably be placed in the sixteenth century, somewhere between 1500 and 1580. [p. 149]

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' গ্রন্থে লেখক নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা ভূমিকায় জানিয়েছেন,—"নরসিংহনা কাব্যমাঁ রাধাকৃষ্ণনী ব্রজলীলানো জে ভাগ তে চৈতন্যদেবনা সমাগমনু পরিণাম হোয়"—'নরসিংহের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার

যে কাব্যরূপ আছে, তা চৈতন্যদেবের সমাগমেরই পরিণাম'। এবং "নরসিংহ মহেতো পণ মূল প্রেরণা চৈতন্যদেব পাসেথী পায়্যো হোয়"—'নরসিংহ মহেতো কিন্তু মূল প্রেরণা চৈতন্যদেবের নিকটই পেয়েছেন' [প্রস্তাবনা, পৃ. ১৩-১৫]।

কানাইয়ালাল মুন্সী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

"বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগে বিকৃত কামাচারকে যখন নির্বাণ লাভের একমাত্র পন্থা রূপে প্রচার করা হচ্ছিল। তখন বিদ্যাচর্চার প্রাচীন কেন্দ্র নবদ্বীপে শোনা গেল ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম চণ্ডীদাসের প্রেম-গীতি। চতুর্দশ শতকের এই কবি ছিলেন পণ্ডিত, খাঁটি ব্রাহ্মণ এবং সহজিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। সহজিয়া মতাদর্শ অনুসারে সাধন সঙ্গিণী রূপে নীচজাতীয়া বিবাহিতা ধোপানী তিনি ভালবাসেন। এই প্রেমের জন্য শাস্তিভোগ করেও তিনি ওই নারীকে সম্বোধন করে তাঁর অমর প্রেমগীতি রচনা করেন। রামীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন :

'তুমি রজকিনী আমার রমণী তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রি সন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী তুমি যে গলার হারা।'

চণ্ডীদাসের কীর্তনে ধর্মের মোড়কের মধ্যে আছে তাঁর প্রেমাবেগের অমর আকুতি।

এই সব অমর গীতির সুর হৃদয়ে নিয়ে মধ্য দিনে সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী বঙ্গদেশ থেকে মথুরার নিকটবর্তী বৃন্দাবনে এলেন। এখানকার পবিত্র কুঞ্জকাননে একদা রাধার প্রতি কৃষ্ণপ্রেম উচ্ছ্বলিত হয়েছিল; ভক্তিবাদী সম্প্রদায়গুলির সবচেয়ে সক্রিয় কেন্দ্র ছিল এই বৃন্দাবন। বছর বছর পুরুষানুক্রমে ভক্তরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে তীর্থ করতে আসেন; মাধবেন্দ্রও এসেছিলেন তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের অভিলাষে। এই বিদ্বান সাধু যমুনার তীরে ঈশ্বরীয় প্রণয়লীলা-কুঞ্জে প্রেমিকা কুমারীর মত গান গেয়ে গেয়ে তাঁর প্রেমাস্পদকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, এই মন্দির হল বাঙালী ভক্তদের কেন্দ্র। ঈশ্বরপুরী প্রমুখ শিষ্যদের রেখে আনুমানিক ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

এর কিছুকাল পরে দিব্য কান্তি যুবক পণ্ডিত নিমাই নদীয়া থেকে গয়াতে পিতার পিণ্ডদান করতে এলে ঈশ্বরপুরী নিমাইকে ভক্তি পথে দীক্ষা দেন। ইতিহাসের বিশিষ্টতম প্রেমিক পুরুষদের অন্যতম নিমাই মাধবেন্দ্র পুরীর বাণী শুনে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি আকুল হয়ে বলতে থাকেন, 'বৃন্দাবনে যাব, প্রভুর দর্শন পাব'। তিনি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হন, ঈশ্বরপ্রেমাবেশে উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ চলতে থাকেন। বৈষ্ণবদের সন্ধানে তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। সন্ন্যাসের কঠোর আদর্শ পালন করেও সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী নিমাই ভগ্ন হৃদয় প্রণয়িণীর মত আবেগ মথিত কণ্ঠে তাঁর প্রেমিক প্রভুর প্রার্থনায় গীতে কালাতিপাত করেন। নিমাই (চৈতন্য বা প্রভুগৌরাঙ্গ রূপে তিনি বেশী পরিচিত) শীঘ্রই হয়ে উঠলেন ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। বৈষ্ণবধর্মে বিপ্লব আনলেন তিনি।

বৃন্দাবনকে ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে দেখতে চেয়েছিলেন চৈতন্য। আনুমানিক ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পার্ষদ লোকনাথ বৃন্দাবনের পবিত্র কুঞ্জে চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করলেন। আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে দুই মুসলমান ভদ্রলোক[১] হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং মন্দিরের ভার গ্রহণ করেন। এঁরা দু'জন-রূপ ও সনাতন—এবং তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র খ্যাতিমান জীবগোসাই[২] বৃন্দাবনকে ভক্তি ও শাস্ত্রচর্চার সজীব কেন্দ্রে পরিণত করলেন। বৃন্দাবনের এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সারাদেশে ভক্তির বান ডেকে গেল। কান্তাভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছা জাতীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়াল।

বৃন্দাবন থেকে ভক্তির এই নতুন প্রবাহ গুজরাটে এসে লাগল ষোড়শ শতকে এবং গুজরাটের দুই শ্রেষ্ঠ ভক্তকবি মীরাবাঈ ও নরসিংহ মেহ্‌তা সম্ভবত এই সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি মীরাবাই ছিলেন রাজপুতানার 'মেড়তা' জনপদের সর্দার রাও দুদাজীর পৌত্রী। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম হয়[২] এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পিতামহের প্রভাব শৈশবকাল থেকেই তাঁর উপর পড়েছিল। চিতোরের রাণা সঙ্গের পুত্র ভোজের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল কিন্তু আনুমানিক ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে ভোজরাজ মারা যান। ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠপুত্র বিক্রম চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন—চিতোর তখন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে রাণা সঙ্গের অ-সফল যুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত।

"বিধবা রাজপুত্রী সমাজসংসার ভুলে গেলেন কৃষ্ণ আরাধনায়।" [পৃ. ১২৮-৩০।

"খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে গুজরাতে ভক্তির এই নতুন প্রবাহের কবি নরসিংহ মেহ্‌তা। এক সময় তাঁর জীবৎকাল ধরা হত ১৪১৪-১৪৮০ খ্রীঃ। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে তাঁর কাল নির্ণীত হয়েছে ১৫০০-১৫৮০ খ্রীঃ" [পৃ. ১৩৬]।

"প্রাচীন গুজরাতী সাহিত্যের বিষয় যখন প্রথম জানা গেল, তখন পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন কাল ও উৎকর্ষ বিচারে নরসিংহই আদিকবি। এরাই নরসিংহের কাল ধরেছিলেন ১৪১৪-১৪৮০ খ্রীঃ। কিন্তু গুজরাতী সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, এ সাহিত্য অন্তত আরও তিনশ বছরের পুরানো।

---

১. রূপ সনাতন শ্রীজীবের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণাটদেশীয় রাজা অনিরুদ্ধ। রূপ সনাতন তাঁর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। [ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃ. ৩১৪]

সুলতান হুসেন শাহের অধীনে উচ্চপদে আসীন থাকা কালে যবন সংস্পর্শের দরুন তাঁরা নিজেদের পতিত মনে করতেন। তাঁরা মুসলমান ছিলেন না। হিন্দু ধর্ম গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। বৈষ্ণব হওয়া ও হিন্দু হওয়া এক ব্যাপার ছিল না। সেকালে অনেক মুসলমান [যেমন সাল বেগ, বিজুলি খাঁ] বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

২. মতান্তরে মীরাবাঈ ছিলেন চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী—জীবৎকাল ১৪০৩-১৪৭০ খ্রীঃ

১. যাঁরা নরসিংহের এই কাল (১৪১৪-১৪৮০ খ্রীঃ) ঠিক করেছিলেন, তাঁরা 'হারমালা' কাব্যে প্রদত্ত ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই কাব্যে আছে জুনাগড়ের রা মাণ্ডলিক (আ. ১৪৩৩-১৪৭৩ খ্রীঃ) নরসিংহের সাধুত্বের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। 'হারমালা' অবশ্য নরসিংহের পরবর্তীকালের কোন কবির রচনা। এতে উল্লেখিত কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এই কবিতা ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ নেই যে নরসিংহ ও মাণ্ডলিক সমসাময়িক ছিলেন; এবং কবিতাটিকে কোন ক্রমেই ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দের আগেকার রচনা বলা চলে না।

২. নরসিংহের প্রাচীনতম প্রামাণিক উল্লেখ পাওয়া যায় বৈষ্ণব গোস্বামী বিঠলনাথজীর পৌত্রের এক রচনায়—রচনাকাল ১৬০০ খ্রীঃ।

৩. পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের গুজরাটি কবিদের রচনায়—এই কবিরা অধিকাংশ ছিলেন ভক্ত পুরাণিক—নরসিংহের কোনই প্রভাব পড়েনি।

৪. গুজরাটে তাঁর প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ কাল ১৬২৫ এবং তাঁর নামে প্রচলিত কোন রচনাই এই তারিখের আগেকার নয়।

৫. গোবিন্দদাসের করচায় আছে গোবিন্দ এবং চৈতন্য ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের অগাস্টে জুনাগড়ের রণছোড়জীর মন্দিরে এসেছিলেন। রণছোড়জী কৃষ্ণের যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, যিনি জুনাগড়কে প্রসিদ্ধ করেছেন ভারতের ভক্তি সাহিত্যে, সেই নরসিংহের কোন উল্লেখ নেই গোবিন্দদাসের করচায়।

৬. ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৃন্দাবনের ভক্তি প্রবাহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। নরসিংহের ভক্তিবাদ বৃন্দাবনের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত।

সুতরাং যুক্তিসংগত ভাবে ষোড়শ শতকের ১৫০০ থেকে ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নরসিংহের বর্তমানকাল ধরা যায়··নরসিংহরাও দিবাতিয়া তাঁর ভাসনজী বক্তৃতায় (গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্যে) স্বীকার করেছেন যে, নরসিংহের কাল সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় সন্দেহ থাকার যুক্তি আছে এবং এই কাল পিছিয়ে আনার প্রয়োজন আছে (পৃ. ১৪৯)।"

'ভক্তমাল' দ্বাবিংশ মালায় মীরাবাঈয়ের অপূর্ব চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে গিরিধারীর আকর্ষণে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। এখানে শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গে এই মহীয়সী সাধিকার কৃষ্ণকথা হয়েছিল বলে জানা যায়। গৌড়ীয় গোস্বামিদের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল. একথা নিশ্চিত। ভক্তিরসবোধিনীতে বলা হয়েছে শ্রীজীব গোসাই পণ করেছিলেন স্ত্রীমুখ দেখবেন না, মীরাবাঈ বৃন্দাবনে এসে তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে দেন—'বৃন্দাবন আঈ জীব গোসাঈ জুসো মিলী ঝিলী তিয়া মুখ দেখি বেকো পণ লে ছুড়ায়ো হৈ' (৪৮৯ অনুচ্ছেদ)।

মীরাবাঈ একটি গৌরপদ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান প্রণেতা হরিদাস লিখেছেন—"ইঁনি গৌরপদ রচনা করিয়াছেন—তাহার বিবিধ পাঠ থাকিলেও সচরাচর যেভাবে গীত হয়, তাহা উল্লিখিত হইল—

'(সাধো) অব তো হরিনাম লো লাগী।
সব জগাকা মন মাখনচোরা নাম ধর্যো বৈরাগী ॥
মাতু জশোধা মাখন কাজে বান্ধ্যো যাকো দাম।
শ্যাম কিশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতন যাকো নাম ॥
কাঁহা ছোড়ী বো মোহন মুরলী কাঁহা ছোড়ী বো গোপী।
মুণ্ড মুড়াই ভয়ো সন্ন্যাসী মাথে নাহিন টোপী ॥
পীতাম্বরকো ভাব দিখা বৈ কটি কৌপীন কসৈ।
দাস ভক্তকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ ॥"

[গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃ. ১৩১৪]

অনুবাদঃ সাধু, এখন ত হরিনাম নিতেই হবে। সব জগতের মনরূপমাখন যিনি চুরি করেছেন, তিনি বৈরাগীনাম ধারণ করেছেন। মাখন তোলায় নিযুক্ত মা যশোদা যাকে বেঁধে রেখেছিলেন, সেই শ্যাম কিশোর হলেন নবগোরা - চৈতন্য হল তাঁর নাম। কোথায় ফেলে এলেন মোহন মুরলী, কোথায় ছেড়ে এলেন গোপীদের, কোথায় গেল মাথার মোহন চূড়া? মাথা মুড়িয়ে তিনি হলেন সন্ন্যাসী। পীতাম্বরের ভাব দেখিয়ে এখন তিনি কটিতে কৌপীন এঁটেছেন। ভক্তজনের দাসের দাসী মীরার রসনায় বসুন কৃষ্ণ।

নরসিং মেহতার রচনা উদ্ধৃত করে কানাইয়ালাল মুন্সী বলেছেন—

'শৃঙ্গারমালা' নরসিংহের ৭৪০টি পদের সংকলন গ্রন্থ। এই পদগুলিতে চৈতন্যের বিশিষ্ট মনোভঙ্গীই প্রকাশ পেয়েছে। চৈতন্য ও মীরার নিকট যেমন, নরসিংহের নিকটও তেমনই, কৃষ্ণই কান্ত, প্রণয়ী।

আধুনিক কালে এই পদগুলির একটা বিদগ্ধরুচিসম্মত অর্থ বার করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছে। বৃন্দাবনের কাহিনীনির্ভর ভক্তিসাহিত্য কবির ইন্দ্রিয়ানুরাগী কল্পনাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেকালের সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে কবি তাঁর ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের পথ খুঁজে পেলেন। পদগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে কবির আকাঙ্ক্ষা বা মন্ময় সুর (পৃ. ১৪০-৪১)।"

১. হায়, প্রিয়তম বাঁশি বাজিয়েছেন। এক মুহূর্তও আমি আর ঘরে থাকতে পারছিনা; কারণ আমি তাঁকে একটিবার দেখব বলে।

'বাঁসলড়ী বাঈ সারে বহালে, মন্দিরমাঁ ন রহেবায় রে ;
ব্যাকুল থঈনে বহালানে, জোবা শুং করুঁ উপায় রে।'

২. কানাইজীর কণ্ঠে বিলগ্ন হয়ে অধরামৃতরস পান করলাম।
'কণ্ঠে বিলাগী কহানজীনে, অধর অমৃতরস পীধোরে।'

৩. যমুনায় জল আনতে কেমন করে যাব? তার বাঁশির সুর বিঁধেছে আমাকে;
সে তার চোখ নাচায়, তার সৌন্দর্যের ফাঁদে আটকা পড়ে যাই আমি।

'কেন জাউঁ জল জমুনাঁ ভরবা, বাঁসলড়ী এ বেঁধানীরে ;
শ্যামগারী নেন নচাবে, লটকে হুঁ লোভানীরে।

৪. তার চোখ দুটির তুলনা নেই·· ও চোখে জাদু আছে ; ভালবাসায় মোহিত করেছে ও চোখ। ঘরে যাই কেমন করে ? সে যে আমার মন চুরি করেছে।

'লোচন মাঁহে কামন ভরীয়ু, তে তো হুঁ নেহশুঁ করীয়ুঁ রে ;
কেন মন্দির জাউঁ মারী সজনী, মারুঁ মন এণে হরীয়ুঁ রে।

৫. সত্য করে বলো, শামালিয়া, কোথায় গিয়েছিলে তুমি। সম্প্রতি নতুন কোন নারীতে আকৃষ্ট হয়েছ তুমি, আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ভুলে গেছ। আমি যে তোমার জন্য মরে যাচ্ছি ; কোথায় খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে।

'সাচুঁ বোলো শামলিয়া বহালা, কহোনে ক্যাগয়া' তারে ;
হমণাঁ কেত উভায়ুঁ হরে, পেলী নবল নরেশুঁ মন মোথুঁরে,
তমো বিনা অমে জাসি মরিয়ে, ঢোল তমারুঁ জোয়ুঁরে'।

৬. আমার নাথ আমার সঙ্গে কথা বলছেন না ; তাঁর কথা না শুনে আমি মরে যাচ্ছি। ······ তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করেছি। কিন্তু এখন কি করি ?

'মারো নাথ ন বোলে বোল, অবোলা মরিয়ে রে ;
হুঁ কাম করী কেতুঁ বিয়োগ, হবে শুঁ করিয়ে রে।

কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে গোপী চাঁদকে বলে।

৭. দীপ শিখার মত কেঁপো না তুমি। চাঁদ, স্থির হও একটিবার। আমার প্রিয়তম আজ রাতে এসেছেন আমার কাছে ; সব লজ্জা আজ ঘুচে গেছে তোমার জ্যোতি ম্লান না হয়। দেখ, প্রিয়তম হাসছেন আমার পানে চেয়ে · আমার প্রাণের প্রাণ আজ আমার সঙ্গে মিলেছেন।'

'দীপকড়ো লইনা সারে চাঁদলিয়া
স্থির থঈ রহেজে আজ ;
বহালোজী বিলসো হুঁ সাথে গোপী সঘলী লাজ··
রখে জ্যোত তুঁ ঝাঁখী করতী পীউড়ে মাঁডয়ুঁ হাস্য···
প্রাণনো প্রাণ তে আজ মুজনে মল্যা।

'রাসসহস্রপদী' বর্তমানে শিথিলবদ্ধ ১২৩টি পদের কাব্য—মূলতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। রাসক্রীড়ার উপযুক্ত বেশভূষায় গোপীদের বর্ণনা দিয়ে কাব্যের সূচনা। ভাবানুগ কবি-ভাষায় একের পর এক বর্ণিত হয়েছে মিলনাকুতি নিয়ে গোপীদের কান্তের নিকট ছুটে যাওয়া, প্রতি গোপীর ব্যাকুলতা ও রাসনৃত্য। ভণিতায় কবি বলেছেন, রাসে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন মশালবাহী রূপে এবং তিনি 'মঞ্জরী'তে পরিণত হলেন।···

৮. 'থৈই ,থৈই' করতে লাগল অগণিত অঙ্গনা, প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে শোভা পেতে লাগলেন কাহ্ন ; ঝাঁঝর, নূপুর কটিকিঙ্কিনী ও মৃদঙ্গের ঐকতানে নাচতে লাগলেন সেই পরম প্রেমিক। সেই সুরসপ্তকের ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ। বাহু দ্বারা পরস্পর কণ্ঠবেষ্টন করে, নাথকে বক্ষে ধারণ করে মনোরম ভঙ্গীতে নৃত্য করতে লাগল গোপীরা।

> থৈই থৈই করে অগণিত অঙ্গনা, গোপী গোপী প্রত্যে সোহে কান ;
> ঝাঁঝর নেপুর কটি তণো কিঙ্কণী, তাল মৃদঙ্গ রাগ একতান।
> নাচতী নাচতী, হেজ চন্দে ভরো, সমস্বর ধ্বনতে গগন চালী ;
> লটকে লেলো করে, নাথনে উর ধরে পরস্পর বাঁহেড়ী কণ্ঠ ঘালী।

৯ কি হবে স্নানে পূজায় ? ঘরে বসে দান করলেই বা কি হবে ? কি হবে ষড়দর্শন পড়ে ? কি হবে বর্ণভেদে ? এগুলো সব পেট ভরাবার কৌশল মাত্র। নরসিংহ বলে, 'যে লোক অন্তর্যামী পরম ব্রহ্মকে জানে না, যার তত্ত্বদর্শন হয়নি, চিন্তামণি সদৃশ মূল্যবান এ জীবন তার ব্যর্থ'।

> শূঁ থয়ূঁ স্নান সেবা নে পূজা থকী ? শূঁ থয়ূঁ ঘের রহী দান দীধে ?
> শূঁ থয়ূঁ ষটদর্শন সেবা থকী ? শূঁ থয়ূঁ বরণ না ভেদ আণে
> এ ছে পরপংচ সহু পেট ভরবা তণা আত্মারাম পরিব্রহ্ম ন জোয়ো ;
> ভণে নরসৈয়ো তত্ত্বদর্শন বিনা রত্ন চিংতামণি জন্ম খোয়ো।

১০ বৈষ্ণবজন তো তেনে কহীএ, জে পীড় পরাই জাণে রে ;
> পরদুঃখে উপকার করে তো, মন অভিমান ন আণে রে।
> সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে, নিন্দা তে ন করে কেনী রে ;
> বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জননী তেণী রে।
> সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাতরে ;
> জীহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাথ রে।
> মোহমায়া ব্যাপে নহি তেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে;
> রামনামসূঁ তালী রে লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে।
> বণলোভী নে কপট রহিত ছে, কামক্রোধনে নিবার্যা রে,
> ভণে নরসৈঁয়ো তেনূঁ দরশন করতাঁ, কুল ইকোতের তার্যা রে।

তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি অপরের পীড়াকে নিজের পীড়া বলে জানেন, দুঃখীজনের উপকার করেন, মনে অভিমান আনেন না। তিনি সকলের বন্দনা করেন, কারো নিন্দা করেন না। তিনি কায়মনোবাক্যে স্থির থাকেন। এমন সন্তানের মা ধন্য। তিনি সমদর্শী, বিষয়বাসনা মুক্ত, পরস্ত্রীকে জানেন মা বলে। তাঁর জিহ্বা কখনও অসত্য উচ্চারণ করে না, তিনি পরধন স্পর্শ করেন না। মোহমায়া তাঁকে অভিভূত করতে পারে না, তাঁর মনে আছে দৃঢ় বৈরাগ্য। রাম নামে তাঁর আনন্দ, তাঁর দেহেই আছে সবতীর্থ।

তিনি নির্লোভ, অকপট, তাঁর কাম-ক্রোধ নিবারিত। নরসৈয়া বলে, এমন মানুষকে চোখে দেখলেও একাত্তর পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়।

["In the fourteenth century, Navadvipa (Nadia), the ancient centre of learning in Bengal where later Budhist monks had preached un chaste love as the only avenue leading to Nirvana, rang with the passionate love-songs of one of the greatest Indian poets, Candidasa. This learned and pure Brahmana belonged to the Sahajia sect. Following its tenets, which required a seeker after salvation to love a low caste married woman, he had given his heart to a washer woman, Rami. Candidasa was persecuted for this love, but for the sake of the woman to whom he addressed his immortal love-songs, he endured every form of persecution "You are religion You are my parents. You are my three fold worship. You are the Vedas, Gayatri. You are the goddess of speech, Sarasvati, and Parvati," thus,he expressed his yearning for Rami. He composed Kirtanas, ostensibly religious, which told only the tale of his undying passion.

With these lyrics eternally ringing in his ears, Madhavendrapuri, a sanyasin from Bengal and a disciple of Madhva, came to Vrindavana near Mathura. The sacred groves, where once Krishna had made love to Radha, were the most active centres of the bhakti cults. The bhaktas, the teachers, and thousands of devotees came there every year from all parts of India, generation after generation, and so also came there Madhavendra to meet his lover, Sri Krishna. On the banks of the Yamuna, in the groves hallowed by divine romance, the learned sadhu wandered like a maiden in love, singing songs, seeking his Love. This bhakta founded there a temple which attracted Bengali bhaktas. He died in c. 1485 having a number of disciples including Isvarpuri.

A few years later Isvarpuri initiated into the mysteries of bhakti Nimai, a young, brilliant, strong-headed Pandita from Nadia who had come to Gaya to perform his father's obsequies. Nimai, one of the most notable lovers in history, heard Madhavendra's gospel and straightway fell in love with Sri Krishna. "Leave me", he said, "I am not of the world. I will go to Vrindavana and meet my Lord."

He gave up the world to become a Sanyasin, and went about like one mad, calling upon his Lord, He wandered all over India in search of Vaishnavas. A stern ascetic and a profound scholar, he prayed and sang to his Lover, quivering with emotion like a heart-broken girl. Nimai, better known as Caitanya or Lord Gauranga, soon became the living embodiment of bhakti. He revolutionised Vaishnanism. (P. 128-29)

Caitanya longed to see Vrindavana become the centre of the bhakti cult. In C. 1510 Lokanatha, his follower, founded the head quarters of the Caitanya sect in the holy grave. In C. 1516 two Mahomedan noblemen became converts to Hinduism, accepted him as their teacher, and took charge of the temple. These two Rupa and Sanatana, and their more eminent nephew, Jiva Gosain, made Vrindavana a living centre of bhakti and learning. Under the influence of the Vrindavana school, bhakti flooded the country. To love Sri Krishna with the undying passion of a bride became a national religion.

The new bhakti impulse from Vrindavana spread in Gujarata in the sixteenth century, and, perhaps, the two greatest bhakti poets of Gujrata, Miranbai and Narasinha Mehta, were influenced by the sadhus and bhaktas of this sect.

Miranbai, the greatest poets of western India, was a grand-daughter of Rao Dudaji chief of Medta, a small principality in Rajputana. She was born about the year 1500, and her grand-father, a devoted Vaisnava, influenced her mind from her earliest years. She was married to Bhojaraja, the son of Rana Sangha of Citoda but he died in C. 1517. In 1532, Sangha's younger son, Vikrama, came to the throne of Citoda, then suffering from the after-effects of Sangha's unsuccessful war with Babar, the founder of the Mogul Empire.

The widowed princess forgot the world in the worship of Krishna." (P. 128-30)

"In the sixteenth century, Narasinha Mehta voices the new impulse of bhakti in Gujrata. At one time his date was taken as fixed

between 1414 and 1480. Results of recent investigations point to his being placed between 1500 and 1580." (P. 136)

Note A. The Age of Narasingha Mehta :

"When the knowledge of early Gujarati literature first began to be acquired, some scholars conferred upon Narasinha the honour of being the first poet both in date and merit. As will appear from the text the literature had its beginning at least three centuries prior to the date, 1414-1480, :entatively fixed for Narasinha by these scholars. (1) This date was chiefly based upon the year 1512 (A. V.) given in Haramala, a poem attributed to Narasinha as the date when Ra Mendalika of Junagadha (C. 1433-1473) put his sainthood to test. Haramala, however, is not composed by Narasinha himself, but is the work of some later poet ; the legend apart from its intrinsic improbablity has no historic basis ; and the belief that Narasinha and Mandalike were contemporaries has nothing in its support excepet the poem itself, the existence of which cannot be traced beyond C. 1650. (2) Further, the earliest authentic reference to Narasinha himself is in a work of the grandson of the Vaishnava Goswami Vithalnathji, composed about 1600. (3) The Gujarati poets of the fifteenth and the sixteenth century, most of whom were bhaktas or puranikas had no knowledge of him, and do not bear any trace of his influence. (4) The first reliable reference to him in Gujarata itself is in 1652; and the available manuscript of none of his alleged works can be placed before that. (5) Govindadasa's diary of his and Caitanya's visit in August 1511 to a temple of Ranachodji, at Junagadha, is silent about this greatest bhakta of Krishna as Ranachodji, who made Janagadh itsalf famous amongst the bhakti cults of India. (6) The bhakti of Narasinha bears traces of the Vrndavana school which spread over the country about 1500. The date of Narasinha, therefore, can reasonably be placed in the sixteenth century, somewhere between 1500 end 1580.···Narasinhrao Divatia in his Vassonji Lectures, Gujarati Language and Literature, ···has admitted the validity of the doubt as to the orthodox date and the necessity of bringing it later." (p. 149)

"The bulk of his works consists of padas, about seven hundred and forty in number, collected under the name of Srngaramala, the Rosary of Love. They are the expression of the Caitanya attitude of mind. To Narasinha, as to Caitanya and Miran, Krshna was the living bridegroom. (p. 140)

Modern prudery has tried in vain to find an esoteric meaning in the padas. The voluptuous imagination of the poet had been set on fire by the sex-tinged bhakti of Vrindavana ; and it expressed itself in a poetic form sanctioned by the literary tradition of the age and acceptable to the religious sentiments of the author. The padas are subjective in their tone. (p. 141)

Rasa sahasrapadi, as it stands at present, is a loosely woven poem of about one hundred and twenty three padas. But the original must have been a free rendering of chapters 29-33 of the Bhagavata Canto X. The poem begins by describing the gopis as they came dressed up for the rasa. In words well-tuned to the idea, the poet first describes the jingling anklets of the cowherdesses as theyrun out to meet their lover, and then, in verse after verse, the longing of each gopi. The rasa begins. The padas grow more picturesque, now describing the rasa, now depicting the condition of some gopi. The poet exclaims, as he describes his own part in the rasa :

The torch-bearer, Narasinha was Hari's torch-bearer ; and his manhood disappeared...."

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে' 'পরিশিষ্ট ঘ' অংশে পূজ্যপাদ হরিদাস দাস আর একটি গৌরপদ উদ্ধৃত করেছেন, পদটির ভাষা গুজরাতী, কবির নাম মধুসূদন।—

গৌরহরি রূপ ছে মদন সমান ;
চন্দন দিব্য, দিব্যমালা কণ্ঠ, দিব্য বসন পরিধান—গৌরহরি।
দিব্য গৌর অঙ্গনী দ্যুতি আগল, ক্যাঁ ছে কনকনী শোভা ;
অনুপম শ্রীমুখ জোতাং জাণে পূর্ণ শশীনু মনমোহা—গৌরহরি।
লাবানে রক্তনয়নযুগ শোভে, জীত্যো কমলদল সার ;
আজানুলম্বী ভুজ সুকণ্ঠ ছে, বিস্তৃত হৃদয় নিদ্ধার—গৌরহরি।
যজ্ঞসূত্র ত্যাঁ জীর্ণু সোহে, শুভ্র সুরধুনী থায় ;
মধুসূদন এ ছবিনে নিরখী, তনমন বারী জায়—গৌরহরি।

লেখককৃত অনুবাদ

গৌরহরি—রূপ মদন সমান ;
ভালে চন্দন, মালা গলে আর দিব্য বসন পরিধান—গৌরহরি।
দিব্য গৌর অঙ্গের দ্যুতি জিনিয়া কনকশোভা,
শ্রীমুখের জ্যোতি পূর্ণ শশীর জানি হয় মনলোভা—গৌরহরি।
আরক্ত দুই নয়ন জিনেছে রক্তকমল দল,
আজানুলম্বী বাহু, সুকণ্ঠ, বক্ষও সুবিশাল—গৌরহরি।
যজ্ঞসূত্র সেখানে শোভিছে শ্বেত সুরধুনী প্রায় ;
এ ছবি নিরখি মধুসূদনের তনুমন মূরছায়।

গুজরাতী ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ 'প্রেমাবতার চৈতন্যদেব' সম্বত ১৯৮৫ অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে মুম্বাই বা বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। লেখক নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা, প্রকাশক—গৌরাঙ্গ সাহিত্য প্রকাশন সমিতির 'মন্ত্রী' সাধু গৌরাঙ্গ দাস। প্রচ্ছদলিপিতে উদ্ধৃত হয়েছে 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'। মুরলীধর কৃষ্ণের চিত্রের পাদদেশে দুটি বন্দনা শ্লোক দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে। একটি শ্লোক রূপগোস্বামী প্রণীত—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

অপর শ্লোকটি বাসুদেব সার্বভৌম রচিত—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

গ্রন্থের প্রস্তাবনায় চৈতন্যদেব ও নরসিংহ মহেতা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—"চৈতন্যদেব খ্রীস্টাব্দ ১৫১০ এবং ১৫১২-র মধ্যে ভারত পর্যটনে বার হয়েছিলেন এবং গুজরাতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে এসেছিলেন—তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি যেখানে যেতেন সেখানকার সাধু সন্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করতেন। কোন কোন সন্তের নিবাস তাঁর নিজের চলার পথ থেকে দূরবর্তী হলেও রাস্তা বদলে চৈতন্যদেব তাঁদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকতেন না। গুজরাতের ভক্ত শিরোমণি নরসিংহের সঙ্গে সম্ভবতঃ তিনি মিলিত হয়েছিলেন। উভয়ের দৃষ্টি ভঙ্গীতে যে সামঞ্জস্য আছে তা থেকে এ অনুমান সঙ্গত। নরসিংহের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার যে পদগুলি আছে, তা চৈতন্যদেবের সমাগমের পরিণাম—একথা মানবার কতকগুলি কারণ আছে। নরসিংহ ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে শৃঙ্গার রসযুক্ত প্রেম ভক্তির প্রবাহ প্রায় অদৃশ্য।

কেবল রামে তাদের অনুরাগ। শৃঙ্গার রস প্রধান কবিতাগুলির মূল ভাব গুজরাতের বাইরের প্রদেশ থেকে এসেছে কিনা তা বিচার্য।

রাধাকৃষ্ণের উপাসনা এবং পরকীয়া শৃঙ্গার রসকে অবলম্বন করে যে ভজনপদ্ধতি তার একমাত্র প্রবোধক চৈতন্যদেব। বল্লভ সম্প্রদায়ে পরবর্তীকালে যে শৃঙ্গাররসের ধারা প্রবাহিত, তা ব্রজভাখা (ব্রজভাষা) থেকে এসেছে একথা মানতে হবে। তাঁর বংশধর এবং ব্রজবাসী বিট্‌ঠল নাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল চৈতন্য সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের সঙ্গে।

বল্লভাচার্যের স্বর্গবাসের পর বিঠ্‌ঠলনাথ ও গোকুলনাথের সময়ে শৃঙ্গার রসের তত্ত্ব চৈতন্য সম্প্রদায় থেকে বল্লভ সম্প্রদায়ে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি বস্তুস্থিত লক্ষণে অনুমান করা যায়; নরসিংহ মহেতা বিত্ত মূল প্রেরণা পেয়েছেন খোদ চৈতন্যদেবের নিকটেই।

নরসিংহ মহেতার কাল চৈতন্যদেব থেকে একশ 'বছর আগে কি একশ' বছর পরে, সে প্রশ্ন গুজরাতের সুধীবর্গের বিচারের জন্য এখানে উপস্থিত করছি।"

"চৈতন্যদেব অনে নরসিংহ মহেতা

চৈতন্যদেব খৃঃ স. ১৫১০ অনে ১৫১২ না গাভামাঁ ভারতনে প্রবাসে নীকল্যা হতা অনে গুজরাতনা কেটলাক ভাগোমাঁ যাত্রা হতায়োবা স্পষ্ট উল্লেখ ছে। তেয়ো জয়াঁ জতা ত্যাঁনা সংত সাধুয়োনে ভগবানো তেমনো স্বভাব হতো। কোই সংতনো নিবাস পোতানা মার্গথী দূর হোয়তো রস্তো বধলীনে পণ চৈতন্যদেব তেনে মল্যা বগর রহেতা নহি। গুজরাত না ভক্তশিরোমণি নরসিংহ মহেতানে তে মল্যা হোয়য়োবা সংভব ছে। য়ো যেওনী বিচারশ্রেণীমাঁ জে গাম্য ছে তেনাহী আ অনুমান বধারে সমগ থায় ছে। নরসিংহনা কাব্যমাঁ রাধাকৃষ্ণনী ব্রজলীলানো জে ভাগ ছে তে চৈতন্যদেবনা সমাগমনুং পরিণাম হেয়ে য়েম মানবানাঁ কেটলাক কারণ ছে।

নরসিংহনী পধীনা কবিয়োমাঁ শৃঙ্গাররসযুক্ত প্রেমভক্তিনো প্রবাহ লগভগ অদৃশ্য থই গয়োলো দেচায় ছে। মাত্র য়ো রামমাঁ তে পাছো দর্শন দে ছে। যো থোড় কবিয়োনা শৃঙ্গার রস প্রধান কবিতায়োনাঁ মূল গুজরাতনী বহারনা প্রদেশ মাঁ হোবাঁ জোধয়ো য়েম মানবনাঁ কারণো বিচারীয়ো।

রাধাকৃষ্ণনী উপাসনা অনে তেমাঁ পরকীয় শৃঙ্গার রসনুং অবলম্বন করবাণী ভজন পদ্ধতি না একমাত্র প্রবোধক চৈতন্যদেব। বল্লভ সংপ্রদায়নাঁ পাছলথী শৃঙ্গার রসনুং জে বহেণ ধয়েল থনুহে তে ব্রজভাখা আবহ্যা হোয় য়েম সারু মানবুছে। য়োমনা বংশজো অনে তেমা বাস করনারে বিঠ্‌ঠলনাথ চৈতন্য সংপ্রদায়না গোস্বামীয়োনা গাঢ় পরিচয়মাঁ আব্যা হতা। বল্লভাচার্যনা স্বর্গবাস পছী বিঠ্‌ঠলনাথ অনে গোকুলনাথনা সময়মাঁ শৃঙ্গার রসনুং তত্ত্ব বল্লভ সম্প্রদায়মাঁ প্রবিষ্ট থয়েলুং জো বা মাঁ আবে হে, তে চৈতন্য সংপ্রদায় সাথে না সংপর্কনুং কক্ষ হোই শকে আয়ধাঁ বস্তুস্থিতিলক্ষমাঁ লেতাঁ যোবুং অনুমান করী শকায় কে নরসিংহ মহেতো পণ মূল প্রেরণা চৈতন্যদেব পাসেথী পায়্যো হোয়। নরসিংহ মহেতানে চৈতন্যদেবথী লগভগ এক সৈকু পহেলানো মানবা

করতাঁ তেনো জন্মকাল এক সৈকঃ আগল অসেবানঃ বাজবী ছে কে নহি তেনো গুজরাতনা বিদ্বানো বিচারি করে যো বা হেতু থী এ প্রশ্ননী চর্চা অত্র উপস্থিত করীছে।"

[প্রস্তাবনা, পৃ. ১৩-১৫]

এই গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' ও গোবিন্দ কর্মকারের 'করচা'কে অবলম্বন করা হয়েছে এবং সমগ্র জীবন কাহিনীকে ৩৫টি প্রকরণে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভুর গুজরাট ভ্রমণ প্রসঙ্গে নর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা লিখেছেন—"শ্রীরঙ্গম থেকে মহাপ্রভু পণ্ঢরপুর গেলেন। সেখান থেকে নাসিক ও অন্য কিছু কিছু স্থলে ভ্রমণ করে তাপী ও নর্মদানদীর কিনার বরাবর প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ আছে।"—"শ্রীরঙ্গসথী মহাপ্রভু পণ্ঢরপুর গয়া। ত্যাঁ থী নাসিক অনে বীজা স্থলো মাঁ করতা করতা ছেক তাপী অনে নর্মদানা কিনারা সুধী আবী গয়োলায়োবো উল্লেখ ছে"।

তিনি আরও লিখেছেন, "দাক্ষিণাত্য প্রদেশ থেকে তিনি নিজে দুখানি অমূল্য পুস্তক খুব যত্ন করে নিয়ে এসেছিলেন। এক, বিল্বমঙ্গল রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত" এবং দুই, 'ব্রহ্মসংহিতা'। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে যে দার্শনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, তার ভিত্তি এই দুই গ্রন্থ।"—"দাক্ষিণাত্য প্রদেশোমাঁথা তেয়ো পোতানী সাথে যে অমূল্য পুস্তকো খুব যতন করিনে লেতা আব্যা। এক বিল্বমংগলনু রচেলুঁ 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' অনে বীজুঁ 'ব্রহ্মসংহিতা' মহাপ্রভুনা সংপ্রদায়মে লগতুঁজে দার্শনিক সাহিত্য পেদা থয়ুঁছে তেনী ভীত্তিআ বেউ পুস্তকো উপর রচায়েলী ছে।"

প্রায় প্রতিটি প্রকরণেই লেখক বাঙালী পদকর্তা ও চৈতন্যপার্ষদদের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বাংলাভাষায় ও গুজরাতী হরফে উদ্ধৃত করেছেন এবং পাদটীকায় প্রতিটি পদের গুজরাতী অনুবাদ দিয়েছেন। এরকম কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত হল।—

প্রথম প্রকরণের উদ্ধৃত পদ—

রাগ—জয়জয়ন্তী

"শ্রীচৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার
উঠিল পরম মংগল রে ;
সকল তাপ হর শ্রীমুখ সুংদর
দেখিয়া হোইলো বিভোর রে।
অনংত ব্রহ্মা শিব চাহি জত দেব
সভাঈ নররূপ ধরি রে ;
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারে রে। [বৃন্দাবনদাস।]

দ্বিতীয় প্রকরণ

গোরা নাচে শচী দুলালিয়া,
চৌদিঠে বালক মেলি, সবে দেই করতালি,
হরিবোল হরিবোল বোলিয়া। [বাসুদেব ঘোষ।]

চতুর্থ প্রকরণ রাগ-কল্যাণ

অমৃত মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
নাহাতে গড়িলো গোরা দেহ ;
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিংগাড়িল গো ইত্যাদি [লোচনদাস]

রাগ—পটমংজরী

জখন দেখিনু গোরা চাংদে
তখন পড়লু প্রেমফাঁদে,
তনুমন তাহারে সঁপিলু ;
কুল ভয়ে তিলাংজলি দিলু,
গোরা বিনু না রহে জীবন,
গৌরাংগ হোইলো প্রাণধন। [বাসুদেব ঘোষ।]

পঞ্চম প্রকরণ : রাগ—ধন্যাশ্রী

জাগত যামিনী জনু ব্রজ-কামিনী
নব নব ভাবে বিভোর ;
কাংচন বরণ ভেলো পুন বিবরণ
গদ গদ হরি বোল,
স্তংভ কংপ আর অংগে পুলক ভরু
উতপত সকল শরীর ;
ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী
নয়নহি বহ ঘন নীর।
রাধামোহন।

'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থের 'অনুক্রমণিকা' এখানে উদ্ধৃত হল। এ থেকে সামগ্রিক গ্রন্থটি সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। বাহুল্যবোধে এর অনুবাদ দেওয়া হল না।—

প্রকরণ ১। অলৌকিক বালক : মহাপ্রভু কোণ? অদ্বৈত আচার্যনী তপশ্চর্যা—বঙ্গালানী ধার্মিক পরিস্থিতি—বিশ্বরূপনো জন্ম—শচীনা গর্ভনু স্তবন করবা আবতা দেবতায়ো—মহাপ্রভুনো জন্মোৎসব দেবতায়োনী মঙ্গল বাণী। [পৃ. ৩—৭]

প্রকরণ ২। বালক নিমাই : বালপণ মাঁথা—হরিনাম উপর প্রীতি—চোরনো উদ্ধার—মহাপ্রভুনু নৃত্য—নৃত্যনী অলৌকিক আসর- চাত্রালুনে থয়েলু গোপালন দর্শন—মহাপ্রভুনী মস্তী অনে বালহঠ—'কোণী পুজা করু'?—মুরারি গুপ্তনে উপদেশ।

প্রকরণ ৩। নিমাই পংডিত : বিশ্বরূপনো গৃহত্যাগ—জগন્નાথની મનઃ કામના—મહાપ્રભુનો યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર તેમનું તે વરતનું તેજસ્વી સ્વરૂપ—જગન્નાથનો નવદ્વીપની વિદ્યાપીઠ—મહાપ્રભુનો બુદ્ધિ વૈભવ—ન્યાયનો હસ્તલિખિત ગ્રન્થ ગંગામાં પહેલીવારનું લગ્ન—વ્યાકરણની પાઠશાળાની સ્થાપના—દિગ્વિજયી પંડિતનો પરાજય—મહાપ્રભુનો સ্বভাব—ধর্মতরক তেমনী উদাসীনতা। [পৃ. ১০-১৫]

প্রকরণ ৪। গয়ানী যাত্রায়ো : মহাপ্রভুনং সৌন্দর্য—পূর্ব বঙ্গালানো প্রবাস—পত্নীনো স্বর্গবাস—তপন মিশ্রনে উপদেশ—গাঁউপণনো ব্যাধি- বিষ্ণুপ্রিয়া সাথে লগ্ন গয়া জবানী তৈয়ারী—বিষ্ণুনাঁ চরণচিহ্ন- মহাপ্রভুনো প্রেমোদ্গম—ঈশ্বরপুরী পাসে মংত্রদীক্ষা। [১৫-১৯]

প্রকরণ ৫। মহাপ্রভু ভক্ত বন্যা : কৃষ্ণনী গূঢ় অভিলাষা—মহাপ্রভুমাঁ থয়োলুং অদ্ভুত পরিবর্তন দীনতানী মূর্তি—কৃষ্ণ ক্যাঁ হশো ?—পাঠশালা বংধ করী—তীব্র কৃষ্ণ বিরহ—বৈষ্ণব সমাজনং নিমংত্রণ—কীর্তননো প্রারংভ—মহাপ্রভুনং অলৌকিক নৃত্য—কৃষ্ণপ্রেমনং দান—মহাপ্রভুনা অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার। [পৃ. ১৯-২৩]

প্রকরণ ৬। ভক্তিনো তরঙ্গ : কীর্তননো প্রচার—মুসলমান দরজী বৈষ্ণব থয়ো—ভক্তি নাঁ আংদোলন—চকচূর অনেলা ভক্তো—ভক্ত মঙ্গল। পৃ. ২৩-২৬

প্রকরণ ৭। নাম প্রচার : ঘেরেঘের করীনে নাম প্রচার—বৈষ্ণব সমাজমাঁ থতো উমেরো দারূঠীআ ভাইয়ো তেমনো ওদ্ধার করবানো নিত্যানংদনো সংকল্প—মহাপ্রভু দারঠী আয়োনা ঘর আগল-দারঠীআয়ো নিত্যানংদনুং মাথুং কোডয়ুং তেমনো পশ্চাত্তাপ - পাপনী দাননো সংকল্প-দারঠীআ বৈষ্ণব থয়া। [পৃ. ২৭-৩০]

প্রকরণ ৮। বিরোধ অনে বিজয় : ব্রাহ্মণোনো বীজবাট-নীচ অনে অস্পৃশ্য জাতিয়ো মাঁ আবেলী চৈতন্য-পতিত পাবন মহাপ্রভু-কাজীপাসে ব্রাহ্মণোনী ফরিয়াদ—কীর্তন বংধ করবানো কাজীনো হুকুম—কাজীনা হবেলীমাঁ জ কীর্তন করবানো মহাপ্রভুনো নিশ্চয়- নগর সংকীর্তন- কাজীয়ো ভুল কবুল করী—তেণো লীধেলা শপথ-কাজী বৈষ্ণব থয়ো-নির্ধন ভক্তনো মহিমা। [পৃ. ৩০-৩৫]

প্রকরণ ৯। মহাপ্রভু পোতানুং স্বরূপ বতাবে মে : ব্রাহ্মণোনো উপদ্রব চালু—লশকরণী গয়- মহাপ্রভুনো ভগবদ্ আবেশ হুং ব্রহ্মাওণো স্বামী ছুং—অদভুত তেজ—নারায়ণীনে কৃষ্ণপ্রেমনং দান —শ্রীধরে রাজ্যনে ধূতকারী কহাওয়ুং—অমনে শুদ্ধভক্তি আয়ো—ভক্তো আনে ভগবাননুং অপরোক্ষ মিলন—মনে আহিং কোণ লই আব্যু ?
[৩৫-৩৮]

প্রকরণ ১০। জগতনো তারনহার : নীচ উচ সৌনো উদ্ধার করো—পারসমণি - বল্যানো রাজমার্গ—মহাপ্রভুনী অপার করুণা—'কৃষ্ণবোলো' য়ো শব্দনো চমৎকার—মহাপ্রভুনী দিনচর্যা—নানা প্রকারনা ভাবাবেশ—নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাণী গয়ুং—রাসলীলানী পুনরাবৃত্তি—আদর্শভক্ত—নিরংতর কৃষ্ণচেতনা— [পৃ.—৩৮-৪৩]

প্রকরণ— ১১। ব্যাধিনা কৃতাং ঔষধ বধারে অনিষ্ট নীবত্তয়ু।

প্রকরণ—১২। হুঁ সংন্যাসী থইশ: বসমী বিদায়—ভকতোনী চিংতা—শচীদেবীনী মুংজবণ - হবে কৃষ্ণ বিরহ সহন থতো নথী—মিত্রো! মনে রজা আপো—মারো আত্মা কৃষ্ণন পাসে উড়ী গয়ো ছে। পৃ. ৪৬—৪৮।

প্রকরণ—১৩। মা দীক্‌শে: কৃষ্ণ মনে খেঁচী জায়ছে—মনে সংন্যাসী থবানী রজা আপো শচীনা কালাবালা—জগতনা কল্যানমে মাটে মনে জবাদো - জা, দীক্ষা ভক্তিনো প্রচার করজে শচীনুং কল্পাংত—সো মনে তেমনা হৃদয়মাঁ জোই শকশে। পৃ. ৪৯—৫২।

প্রকরণ—১৪। বরবহু: বিষ্ণুপ্রিয়ানে কাল পড়ী সাঁচু কহো—বিষ্ণুপ্রিয়ানী দলীল—জগতনী সেবানে অর্থে মার দান করো—হুঁ পন সংন্যাসীনী থাউ - তমারাঁ অশ্রু বউ জগতনাঁ পাপ ধোধা ছে প্রিয়ে। ক্ষমা করছো। পৃ. ৫২—৫৫।

প্রকরণ—১৫। বা! য়ো তো গয়া: সোনে ভুলাবামাঁ ন গ্যাঁ—ছেল্লী বিদায় - ভকতোনে ছেল্লী আদেশ—গৃহত্যাগ শচীনো টলবলাট—নিত্যানংদনী যোজনা। পৃ. ৫৬—৬।

প্রকরণ—১৬। সংন্যাসদীক্ষা: বৈষ্ণব ভারতী—ভারতীনো ক্ষোভ—লোকসমূহ সাথে কৃষ্ণকীর্তন—হৃদয়দ্রাবক দৃশ্য হজামে মুংডন করানা কহী—মংত্রদীক্ষা - কৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণনে বিসরশো নহি—য়ো কৃষ্ণ' হুঁ দোউয়ো আবু ছু। পৃ. ৬১ ৬৮।

প্রকরণ—১৭। প্রগাঢ় কৃষ্ণচেতনা: বর্ধমাননাঁ জংগলোমাঁ—ইন্দ্রিয়ো কাম করতী আটকী - এন দিবস পছী ত্যাংনা ত্যাঁ—গোবালায়ানো প্রসংগ জ্যাং তমে ত্যাঁজ বৃন্দাবন শাংতিপুরমাঁ। পৃ. ৬৮ ৭।

প্রকরণ—১৮। মহাপ্রভু শাংতিপুরোমাঁ: অদ্বৈতনে ঘের কীর্তন—নিত্যানংদ নবদ্বীপমাঁ বিবোধীয়োনো পশ্চাত্তাপ চালো, তেনী থামা মাগীয়ো শাংতিপুরমাঁ প্রেমভক্তিনী লূট—মাতা অনে পুত্র—আদর্শ মাতা—পুরী তরফ প্রয়াণ,। পৃ. ৭৩—৭৯।

প্রকরণ ১৯। জগন্নাথপুরীনে রস্তে: শ্রদ্ধানো আদর্শ - গামেগাম কীর্তন নৌকামাঁ নৃত্য—ক্ষীরচোবা গোপীনাথ গোপাল অনে মহাপ্রভু—শৈব মংদিরমাঁ নৃত্য—জ্যাং নজর পড়ে ত্যাং কৃষ্ণনী মূর্তি জগন্নাথনে ভেটনাঁ মূর্চ্ছা—সার্বভৌমনে ঘের। পৃ. [illegible]০—৮[illegible]।

প্রকরণ - ২০। সা[illegible]ভৌ[illegible]: গোপীনাথ আচার্য—সার্বভৌমনো গর্ব—[illegible] সার্বভৌম [illegible] মাগে ছ—গোপীনাথনী প্রতিজ্ঞা—মহা[illegible]—বেদাংতনুং প্রবচন সার্বভৌমনো পরাজয়—[illegible] দর্শন—[illegible] ধর্ম পরিবর্তন। পৃ. ৮৬—৯৪

প্রকরণ—২১। দক্ষিণ ভারতনী যাত্রা: আলালনাথমাঁ সংকীর্তন—মূর্তিমতী ভক্তিদেবী—জংগলোমাঁ থইনে—মহাপ্রভুনী প্রচার পদ্ধতি—বাসুদেব রক্তপীতীয়ো—রামানংদ রায়—ভাগবত ধর্মনুং গূঢ় স্বরূপ—রাধাপ্রেম—রাধাকৃষ্ণ পরম ঐক্যনুং দর্শন—অনুগা ভক্তি—সখীয়ানো স্বভাব—কাম অনে প্রেম—ব্রজমাঁ প্রবেশ করবাণী চাবী—গীতানো বাংচনার - মহারাষ্ট্র অনে গুজরাতমাঁ মহাপ্রভু। পৃ. ৯৫—১০৬।

প্রকরণ—২২। রথযাত্রা: রাজা প্রতাপরুদ্রবী উৎসুকতা—সংন্যাসী থী রাজদর্শন

থায় নহী—প্রতাপরুদ্র সংন্যাসী থবা তৈয়ার থয়ো—যুবরাজনা উপর কৃপা—য়োরিরসানুং ভকত মংগল—পুরীমাং বংগালা ভকতোনুং আগমন—মহাসংকীর্তন—রথযাত্রা—মহাপ্রভুনো রাধাভাব—প্রতাপরুদ্রনো উদ্ধার-ভক্তিনো প্রচার করবানো নিত্যানংদনে আদেশ। পৃ. ১০৭—১১৩।

প্রকরণ—২৩। মহাপ্রভু শাছা জন্মভূমিমাং: বৃন্দাবন জবানী লগনী—জ্যাং নজর পড়ে ত্যাং কৃষ্ণ—মহাপ্রভু কটকমাং—তেমনুং স্মারক—গদাধরনো ক্ষেত্র সংন্যাস-ব্রত করতাং প্রেম প্রবল থয়ো—মুসলমান কিল্লেদার দর্শন করবা আব্যো—তে বৈষ্ণব থয়ো—গঙ্গা কিনারে জন সমূহ—বংগালানী রাজধানী গৌড় আগল—রূপ অনে সনাতন—মহাপ্রভুনো তেমনে উপদেশ—রঘুনাথনে শিখামন—পাছা পুরীমাং।
পৃ. ১১৪—১২৩।

প্রকরণ-২৪। মহাপ্রভু অনে তেমনা ভকতো: খানগী মংত্রী স্বরূপ—জগদানংদনী মমতা—চংদনাদি তেলনী কহানী—তোনে ফড় কহেনার দামোদর—বৈষ্ণবনী ব্যাখ্যা—উত্তম বৈষ্ণব কোণ?—মুরারি গুপ্তনী আয়ল রাম ভক্তি—বাসুদেব দত্তনী প্রার্থনা—আবা জগতনে মাটে মনে নরকে জবা হো—মহাপ্রভুনো উত্তর।
পৃ. ১২৩—১২৭।

প্রকরণ—২৫। মহাপ্রভু বৃন্দাবন গয়া: ঝারিখংডনা জংগলমাং থইনে—পশু-পক্ষীনে প্রেমোন্মত্ত বানাব্যাং—মহাপ্রভু কাশীমাং—প্রকাশানন্দ ক্ষীজবায়া—চৈতন্য মূর্খ অনে জাদুগর ছে—যমুনামাং ডুবকী-মথুরামাং কৃষ্ণনু আগমন-ব্রজমাং পরিভ্রমণ—লতায়ো পুলকিত থৈ—বৃক্ষ অনে পশু-পক্ষীয়ো মহাপ্রভুনে আবকার আয়ে ছে—বারংবার গাঢ় মূর্চ্ছা—প্রয়াগ জতাং মার্গমা মূর্চ্ছা—বীজলীখান পঠান বৈষ্ণব থয়ো—বল্লভ ভট্টনী মুলাকাত ভট্টন ঘের মহাপ্রভু। পৃ. ১২৭—১৩৬।

প্রকরণ—২৬। হবে প্রকাশানংদ বৈষ্ণব থয়া: বংগালনা প্রধান—সনাতন ফকীরনে বেশে—এন রূপীয়ানী কামলী পন আয়ী দীধা—কাশীমাং প্রেমভক্তিনো তরঙ্গ—সংন্যাসীয়োনী মিজলসমাং মহাপ্রভু প্রকাশানংদনু দিল পীগয্যুং—হরিনামনো মহিমা—মহাপ্রভুনুং বিবেচন—ব্যাস সূত্র বড়ে ভক্তিনী স্থাপনা—সংন্যাসী য়োনো হৃদয়লনো—প্রকাশানংদনো গোপীভাব-মহাপ্রভুনুং নৃত্য জোবা দোউয়া—নৃত্যমাং সচ্চিদানংদনু দর্শন—বৃদ্ধ সংন্যাসী পন নাচতা থয়া—প্রবোধানংদ নামধারণ কর্যু-মহাপ্রভুনো মহিমা গায়ো। পৃ. ১৩৬—১৪২।

প্রকরণ—২৭। রূপমে উপদেশ।
„ ২৮। সনাতন মে উপদেশ।
প্রকরণ—২৯। সনাতন মে উপদেশ।
„ ৩০। ছ গোস্বামীয়ো।
„ ৩১। মহাপ্রভু পাছা পুরীমাং।
„ ৩২। শিক্ষাষ্টক।
„ ৩৩। মহাপ্রভুনোঁ রাধাভাব।
„ ৩৪। মহাপ্রভুনোঁ দিব্যোন্মাদ।
„ ৩৫। সমুদ্রমাং ঝংপাপাত।
উপসংহার—

অষ্টম অধ্যায়

ব্রজভাষার সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে ব্রজধাম বা বৃন্দাবনের মহিমা অতুলনীয়। বৃন্দাবন ও মথুরা মণ্ডলের আভীরদের জীবনানুষঙ্গে গোপীনাথ কৃষ্ণকে সারা ভারতের ভক্তসমাজ স্মরণাতীত কালেই পরম তত্ত্ব ও পরম উপাস্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলাস্থল বৃন্দাবনের এক ভাবময় রূপ ভারতের ভক্ত কবিরা গ্রহণ করেছেন। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে তামিল সাহিত্যে দ্বাদশ আলোয়ারের অন্যতম মহিলা কবি আণ্ডালের মনোভূমিতে 'তিরুপপাবৈ' গানে বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তামিল ভক্তি সাহিত্যের আধারেই সৃষ্টি হয়েছে ভাগবতের। ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৃন্দাবনলীলাকে আশ্রয় করে মালয়ালম কবি লিখলেন 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', বঙ্গদেশের কবি জয়দেব লিখলেন 'গীতগোবিন্দ'। দক্ষিণ ভারতে মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যদের সমাধিকেও বলা হল 'বৃন্দাবন'—তাঁদের লোকান্তর হল বৃন্দাবন প্রাপ্তির সামিল। গুজরাতের ভক্তকবি নরসিংহ মহেতার রচনায়ও 'বৃন্দাবনমাঁ রমত মাড়ী, গোপীগোবিন্দ সাথেরে, ('রাস সহস্রপদী')। গুজরাতী কবি নাট্যকার রামকৃষ্ণের 'গোপাল কেলিচন্দ্রিকা' ওড়িষ্যার কবি রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' এবং বৃন্দাবনের রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটক একই বৃন্দাবনলীলা সূত্রে গ্রথিত। আসামের শঙ্করদেবের সমকালীন ও পরবর্তীযুগের অধিকাংশ ভক্তিসাহিত্যের উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা।

শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের মধুরসে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলের সংস্পর্শ থেকে—কিছুটা স্বাধ্যায় থেকে কিছুটা গুরু পরম্পরায়। গুরু ঈশ্বরপুরী তাকে কৃষ্ণমন্ত্র দেবার আগেই নবদ্বীপে শুনিয়েছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'। তাঁর পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়ে গোবর্দ্ধনধারী 'শ্রীগোপাল' বিগ্রহ ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেন এবং দুবছর সেখানে থেকে সেবা করেন। বিধর্মীদের আক্রমণে মথুরা মণ্ডলে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর প্রয়াসে সেখানকার মানুষ সে ত্রাস কাটিয়ে উঠে গোপালের অর্চনা সুরু করলেন—

'গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে। নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী। ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির। কেহ পাকভাণ্ডার কৈল কেহত প্রাচীর॥

[চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য৪/৯৮-১০১]

শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন সেখানে যে-ভাববন্যা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়। রূপ সনাতনকে তিনি প্রেমভক্তি প্রচারে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন

কিন্তু তার ফলশ্রুতি কি কেবল সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ? এ যাবৎ আমরা চৈতন্য চরিত্রের একটি প্রধান দিক দেখে এসেছি—আঞ্চলিক ভাষায় ভক্তি ধর্ম প্রচার। বৃন্দাবনে কি তার অন্যথা হয়েছিল ? বৃন্দাবনের লোকেরা যে-ভাষায় কথা বলেন, সেই ব্রজভাষা বা 'ব্রজ্‌ভাখায়' কি সৃষ্টির জোয়ার বয়ে যায় নি, যেমনটি হয়েছিল অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় ?

এই প্রশ্ন নিয়েই আমরা দাঁড়াব ব্রজভাষায় রচিত সাহিত্যের দুয়ারে।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর পার্ষদবর্গ-অনুপ্রাণিত ব্রজসাহিত্যের একনিষ্ঠ প্রকাশক মথুরা-নিবাসী পরম ভাগবত বাবা কৃষ্ণদাস বলেছেন— 'ব্রজরাজনন্দন শ্রীহরির গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ ছিল প্রেয়সী রাধিকার প্রেমভাব আস্বাদন এবং জীবজগৎকে অনর্পিত নিজভক্তিযোগ দান। শ্রীপ্রভু ধরায় প্রকট হয়ে স্থানে স্থানে ভক্তি-বিদ্যালয় স্থাপন করে আপন প্রেম মহাবিদ্যায় জীব ছাত্রদের পাঠদান করে রূপ-সনাতন প্রভৃতি পার্ষদদের অবতারিত করে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করেছেন যাতে ধারাবাহিক রূপে প্রেমমহাবিদ্যাদান চলতে থাকে। উক্ত বিদ্যালয়ে নাম সংকীর্তনই হল প্রধান পাঠ্যবিষয়। এই বিদ্যার প্রধান বিদ্যাপীঠ বৃন্দাবন, নবদ্বীপ আর নীলাচল ক্ষেত্র। রূপ সনাতন প্রমুখ প্রভুপার্ষদগণ বৃন্দাবন ধামে এসে ধামের পুনরুদ্ধার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করে উক্ত ভক্তি বিদ্যালয়ে পাঠ্য করেন। এ সব গ্রন্থ অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায়, বঙ্গভাষায় ও ব্রজভাষায় রচিত। গৌড়েশ্বর (শ্রীচৈতন্য) সম্প্রদায়ে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থের যেমন সীমা সংখ্যা নেই, ঠিক তেমনিই ব্রজভাষায় রচিত গ্রন্থেরও কোন ইয়ত্তা নেই।'

[শ্রীব্রজরাজনন্দন হরিকা গৌরাঙ্গ রূপ সে নবদ্বীপ মে অবতীর্ণ হোনে কা মূল কারণ থা অপনী পরম প্রেয়সী রাধিকাকে ভাব প্রেমকা আস্বাদন তথা সাথ হী সাথ অনর্পিত নিজ-ভক্তিযোগ কা জীব জগৎকে লিয়ে দান। শ্রীপ্রভুনে ধরানে প্রকট হো কর জগহ জগহ পর ভক্তি বিদ্যালয় কী স্থাপনা কর অপনী প্রেম মহাবিদ্যাকা জীব ছাত্রোঁ কে পাঠ পঢ়া কর, তথা রূপ সনাতন প্রভৃতি পার্ষদ গণোঁকো অবতারিত করা কর উন বিদ্যালয়োঁ মে প্রধান প্রধান অধ্যাপক রূপ সে নিযুক্ত কিয়া, জিসমে কি প্রেম মহাবিদ্যা কা দান ধারাবাহিক রূপ সে চল সকে। উন বিদ্যালয়োমে নাম সংকীর্তন পাঠ হী প্রধান রূপসে রখা গয়া। বৃন্দাবন নবদ্বীপ ঔর নীলাচল ক্ষেত্রহী প্রধান বিদ্যাপীঠ রূপসে মানা গয়া হৈ। রূপ, সনাতন প্রভৃতি প্রভু পার্ষদোনে বৃন্দাবনধামমে আকর উসকা পুনরুদ্ধার কিয়া তথা সাথ হী সাথ অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থোঁ কী রচনা কর উন ভক্তি বিদ্যালয়োঁ মে উন্হে পাঠ গ্রন্থ নির্ধারিত কিয়া। য়হ সব গ্রন্থ অধিকাংশ রূপসে সংস্কৃত ভাষা তথা বঙ্গভাষা ঔর ব্রজভাষাদি মে রচে গয়ে হৈ।

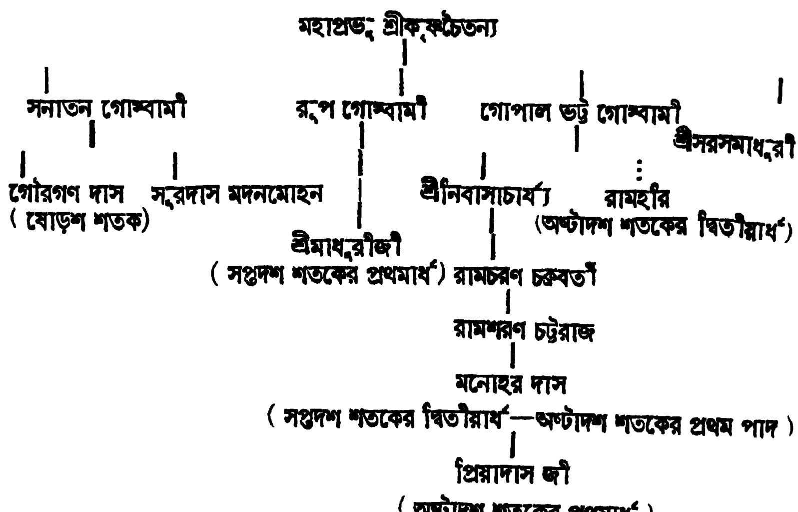
গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়মে জিস প্রকার সংস্কৃত তথা বঙ্গ ভাষ মে রচিত গ্রন্থো কী কোঈ ইয়ত্তা নহী হৈ ঠীক উসী প্রকার ব্রজভাষামে রচিত গ্রন্থো কী ভী কোঈ ইয়ত্তা নহী।'

[ভূমিকা, শ্রীরাধারমণ রসসাগর, সম্বৎ ২০০৮ (১৯৫২ খ্রীঃ)]

ব্রজভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীগৌরাঙ্গ পদাবলীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন মথুরা কুসুম সরোবর নিবাসী বাবা কৃষ্ণদাস। তিনি উদ্যোগী হয়ে সনাতন-রূপ-গোপাল ভট্টের ব্রজবাসী শিষ্য সম্প্রদায়ের রচনাবলী সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যপ্রেমী মাত্রই তাঁর নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

পরমপূজ্য হরিদাস দাস গোস্বামীও তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' ও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' গ্রন্থে ব্রজভাষায় রচিত সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। ব্রজভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীগৌরপদ রচনা করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌরগণ দাস, সূরদাস মদনমোহন, শ্রীমাধুরী জী, মনোহর দাস, প্রিয়াদাস জী, রামহরি জী ও শ্রীসরস মাধুরী জী।

এঁদের কাল ও গুরু পরম্পরা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হল ঃ



শ্রী গৌরগণ দাস : গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী

ব্রজভাষায় রচিত 'গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী' সম্বৎ ২০০৭ অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে মথুরা কুসুম সরোবর থেকে বাবা কৃষ্ণদাস প্রকাশ করেন। গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ-সহায়তা করেন গৌরনিষ্ঠ রাজা রঘুনন্দন প্রসাদজী (মুঙ্গের)। গ্রন্থকার গৌরগণ দাস ছিলেন শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য।

গ্রন্থের ভূমিকায় বাবা কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

আজ হাম করুণ বরুণালয়, জগদাধার, প্রেম-পুরুষোত্তম, প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু কী কৃপাসে অদ্ভুতাদ্ভুত, মধুরাতিমধুর, বচনাতীত, অপূর্ব, উনহী প্রভুকে গুণগরিমা মে ভরপুর "গৌরাঙ্গ মঞ্জাবলী" নামক দিব্যাতিদিব্য বস্তু (গ্রন্থ) রত্ন কো রসিক-প্রেমী জনতা কে সমক্ষ উপস্থিত করনে মেঁ সমর্থ হুএ হৈ। যদ্যপি অনেক স্থলোঁ পর কঠিন হোনে কি কারণ য়হ সাধারণ বোধগম্য নহীঁ হৈ তো ভী ইস কী রচনা শৈলী, শব্দ বিন্যাস, ভাষা পরিপাটী কো দেখনে সে সবকা শির ঝুক জাতা হৈ। ইস প্রকার রচনা শৈলী উন প্রভু কী কৃপা বিনা নহীঁ হো সক্তী হৈ।

আপকে বিষয় মেঁ কোই বিশেষ বাত হমে মালুম নহীঁ হৈ। পরন্তু ইস গ্রন্থ মে সেহী পতা চলতা হৈ কী আপ শ্রীসনাতন গোস্বামী চরণোঁকে আশ্রিত প্রিয় শিষ্য থে। সর্বপ্রথম শ্রীগুরুদেব স্বরূপ বর্ণণ, দুসরে শ্রীমহাপ্রভু কা রূপ শৃঙ্গার বর্ণণ, তীসরী প্রার্থনা চৌথী শৃঙ্গার মঞ্জাবলী দোভাগ, পাঁচবাঁ সিদ্ধান্ত সংপুটিত সপার্ষদ প্রভু কা সাম্রাজ্য চক্রবর্তিত্ব রূপ সে বর্ণন হৈ।…প্রথম মন মেঁ ঐসা বিচার হুআ থা কি ইসকে কঠিনাংশ কো কুছ সরল অনুবাদকে সাথ প্রকাশিত করেঁ কিন্তু অনজান মেঁ মহানুভাবোঁ কা নিগূঢ় আশয় কিংবা গ্রন্থ কা মার্মিক ভাব কহী বিগড় ন জায় ইসলিয়ে বহ বিচার হী স্থগিত কর দিয়া ঔর প্রাচীন বস্তু লোপ ন হো জায় ইস্ আশঙ্কাসে শীঘ্র প্রকাশিত করনা হী উচিত সমঝা।……

বিনীত
কৃষ্ণদাস

অর্থাৎ, "আজ আমি করুণ বরুণালয়, জগদাধার, প্রেম-পুরুষোত্তম, প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অত্যদ্ভুত, অতিমধুর, অনির্বচনীয়, অপূর্ব সেই প্রভুর গুণগরিমায় ভরপুর 'গৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী' নামক দিব্যাতিদিব্য বস্তু (গ্রন্থ) রত্ন রসিক প্রেমী জনতার সামনে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছি। যদিও এ গ্রন্থের অনেক স্থল কঠিন এবং সেই কারণে সাধারণের অবোধগম্য। তবু এর রচনা শৈলী, শব্দ বিন্যাস ও ভাষা-পরিপাট্য দেখলে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করবেন। এ ধরনের রচনা-শৈলী সেই প্রভুর কৃপা বিনা সম্ভব নয়।

গ্রন্থকারের বিষয় আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। কেবল এই গ্রন্থ থেকেই

জানা যায় যে, তিনি সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রিত প্রিয় শিষ্য ছিলেন।...গ্রন্থে সর্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ বর্ণন তারপর শ্রীমহাপ্রভুর রূপসজ্জা বর্ণন, প্রার্থনা, শৃঙ্গার মঞ্জাবলী দুভাগ এবং সিদ্ধান্ত সম্বলিত সপার্ষদ প্রভুর সাম্রাজ্য চক্রবর্তী রূপ বর্ণিত হয়েছে।...প্রথমে ভেবেছিলাম, গ্রন্থের কঠিন অংশ সরল অনুবাদ সহ প্রকাশ করব, কিন্তু পরে, মহানুভাব কবির নিগূঢ় অভিপ্রায় অথবা গ্রন্থের মর্মগত ভাব পাছে নষ্ট হয় এবং প্রাচীন বস্তু পাছে লুপ্ত হয়ে যায়, এই আশঙ্কায়, অনুবাদ ছাড়াই গ্রন্থ যথাশীঘ্র প্রকাশ করাই সংগত মনে হল।"

গ্রন্থপাঠ : শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দৌ জয়তাং শ্রীশ্রীনিকুঞ্জ বিহারিণ্যৌ নমঃ

অথ মঙ্গলাচরণ শ্লোক

গৌড়োদয়মুপযান স্তমঃ সমস্তং নির্হন্তি যো যুগপৎ।
জ্যোতিশ্চ যোতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ। ১॥
লক্ষ্মীদৃঙ্গি দিন্দিরপীতমঙ্গুলিচ্ছদোল্লসন্ সুন্দর মধুপ্রুতম্।
পাদারবিন্দং নখরাংশুকেশরং স্মরাম্যহং কংসহরস্য সর্বদা॥ ২॥
তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্তারবিন্দং তৎ কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ সান্দ্রস্মিতা শ্রীঃ সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবতেহপি॥

অথ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভূষণ বিলাস মঞ্জাবলী লিখ্যতে শ্রীশ্রীগৌরগনদাস জুকৃত অথ মাঁঝ ছপৈপ—

রস ভূষিত গৌরাঙ্গ প্রেমবপু উজ্বল নীকে।
রস ভোজন রস শয়ন বৈন রস বিন সব ফীকে॥
রস সে বিলসন কুঞ্জ কেলি রস পগে অমীকে।
ঠাকুর পরম রসাল চসক রস বস জু ভনী কে॥
রস উমগৈ নিসিযাম সহচরগণ রস হীকে।
বিন লখে গৌর বিলাস রচৈ কা ভূষণ জীকে॥ ইতি।

অথ মাঁঝ —

শ্রীগৌর রূপকো লখা নহী তো প্রেম স্বাদ বিপরীত লখৈ।
মনসিজ বিলাস রস পগা নহী তো কহা মধুর রসরীত লখৈ॥
ভাবভেদ গতি লখী নহী পাবক কপুর সম প্রীতি লখ॥
গুরু মার্গ কো লখা নহী তো ঈস্ ইষ্ট বিপরীতি লখৈ॥ ২
জো—গীসশ্বেত ছীরোদপতী গর্ভোদপরে কছু ঔর কহা।
কারণ পতি উজ্বলরূপ লখা সাযুজ্য ব্রহ্মপরে ঔর কহা॥
তা পরে ভিন্ন বহুভেদ লখে তা পরে অধিষ্ঠিত ঔর কহা।
তা পরে মধুর ছবি রূপ লখা পুনি লোক অনেকন ঔর কহা॥ ৩
তত রূপ তজা তত রূপ তজা তত রূপ পরে তদ্ রূপ রচা।
তত সার খেঁচি মৃদু সিন্ধু রচা তদ্ রূপ অভিন্ন সরূপ রচা।

তত রূপ বিপক্ষী ত্যক্ত কিয়ে তদ্ যোগ্য সুধা সুরূপ রচা।
সুধামথন সংভূত ছবী পুনি ঈস পতিত কা ভূপ রচা ॥ ৪
সো অবাংগ মন গোচর বাণী বেদভেদ নহি কোঈ লখা।
শ্রীরূপ সনাতন বিলাস রহে তিন সরিত মীন জ্যো কোঈ ন লখা ॥
জলজাত মুখোমুখ পান করে পুনি জীব কৃপা বিন কোঈ ন লখা।
শ্রীগুরুকৃপা অবলোকি সুলোচন দীন গৌরগণ সোঈ লখা ॥ ৫
ছপ্পৈ—ভাবভেদ রসভেদ উপাসক ভেদ সো কীনৌ।
বহুরি উপাস্য সরূপভেদ তজি লখি তেঁহি চীনৌ ॥
উজ্বল প্রেম সরূপ মধুর ঠাকুর রঙ্গ ভীনৌ।
বঢ়ে পরম অনুরাগ সুখ সেবা মেঁ লীনৌ।
ভাব সুমন চুনি গ্রন্থ আভরণ গৌরহি দীনৌ ॥ ৬ ॥
ইতি সিদ্ধান্ত কী মাঁঝ সম্পূর্ণ!
অথ সিঙ্গার কী মাঁঝ লিখ্যতে ॥
প্রেমপান ছক ছকন মত্তবপুলোক ব্যক্ত কোঈ গৌরহরী।
চপলাগতি চন্দ্র সে অমী ঝর লাবণ্যছবী কোঈ গৌরহরী ॥
রসসিন্ধু সরস জ্যো মীন রমৈ ত্যো কেলিরসিক কোঈ গৌরহরী।
আনন্দতরঙ্গ বস উমগ উমগ নবভাব বৃন্ধি কোঈ গৌরহরী ॥ ৭ ...
হরি অঙ্গন প্রতি দেস সজীউপভা ঝলকাঈ।
সো প্রেমবারিধী ভ্রমরগত ভূষণ গৌর স্বরূপ।
তত্ত্ব বিনা পাবে নহীঁ অক্ষর অর্থ অনূপ ॥ ৮ ॥

দোহা

দ্বৈতাদ্বৈত বিচারি কৈ বহুরি বিশিষ্টাদ্বৈত।
ব্রহ্ম দ্বৈতৈ শোধিকৈ সোধহি শুদ্ধাদ্বৈত ॥ ১
ভেদাভেদ জাকো কহৈ সোঈ অচিন্ত্যাভেদ।
গৌররূপ নির্দেশ করি যহি প্রতিপাদ্যো বেদ ॥ ২
যোগহীন পূরণ নহীঁ করে তৌ লক্ষণ হোয়।
চিন্ত্যাচিন্ত্য লখাইয় পূরণতম হৈ সোয় ॥ ৩
ধ্যেয় ধ্যানযুত ধারনা মধ্য লখৈ জো ঈস।
চিন্ত্যাচিন্ত্য বিলাসি সো পূরণতম জগদীস ॥ ৪
শ্রীগুরু কৃপা নির্দেশ করি ভূষণ বিশদ বিলাস।
দীন গৌরগণ নিরখি ছবি প্রমুদিতমোদ উলাস ॥ ৫
পুনরাবৃতী দোষ জো কাব্য মধ্য নহি সোয়।
ধ্যানভাব রস রূপ যহাঁ নিত নূতনতা জোয় ॥ ৬
ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ ভূষণ বিলাস কাব্য সম্পূর্ণ ॥

অথ প্রার্থনা

নমো নমো শ্রী গৌর গদাধর অবধূত প্রেমপ্রদ শ্রী নিত্যাঈ।
রামানন্দ স্বরূপ নমো শ্রীবাসাদি অদ্বৈত গুসাঈ।
গৌর পারষদ নমো রহে প্রেম বস মত্ত সদাহী।
নমো শ্রীগুরুদেব সনাতন রূপ দোউ ভাঈ।
নমো জীব গোপাল ভট্ট করো মিল দীন সহাঈ।
নমো ভট্ট রঘুনাথ গোসাঁঈ দান সরস মৃদু আরতি গাঈ।।
নমো নবদ্বীপ ধাম সুর সরি চহুঁ ওর বহঈ।
নমো গৌরগন বৃন্দ পতিত কো-লেব অপসাঈ।।
অথ সিদ্ধান্ত প্রণালী সাখা লিখ্যতে।।

ছপৈ— কনক সার সংভূত কল্পতরু গৌর সে গাঈ।।
পরমগূঢ় অনুরাগ ভূমি তামে প্রগট আঈ।'
হরিদাসাদি দৃঢ় মূল রহেঁ গম্ভীর সদাঈ।।
উজ্জ্বল কোমল প্রেম লগ্যো ফল তাকে মাঈ।। ১।।
অবধূতাদি অদ্বৈত সুভগ অস্কন্ধ সোহায়ে।।
চৌসঠি সাখা চলী মহন্ত নিরমল যস ছায়ে।।
ষড় গোস্বামী নিধি ছায়া ঐশ্বর্য দুরায়ে।।
মনো পূরিত করৈ শরণ জো আরত আয়ে।। ২।।
পুনি সাখাদল অমিত কোটি শারদ মতিহারী।।
রামানন্দ স্বরূপ পুষ্প সৌরভ বিস্তারী।।
নবধা ভক্তি বিচার গদাধর রস সঞ্চারী।।
গৌর উপাসক ভক্ত অলীগণ পিয়ে বিচারী।। ৩।।
অখিল শাস্ত্র কী সিন্ধ পীঠ পাদপকে তল মেঁ।।
জ্ঞান ভক্তিরসভেদ মনী সী উজ্জ্বল ঝিল মেঁ।।
পরম অধিপ উপযোগ রূপ কী ইস্থিত থল মেঁ।।
গৌরনাম কী ছাপ দেঁয় জীবন কী কলি মে।। ৪
ভক্তি ভূমকে ভূপ রূপ ভূপনপতি সোহৈ।।
সীস সনাতন মুকট গৌরপদ ছত্রক মোহৈ।।
জীব সচিব গম্ভীর সরস পুনি তাকী কোহৈ।।
ষড়ৈশ্বর্য সবহী সনমুখ রূপ জোহৈ।। ৫
দ্বাদস রসকে কোষ সংপতী কর তল রাজৈ।।
বিমলভক্তি বৈরাগ্য তীর ব্রজ উজ্বল ছাজৈ।।
মন বাদী খল দলে তিমির জ্যোঁ রবি লখি ভাজৈ।।
জ্যোঁ শৃগালগন মধ্য মত্ত পংচানন গাজৈ।। ৬

পরম অকিঞ্চন বৃত্তি কৃষ্ণ রস মে' মন পাগ্যো ॥
কঠিন বিরহ অনুরাগ প্রেম সর হিয় মে' জাগ্যো ॥
কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি কেলি নিরখি দংপতি হিত লাগ্যো ॥
লতাপত্র মে ঝলক স্যাম সেবাপন সাধ্যো ॥ ৭

গৌর রূপ বিন ভজে প্রেমরস কহাঁ কোঈ পাবৈ ॥
শ্রীরূপ সনাতন বিনা কৌন ব্রজকো প্রগটাবৈ ॥
বিনা কৃপা শুকদেব ভাগবত কহাঁ তে আবৈ ॥
বিনা ভাগবত কৌন রাসলীলা কো গাবৈ ॥
নহী ভট্ট গোপাল বিন সেবা কো সংসাবে।
বিস করুণা প্রভুগনন কী প্রীতি রীতি নহী' ভাবে।
লীলাতত্ত্ব অনন্ত জীব বিন কো দরসাবৈ ॥
দরসে বিন গোবিন্দ রতিরস কহা কোঈ প্যাবৈ ॥ ৮

ব্যাসসূত্র গম্ভীর জলধি তাকর নিত লাঈ' ॥
উত্তম ভক্তিতত্ত্ব নিধি ধরী থলকে মাঈ' ॥
মতবাদীগণ অসুর অমর জন মধ্যো উপাঈ ।
ঘোর অনীশ্বরবাদ সুরামতি তিন কো প্যায়ী ॥ ৯ ॥

পুনি শুক বিরচ্যো শ্রুতিসার ভাগবত রস কো সাগর ॥
স্যামা স্যাম বিলাস কোটি আনন্দ কো আগর ॥
শ্রীরূপ সনাতন মধ্যো কিয়ো সো লোক উজাগর ॥
জোরস ব্রহ্মে ন মিল্যো তাহি দৈ ভরি ভরি গাগর ॥ ১০ ॥

শ্রীরূপ সনাতন মারগ বাঁকো সমঝ সুর যামে' চরণ ধরৌ ॥
কর করবাকো পীন গুদরী তিলকমাল আমরণ ধরৌ ॥
সুন্দর বিপিন পুলিন গিরি সর তরু বৈটি জুগল উর শরন ধরৌ ॥
নাম কীরতন নৃত্য গান তজিলাজ ভক্তি অনুকরণ ধরৌ ॥ ১১ ॥

চিন্তামনি ব্রজভূমি বিলোকন নিত নূতন নব ভাব ভরী ॥
ধূসর ধূরি অঙ্গ ব্রজরজমে' প্রেম মত্ত জনু ধাব করী ॥
গুরু অনুসরণ ভাবকো বারিধি উমগি উমগি কহৌ গৌর হরী ॥
শ্রীরূপ সনাতন আসা উরমে ব্রজগোপিন অনুভাব সরী ॥ ১২ ॥

ছপ্পৈ—সদা রহৈ একান্ত জুগল মে' ধ্যান লগাবৈ ॥
গুরু বৈষ্ণব দেখি ভূমি ঝুকি সীস নবাবৈ ॥
আস ত্রাস করি দূরে ভাগবত হিত করি গাবৈ ॥
মধুকর বৃত্তী করৈ নেম বৃত রীতি নি ভাবৈ ॥ ১৩ ॥

বৃত্তি অকিঞ্চন রহৈ ধান প্রতিগ্রহকো ত্যাগৈ ॥
বহু শাস্ত্র মতবাদ বুন্ধি নহি তিন মে সাধৈ ॥
লতা সরোবর দেখ প্রেম হিরদে মে জাগৈ ॥
ফির রূপ সনাতন গৌরহরী কহিকহি অনুরাগৈ ॥ ১৪ ॥
জব তনময়তা হোয় দেহ কী সুধি বিসরাঈ ॥
রাধাকৃষ্ণ সরূপ চলৈ জহাঁ জহাঁ জন জাঈ ॥
উরৈ ভক্ত অপরাধ ধ্যান কী হোয় সিথিলাঈ ॥
নব বৃন্দাবিপিন বিলাস সনাতন রূপহি পাঈ ॥ ১৫ ॥
শ্রীরূপ সনাতন শরন বিন করৈ স্যাম সো হেত ॥
বিন তরনী জনুসিন্ধু মেঁ কুদহি অজ্ঞ অচেত ॥ ১ ॥
শ্রীগুরু কৃপা রুখ পায় কৈঁ বরনৌ স্যাম বিলাস ॥
দীন গৌরগন দাস কী কীজৈ পুরী আস ॥ ২ ॥

॥ ইতি সিন্ধান্ত ॥

অনুবাদ (লেখককৃত) ঃ

রসভূষিত গৌরাঙ্গের প্রেমতনু অতি উজ্জ্বল। তাঁর ভোজন, শয়ন, বাণী সবই রসময়, রস বিনা সব ফিকে। রসামৃতে মগ্ন তাঁর কুঞ্জকেলি, রসেই তাঁর বিলাস। পরমরসের রসিক ঠাকুর অকপট সরল প্রেমের বশ। নিশিদিন সহচর সঙ্গে সেই রসই উচ্ছলিত হয়। গৌরবিলাস না দেখলে কোন মনোভূষা রচনা করা যায় না।

গৌরাঙ্গের রূপ না দেখলে প্রেমের স্বাদ বোঝা যায় না। তাঁর মদন বিলাসরসে নিমগ্ন না হলে মধুর রসরীতি কোথায় লক্ষ্য করবে? অগ্নিতে কর্পূরের মত (সূক্ষ্ম) তাঁর ভাবের বিচিত্রগতি প্রীতির সঙ্গে লক্ষ্য কর, গুরু মার্গ লক্ষ্য কর, নয়তো ইষ্ট মিলবে না।

ক্ষীরসিন্ধুর মধ্যে শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরোদপতি আরও কিছু বললেন।—তিনি বললেন —ব্রহ্মসাযুজ্যের উপরে সর্বকারণের কারণ সেই উজ্বল রূপ লক্ষ্য করা যায়। (অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর উজ্বল রসরূপই অধিক কাম্য)। সেই পরম উৎস থেকেই বহু বিচিত্র দৃশ্য বহু বিচিত্র জগতের উদ্ভব। রূপসাগরের সারবস্তু নিষ্কাশিত করে রচিত হয়েছে তাঁর অপরূপ রূপ। পতিত পাবন তিনি অবাঙ্মানস-গোচর, বেদের অগোচর তাঁর বাণী। তাঁর ভাবের নদীতে লোকলোচনের অন্তরালে মীনরূপে খেলে বেড়ান শ্রীরূপ ও সনাতন। সেই ভাব-সরিতে ফোটা পদ্মের মধুপান শ্রীজীবের কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়। শ্রীগুরু কৃপায় দীন গৌরগণ (পদকর্তা) হয়েছেন সুলোচন, কেনমা শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অপরূপ অবলোকন করেছেন তিনি।

যেমন আছে ভাবভেদ, রসভেদ, তেমনিই আছে উপাসকভেদ। বহুদেবতার উপাসনা ত্যাগ করে তাঁর স্বরূপ লক্ষ্য করো—তা-ই হোক তোমার উপাস্য। ঠাকুর

(শ্রীগৌরাঙ্গ) উজ্জ্বল প্রেমস্বরূপ, বিচিত্র রঙ্গে তাঁর মাধুর্যের স্ফূর্তি। তাঁর সেবাসুখে লীন হলেই বাড়ে পরমের প্রতি অনুরাগ (অথবা, তাঁর সেবালীনতায় অনুরাগের পরম বৃদ্ধি)। দীন গৌরগণ দাস সুজনের বা ভক্তজনের সেই মনোভাব সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থের আভরণ রচনা করেছেন। (অথবা, গৌরই দিয়েছেন এ গ্রন্থের ভক্তি আভরণ)।

আশ মিটিয়ে প্রেমরসপানে মত্ততনু লোকসমাজে ব্যক্ত করেছেন যিনি, তিনি গৌরহরি। চপলগতি চন্দ্রের অমিয়ঝরা লাবণ্যের ছবি যিনি, তিনি গৌরহরি। রসসিন্ধুতে সরস ক্রীড়ারত মীনের মত কেলিরসিক যিনি, তিনি গৌরহরি। আনন্দ-তরঙ্গের হিল্লোলে নবনব ভাবের বিকাশ ঘটান যিনি, তিনি গৌরহরি।

গৌরহরির প্রতি অঙ্গে ঝলকিত দামিনী। প্রেম-রত্নাকরের হৃদ্‌গত রত্ন গৌরহরি। যার তত্ত্বদৃষ্টি নেই; সে এই অনুপম অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না।

দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করে হল বিশিষ্টাদ্বৈত। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈতবাদকে শুদ্ধ করে হল শুদ্ধাদ্বৈত॥ যাকে ভেদাভেদ বলা হয়, তা-ই হল অচিন্ত্য ভেদাভেদ। বেদের পরিবর্তে গৌরূপই আমার প্রতিপাদ্য॥ যোগে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ চিন্তা যে করে, সে নিজেই পায় পূর্ণতমকে॥ ধ্যানযুক্ত হয়ে চিন্ত্য অচিন্ত্য-ধারণার মধ্য দিয়ে ধ্যেয় বস্তুকে যে লক্ষ্য করে, সে-ই পায় পূর্ণতম জগদীশকে॥ শ্রীগুরুর কৃপায় বিশদ ভাবে ভূষণ বিলাস নির্দেশ করে দীন গৌরগণদাস আমোদিত উল্লাসে শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি নিরীক্ষণ করেন॥ এ কাব্যে পুনরাবৃত্তি দোষ থাকতে পারেনা, কেননা এ কাব্যে বর্ণিত ধ্যান-ভাব-রস-রূপ সবই নিত্য নতুনত্ব লাভ করে চলেছে।

———

[বৃন্দাবন-বন্দনার আগে গৌর পার্ষদদের এবং নবদ্বীপের বন্দনা]

প্রার্থনা

নমো নমো শ্রীগৌর গদাধর অবধূত প্রেমপদ শ্রীনিতাই।
রামানন্দ স্বরূপ নমো শ্রীবাসাদি অদ্বৈত গোসাই॥
গৌর পারষদ নমো রহে প্রেমবশ মত্ত সদাই।
নমো শ্রীগুরুদেব সনাতন রূপ দুই ভাই॥
নমো জীব গোপালভট্ট উভয়ে এ দীনসহায়।
নমো ভট্ট রঘুনাথ যাঁর স্তবে রস উথলায়॥
নমো নবদ্বীপধাম সুরধুনী যেথা বয়ে যায়।
নমো গৌরগণ বৃন্দ পতিতেরে প্রেম যাচায়॥……

সিদ্ধান্ত প্রণালী শাখা

কনক কল্পতরু গৌরের গান গাই, তিনি প্রকট করেছেন পরমগূঢ় অনুরাগ ভূমি। হরিদাসাদি সেই কল্পতরুর দৃঢ়মূল—সেই তরুতে ফলে উজ্জ্বল কোমল প্রেমফল ॥ ১

অবধূত অদ্বৈত সেই তরুর স্কন্ধ—চৌষট্টি মহন্ত শাখা বিস্তার। যশ তার ছায়া। ষড় গোস্বামী রত্নরূপ—ষড়ৈশ্বর্যকে বিদূরিত করেন। আর্তজন শরণ নিতে এলে কল্পতরু তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন ॥ ২

কল্পতরুর শাখা অযুত কোটি; রামানন্দ পুষ্পসৌরভ ছড়িয়ে দেন চারদিকে। নবধা ভক্তি পথে বিচরণ করে গদাধর তরুতে রস সঞ্চার করেন। গৌর উপাসক ভক্তবৃন্দ অলির মত ওই ভক্তিরস পান করেন ॥ ৩

কল্পতরুর তলে অখিল শাস্ত্রের সিদ্ধপীঠ (সর্বপ্রকার সাধনার সিদ্ধি) এবং জ্ঞান ভক্তির সরোবর যা মণির চেয়ে উজ্জ্বল। সেই সরোবরেব পারে পরম অধিপ রূপের স্থিতি। তিনি কলির জীবের অঙ্গে গৌরনামের ছাপ দেন ॥ ৪

রূপ গোসাই ভক্তিভূমির রাজার রাজা। সনাতন গোসাইর মাথার মুকুট হল গৌরপদ—তা ছয় গোসাইকেই মোহিত করে।

জীব গোসাই তাঁর সচিব—গম্ভীর অথচ সরস; ষড়ৈশ্বর্য্য রূপ সেনাদলকে তিনি প্রতিহত করেন ॥ ৫

দ্বাদশ রসের সম্পত্তির কোষাগার তাঁর করতলে—সেখানে আছে বিমলা ভক্তি, তীব্র বৈরাগ্য ও উজ্জ্বল ব্রজমাধুরী বা মধুরা রতি। বিবাদীমনের খল তিমিরে সূর্যের মত, শৃগাল ধ্বনির মধ্যে গানের গুরু পঞ্চাননের সংগীতের মত, তা বিরাজ করে ॥ ৬

পরম অকিঞ্চন বৃত্তি অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণরসে মগ্ন হও। হৃদয়ে জাগিয়ে তোল অনুরাগ প্রেম আর কঠিন বিরহ। কুঞ্জে কুঞ্জে নিত্যযুগলের লীলা নিরীক্ষণ কর। লতাপত্রে শ্যামের রূপের ঝলক দেখে সেবা নির্বাহ কর।। ৭

গৌররূপ বিনা প্রেমরসের ভজন ব্যর্থ। শ্রীরূপ সনাতন বিনা ব্রজভাবনা বৃথা। শুকদেবের কৃপা ভিন্ন ভাগবত কোথা থেকে আসবে? ভগবত বিনা রাসলীলা কে গান করবে? ভট্ট গোপাল বিনা সেবাকে সরস করবেন কে? গৌরগণের করুণা ছাড়া প্রীতি-রীতি কি করে বোঝা যাবে? জীব গোসাই বিনা অনন্ত লীলাতত্ত্ব কে দেখাবেন? গোবিন্দের দর্শন বিনা রসরীতি কি করে পাওয়া যাবে? ৮ ॥

ব্যাসসূত্র গম্ভীর জলধি—গভীর সমুদ্র। সেই সমুদ্র মন্থন করে পেতে হয় উত্তম ভক্তিতত্ত্ব রূপ রত্ন। বিভিন্ন মতবাদীরা হল অসুর, ঘোর অনীশ্বর বাদীরা হল মদমত্ত—এরা পায়না সেই তত্ত্বরত্ন। যাঁরা অমর তাঁরাই তার সন্ধান পান ॥ ৯

শুক শ্রুতিসার ও রসসাগর ভাগবত রচনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দলীলা বিলাস তাতে বর্ণিত হল। শ্রীরূপ-সনাতনও সেই লীলা লোক-সমাজে বিখ্যাত করলেন—যে-রস ব্রহ্মারও মেলেনা, সেই রস কলসী ভরে ভরে দান করলেন ॥ ১০

শ্রীরূপ সনাতনের মার্গ বা পন্থাকে বাঁকা ভেবে সূর্যদেব (অনুতপ্ত হয়ে) রাত্রি-কালে এসে তাঁদের চরণ ধরেছেন। রবিরশ্মিকে সুতীক্ষ্ম করার জন্য তিলক মালা চেয়ে নিয়ে তিনি আমরণ তা ধারণ করেছেন। সুন্দর বিপিন পুলিন-গিরি-সরোবর-তরু সমন্বিত বৃন্দাবনকে বক্ষে ধারণ করেছেন তিনি, লজ্জা ত্যাগ করে নাম কীর্তন, নৃত্যগান ও ভক্তি অবলম্বন করেছেন তিনি ॥ ১১

শ্রীরূপ সনাতন চিন্তামণি ব্রজভূমিকে নিত্যনূতন ভাবে অবলোকন করেন। প্রেমে মত্ত হয়ে, মত্তহস্তীর মত ধাবিত হয়ে ব্রজের ধূলিতে সর্বাঙ্গ ধূসর করেন। গুরুর অনুসরণে তাঁদের ভাবসমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাঁরা মুখে বলেন 'গৌরহরি'। ব্রজগোপীদের অনুগা হয়ে চলার আশা পোষণ করেন শ্রীরূপ সনাতন ॥ ১২

সর্বদা নিরালায় থেকে নিত্যযুগলের ধ্যান করবে। গুরু বৈষ্ণবকে দেখে মাটিতে ঝুঁকে মাথা নোয়াবে। আশা বা আশঙ্কা দূর করে হিতকর ভাগবত গান করবে। মুষ্টি ভিক্ষা হবে নিয়মিত বৃত্তি ॥ ১৩

অকিঞ্চনবৃত্তি অবলম্বন করে ধনসম্পদ ত্যাগ করবে। বহু শাস্ত্রপাঠ, বহুমতবাদ, তর্কবুদ্ধি বর্জন করবে। বৃন্দাবনের সরোবর নিকুঞ্জ দেখে হৃদয়ে জাগাবে প্রেম, বারংবার অনুরাগের সঙ্গে উচ্চারণ করবে 'রূপ-সনাতন-গৌরহরি' নাম ॥ ১৪

ভাবে তন্ময়তা এলে সুধীগণ দেহ বিস্মৃত হন। সকলের মধ্যে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ দেখতে পান। হৃদয়ে ভক্তি অবতীর্ণ হলে অপরাধে প্রবৃত্তি শিথিল হয়। সনাতন রূপই উপলব্ধি করেছেন নববৃন্দাবন লীলা বিলাস ॥ ১৫

শ্রীরূপ-সনাতনের শরণ বিনা শ্যামের শরণ অসম্ভব—সে যেন অজ্ঞ লোকের বিনা নৌকায় সমুদ্র পার হতে চাওয়া ॥ ১ ॥

শ্রীগুরু কৃপা তরুই লাভ করে শ্যামবর্ণ। শ্রীগুরু-কৃপায় দীন গৌরগণ দাসের আশা পূর্ণ হোক ॥ ২ ॥

শ্রীমাধুরী জী : মাধুরী বাণী

শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমাধুরী জী ব্রজভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। এই পদাবলী সাতটি ভাগে বা 'মাধুরী'তে বিন্যস্ত—১. বংশীবট মাধুরী ২. উৎকণ্ঠা মাধুরী, ৩. কেলি মাধুরী, ৪. বৃন্দাবন বিহার মাধুরী, ৫. দান মাধুরী, ৬. মান মাধুরী ও ৭. হোরী মাধুরী। প্রত্যেক মাধুরীতে গৌরচন্দ্রের বন্দনা আছে।

কেলি মাধুরী উপসংহারে রচনা কাল দেওয়া আছে—'সংবৎ সোলস সে অসী সাত

অধিক হিয় ধার। কেলি মাধুরী ছটি লিখি শ্রাবণ বদি বুধবার'। পূজ্যপাদ হরিদাস দাস 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' গ্রন্থে লিখেছেন—১৬৭৮ সম্বতে (১৫৪৩ শকাব্দায়) শ্রাবণ মাসে এই পদাবলী রচিত হয়' (পৃ. ১৬০১-২)। কিন্তু 'অসী সাত অধিক' স্পষ্টত ৮৭। অর্থাৎ ১৬৮৭ সম্বৎ। যাই হোক, এই পদাবলীর রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ। ১৬৭৮ সম্বতে হয় ১৬২১-২২ খৃঃ এবং ১৬৮৭ সম্বতে হয় ১৬৩০-৩১ খৃঃ।

১৪ই মার্চ ১৯৩৯ তারিখে বাবা কৃষ্ণদাস মথুরা কুসুম সরোবর থেকে ব্রজের ভজনানন্দী মহাত্মাদের নিকটে প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে 'শ্রীমাধুরী বাণী' প্রকাশ করেন। গ্রন্থের সূচনায় শ্রীমাধুরী জীর নিম্নোক্ত গুরু পরম্পরা দেওয়া হয়েছে—

শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাস, শ্রীমধ্বাচার্য,
শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনরহরি, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ,
শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, শ্রীমহানিধি,
শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীব্যাসতীর্থ, শ্রীলক্ষ্মীপতি,
শ্রীরাঘবেন্দ্র
|
শ্রীঈশ্বর
|
শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
|
তস্য পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়
|
শ্রীমাধুরী জী

সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদে শ্রীমাধবেন্দ্র 'শ্রীরাঘবেন্দ্র' হয়েছেন। কেননা 'শ্রীমাধুরী বাণী'র প্রকাশক কৃষ্ণদাস বাবা তাঁরই প্রকাশিত 'শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এবং বল্লভাচার্য' গ্রন্থের সূচনায় যে গুরুপ্রণালী দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে—

শ্রীকৃষ্ণো ভগবান, ব্রহ্মা নারদে বাদরায়ণঃ।
শ্রীমধ্বঃ পদ্মনাভশ্চ নৃহরির্মাধবশ্চ সঃ॥
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয় ধর্ম মুনিস্ততঃ॥
পুরুষোত্তমো ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থশ্চ তস্য হি।
লক্ষ্মীপতিস্ততঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র যতীশ্বরঃ॥

'শ্রীমাধুরী বাণী'র ভূমিকার প্রকাশক লিখেছেন, "ব্রজমাধুরী সাগরমে মাধুরী জীকা স্থান বহুত উঁচা হৈ। আপ শ্রীরূপ গোস্বামি চরণকে শিষ্য, ব্রজনিষ্ঠ পরম-রসিক মহান, আত্মা হুএ।…বাণীকার কে জন্ম তথা তিরোভাব সময় কা ঠীক ঠীক

পতা নহী মিলতা হৈ। কিন্তু কেলি মাধুরী নামক গ্রন্থকে অন্তিম দোহা মে নিশ্চিত কিয়া জা সকতা হৈ কি আপ কা স্থিতিকাল সম্বৎ সোলহ সৌসে লেকর সম্বত ১৭০০ পর্য্যন্ত হৈ"।

মাধুরী জী যে চৈতন্যপার্ষদ রূপ গোস্বামীর কৃপাধন্য শিষ্য ছিলেন, এ সম্পর্কে প্রমাণ দিয়ে কৃষ্ণদাস বাবা লিখেছেন—

"আপকে দ্বারা বিরচিত গ্রন্থোসে নিশ্চিত পতা চল্‌তা হৈ কি আপ শ্রীরূপ গোস্বামী জীকে কৃপাপাত্র শিষ্য থে। যথা—

শ্রীচৈতন্য সুদৃষ্টিতে বিবিধ ভাঁতি অনুরাগ।
পিয় প্যারী মুখ কমলকো প্ময়ো প্রেমপরাগ।
রূপ মঞ্জরী প্রেমসোঁ কহত বচন সুখ রাস।
শ্রীবংশীবট মাধুরী হোহু সনাতন বাস॥ ৩০৮, বংশীবট মাধুরী।
বহী রূপমঞ্জরী হী ব্রজসে প্রসিদ্ধ শ্রীরূপ গোস্বামী হুএ।—

'সদা সনাতন রূপ বিরাজৈ। বরণত হী জিয় অতিহী লাজৈ'॥ কেলি মাধুরী বিপিন সিন্ধুরস মাধুরী কৃপা করী নিজরূপ। মুক্তা মাধুর বিলাসকে ? নিজকর দিয়ে অনূপ॥

১২৬, কেলি মাধুরী।"

এখানে 'মাধুরী বাণী'র অন্তর্গত কয়েকটি গৌরবন্দনা উদ্ধৃত ও অনূদিত হল।—

উৎকণ্ঠা মাধুরী : শ্রীচৈতন্য স্বরূপকো মনবচ করুঁ প্রণাম।
সদা সনাতন পাইয়ে শ্রী বৃন্দাবনধাম॥ ১

গৌর নাম অরু গৌরতনু অন্তর কৃষ্ণস্বরূপ।
গৌর সাঁবরে দুহুন কো প্রগট একহী রূপ॥ ২॥

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য স্বরূপেরে বাক্যে মনে করহ প্রণাম।
সদা সনাতন প্রাপ্ত হইবে শ্রীবৃন্দাবন ধাম॥ ১

গৌর নাম গৌরতনু অন্তরেতে কৃষ্ণের স্বরূপ।
গৌর শ্যাম দোঁহাকার প্রকটিত অভিন্ন সে রূপ॥ ২॥

বংশীবট মাধুরী : চারু চরণ চৈতন্যচন্দ্র মন বচ কর ধ্যাউঁ।
সদা সনাতন রূপ বাস বৃন্দাবন পাউঁ॥১

অনুবাদ

চৈতন্যচন্দ্রের ও চারুচরণ বাক্যে মনে করি ধ্যান।
সদা সনাতন রূপের বসতি বৃন্দাবনে অভিমান॥১

কেলি মাধুরী ঃ শ্রীচৈতন্যচরণ চিত ধরোঁ। রস বিনোদ কছু বরণন করোঁ ॥
অনুবাদ শ্রীচৈতন্যচরণ চিতে ধরি। নিকুঞ্জবিহার কিছু বর্ণনা করি।
বৃন্দাবন মাধুরী ঃ কৃষ্ণরূপ চৈতন্য কী সদা সনাতন কেলি।
গিরিবন পুলিন নিকুঞ্জগৃহ দ্রুম দ্রোণী বন বেলি ॥ ১
অনুবাদ সদা সনাতন কেলি কৃষ্ণের চৈতন্য রূপ লয়ে।
গিরিবন দ্রোণীদ্রুম পুলিন ও নিকুঞ্জ নিলয়ে ॥
দান মাধুরী ঃ নিশিদিন চিত চিন্তত রহোঁ শ্রীচৈতন্য সরূপ।
বৃন্দাবন রস মাধুরী, সদা সনাতন রূপ ॥
অনুবাদ নিশিদিন চিত চিন্তন করো শ্রীচৈতন্য রূপ।
বৃন্দাবনের শ্রীরস মাধুরী, সদা সনাতন রূপ ॥১

বাবা কৃষ্ণদাসের মতে ব্রজভাষার প্রাচীন কবিদের মধ্যে শ্রী মাধুরী জী শ্রেষ্ঠতম এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ("ব্রজভাষাকে প্রাচীন কবিয়োঁমে শ্রীমাধুরী জী মুখ্যতম হৈ ইসমে রংচকমাত্র সন্দেহ নহী হৈ।")।

কেলি মাধুরীতে 'প্রিয়া প্রিয়তমের (রাধা কৃষ্ণের) দিব্য কেলির অলৌকিক বর্ণনা' আছে। বৃন্দাবন মাধুরীতে শ্রী বৃন্দাবনের সরস বর্ণনা বড়ই মনোরম ঃ

দেখহু প্রিয়ে বিপিন কী শোভা। উপজত হৈ কছু মন কী লোভা।
ছাঁড়হু লতা মান ঘর সংগ। হ্ব হৈ কছুক রংগ মে ভংগ ॥
কহুঁ সুরঙ্গ দারিম সুমনালী। কহুঁ রসভরে করক ফল পালী ॥
কহুঁ তমাল কদম্ব রসালা। কহুঁ ডোলত মধুপন কী মালা ॥
কহুঁ বোলত কোকিল কল-বাণী। লোলত কহু লতা সরসানী ॥

এক্ষেত্রে কবি তাঁর গুরু শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের বর্ণনা অনুসরণ করেছেন—

'ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিল ভংগী শিশিরতা।
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমল মল্লী পরিমল ঃ ॥
ক্বচিদ্ধারাশালী কনক ফলপালী রসভরো।
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্' ॥ ('বিদগ্ধমাধব')

দান মাধুরীতে কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দানকেলিচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত।

শ্রীমনোহর দাস জী ঃ ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি

কবিবর শ্রীমনোহর দাসজী কৃত (সংকলিত) 'ক্ষণদাগীতি চিন্তামণি' ২০১৭ সম্বতে অর্থাৎ ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে মথুরা কুসুম সরোবর থেকে বাবা কৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় বাবা কৃষ্ণদাস জানিয়েছেন—

'কবিবর মনোহর দাসজী ভক্তমাল গ্রন্থের হিন্দী টীকাকার শ্রী প্রিয়াদাসজীর গুরু। এই সংকলন গ্রন্থে তিনি ব্রজলীলার প্রায় সাতচল্লিশ মহানুভাব কবিদের পদসংগ্রহ ক'রে ব্রজলীলার মহিমা দেখিয়েছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জীও ওদিকে তাঁর পূর্বাচার্য মহানুভাব কবিদের পদ সংগ্রহ করে বঙ্গভাষাকে মহত্ত্ব দান করেছেন! উভয় গ্রন্থই ক্ষণদাগীত চিন্তামণি নামে প্রসিদ্ধ। চক্রবর্তী জীর সংগ্রহ পশ্চিম বিভাগ নামে বিখ্যাত। রাত্রিকালে লীলাস্মরণ করার জন্য এ দুই গ্রন্থ লীলাস্মরণকারী গৌড়ীয় বা অন্যান্য বৈষ্ণবদের জীবন স্বরূপ গণ্য হয়ে থাকে। প্রস্তুত গ্রন্থে নিকুঞ্জবিহার বর্ণনা করতে গিয়ে রাধা গোবিন্দের শৃঙ্গার সম্বন্ধীয় ব্রজলীলার সরস উপস্থাপনা করে হয়েছে। এই ব্রজলীলাই সর্বোৎকৃষ্ট—নিকুঞ্জবিহার বা নিত্য বিহারেব প্রাণস্বরূপ।...

গ্রন্থকার প্রতি ক্ষণদার পূর্বে আপন উপাস্যদেব ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর বন্দনা দিয়ে মঙ্গলাচরণ করেছেন—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এটি রীতি—একে 'গৌরচন্দ্র' বলা হয়ে থাকে ["কবিনে হর ক্ষণদাকে পহলে অপনে উপাস্যদেব ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে বন্দনা রূপ মঙ্গলাচরণ কিয়া হৈ জোকি গৌড়ীয় সম্প্রদায় কী পরিপাটী হৈ, জিসে 'গৌরচন্দ্র' কহা যাতা হৈ।"]

কবি মনোহর দাসজী প্রিয়াদাস জীর গুরু! প্রিয়াদাসজী ১৭৬৯ সংবতে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দী ভক্তমালের টীকা সমাপ্ত করেন। এই টীকায় প্রিয়াদাস মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য ও মনোহর জী-র বন্দনা করে লিখেছেন—

'মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনহরণ জুকে
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন,—"প্রিয়াদাস জীর উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার গুরুর নাম ছিল মনোহর। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যে মনোহর দাস 'অনুরাগবল্লী' শেষ করেন তিনিই সম্ভবতঃ প্রিয়াদাসজীর গুরু। এরূপ অনুমানের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ প্রিয়াদাসজীর টীকায় পাওয়া যায় যে তাঁহার গুরু কবি ছিলেন ও বৃন্দাবনে বাস করিতেন। অনুরাগ বল্লীতেও দেখা যায় যে মনোহর দাস কবি ও বৃন্দাবন বাসী। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক কৃষ্ণদাস বা লালদাসজী বলেন যে প্রিয়াদাসজী শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার ভুক্ত ছিলেন (বসুমতী সংস্করণ, বাংলা ভক্তমাল, পৃ. ৪৯) মনোহর দাস নিজেকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্যালক রামচরণ চক্রবর্তীর প্রশিষ্য ও রামশরণ ভট্টাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (অনুরাগ বল্লী, অষ্টম মঞ্জরী, পৃ, ৪৯)। একই যুগে, একই স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্য-পরিবার-ভক্ত মনোহর নামে দুইজন

কবি থাকার সম্ভাবনা অল্প বলিয়া আমার মনে হয় যে অনুরাগ বল্লীর লেখক ঐ প্রিয়াদাসজীর গুরু।" [চৈ. চ. উ. ৫২৮-২৯ পৃঃ]

সুতরাং 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি'র রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে হওয়াই সম্ভব।

অনুরাগবল্লীর মনোহর দাস এবং ব্রজভাষার কবি মনোহর দাস যে একই ব্যক্তি, সে বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি। ব্রজভাষার কবি মনোহর দাস জী তাঁর 'শ্রী রাধারমণ রস সাগর' গ্রন্থের সূচনায় বন্দনা অংশে লিখেছেন—

"অথ শ্রীরাধারমণ রস সাগর নাম লীলা লিখ্যতে
প্রথম প্রণাম গুরু শ্রীরামসরণ নাম,
চট্টরাজ চরণ সরোজ মন ভায়ো হৈ।
কৃপা করি দীনী দিক্ষা সিক্ষা পরিচর্য্যা নিজু,
রাধিকারমণ বৃন্দাবন দরসায়ো হৈ॥
সদ্‌গুণ সমুদ্র দয়াসিন্ধু প্রেম পারাবার,
সীল সদাচার কৌ কবিত্ব জগ ছায়ো হৈ।
তা দিন সফল জন্ম ভয়ো হৈ অনাথ বন্ধু,
মনোহর নাম রাখি মোহি অপনায়ো হৈ॥ ১
ছপৈ—শ্রীচৈতন্য কৃপালু কৃপা করি ভট্ট গোপালৈ।
তিন শ্রীনিবাসাচার্য্য বর্য্য করুণা কৌ আলৈ॥
রামচরণ তিন কৃপা চক্রবর্তী বিখ্যাতা।
রামসরণ চট্টরাজ কৃপা তিন সারহি জ্ঞাতা॥
শুদ্ধ ভক্তি রস রাগ তিন করুণা করি দীক্ষা দঈ।
দাস মনোহর নিত্য গুরু পদধূলী সির পর লঈ॥ ২

এখা'নও দেখা যায় মনোহর নিজেকে রামশরণ চট্টরাজ (ভট্টাচার্য্য?)-এর শিষ্য এবং রামচরণ চক্রবর্তীর প্রশিষ্য বলেছেন। তাঁর গুরু পরম্পরা নিম্নোক্তরূপ—শ্রীচৈতন্য -গোপাল ভট্ট—শ্রীনিবাসাচার্য্য-রামচরণ চক্রবর্তী-রামশরণ চট্টরাজ। সুতরাং অনুরাগ বল্লীর মনোহর দাসই যে ব্রজভাষার কবি, এবং হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসের গুরু মনোহর দাস—এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না।

মনোহর দাসের কাল সম্পর্কে বাবা কৃষ্ণদাসের সম্পাদকীয় মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীরাধারমণ রস সাগর' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"প্রস্তুত গ্রন্থকা রচনা কাল ১৭৫৭ সংবৎ হৈ"। গ্রন্থশেষে কবি মনোহরও লিখেছেন—

'সংবত সতরহ সৈ সতাবন জানি কৈ।
সাবন বদি পংচমী মহোৎসব মানি কৈ"॥

১৭৫৭ সংবৎ অর্থাৎ ১৭০০-১৭০১ খৃষ্টাব্দ!

এ হিসাবেও কবি মনোহর দাসের বর্তমান কাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হয়।

সেকালে কবিবর মনোহর জীকে বৃন্দাবনে রসিক শিরোমণি রূপে মান্য করা হত। বড় বড় মহানুভাব ব্যক্তিরা তাঁর সংসর্গ লাভ করে রসিক হয়ে যেতেন। এ বিষয়ে তাঁর শিষ্য প্রিয়াদাস জী ভক্তমালের টীকার পরিশিষ্টে লিখেছেন—

'রসিকাঈ কবিতাঈ জাহি দীনী তিন পাঈ, ভঈ সরসাঈ হিয়ে নব নব চায় হৈ।
জন মন হরি লাল মনোহর নাম পায়ো, উন হূঁকো মন হরি লীনো তাতে রায় হৈ॥'

ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি

প্রথমা ক্ষণদা

রাগ কল্যাণ (উপতাল)

গৌরগোপাল রস রাস মণ্ডলী মধ্য মণ্ডিত সুরংগী।
রচিত তাণ্ডব কলাপণ্ডিত সিরোরতন বিতনু শতকোটি জিত চারু ভংগী॥
ঝমক করতাল বরতাল মিলি চর্চরী রীঝি গতিলে বজাবত মৃদংগী।
তান অরু মান কল্যাণ গতিভেদ জব লেত সুর সরসতর সুঘর সংগী॥
ভাবভর ভরিত গুরু রচিত গম্ভীর গুণগণন অতিরক্ত দ্রুত কনক অংগী।
অরুণ কর চরণ নখ চন্দ্র কী চন্দ্রিকা চমক লব লক্ষ কৃত বপু অনংগী॥
বাহু আজানু কৃস কটি প্রসর বক্ষসে স্বচ্ছমাল পুহপ পঞ্চরংগী।
বদন রদচ্ছদন সুখ সদন শোভা অমিত শ্রবত ঘূর্ণিত নৈন ভুব তরংগী॥
নিরখি টক থকিত মানো লিখি চিত্রাবলী ত্রিবিধজন তাহি ইকতান তংগী।
হরসতর তরল অবিরল পুলক কুল খচিত চকিত বক্ষত উঠাবত উচ্ছংগী॥
ললিত অংগ সুবলিত কলিত মাধুরী মহক কেসর মিলি মদকুরঙ্গী।
চরণ পরিচরণ বিন আন নহী আস জিয় দাস মনহরণ জন কতকরহুঁ অংগী॥

সুরঙ্গী রসময় গৌরগোপাল রাসমণ্ডলী শোভা করে আছেন। তাণ্ডবকলা পণ্ডিত (নৃত্যপটু)-দের শিরোরত্ন স্বরূপ তিনি শতকোটি মনোজয়ী চারুভঙ্গী রচনা করছেন॥ ঝমক করতাল মিলিয়ে চর্চরী (বসন্ত উৎসবে হাতে তালি দিয়ে গাওয়া বসন্তকালের গান)-গীতে মনোরস ছন্দে বাজছে মৃদঙ্গ। কল্যাণ রাগের সরস সুর ও তান হয়েছে সুন্দর সঙ্গী॥ গুরু গৌরাঙ্গের কনকবরণ দেহ নৃত্যভঙ্গীতে দ্রুত সঞ্চরণশীল—অপূর্ব দিব্যভাব পূরিত তাঁর দেহ। রক্তিম তাঁর করপদ্ম, রক্তিম তাঁর পদনখ, সেই নখচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে এক মুহূর্তেই অতনুর লক্ষতনুর রূপমাধুরী উদ্ভাসিত হয়॥ তাঁর বাহু আজানুলম্বিত, কটিদেশ কৃশ, প্রশস্তবক্ষে শোভা পায় পাঁচরঙা ফুলের সুন্দর মালা। অধর দংশন জনিত সুখ সদন তাঁর শ্রীমুখের অমিত শোভা, আকর্ণ দীঘল নয়নের ঘূর্ণনে বিশ্বভুবন তরঙ্গিত॥ তাঁকে দেখে বিস্ময়ে যেন চিত্রার্পিত হয়ে থাকে সুরাসুর ও মর্তের মানুষ—এক তানের বন্ধনে আবদ্ধ তারা। আনন্দাশ্রুর ধারাবর্ষণে পুলক রোমাঞ্চিত তাঁর দেহ, ঘন ঘন ওঠানামা করে তাঁর বুক॥ হরিনী মত্ত হয় তাঁর সুঠাম ললিত অঙ্গের সৌরভ মাধুরীতে। তাঁর চরণ পরিচর্যা ছাড়া জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—এই অঙ্গীকার করছি আমি মনোহর দাস॥

দ্বিতীয়া ক্ষণদা

(কল্যাণ)

গৌরসুন্দর সুধর রাস মণ্ডল লসত।

সরস সুর গানকে তান বস বিবশ হৈঁ সজল লোঈন মগন কবহুঁ গাবত হসত ॥ ১
বজত মাদক মৃদংগ উঘটত ধা ধা ধলংগ রঙ্গ ভরি কর চরণ চারণ হিয়ো গসত।
মিলিত করতাল ধুনি ধ্যান গতি সবনি মুনি প্রেম রস মাধুরী শ্রবন রসনা রসত ॥ ২
সুনত হী ত্রিবিধ জন সবনিকে একমন পরম আনন্দ ধন অগম মারগ ধসত।
অরত অলাপ মেঁ গ্রসত তন মন করণ এসোঈ ভাগয়া সুখ মনোহর লসিত ॥ ৩

সুঠামতনু গৌরসুন্দর শোভা পাচ্ছেন রাসমণ্ডলে। গানের সরস সুরে ও তানে বিবশ হয়ে সজল নয়নে ভাবমগ্ন তিনি কখনও গাইছেন, কখনও হাসছেন॥ মৃদঙ্গ প্রকাশ করছে মাদক ধ্বনি—'ধা ধা ধলঙ্গ'; সেই বাদ্যরঙ্গে তাঁর হস্ত পদের অপূর্ব সঞ্চালনে হৃদয় মূর্ছিত হয়। সকল মুনির ধ্যানের বিষয় তিনি, করতালের সম্মিলিত ধ্বনির সঙ্গে প্রেমরস মাধুরী প্রকাশ করে শ্রবণ ও রসনাকে পরিতৃপ্ত করেন॥ তাতে অগম্য মার্গ ধ্বংস পায় এবং ত্রিলোকবাসী সকলে একমনে সেই কীর্তন শুনে পরম আনন্দধন লাভ করে। অসৎ আলাপে গ্রস্ত তনুমন নিয়ে মনোহর এই আনন্দকে তাঁর সৌভাগ্য বলে মনে করেন।

তৃতীয় ক্ষণদা

দেখোরী এক গৌরমেহ। নখ শিখতেঁ মানো ধরথো হৈ দেহ। ১
নৃত্য কর মানো প্রেমপবন বশ। নৈন ঝরত মানো বর্ষাঘন রস॥ ২
বরণ বরণ আভূষণ রাজত। মানহুঁ বিজ্জুল মালা সাজত॥ ৩
বিচ বিচ অট্টহাস মানো গর্জনি। থর হরাত হিয় রোম রোম সুনি সুনি ॥ ৪
সীঁচত স্বজনবেলি মানো উলহীঁ। ভনত মনোহর নাহিন তুলহী॥ ৫

দেখ দেখ, এক গৌরমেঘ। নখের ডগায় ভর দিয়ে চলছেন (হাল্কা মেঘের মত)। নৃত্য করছেন যেন প্রেমপবন দ্বারা চালিত হয়ে (পবন চালিত মেঘের মত)। নয়ন থেকে অশ্রু ঝরছে যেন মেঘ থেকে হচ্ছে সঘন বর্ষণ। তাঁর গাত্রবর্ণ আর গাত্রালঙ্কার উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে—যেন মেঘের দেহে বিজুলীমালা। ঘন ঘন শোনা যায় তাঁর অট্টহাসি—যেন মেঘের গর্জন। তা শুনে হিয়া কাঁপে থর্ থর্ করে, রোমে রোমে জাগে রোমাঞ্চ। নয়ন জলে সিক্ত হয় তাঁর স্বজন সহচরেরা—যেন মেঘের ধারাবর্ষণে উদ্গত তরুরাজি। মনোহরদাস বলেন, এর কোন তুলনা নেই।

পঞ্চমী ক্ষণদা

(কল্যাণ)

নিশিদিন ইহৈ সোচ মেরে উর।
কৌন কাজ ব্রজরাজকুঁবর বর ধারয়ো গৌর কলেবর॥ ১
সুখ কো পরম সদন বৃন্দাবন পরিজন নিপট সনেহ।

সো সুখ ছাড়ি বসত নদীয়াপুর সমঝ পরত নাহিঁ এহ ॥ ২
সংকীর্তনরস সংতত বিলসত কৌন মাধুরী তামেঁ।
ভোগীরস সিংগার সার তজি লোভী হোই রহে যামেঁ ॥ ৩
জাকো ভাব করী ঐসী গতি সো সবতেঁ অধিকাঈ।
ইহ অনুমান মনোহর তনমন চরণকমল বলি জাঈ ॥ ৪

নিশিদিন—হে আমার হৃদয়,—একথাই ভেবে দেখ, কোন্ কাজে ব্রজরাজকুমার গৌর-কলেবর ধারণ করলেন। পরম সুখসদন বৃন্দাবন, পরিজনের অকপট স্নেহসুখ ছেড়ে নদীয়াপুরে কেন বসতি করলেন তা বোঝা যায় না। যে সংকীর্তন রসে তাঁর সতত বিলাস, তাতে কি মাধুরী আছে যে রাত্রিকালে ভোগীর কাম্য শৃঙ্গাররস ত্যাগ করে তাতেই (ওই সংকীর্তনেই) লুব্ধ হয়ে থাকেন ?

যাঁর ভাবের গতি ওইরকম, তিনি সবার চেয়ে অধিক (শ্রেষ্ঠ) এই অনুমান করে পদকর্তা মনোহর ওই চরণ কমলে নিজের তনুমন উৎসর্গ করলেন।

সপ্তমী ক্ষণদা

(কাহ্নরী)

অদভুত এক দেখে মৈঁ আজ। কনক ধরাধর কীর্তন ভাঁঝ ॥ ১
থাবর কবহু কবহু জংগমগতি। কবহুক ফিরত চক্রকী আকৃতি ॥ ২
উপরতেঁ ঝরনা বহি আবতি। গহবর মধিকে হরি গুঞ্জরাবতি ॥ ৩
চহুঁদিশ তৈ মুকুলিত বনরাঈ। বিচ বিচ কোঈল কুঁহক নিমাই ॥ ৪
ধরনি কম্পাবতি কম্পনিকাঈ। মুদিত মনোহর বলি বলি যাই ॥ ৫

অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলাম আজ। এক কনকগিরি কীর্তনরত। কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল, কখনও আবার ঘুরপাক খাচ্ছেন। উপর থেকে ঝরণা বয়ে আসছে, গিরিগহ্বরের মধ্যে হরিনাম গুঞ্জরিত হচ্ছে। চতুর্দিকে তার মুকুলিত বনরাজি। ঘন ঘন কোকিল ডাকছে 'নিমাই নিমাই' বলে। সেই ডাকে ধরণী কম্পিত হয়। কম্পিত দেহে আমোদিত মনোহর (সেই কনক গিরির নিকট) আত্মসমর্পণ করেন।

নবমী ক্ষণদা

(ধনাশ্রী)

হরি হরি কৌন কৃপা রস এহ।
ধন্য গৌর ধরণী জহাঁ লোকন অবলোকন হরি গৌরদেহ ॥ ১
বিনহি জতন নব প্রেমরতন সোঁ সবহিনকে য়হাঁ ভরয়ো গেহ।
সবহী রসিক সবহী হরিবল্লভ রাজত য়হা পরস্পর নেহ ॥ ২

হরি হরি, একি কৃপারস! ধন্য সেই গৌড়ভূমি যেখানে ধরণী অবলোকন করেছেন হরি-গৌরের দেহ। অবলীলাক্রমে সকলের গৃহ তিনি নবপ্রেমরতনে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এখানে সকলেই রসিক, সকলেরই বল্লভ বা কান্ত হরি, ভক্তরা সকলে পারস্পরিক স্নেহরসে মুগ্ধ।

দশমী ক্ষণদা

(রাগ-গৌরী)

তুম মত দেখহু গৌরহরি। জো চাহো ঘরবসতি করী।
অরুণ নয়ন জল ঝরত নিরন্তর। দেখত হী সোঁ পৈঠে অন্তর। ১

পুত্র কলত্র পিতা নহীঁ ভাবে। অশ্রুকম্প পুলকাদি করাবেঁ। ২
বল্লভ হোয়ে কৃষ্ণগুণ নাম। অরু বৃন্দাবন তরুতল ধাম। ৩

তোমরা যারা ঘর বসত করতে চাও, তারা গৌরহরিকে দেখোনা। অরুণ নয়নে তাঁর নিরন্তর জল ঝরছে। দেখা মাত্রই তিনি (গৌরহরি) (দ্রষ্টার) অন্তরে প্রবিষ্ট হন। (তোমরা) পুত্রকলত্র পিতার কথা তখন ভুলে যাবে। তোমাদের মধ্যে অশ্রুকম্প পুলকাদির সৃষ্টি হবে। কৃষ্ণ হবেন তোমাদের বল্লভ, তাঁর নামগুণকীর্তন হবে আশ্রয়, আর বৃন্দাবনের তরুতল হবে তোমাদের ধাম।

একাদশী ক্ষণদা

(বিহাগরী)

শচীকে নন্দন আজ দেখি মৈঁ চারু।
বারিজ বদন সুখ সদননি মৃদন কদন মানো লোচন চারু॥
হাব হুলাস বাস মুখ পাননি অধর বিম্ব অতি চারু।
তিলক সুচারু অলক কলরোলনি কর্ণন কুণ্ডল গণ্ডনাসা চারু॥
ভৌঁহন সোহন মোমন গোহন মোহন চিবুক সুচারু।
কুটিল কুন্তলগুচ্ছ পুচ্ছ মোরচন্দ্রিকা রচিহৈ পুহুপ তামে বনে অতি চারু
কঞ্জ করবীর মাল বসন কিংকিনী কটি গৌরবরণ অতি চারু।
নখ শিখি অবলোকি অংগ অংগ পর মদন বারি ডারো জগতকী চারু॥

শচীনন্দনের লাবণ্যময় রূপ আমি দেখলাম। পদ্মমুখখানি সুখের আধার, চারু-লোচন যুগলে যেন মদন বাস করেন। ভাবোল্লসিত মুখমণ্ডলে অতি চারু বিম্বাধর। তাঁর চারু নাসায় সুচারু তিলক; চারু অলকদাম, চারু গণ্ডদেশ, কমনীয় কর্ণকুণ্ডলের ধ্বনি। প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি মনে মনে সেই মোহন চিবুকের সৌন্দর্য্য কীর্তন করি। তাঁর কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছে ময়ূর পুচ্ছের আর ফুলের মুকুট অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করে। কেশচূড়ায় করবীর মালা, কটিতে কিঙ্কিনী, গৌর গাত্রবর্ণ, বসন—সবই অতিচারু। তাঁর আপাদ মস্তক অবলোকন করে মনে হয় তাঁর পার্থিব দেহের প্রতি অঙ্গে স্বয়ং মদনদেব অভিষেক বারি সিঞ্চন করেন।

[উপযুক্ত পদগুলি কৃষ্ণপক্ষে এবং নিম্নোক্ত পদগুলি শুক্লপক্ষে গেয়।]

প্রথম ক্ষণদা

রাগ—গৌরী

জয় জয় শচীকুঁবর বিশ্বম্ভর নাগর বর।
ত্রিজগত পতিত বিলোকি কলাগুরু করুণারস সর্বস বিগ্রহ ধর।
নিজবৃন্দাবন লীলা বিলসত সংকীর্তন গুণগ্রাম বিতত কর।
তান বধান মান অভিনব যুত নৃত্যত ভূষণ ভাব রতন ধর॥
চঞ্চল চরণ বরণ গোরচন লোচন বারিজ বারি প্রণয় দর।
ধীরজ বিরহিত রহিত পরাপর উমগত উর অকুলাত ধরত গর॥
মিলি সহচরগণ রস আস্বাদন প্রেম মগন কীনে হৈ থিরচর।
যা মধি হেতু ন কহত অপরাধা বঞ্চিত হীন সুদীন মনোহর॥

শচীকুমার নাগরবর বিশ্বম্ভরের জয়। ত্রিলোকের পতিতজন তাকিয়ে থাকে করুণা-রসের বিগ্রহ স্বরূপ কলাগুরু শচীনন্দনের দিকে। নিজের (কৃষ্ণের) বৃন্দাবন-লীলা কীর্তন করে তিনি কৃষ্ণগুণাবলী প্রচার করেন। অভিনব ভাবরঙ্গে ভূষিত হয়ে তিনি নৃত্য ও স্তবগান করেন ॥ তাঁর চরণ যুগল চঞ্চল, বর্ণ গোরোচনার মত উজ্জ্বল, তাঁর পদ্মলোচনে দরবিগলিত প্রণয়ধারা। আপন-পর-রহিত তিনি ; অধীর উল্লাসে বিস্তৃত বক্ষপট ধারণে তার গ্রীবা যেন অক্ষম। সহচরগণের সঙ্গে মিলে চরাচর বিশ্বকে প্রেমরস আস্বাদনে নিমগ্ন করেছেন। হীন সুদীন মনোহর নিজের অপরাধের হেতু বলতে পারেন না—কেন তিনি সেই প্রেমরসাস্বাদে বঞ্চিত।

দ্বিতীয়া ক্ষণদা

(কানরী)

জবতেঁ দেখ্যো মৈ গৌর কিশোর।
তবতেঁ ভূলি অপন পৌর ছি জানত নহিঁ কিহি ঠৌর ॥
জাসোঁ অধিকহু তো মন মেরো তাসোঁ ভয়ো উদাস।
লোইন স্রবত গাত অতি সুললিত লৈ লৈ জিয়ো উদাস ॥
বুঝি ন পরত কহাঁ হীনৌ হৈ নিসি বাসর নহিঁ চৈন।
পুছৌতোহি মনোহর হুঁভই কহা গহেলী ঐন ॥

যখন থেকে আমি গৌর কিশোরকে দেখেছি, তখন থেকে আপন পৌরজনকেও ভুলে গেছি। যা ছিল আমার অধিক প্রিয়, তাতেই মন আমার উদাস হল। তাঁর অতি-সুললিত দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে পড়ে, তার অনুভাবে হৃদয় হল উদাস। অবিরাম নিশিবাসরে কেন বঞ্চিত হয়ে আছি বুঝিনা। মনোহরের জিজ্ঞাসা—'আমি কি করে সরাসরি পাগলিনী হয়ে গেলাম ?'

চতুর্থী ক্ষণদা

রাগ কানরী ইকতালা

জৈ জৈ নদিয়া নগর বিহারী।
সুন্দর শ্যাম নাম সুখ অনুভব হেতু জ্যো গৌরবপুধারী ॥
কৃষ্ণ নাম বর রহত মন্দ স্বর গদগদ রোকত বাণী।
লোচন অরুণ প্রবাহ রোবি মানো ছাড়্যো হৈ পানী ॥
পুলকিত কম্পিত তামধি হুংকৃত তুংগত ভাব অনন্ত।
বিরহ জলধি জল মানৌ অপনে বন কুঁদি পরে গুণবন্ত ॥
কবহুঁ ন সুন্যো নৈন নহিঁ দেখ্যো ঐসী ভাব বিলাস।
সমঝ ন শকত তৌউ ফিরি বরণত নিলজ মনোহর দাস ॥

জয় জয় নদীয়া নগর বিহারী।
সুন্দর শ্যাম নামসুখ অনুভব হেতু যিনি গৌর বপুধারী ॥
কৃষ্ণনাম বর রসনায় মৃদুস্বর গদগদ নিরুদ্ধবানী।
রুদ্ধ সে জলধারা অরুণলোচণ পথে সহসা-ই বেগবতী জানি ॥

পুলকিত কম্পিত ঘন ঘন হুংকৃত তুংগিত ভাব অনন্ত।
বিরহ জলধি জল তরঙ্গ উছলিত প্রভু, পুনঃ তরণী ভাসন্ত ॥
কভু নাহি শুনি, কভু নয়নে না হেরি সেই অনুপম ভাব বিলাস।
বুঝিতে শকতি নাহি, কহিতে প্রয়াসী তবু, নিলাজ এ মনোহর দাস ॥

দশমী ক্ষণদা

(কল্যাণ)

রাস মণ্ডল বনে নৃত্য নীকী বনী।
গৌরগোবিন্দকে নৈন অরবিন্দ সো ছুটত আনন্দ মরকন্দ চহুঁদিশি ধনী ॥
তালবশ মৃদু চরণ ধরণ ধরিনী হুলসি বিলসি হস্তক ভেদ চলনি লোইন অনী।
পুলক আপাদঘন কম্পভর থর হরণ পরত প্রস্বেদ সুরভোপ ভারী বনী ॥
অসিত সিত আরকত ধরত জড়তা জবহিঁ তবহিঁ ঠাড়ে রহত গহত বানিকফণী।
নিপট অবসন্ন জবতবহি খিতি ধুকি পরত অংগনহি হনতি গতিস্বাসকী নিগমনী ॥
তা সমৈ জগতমেঁ জীব জেতিক বসত প্রেম আনন্দকে হোত সগরে ধনী।
চকিত সব পারিষদ সবদ মুখমে মিল্যো লগী টকটকী এহ সুখ মনোহর ভনী ॥

দশমী ক্ষণদা

রাসমণ্ডল পরে নৃত্য অমৃত ঝরে, নাচে ওই গৌরগোবিন্দ
ধন্য চতুর্দিশি – সুধা ধারা বরষী যুগল নয়ন-অরবিন্দ।
তাল বশীভূত হস্তপদযুত উলসিত বিলসিত লাবণ্যপুঞ্জ
পুলক আপাদ ঘন কম্পন থরহর স্বেদ অমৃতরসে ভরিল নিকুঞ্জ।
কৃষ্ণশ্বেত কভু রক্তিম অঙ্গ ফণী-মণিসম থির চঞ্চল রঙ্গ
কভু অতি অবসাদ ধরণী পতন কভু নিশ্বাস রহিত বিভঙ্গ।
ধন্য সে-কাল-জন প্রাপত প্রেমধন ধনী সবে সে আনন্দ ধনে
ধন্য সব পারিষদ, সবে করে জয়নাদ—হেরিয়া আমোদিত মনোহর ভনে ॥

একাদশী ক্ষণদা

(কল্যাণ)

গৌরগোবিন্দ ব্রজচন্দ আনন্দনিধি কীর্তনহিঁ বণি নাচত রসিকজন সংগিয়া।
প্রিয় গদাধর লিয়ে প্রেম পুলকিত হিয়ে সঘন হরি হরি বোলি থকিতগতি ভংগিয়া ॥
প্রকট কংচন বরণ অন্তর নবীন ঘন রাধিকা ভাব ভর মত্তরস রংগিয়া।
গাবত মধুর বৈন শ্রবত অরুণিত নৈন দুঃখিত জন নিরখি প্রভু করত উছংগিয়া ॥
মৃদঙ্গ করতালবর মিলিত সুর পরস্পর শ্রবণ আনন্দ করত বজত উতংগিয়া।
পতিত জন পাবন হে নিজচরণ রাখিলে তুম জগন্নাথ গতি করুণরস অংগিয়া।

গৌর গোবিন্দ শ্রীব্রজচন্দ কীর্তনানন্দে নাচে রসজন সঙ্গে।
প্রিয় গদাধর লয়ে প্রেম পুলকিত হিয়ে হরি হরি বলে প্রভু মোহিত বিভঙ্গে।
প্রকট হেমবরণ অন্তর নবীন ঘন রাধিকার ভাবরসে প্রেমতরঙ্গে।

গাহিছে মধুর বাণী নয়নে ঝরয়ে পানি
দুঃখিত জনে হেরি টানিছে উছঙ্গে।
মৃদঙ্গ করতাল মিলিত এ সুরজাল শ্রবণানন্দতানে বাজিছে উতঙ্গে।
তার হে পতিত জনে, রাখ তব শ্রীচরণে
জগন্নাথ তুমি সকরুণ অঙ্গে। (উছঙ্গে—বুকে, কোলে। উতঙ্গে—উচ্চে)

ত্রয়োদশী ক্ষণদা

শচীনন্দন রসরূপ।
প্রগট গৌরবরণ তন ভাবিত অন্তর শ্যাম স্বরূপ॥
সহজ সুবাস হাস রস আনন লোচন কমল স্বরূপ।
হেরত সহজ বেধত নাগরি হিয় উর নৈনন কে স্বরূপ॥
ভাব তিলক শ্বেতবসন কটি পদতল কমল স্বরূপ।
পদবিন্যাস চারু হস্তক গতি মোহত জগত স্বরূপ॥
হরি হরি বুলাবতি অংগুরী ফিরাবতি উপমা নহী স্বরূপ॥
বরসত প্রেম ছেম সকল জীব অংগ অংগ মদন স্বরূপ॥

শচীনন্দন রসরূপ।
প্রকট গৌরতনু অন্তরভাবিত জনু শ্যামর কান্ত স্বরূপ॥
সহজ সুবাস হাস রসময় মুখভাষ লোচন কমল-স্বরূপ॥
দৃষ্টি-শর নিরখিয়া কাতর নাগরী হিয়া,—সে হৃদয় নবনী স্বরূপ॥
কপালে তিলকখানি, শ্বেত বসন জানি, পদতল কমল স্বরূপ।
পদবিন্যাস চারু হস্ত মুদ্রা চারু, জগতের মোহন স্বরূপ॥
মুখে বলে 'হরি' 'হরি', করে জপমালা ধরি', অনুপম তাঁহার স্বরূপ।
প্রেম বারি বরষিয়া, জগজনে ঋদ্ধি দিয়া সর্বঅঙ্গ মদন স্বরূপ॥

শ্রীসরস মাধুরীজী ঃ সরস সাগর

শ্রীশুক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীসরস মাধুরীজী 'সরস সাগর' গ্রন্থে প্রায় তিন হাজার পদ রচনা করেছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপুতানায় স্থানে স্থানে বর্তমান। এঁদের উপাসনা প্রণালী মাধুর্যভাবেই। সুদূর জয়পুরে বাস করে কবি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক যে পদাবলী রচনা করেছেন, তাতে প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব অনুভূত হয়। সরস-মাধুরীজী নিজেকে শ্রীগৌরাঙ্গের দাসী জ্ঞান করে লিখেছেন—

'জান সুঅবসর সুভগ মহাপ্রভু অপনে জন অভিলাষী।
প্রগট হোয় নিজদর্শন দীনো সরস মাধুরী দাসী॥

অনুবাদ

শুভক্ষণে ভগবান মহাপ্রভু হইলেন আপন জনের অভিলাষী।
প্রকটিত অপরূপ রূপ-দরশন-সুখ-সরস মাধুরী তাঁর দাসী॥

'সরস সাগর' গ্রন্থের ৩য় ভাগে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজীকো জন্মবধাই" শীর্ষক ৫৫টি পদ আছে। এখানে একটি পদ উদ্ধৃত হল।—

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রগটায়ে। গৌরাঙ্গ (ধ্রু)
কলিমল হরণ করণ পাবন জন পতিত উদ্ধারণকো আয়ে॥ গৌ°
লিয়ো জন্ম জগদীশ ঈশ হরি সন্ত ভক্ত সব হরষায়ে।
গুণিজন জুরি আয়ে তিঁহি অবসর সাজবজা গুণ গায়ে॥ গৌ°
হোরী দিন শুভ জান আন কর রঙ্গ পরস্পর ছিরকায়ে।
অবির গুলাল উড়াই অতিহী মনু বহুরঙ্গ বাদর ছায়ে॥ গৌ°
ভীজি রহে অনুরাগ রঙ্গমে তন মন মাঁহী পুলকায়ে।
সরস মাধুরী মহামহোৎসব লখি লোচন মন মগনায়ে॥ গৌ°

অনুবাদ

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজি মর্তলোকে হইলা অবতার।
কলি কল্মষ নাশি' পতিত জনেরে সবে করিতে উদ্ধার॥
জগদীশ-আবির্ভাবে সন্তভক্তজনে আজি হরষিত প্রাণ।
গুণিজন মিলি সবে শুভক্ষণে জুড়িলেন হরি গুণগান॥
শুভ হোরীদিনে সবে পরস্পরে অনুরাগে ফাগুয়া ছিটায়—
আবীর গুলাল ওড়ে রঙীন মেঘের মত আকাশের গায়।
অনুরাগ রসসিক্ত রঙ্গরসে পুলকিত দেহমন প্রাণ
মহামহোৎসব হেরি সরস মাধুরী মানে সার্থক নয়ান॥

শ্রীপ্রিয়াদাসজী

শ্রী প্রিয়াদাস জী রচিত (ভক্তমালের টীকা) 'ভক্তিরস বোধিনী'র রচনা সমাপ্তিকাল ১৭৬৯ সংবৎ। তাঁর রচিত 'রসিকমোহিনী'র রচনাকাল ১৭৯৪ সংবৎ—এ থেকে অনুমান করা যায় যে মোটামুটি ১৭৪০ সংবৎ (১৬৮৪ খ্রীঃ)-এর কিছু আগে তাঁর জন্ম। সুরত নগরের রাজপুরা গ্রামে তাঁর জন্ম। নবীন বয়সে তিনি বৃন্দাবনে এসে শ্রীমনোহর দাসের শিষ্য হন এবং কিছুকাল তীর্থভ্রমণে কাটান। প্রয়াগ, চিত্রকূট প্রভৃতি তীর্থ ঘুরে জয়পুরে পৌঁছান। এখানে গলতা গদীতে নাভাজী স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় নাভা স্বামী তাঁকে ভক্তমালের টীকা লিখতে বলেন।

ভক্তিরসবোধিনী টীকায় প্রিয়াদাসজী তাঁর গুরু শ্রীমনোহর দাসজী সম্পর্কে লিখেছেন—"রসিকাঈ কবিতাঈ জিহ্নী দীনী তিনী পাঈ ভঈ সরসাঈ হিয়ে নব নব চায় হৈঁ। উর রঙ্গ ভবন মে রাধিকা রবন বসৈঁ লসৈঁ জ্যোঁ মুকুর মধ্য প্রতিবিম্ব ভয়ে হৈঁ। রসিক সমাজমে বিরাজ রসরাজ কহৈঁ মুখ সব ফুলৈঁ সুখ সমুদায় হৈঁ। জন মন হরি লাল মনোহর নাব পায়ো উনহুঁ কো মন হরি লীনো তাতে রায় হৈ।

[৬৩০ কবিত্ত]

প্রিয়দাসজী লিখিত প্রধান পাঁচটি গ্রন্থ—অনন্য মোদিনী, চাহবেলী, ভক্তসুমরিণী, রসিকমোহনী, আর ভক্তিরসবোধিনী টীকা। প্রতিটি রচনার আরম্ভে তিনি গুরুবর্গের বন্দনা করেছেন।—

'রসিক মোহনী'তে—'মহাপ্রভু চৈতন্য হরিরসিক মনোহর নাম।
সুমিরি চরণ অরবিন্দ বর বরনৌঁ মহিমা ধাম ॥ ১
শ্রীগুপাল রাধারমণ বিপিন বিহারী প্রাণ।
ঐ সে শ্রীজুত রূপ জু দাস সনাতন দসে ॥ ২
প্রগট করী ব্রজ ভূমি মধি শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
তাকী ছবি কবি কহি সকে সব জন মন অভিরাম ॥ ৩

'অনন্য মোদিনী'তে—'শ্রীচৈতন্য মনহরণ ভজ, শ্রীনিত্যানন্দ সংগ।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরিষদ, জৈসে অংগী অংগ ॥ ১
রসিক শিরোমণি বিজ্ঞবর, শ্রীমদ রূপ অনূপ।
সদা সনাতন ধরি হিয়ে, দোউ এক স্বরূপ ॥ ২

'চাহবেলী'তে—

হা হা শ্রীমনহরণ মহাপ্রভু, শ্রী নিত্যানন্দ গাউঁ।
অমিত প্রেমফল দিএ সবন কোঁ, এক বুঁদরস পাউঁ ॥ ১
হা হা শ্রীঅদ্বৈত গদাধব, শ্রীনরহরি সরকার।
কীজৈ কৃপা তুচ্ছ জন হু পৈ, যাহী হিত অবতার ॥ ২
হা হা শ্রীমত রূপ সনাতন, অদ্ভুত রস আচারজ।
কৃপারঞ্জ রঞ্জিত অবলোকনি, দৈ কীজৈ মম কারজ ॥ ৩
হা হা শ্রীমদ্ভট্ট গোসাঁঈ, শ্রীগোপালজু নাম।
রাধারমণ রূপ গুণ সম্পত্তি, বিলসত আঠোঁ জাম ॥ ৪
হা হা শ্রীমতদাস গোসাঁই, উৎকণ্ঠিত নিশি-ভোর।
অচরজ সহীগুণ বোম বোম প্রতি, ঝলকত যুগল কিশোর ॥ ৫
হা হা শ্রীমত জীব গোসাঁঈ, বড়ে রসিক গম্ভীর।
জো রস উরমেঁ রহত নিরন্তর, মো দৈ মেটৌ পীর ॥ ৬
হা হা শ্রীআচারজ ঠাকুর, ভাব রসমঈ মূরতি।
মনমানী রসসানী জোরী, দৈ করি কীজৈ পূরতি ॥ ৭
হা হা শ্রীচৈতন্য পারষদ, অগিনিত বার ন পার।
য়হ সুনি করৌ সবৈ করুনা কছু, অপনী ওর নিহারি ॥ ৮…

ভক্ত সুমিরনী

সুমিরৌ শ্রীমনহরণ অনূপ।	মহাপ্রভু চৈতন্য স্বরূপ ॥১
শ্রীরঘুনাথ গুসাঈঁ নাম	সুমিরৌ জো চাহত হো স্যাম ॥ ৯৩
ভজিলে শ্রীনিত্যানন্দ রাম।	উর আবত বৃন্দাবন ধাম ॥ ৯৪
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।	কলি অবতার কিয়ো জগ ধন্য ॥ ৯৫

শ্রীরামহরিজী

শ্রীরামহরির পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে কেবল এইটুকু জানা যায়ে যে তিনি গোপালভট্ট গোস্বামীব শিষ্য পরম্পরায় বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-রমণজীর সেবক হয়েছিলেন। প্রত্যেক গ্রন্থে তিনি নিজ উপাস্যরূপে শ্রীশচীনন্দন

গৌরহরির বন্দনা দিয়ে মঙ্গলাচরণ করেছেন। তিনি ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজীর পৌত্র বৈষ্ণবদাসের সমসাময়িক ছিলেন।

তাঁর রচনার মধ্যে বুধিবিলাস, সতহংসী, বোধবাওনী, রসপাঁচসী, লঘুনামাবলী, লঘুশব্দাবলী, প্রেমপত্রী, বারহখড়ী ককো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বুধিবিলাসে' প্রেমভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ আছে। 'রসপাঁচসী'তে নায়ক নায়িকার অঙ্গসম্বন্ধী গুণের বিচার আছে। 'প্রেমপত্রী'তে বিরহবিধুরা ব্রজগোপীরা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পত্র দিচ্ছেন।

'লঘু শব্দাবলী'র সূচনায় ভক্তকবি বলেছেন—

'অঙ্ঘ্রিকমল রাধারমণ শচীসূন গোপাল। শ্রীমুকুন্দ বৃন্দাবিপিন সুমিরি মিটৈ জঞ্জাল ॥'

'ধ্যানরহসি ককো'র সমাপ্তি শ্লোকে কবি গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন—

'সংবত অষ্টদস বীস হৈ সাবন ভাবন মান'।

১৮২০ সংবৎ অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং রামহরি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

সূরদাস মদনমোহন

এঁর সম্পর্কে পূজ্যপাদ হরিদাস গোস্বামী তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখেছেন, "সুরদাস মদনমোহন—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য। প্রকৃত নাম সুরধ্বজ। আকবরের রাজত্বকালে ইনি 'সণ্ডীলে' নামক স্থানের সুবাদার ছিলেন।… ইনি ঠাকুর-সেবার অবসরে পদাবলি রচনা করিতেন। তাহার নাম হয়—'সুহৃদ্বানী'। তাঁহার কবিতা সরস ও উচ্চস্থানীয়। ব্রজভাষায় ১০৫টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে।"

এই আলোচনায় দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যপ্রভাব ব্রজভাষায়ও স্বর্ণপ্রসূ হয়েছিল। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রূপ-সনাতন-গোপালভট্টের শিষ্যপরম্পরায় বৃন্দাবনের আঞ্চলিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলাকে ভিত্তি করে যে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল চৈতন্যপ্রেরণা। ব্রজধামের এই কবিরা ছিলেন গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা; তারই প্রমাণ ব্রজভাষায় রচিত তাঁদের অনিন্দ্যসুন্দর গৌরপদাবলী।

নবম অধ্যায়

হিন্দী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের পুণ্যচরিত ও ভক্তি সাধনার উল্লেখ আছে।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদাসজী হিন্দী ভাষায় ভক্তচরিতমালা ভক্তমাল রচনা করেন। ড. বিমান বিহারী মজুমদারের মতে ভক্তমালের রচনাকাল আনুমানিক ১৬৫০-১৭০০ খ্রীঃ (চৈতন্য চরিতের উপাদান, পৃ. ৫২৮)। বৃন্দাবন বাসী প্রিয়াদাস জী। ব্রজভাষা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই এঁর কথা আলোচনা করেছি ১৭৬৯ সংবতে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রিয়দাস জী ভক্তমালের হিন্দী টীকা রচনা করেন। মুঙ্গের জেলার কবি যজ্ঞদত্ত শর্মা ১৯৭৩ সংবতে অথাৎ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দী চরিতকাব্য শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস রচনা করেন। ১৯৩৩-৩৫ খ্রীস্টাব্দে গোরখপুর গীতা প্রেস থেকে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী প্রণীত হিন্দী গদ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতাবলী ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নাভাজী তাঁর গ্রন্থে বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ গুসাঁই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছপ্পয় লিখেছেন এবং গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, মধু গুঁসাইজী কৃষ্ণদাস ও ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, ভূগর্ভ, কাশীশ্বর, প্রতাপরুদ্র ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম মাত্র উল্লেখ করেছেন।

নাভাজী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি পূর্ব দেশে বিদিত অবতার'—গৌড় দেশে পাষণ্ড দমন করে সেই করুণাসাগর, অগতির গতি, মানুষকে ভজনপরায়ণ করেছেন। দশধার থেকে নরক যখন গ্রাস করতে আসে, তখন মহৎ জনের উপাস্য সেই নাম নিলে মানুষ নিষ্পাপ হয়, তার নরকভয় দূরীভূত হয়। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য-ভক্তি দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—তাঁরা উভয়ে পূর্বদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

ছপ্পয়—গৌড়দেশ পাষণ্ড মেটি কিয়ো ভজন পরায়ণ
করুণা সিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন।
দশ ধারস আক্রান্ত মহত জনচরণ উপাসে নাম লেত
নিষ্পাপ দুরিত তিহি নরকে নামে।
অবতার বিদিত পুরব মহী ; উভৈ মহত দেহী ধরী।
শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্যকী, ভক্তি দশোদিশি বিস্তরী ॥ ৭২ ॥

নাভাজী রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পর্কে বলেছেন—তাকে উৎকল দেশের সকলে 'বৈনতেয়' বা 'গরুড়' বলতেন কেননা তিনি গরুড়ের মত মন্দিরের সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

জগন্নাথ পদপ্রীতি নিরন্তর করত স্ববাসী।
ভাগবত ধর্ম প্রধান প্রমন লীলাচল বাসী ॥
উৎকল দেশ উড়ীসানগর বৈনতেয় সবকোউ কহৈ।
শ্রীরঘুনাথ গুসাঁই গরুঢ় জ্যোঁ সিংহপেটরি ঠড়ে রহৈ ॥ ৭১

প্রিয়াদাসজী তাঁর 'ভক্তিরসবোধিনী' টীকায় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ করে বলেছেন 'জসুমতি সুত (যশোমতী সুত শ্রীকৃষ্ণ) সোঈ শচীসুত গৌর ভয়ে।'

গোপিনকে অনুরাগ আগে আপ হরি শ্যাম জান্যো যহ লাল রংগ কৈসে আবে তনমেঁ॥ এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী খুল্যো। যো সুরংগ রংগ অংগ রংগে বনমেঁ॥ শ্যামতাঈ মাঁঝা সো ললাঈ হু সমাই জাহি তাসে মেরে জান ফিরি আঈ যহ মনমেঁ! জসুমতি সুত যোঈ শচী সুত গৌর ভয়ে নয়ে নয়ে নেহ চীজ নাচে নিজ গনমেঁ॥ ৩৩০॥ আবে কভু প্রেম হেমপিণ্ডবত তন হোত কভু সন্ধি সন্ধি ছুটি অংগ বাঢ় জাত হৈ॥ ঔর এক ন্যারী রীতি অশ্রু পিচকারী মনো উভৈ লাল প্যারী ভবসাগর সমাত হৈ। ঈশতা বখানি কহা করো সো প্রমাণ যাকো জগন্নাথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাৎ হৈ। চতুর্ভুজ ষড়ভুজ রূপ লে দিখায় দিয়ো জো অনূপ হিত বাত পাত পাত হৈ॥ ৩৩১॥ কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগত্ প্রগট ভয়ো অতি অভিরাম লে মহন্ত দেহী ধরো হৈ॥ জিতো গৌড় দেশ ভক্তি লেশহূন জানে কোউ সোউ প্রেম সাগর মেঁ বোরয়ো কাহি হরীহৈ ভয়ে শির মৌর এক এক জন তারিবে কো ধারিবে কো কৌণ সাখি পোথিন মেঁ ধরী হৈ। কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে দুষ্ট তাপৈ ঐসেহু মগন কিয়ো ভক্তি ভূমি ভরী হৈ॥ ৩৩২

রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পর্কে প্রিয়াদাসজী বলেছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করতে থাকেন—'মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য জুকী আজ্ঞা পাই আয়ে বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড বাস কীয়ো হৈ। ৩২৮

প্রিয়াদাসজী লিখেছেন, লোকনাথ গোস্বামী ভাগবত গান করতেন এবং ভাগবত পাঠক মাত্রই তাঁর অতি প্রিয় ছিলেন ; কবিকর্ণপুর বৃন্দাবনে এলে তাঁর গায়ে শ্রীরূপের নিশ্বাস লাগছিল আগুনের হল্‌কার মত (প্রেমাবেগই এর কারণ) ; ভূগর্ভ গোস্বামী বৃন্দাবনের গোবিন্দকুঞ্জে বাস করতেন ; কাশীপুর গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে এসে গোবিন্দ সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন ; মহাপ্রভুর কৃপাধন্য প্রবোধানন্দের গ্রন্থ শুনে কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো। রাজা প্রতাপরুদ্র যখন কিছুতেই প্রভুর কৃপা পাচ্ছিলেন না, তখন একদিন প্রভু রথের সামনে নাচবার সময় তিনি প্রভুর পায়ে পড়লেন ; প্রভু তাকে আলিঙ্গন করে প্রেমদান করলেন।

নাভাজী বিষ্ণুপুরীর প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাম করেননি।

নাম ত্রিলোচন শিষ্য সুর শশি সদৃশ উজাগর।
গিরা গঙ্গ উনহারি কাব্যরচনা প্রেমাকর
আচারজ হরিদাস অতুলবল আনন্দ দায়ন॥
তিহিঁ মারগ বল্লভ বিদিত প্রভু পদ্ধতি পরায়ণ।
নবধা প্রধান সেবা সুদৃঢ়, মনবচক্রম হরিচরণ রতি।
বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় দৃঢ় জ্ঞানদেব গম্ভীর মতি॥' ৪৬

কিন্তু প্রিয়াদাসজী তাঁর টীকায় লিখেছেন—

'মহাপ্রভু জগন্নাথক্ষেত্রে ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হয়ে বললেন, 'কাশীপুরীতে বিষ্ণুপুরীর মোক্ষকামনা হয়েছে।' তিনি বিষ্ণুপুরীকে এক চিঠিতে লিখলেন, 'আপনি আমার জন্য

সুন্দর একটি মণিমালা পাঠিয়ে দিন।' কথাটি বুঝে নিয়ে বিষ্ণুপুরী ভাগবত রত্ন সমূহ তাকে পাঠিয়ে দিলেন।'—

'জগন্নাথ ক্ষেত্র মাঝ বৈঠে মহাপ্রভু জবে
চহুঁ ওর ভক্তভূপ ভীর অতি ছাঈ হৈ।
বোলে বিষ্ণুপুরী পুরীকাশী মধ্য রহে জাতে
জানিয়ো মোক্ষ চাহনীকী মন আইহৈ।
লিখীপ্রভু চীঠী আপ মনিগণমালা এক দীজিএ পঠাই
মোহি লাগত সুহাই হৈ।
জান লঈ বাত নিধি ভাগবত রত্ন দাস
দই পঠৈ আদি ভুক্তি খোদিকৈ বহাই হৈ॥

প্রিয়াদাসজী ছিলেন শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য পরম্পরায় শ্রীমনোহর দাসের শিষ্য। 'ভক্তিরসবোধিনী' টীকার মঙ্গলাচরণে তিনি মহাপ্রভুর ও তাঁর গুরুর বন্দনা করেছেন এবং নাভাজীর আজ্ঞাপ্রাপ্তির কথা বলেছেন।—

'মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনোহরণ জুকে চরণকো ধ্যান মেরে, নাম মুখ গাইয়ে।
তাহী সময় নাভাজুনে আজ্ঞা দই লই ধারি টীকা বিস্তার ভক্তমালকো সুনাইয়ে।
কীজিয়ে কবিত্ববন্ধ ছন্দ অতি প্যার লগৈ জগৈ জগমাহি কহি বাণী বিরমাইয়ে।
জানো নিজমতি ঐপৈ শুন্যো ভাগবত শুক দ্রুমণি প্রবেশ কিয়ো ঐসেহী কহাইয়ে॥

বৃন্দাবনের বাঙালী ভক্তদের ভক্তিভাবের প্রশংসা করে হিন্দী ভক্তমালে বলা হয়েছে—'যো ভাব ঔর প্রেম উস্‌দেশকে রহনেবালোঁকা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, লিখা নহী যা শক্‌তা। অব্‌ভী বৃন্দাবনমে আধে বেহী লোক হৈঁ ভগবৎ ভজন ঔর কীর্ত্তনমে রহতে হৈঁ।'

শ্রীযজ্ঞদত্ত শর্মা : শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস

হিন্দী সাহিত্যে একটি অপূর্ব গ্রন্থ 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস'। শ্রীতুলসী দাসজীর বিখ্যাত'রামচরিত মানস' কাব্যের ছন্দোরীতি অনুসরণ করে মুঙ্গেরের বিষ্ণুপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞদত্ত শর্মা ১৯৭৩ সংবত অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'গৌরাঙ্গ চরিত মানস' কাব্যের প্রথম খণ্ড [পূর্বঘাট-আদিখণ্ড] রচনা করেন। পূর্বঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী (মিত্র অ্যাণ্ড কোং-এর মালিক) শ্রীবাবু সুধন্য কুমার মিত্র এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পর পর চারখণ্ড প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পর হিন্দী বঙ্গবাসী পত্রিকায় (২৪ আগস্ট, ১৯১৬, সোমবার) গ্রন্থসমালোচনায় বলা হয়—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কা বঙ্গালে কে নবদ্বীপ জিলে মেঁ আবির্ভাব হুআ থা।...ইনকে চরিত বঙ্গভাষামেঁ বহুতরে গ্রন্থ হৈ, হিন্দীমে নহীঁ। ইসমে অন্যান্য প্রান্তকে বহুতরে মনুষ্য ইনকে চরিতমে অপরিচিত হৈ। গ্রন্থকর্তা মহাশয়নে ইস পুস্তক কো রচনা কর বড়া কাম কিয়া হৈ। আপনে ইসকী পদ্যময়ী রচনা কী হৈ+পুস্তক উপাদেয় হৈ+কিন্তু ইসকা মূল্য কুছ অধিক প্রতীত হোতা হৈ...।" প্রথম খণ্ডটির মূল্য ছিল ছ'আনা।

প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশক ও লেখককে অনেকে অভিনন্দিত করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে কয়েকটি অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত হয়। প্রকাশককে পত্র দেন বৃন্দাবন-কুসুমসরোবর নিবাসী শ্রীহরিচরণ দাস, মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার বামাচরণ বাবু, কলকাতা থেকে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং মুর্শিদাবাদ কাসিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লেখেন—শ্রীপুরীধামমেঁ 'শ্রীগোবিন্দদাদা দ্বারা শ্রীগ্রন্থকা পতা পায়া থা, সো আজ পূর্ণতয়া লাভ কিয়া। ঠীক হৈ, মিত্র কোম্পানীকে অর্থ মিত্রতা হী মেঁ ব্যয় হোতা হৈ।' (অনুবাদ)

মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র লেখেন—'ভারতবর্ষমেঁ প্রায়ঃ মনুষ্য হিন্দী বোলতে ব বুঝতে হৈ। অতএব উক্ত গ্রন্থ কী পরম আবশ্যকতা থী। (অনুবাদ) ৮/৫/১৬ ইং

বৃন্দাবনধাম নিবাসী মধুসূদন গোস্বামী গ্রন্থকর্তাকে লেখেন—

'সর্বাধিক গুণ আপমেঁ য়হ হৈ কি আপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে অনন্য অনুভব হৈ।… য়হ গ্রন্থ দোহা চৌপাঈ ছন্দোমে বড়া সরস ঔর মনোহর রচিত হুআ হৈ ইসকো পঢ় কর হম পরম সন্তুষ্ট হুএ হৈ। ইস গ্রন্থকা প্রচার জীবগণকে মঙ্গলকা বিধায়ক হোগা'। বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী লেখেন—'হর্ষকা অবসর হোই কি ভগবন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ লীলাকে স্ফুট প্রধানাংশোঁকা অনুভব অব সংস্কৃত বঙ্গভাষা অনভিজ্ঞ জন ভী 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস 'সে অনায়াস পূর্বক করেঙ্গে…।' বৃন্দাবনের দামোদর আচার্য্য লেখেন—'সংসার কী কালিমাঁকো দূর করনা হী শ্রীশ্রীপ্রেমাবতার ভগবচ্ছ্রী গৌরচন্দ্রকা উদয় হৈ। য়হ গ্রন্থ আপকা হিন্দীভাষা ভাষিয়োঁকে লিয়ে অমূল্য বস্তু হৈ।…১২/৮/১৬ ইং

নামকরণ ঃ

শ্রীতুলসীদাসজী রামভক্তিকে সুরধুনীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—

'রামভক্তি জহঁ সুরসরি ধারা। সরসই ব্রহ্ম বিচার প্রচারা ॥ (বালকাণ্ড)

কাব্যের উপসংহারে তিনি বলেছেন—

পুণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞানভক্তিপ্রদং
মায়ামোহমলাপহং সুবিমলং প্রেমাম্বুপূরং শুভম্।
শ্রীমদ্রামচরিত্রমানসমিদং ভক্ত্যাবগাহন্তি যে
তে সংসার পতঙ্গঘোর কিরণৈর্দহ্যন্তি নো মানবাঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকল কলিকলুষ বিধ্বংসনে

সপ্তম ঃ সোপান ঃ সমাপ্ত ঃ

অর্থাৎ—ভক্তরা যাতে অবগাহন করে কলিকলুষ ও সংসার দাহ থেকে মুক্ত হ'তে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে কবি এই মঙ্গলজনক জ্ঞান-ভক্তিপ্রদ মায়ামোহ নিবারক প্রেমাম্বুপূরিত সুবিমল রামচরিত রূপ মানস সরোবর রচনা করেছেন। রামায়ণের সপ্তকাণ্ড এই মানস সরোবরে অবতরণের সাতটি সোপান বা সিঁড়ি।

কবি যজ্ঞদত্ত শর্মা বলেছেন, কৃষ্ণলীলা মানস করে, ভক্তদের সেই লীলা শোনাতে ভক্ত

উদ্ধব বারবার পৃথিবীতে আসতে চেয়েছেন। কবির মানস শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা কীর্তন; যিনি নিজরস আস্বাদন করতে, ভক্তদের আস্বাদন করাতে, রাধা ও গোপীভাব অবলম্বন করেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকীর্তনই কবি যজ্ঞদত্তের মানস-অভিলাষ, তাই তাঁর মন ধেয়ে চলে শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত রূপ মানস সরোবরের তটে।—

প্রভু লীলা মানস করি গাঈ, কারণ ভক্ত সুনাউঁ।
উদ্ধব বচন কৃষ্ণ মানস কিয়, ভক্ত রূপ ভব আউঁ॥
নিজরস চাখুঁ, ভক্ত চখাউঁ, রাধা, গোপী, ভাবা।
তাসোঁ "শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস," তট মন ধাবা॥ অন্ত্যখণ্ড, পৃ. ১১০

হিন্দীতে প্রভুলীলা চরিত রচিত হোক—এই বাসনায় ফরিদপুর নিবাসী সুধন্য মিত্র (বৃন্দাবনের শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজীর নিকট দীক্ষিত হয়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস নামে আখ্যাত) বারংবার তাগিদ দিয়ে কবিকে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করেন। কবি চৈতন্যচরিত রচয়িতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় তাঁরও উল্লেখ করেছেন—

'বিষ্ণুপ্রিয়া সুনি প্রেম বিভোরা, প্রভুপদ পঙ্কজ পাঈ।
সুনি সুনি চরিত ভাগবত করি কৈ, শ্রীবৃন্দাবন গাঈ॥
লোচন দাস গৌররস গায়ে, কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্তা।
ঔরো ভক্ত চরিত বহু গায়ে, নহিঁ প্রভুলীলা অন্তা॥
সোই লীলা হরিচরণ দাস, হিয় গৌর প্রেরণা কীনাঁ।
সো বৃন্দাবন দাস দ্বারা, মম হিয়মেঁ ধরি দীনা॥
কৃপা গৌরপ্রভু করি হিয় কর বসি, কীয়ে মোহি উদ্ধারা।
গৌর চরিত মানস সরমেঁ, তৈরাই দিয়ে সুখ সাবা॥' তদেব

কবি যজ্ঞদত্ত গৌরচরিতরূপ মানস সরোবরের চারিদিকে চারটি ঘাট এবং প্রত্যেক ঘাটে তিনটি সোপান কল্পনা করেছেন। এই অনুসারে তাঁর কাব্যের বিষয় বিন্যাস দেখানো হল :

আদিখণ্ড-পূর্বঘাট :

প্রথম সোপান : মঙ্গলাচরণ—অবতারহেতু-নিত্যানন্দ জন্ম-গর্ভস্তুতি-জন্মলীলা-জন্মোৎসব লীলা-বাল রক্ষলীলা-বালকীর্তন লীলা-অন্নপ্রাশন লীলা-অহিশয়ন লীলা-দম্পতিমন হর্ষলীলা চোরহরণ লীলা-চরণচিহ্ন লীলা-ধ্বজউদ্ধারণ লীলা-মৃদভক্ষণ লীলা-মুরারি গ্রহণ লীলা-খড়ী-শশি পকরণ লীলা-ভোগ ভক্ষণ লীলা-উর রহন লীলা। পৃ. ১-৩৮

দ্বিতীয় সোপান : বিশ্বরূপ সৎসঙ্গলীলা-বিশ্বরূপ সন্ন্যাসলীলা-পঢ়ন নিষেধ লীলা-হণ্ডী বৈসনলীলা-যজ্ঞোপবীত লীলা-পঠনপাঠ লীলা-পিতুপরলোক লীলা-ক্রোধৈশ্বর্য প্রকাশ লীলা—গুরু উপদেশ লীলা—নিত্যানন্দ চরিত—শিশুচিন্তাবন লীলা—প্রথম বিবাহলীলা-বিবাদলীলা-ঈশ্বর পুরী চরিত। পৃ. ৩৮-৫৬

তৃতীয় সোপান : শাস্ত্রার্থলীলা-শরীর মন্দ লীলা-বিলাসলীলা-নগরভ্রমণ লীলা-শচীবিস্ময় লীলা-দিগ্বিজয়ী বিজয় লীলা-অতিথিসেবন লীলা-পূর্বঙ্গগমন লীলা-লক্ষ্মীস্বর্গ গমনলীলা-চপলতা লীলা-দ্বিতীয় বিবাহলীলা-হরিদাস-চরিত-গয়াগমনলীলা-দীক্ষাগ্রহণ লীলা-গৃহআগমণ লীলা। পৃ. ৫৬-৮০

মধ্যখণ্ড-দক্ষিণঘাট

প্রথম সোপান ঃ মঙ্গলাচরণ-স্বভক্তি প্রকাশলীলা-মাতৃ শিষ্য উপদেশ লীলা-অদ্বৈত মিলনলীলা-নৃসিংহাবেশ লীলা-বারাহাবেশ লীলা-নিত্যানন্দ গমনলীলা-ব্যাসপূজন লীলা অদ্বৈতাগমন লীলা-পুণ্ডরীক ভক্তচরিত্র-শচীস্বপ্নলীলা-সপ্তগ্রাম কীর্তনলীলা-গৌরাঙ্গ অভিষেক লীলা-শ্রীধরোদ্ধার লীলা-ভক্তবরদান লীলা-নিত্যানন্দ প্রকাশলীলা-জগাই মাধাই উদ্ধারলীলা-শুক্লাম্বর তণ্ডুল ভক্ষণলীলা-অপরাধভঞ্জন লীলা-গোপীভাব নৃত্যলীলা-ভক্তিশ্রেষ্ঠতা লীলা-শচীপ্রেমদান লীলা-কাজীদমন লীলা-বিরাটলীলা। পৃ. ১৬৫

দ্বিতীয় সোপান ঃ দ্বিজশাপ প্রসঙ্গলীলা-প্রভুসন্ন্যাস প্রকাশলীলা-মণ্ডপলীলা-বিষ্ণুপ্রিয়া রাসলীলা-বিষ্ণুপ্রিয়া উপদেশলীলা-প্রভুবিদাইলীলা-শোক প্রকাশ লীলা-কেশব ভারতী প্রভু মীলন লীলা-প্রভুসন্ন্যাস গ্রহণলীলা-চৈতন্যদাস চরিত্র-অরণ্যপ্রবেশ লীলা-অদ্বৈত গৃহভোজন লীলা-অদ্বৈতগৃহবিলাস লীলা। ৩১৯ ৬৫-৯৭

তৃতীয় সোপানঃ নীলাচল গমনলীলা-দক্ষিণ বঙ্গোদ্ধার লীলা-দণ্ডভঙ্গ লীলা-পুরী প্রবেশ লীলা-সার্বভৌমোদ্ধার লীলা-দক্ষিণদেশ গমনলীলা-রায় রামানন্দ প্রভুমিলন লীলা বৌদ্ধগণোদ্ধার লীলা-পার্বতা তীর্থভ্রমণলীলা-রামেশ্বর পথজনোদ্ধার লীলা-নৈঋত্যপ্রান্ত জনোদ্ধারলীলা-দ্বারকাপথ জনোদ্ধার লীলা-পুরী আগমন লীলা। পৃ. ৯৭-১৪৪

মধ্যখণ্ড-পশ্চিমঘাট ঃ

প্রথম সোপান ঃ মঙ্গলাচরণ-বৈষ্ণবমিলন লীলা-গুণ্ডিচামার্জন লীলা-রথাগ্রনর্তনলীলা-হোড়াপঞ্চমী দর্শনলীলা-ভক্তবিদাই লীলা-অমোঘোদ্ধার লীলা-গৌড়যাত্রা লীলা-প্রতাপ-রুদ্র নৃপমিলন লীলা-যবন নৃপোদ্ধার লীলা-বাচস্পতি ভবন বিলাস লীলা-কুলিয়া বিলাস লীলা-দেবানন্দ বিলাস লীলা-চাঁপল গোপালোদ্ধার লীলা-নৃসিংহানন্দ পথগমন লীলা-অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ লীলা-রূপ সনাতন মিলন লীলা-শান্তিপুর আগমন লীলা মাধবেন্দ্রপুরী তিথ্যোৎসবলীলা-নীলাচল পথ গমন লীলা। পৃ. ১-৫৩

দ্বিতীয় সোপান ঃ পুরী প্রবেশ লীলা-বনপথ গমন লীলা-প্রকাশানন্দ প্রশ্নোত্তর লীলা কাশীবাস লীলা-মথুরাতীর্থ ভ্রমণলীলা-মধুবনাদি ভ্রমণলীলা-রাধাকুণ্ড প্রগট লীলা-গিরিরাজ পরিক্রমা লীলা-কামনাদি ভ্রমণ লীলা-যমুনাপার বন ভ্রমণ লীলা-শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ লীলা-বর্তমান বৃন্দাবন দর্শন লীলা-গৌরবৃন্দাবন বাসলীলা-বিজলীখানোদ্ধার-লীলা-রোপন গুরু মিলন লীলা। পৃ. ৫৩-৮৩

তৃতীয় সোপান ঃ রূপমিলন লীলা-বল্লভাচার্য গৃহভোজনলীলা-গৌরগীতা ভক্তিলতা গৌরগীতা প্রেমস্বরূপ বর্ণন-গৌরগীতা সনাতন মিলন লীলা-গৌরগীতা কৃষ্ণসম্বন্ধ বর্ণন গৌর গীতা অবতার বর্ণন-গৌরগীতা ঐশ্বর্য বর্ণন-গৌরগীতা মাধুর্য চালিসা-গৌরগীতা অভিধেয় বর্ণন-গৌরগীতা ভক্তি বর্ণন-গৌরগীতা প্রয়োজন বর্ণন-গৌরগীতা স্মৃতিসূচী-গৌরপ্রকাশ লীলা-প্রকাশানন্দোদ্ধার লীলা-প্রভুপথ গমন লীলা। পৃ. ৮৩-১১০

অন্তখণ্ড-উত্তরঘাট ঃ

প্রথম সোপান ঃ মঙ্গলাচরণ-পুরী আগমন লীলা-রূপ সুবুদ্ধিরায় মিলন লীলা-গৌড়িয়া ভক্ত বিলাস লীলা--শ্রীরূপ পুরী আগমন লীলা-শ্রীসনাতন নীলাচললীলা—ছোট

হরিদাস দণ্ডলীলা—দামোদর বিচার লীলা—নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার লীলা—দস্যু উদ্ধার লীলা—প্রভু কৃত নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য লীলা—নিত্যানন্দ বিবাহ লীলা—নিতাই পুরী আগমন লীলা—বিদ্যানিধি পুরী আগমন লীলা। পৃ. ১—৪২

দ্বিতীয় সোপান ঃ রামানন্দ অভিনয় লীলা—রঘুনাথ দাস পুরী আগমন লীলা-বল্লভ ভট্ট পুরী আগমন লীলা—গোপীনাথ নৃপদণ্ড লীলা—রাঘব ঝালী বর্ণন—হরিদাস তিরোভাব লীলা—জগদানন্দ প্রেমলীলা—রঘুনাথ ভট্ট পুরী আগমন লীলা—প্রভু রসাস্বাদন লীলা—গোপীভাব বিলাপ লীলা—কৃষ্ণাধরামৃত লীলা—কুর্মভাব প্রলাপ লীলা—সমুদ্রঝাঁপ লীলা—প্রভু প্রেমাবস্থামুখ ঘর্ষণ লীলা। পৃ. ৪২—৭৮

তৃতীয় সোপান ঃ বিষ্ণুপ্রিয়া কৃত প্রভুমূর্তি স্থাপনা লীলা—প্রভু অপ্রগট লীলা—সংপ্রদায় বর্ণন—সিদ্ধান্ত বর্ণণ—বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরগুণ শ্রবণ লীলা—নবদ্বীপ বর্ণন—গৌরকল্পতরু—গৌরশাখা বর্ণন—নিত্যানন্দ শাখা বর্ণন—অদ্বৈত শাখা বর্ণন—গৌর-পঞ্চতত্ত্ব বর্ণন—কুটুম্বোতত্ত্ব বর্ণন—প্রধান মহন্ত তত্ত্ব বর্ণন—ষট্ গোস্বামী তত্ত্ব বর্ণন—গোপাল উপগোপাল তত্ত্ব বর্ণন—মহান্ত উপমহান্ত তত্ত্ব বর্ণন—শক্ত্যাদিতত্ত্ব বর্ণন—নিধি মহানিধি তত্ত্ব বর্ণন—মানস শ্রবণ লীলা—মানস। পৃ. ৭৯—১১২

কবির পাণ্ডিত্য সরস হয়েছে তাঁর ভক্তি নম্রতায়। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর দখলও চমৎকার। সমগ্র কাব্যই তার নিদর্শন। বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হল।

গ্রন্থপাঠ ঃ

মঙ্গলাচরণে সংকীর্তন পিতা গৌরনিতাই ও চার বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তকের বন্দনা করা হয়েছে—

কনক কান্তি কমনীয়, যুগল জানুলম্বিত ভুজা।
বন্দো ভবভরণীয়, কমলনেত্র কীর্তন পিতা ॥ ৪
শ্রীচৈতন্য নিতাই, পালক দোউ কলিধর্মকে।
জড় চেতন প্রিয় জাই, বিপ্রবর্ণ করুণাবরে ॥ ৫...

দোহা. সম্প্রদায় চারো কে স্বামী বন্দো জাসু সুযশ যগ নামী ॥
রামানুজ নিম্বার্ক সবিষ্ণু। মাধ্বন্তর গত গৌর সতৃষ্ণু ॥
সবকে পদরজ এক সমানা। বন্দো মন কছু ভেদ ন আনা ॥

মুসলমান রাজশাসন ও জনসাধারণের ভক্তিহীন জীবন যাপন সম্পর্কে কবি বলেছেন—

'বৈষ্ণব ধর্ম লোক নহি জানত। কেবল চণ্ডী গীত বখানত ॥
পুজে বিষহরি দম্ভ করাঈ। ব্যর্থ কালধন বেশ্যা খাই ॥...
দারা সুত গৃহধন জন মনসে। প্রীতি নহী কছু হরি চরণনমে ॥
হরি-মায়া-মোহিত সংসারা। যবন রাজ য়হ নীতি পসারা ॥

শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ একমনে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন, কবে তিনি অবতীর্ণ হয়ে সব দুঃখ দূর করবেন।—

'ভোজন নহি রুচৈ, চিন্তা বিচৈ, তজি সবহী উপভোগা।
কব হরি অবতরি হৈ, সব দুখ হরি হৈ, করত সোই উদ্যোগা ॥'

নিতাইয়ের জন্ম হল রাঢ় একচাকা নগরীতে, পদ্মার উদরে—

'আজ্ঞা ধরি শ্রীকৃষ্ণকে, পদ্মোদর সে আই।
রাঢ় একচাকা নগরী, জন্মে প্রথম নিতাই ॥'

তারপর এল বহু প্রতীক্ষিত সেই শুভ লগ্ন।—

শচীগর্ভ পূরণ জব ভএউ। পুনো তিথি ফাগুন আগএউ ॥...
শুভ নছত্র গ্রহ মিলি সংযোগা। মন প্রসন্ন তেহি কালন লোগা ॥
চন্দা রাহুগ্রস্যো কলি নামা। প্রগটে গৌর গুপ্ত শচি ধামা ॥
বামা সব মঙ্গল মিলি গাবত। জয় জয় হরি হরি বোলিন হাবত ॥

শিশু নিমাই কীর্তন শোনার জন্য কাঁদেন, কীর্তন শুনে চুপ করেন।—

সুনন চাহ প্রভু জব হরিকীর্তন। চরণ চলাই লগে তব রোবন ॥
জহঁতহঁ সে আঈ সব ধাঈ। হরি হরি গাবত তালি বজাঈ ॥

শুভক্ষণে পিতা জগন্নাথ মিশ্র হাতে খড়ি দিলেন, শিশু নিমাই মধুর স্বরে ক-খ-গ পড়েন, কিছু দিনের মধ্যেই লিখতে শিখলেন।

শুভ তিথি প্রভু-কর পিতু খড়ি দেহী। বাদ্য গীত সংগ হরি হঁসি লেহী ॥
লিখন লগে গুরু লগ প্রভু জাঈ। পঢ় ক-খ-গ মধুর সুনাঈ ॥
কছু দিন মাহিঁ লিখে হরি নামা। কৃষ্ণ মুরারি লখণ শ্রীরামা ॥

গঙ্গা তীরে পূজো ব্রত করতে আসেন মেয়েরা। বালক নিমাই তাদের উপর উৎপাত করেন। তারা এসে শচী মাকে নালিশ করে—

'পূজাকে ফল ফুল মিঠাঈ। খাহিঁ কছু কছু দেহি গিরাঈ ॥
করি অস্নান উপর হম আবহি। দৈ শিকতা শিশসংগ ভগি জাবহি ॥
কর্ণ ল্যাগ কহ নিন্দিত বাণী। ফেকত হমপর কুল্লী জানী ॥
ওকর ফল শির দৈক হমোহী। মোর বিবাহ হোয় সংগ তোহী ॥
এহি বিধি নিতি মম পর অপকারা। কী শচি তব সুত রাজকুমারা ॥
ব্রজগোপী জিমন নন্দকিশোরা। কর উৎপাত সুবন তিমি তোরা ॥'

নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ, পিতামাতা তাঁর বিবাহের উদ্যোগ করতেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন—

বিশ্বরূপ ভয় ব্যাহন যোগু। মাতু পিতা সোই কর উদ্যোগু ॥
সো সুনি মন তিনি বহু দুখ পাঈ। ন্যাসকরণ চিতমে তব লাঈ ॥
মাঁ পিতু তজি ছিপি ভয় হরিরাগী। নাম শঙ্করারণ্য বিরাগী ॥
সুনি দম্পতি অতি রোদন করহী। ভ্রাতু বিরহ প্রভু মূর্ছিত খসহী ॥

প্রভু খেলা ছেড়ে পড়ায় মনোযোগী হলেন। পথে ঘাটে সকলকে যুক্তিতর্কে হারিয়ে দিতে লাগলেন। সেকথা শুনে জগন্নাথ ভাবলেন এ পুত্রও তাঁর বিবাগী হয়ে যাবে। কেননা—

সার অর্থ শাস্ত্রন জো জানত। সো ভবকো মিথ্যা করি মানত ॥

দোহা, বিদ্যাসুত ন পঢ়াউগো কহত মিশ্র সমুঝাই।
মোহি তোহি জিবন প্রাণধন রহ ঘর মূর্খ নিমাই।

সে কথায় শচী বললেন নিমাই মূর্খ হয়ে থাকলে কেউ তাকে ধন বা কন্যা দেবে না। জগন্নাথ বললেন শ্রীকৃষ্ণই সকলের পালক এবং বিদ্যা-ধন-বিবাহ-মৃত্যু এসব বিধি নির্দিষ্ট।—

শচী কহ যদি মুরখ সুত হোঈ। ধন কন্যা নহিঁ দৈহে কোঈ॥
কহ পতি পুনু মোহি প্রাণ পেয়ারী। ভবপালক শ্রীকৃষ্ণ মুরারী॥
বিদ্যাধন বিবাহ অরু মরণা। হোই হৈ সোই জো করি গয়ে রচনা॥

মনে মনে দুঃখিত হয়ে নিমাই পড়া ছেড়ে আবার খেলায় মাতলেন। একদিন বর্জ্য হাঁড়ির উপর গিয়ে বসলেন। শচীমাকে বললেন, আমি মূর্খ, কর্তব্য অকর্তব্য আমি জানিনা।—'কহ প্রভু মুরেখ কী করি জানহিঁ। বুদ্ধি রহিত সব সম করি মানহিঁ॥' প্রতিবেশীরা বলল, দোষ ছেলের নয়, দোষ তার বাবা মার। তখন জগন্নাথ ছেলেকে আবার পড়ায় অনুমতি দিলেন।

সুনি সব কথা গুরুহিঁ হরষাঞী। পঢ়ন লগে ব্যাকরণ নিমাঞী॥
সূত্রবৃত্তি বার্তিক প্রয়োগা। পঢ়ন গুরু মুখ লৈ কছু যোগা॥
খেলত কবহুঁ পঢ়ত কভু জাঈ। নাচত শিশু সংগ হরিগুণ গাঈ॥…
গঙ্গাদাস দ্বিজন ঘরে পঢ়হী। পঢ়ুআ গণ মিলি ব্যাখ্যা করহী।
পঢ়ি গুণ মধ্যদিবসকে মাহঁী। নিত গঙ্গা বিচ খেলি নহাহী॥

একদিন জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্ন দেখলেন—পুত্র মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে।

'দেখেউঁ স্বপ্ন পুত্র শিরমুণ্ডণ। গয়ে ছারি সন্ন্যাসী ঝুণ্ডন॥

তখন রামের বিরহে দশরথের যে দশা হয়েছিল, স্বপ্ন দেখে মিশ্রের তাই হল।—

রামবিরহ দশরথগতি জৈসী। গৌরস্বপ্ন মিশ্রহু ভই তৈসী॥…
মাতু প্রবোধি কিয়ে পিতু কর্মা। পঢ়ন লগে প্রভু করি গৃহধর্মা॥

গঙ্গাদাসের টোলে মুরারিকে কূটপ্রশ্নে হারিয়ে দিয়ে—

প্রভু কহ চিন্তহু ক্যোঁন মুরারি। বৈদ্যকুল দম্ভী তুম ভারি॥…
তুম ন ব্যাকরণ পাত্র মুরারি। ব্যাধিকরণ কুল জন্ম তুম্হারি॥
খোজহু কফ পিত বায়ু ত্রিদোষা। কূটবচন সুনি কহত অরোষা॥
দো ঠাকুর তোহি মে কা কহব। প্রশ্ন করহু কছু আই।…

বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করলেন নিমাই।—

গাবত বামাগণ মিলি গারী। বল্লভ শচী মিলাই দৈ নারী॥
বধু উপবেশন সখী করাঈ। প্রভু কর শীশ সিন্দুর দেবাঈ॥
হরিধ্বনি জয় জয় হো চহু ওরা। নভ পতাল ভু হো রোহি সোরা॥

শ্রীবাসাদি চারভাই রাত জেগে হরিনাম করেন। পাষণ্ডীরা নানা কথা বলতে লাগল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রবোধ দিয়ে বললেন আর কিছুদিনের মধ্যেই যদুবায় এখানেই আবির্ভূত হবেন।—

'শ্রীবাসাদিক চারি ভাই। গর্জত নিশি নিদ্রা নাহি জাঈ॥
শাস্ত্র কহত জপতপ মনপুতা। কিমিগর্জহিঁ বাভন কে সুতা॥
সুনি নিন্দা পাখণ্ডীকেরী। শ্রী অদ্বৈত থান সব ঘেরী।…

কছুক দিন চিন্তা অরু ভাঈ। মিলি হৈঁ এহি গাম বদুরাঈ ॥
সুনি অদ্বৈত বচন সব দাসা। জয় হরি হরি হরি কহি সব হাঁসা ॥

সেই সময় সেখানে এলেন ঈশ্বরপুরী। সকলে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। ঈশ্বরপুরী বললেন—আমি শূদ্রাধম ঈশ্বরপুরী, তোমাদের দর্শন করতে আর কীর্তন শুনতে এসেছি।—

শূদ্রাধম ঈশ্বরপুরি নামা। আএউঁ তব পদদরশন কামা ॥
জানি মুকুন্দ গাই হরিগীতা। প্রেমীগীরে প্রেমরস পীতা ॥

সকলে তাঁকে চিনতে পেরে (আগে সম্ভবতঃ তাঁর নাম জানা ছিল) সকলে জয়ধ্বনি দিলেন।—'বৈষ্ণব জয় জয় হরিধ্বনি করহীঁ। ঈশ্বর পুরী চিহ্নেউ তব সবহীঁ ॥'
প্রভু ঈশ্বরপুরীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন।

দো· শচীকৃষ্ণনৈবেদ্য করি, ঈশ্বরপুরী খবাহিঁ।
কৃষ্ণকথা মদমত্ত দোউ, দৈঁ আশীশ তিন জাহিঁ ॥

গোপীনাথের ঘরে কিছুদিন রইলেন ঈশ্বরপুরী। রোজ সেখানে যান নিমাই। ঈশ্বরপুরী তাঁর স্বরচিত কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যের দোষত্রুটি দেখাতে বললে নিমাই বললেন—ভক্ত ভাবুকের বচন মাত্রই নির্দোষ, কেননা তা শ্রীহরিকে তুষ্ট করে।—

বৈষ্ণবপ্রীতি পুরী পদ করহী। কৃষ্ণকাব্য তে কৃত নিত সুনহীঁ ॥...
হঁসি কহ পুরী গৌর তুম পণ্ডিত। মমকৃত চরিত দেখহু কছু দূষিত ॥...
প্রভু কহ ভক্ত প্রেমগুণ গাবহিঁ। তে দূষিত জন যমপুর জাবহিঁ ॥
ভক্ত কবিত্ব প্রীতিরস সানী। কৃষ্ণ প্রসন্ন হোই তেঁ বাণী ॥
কহ বিজ্ঞায় বিষ্ণবে কোঈ। ভাব শুদ্ধ তেঁ হি মে হরি হোঈ ॥
দেখ হিঁ দৃষ্টি দোষ সো দোষী। ভাবুক বচন সদা হরিতোষী ॥

একদিন প্রভুর ইচ্ছা হল পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাবেন।—

গৃহীধর্ম কছুদিন করি ভাঈ। পূর্ববঙ্গ দেখন মন লাঈ ॥
ভার্যা অম্বা দোউ সমঝাঞী। শিষ্য সঙ্গ লে চলে নিমাঞী ॥
পূর্ববঙ্গে— 'কছুদিন বসি বস করি নিজযোগা। বিদ্যাছল প্রভুবশ ভৈ লোগা ॥
বৈষ্ণব হো বহুতটকে মাহীঁ। হরি সংকীর্তন হরি হরি গাহীঁ ॥

এদিকে প্রভুবিরহে কাতর লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পদংশনে মারা গেলেন।—

স্বামীবিরহ কমলা ভই কমলা। রোম রোম চঢ়ি গইসো অমলা ॥
রুচৈ ন অন্ন নিঁদ নিশি নাহীঁ। পতি পদ ধ্যান নয়ন জল জাহীঁ ॥
দিন দিন বিরহ বঢ়ত গই ভারী। সর্প রূপ আএ বনি কারী ॥
লক্ষ্মীপদদংশিত ক.র ভাগা। সুনি শচিমন দুঃখিত বহু লাগা ॥

দো. হরিধ্বনি সন্তোহি প্রাণপ্রিয়। হরিপদ পহুঁচে জাই।
শচি রোবত জল মীন বিনা। জ্যোঁ তরফত ভু পাই ॥

দিন এগিয়ে চলে। শচীমা দুঃখ করেন দিনরাত। একদিন গঙ্গা তীরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে তাঁর ভাল লেগে গেল। পণ্ডিত রাজ সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। সনাতনের নিকট প্রস্তাব যেতে তিনি সানন্দে রাজী হলেন। শচীর ঘরে বধূ হয়ে এলেন

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিয়েতে বরযাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার সরস বর্ণনা দিয়েছেন কবি, এমনকি হাল আমলের রসগোল্লা পান্তুয়াও বাদ পড়েনি।—

নববর বধূ কো বর ঘর ল্যাঈ। হোত প্রাত মর্যাদ খবাঈ ॥
ভাত দাল ব্যঞ্জন বহু নানা। পুরী পুপ খজাঝর দানা ॥
রসগুল্লা খিরসা পনতাবা। অগণীত বহু সামগ্রী ল্যাবা ॥…
হ্ঁসি রসগুল্লা খাঁহি বরাতী। ল্যো পানিতবা কহৈ সরাতী ॥
ভোজন পর বীরা সব খাঈ। করহু বিদাভই বেলা ভাঈ ॥
পুনি ভূষণ কন্যাবর দিহ্না। শিবিকা চঢ়ি পয়ান দোউ কিহ্না ॥
বাজত বাজা সজে বরাতী। আএ প্রভু নিজগৃহ কছু রাতী ॥

যবন হরিদাস মুসলমান হয়ে হরিনাম নেন কেন? কাজীর বিচারে হরিদাসকে বাইশ বাজারে প্রহারের শাস্তি দেওয়া হল।

কহ রাজা সুনহু তুম সাধু। ছারু কৃষ্ণ পদ্ম কলিমাগাধূ ॥
নহি ছারব কভু হরি হরি গেহা। যদি শত খণ্ড করহু মম দেহা ॥
কহ নৃপ কাজী অব কা করবা। বাইশ বজার মারিমে ধরবা ॥…
মারণ লগৈ সবহিঁ হরিদাসা। সুজন দুখী দম্ভী কর পাসা ॥
পথ হরিদাস হরে কহি জাঈ। রামকৃষ্ণ গোবিন্দ কহ্যাঈ ॥…

দো. যবন ফেঁকি জলমে গয়ো, প্রভু গাম্ভীর্যাধিষ্ঠান।
উঠি বৈসে হরি হরি করত, কুলিআ কিয়ো প্রয়ান'॥…
গোফা গঙ্গাতট করি রসহী, নির্ভয় হরি কীর্তন নিত করহী ॥

গয়ায় পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে গেলেন নিমাই। সেখানে 'কৃষ্ণ কহত ঈশ্বর পুরি আএ।' তাঁর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন প্রভু—

দো. পাই দশাক্ষর মন্ত্র প্রভু, কিহু প্রদক্ষিণ তাহি।
তন মন ধন অর্পণ মম, তব চরণন কে মাহি ॥
কৃপা করিয় জন জানি গুণ, পুলক রোম জল নয়ন।
পুরী অঙ্ক লৈ প্রেমময়, দৈহি অশীষ সুবয়ন ॥

প্রভু ঠিক করলেন সেখান থেকে মথুরা যাবেন। কিন্তু

কছুক দূর পথ ভয় নভবাণী। মথুরা সময় নাহি লগি চানী ॥
জাহু নবদ্বীপ কছুপর এহহু। ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য সিখৈহহু ॥
সুনি প্রভু তব আএ নিজ বাসা। মণি ফণি মিলেউ সকল হরিদাসা।

গয়া থেকে ফিরে প্রভুর ভক্তিভাব উচ্ছলিত হয়ে উঠল।

দেখি চরিত ভক্তন গতি সোঈ। মূর্ছিত পবে গদাধর রোঈ ॥
লোটত ভক্তন প্রেম মগন মন। দেখি হোহিঁ বিস্মিত সব সজ্জন ॥
পুনি কহ ব্যাকুল প্রভু অতিরোঈ। পাই কৃষ্ণ মণি নিজ কর খোঈ ॥
ইত উত বিকল ভূমি পর লোটহিঁ। রোবন ভক্ত দেখি কৈ পোটহি ॥
উঠত প্রেম তরঙ্গ অগাধা। ভসে বিশ্বম্ভর জ্যোঁ ব্রজরাধা ॥

সব কিছু প্রভুর নিকট কৃষ্ণময় হয়ে উঠল।

পুছেউ শিষ্য ধাতুকে অর্থা। প্রভু কহ কৃষ্ণ বিনা সব ব্যর্থা ॥

ছাত্র পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। পাষণ্ডীরা বলল, নিমাইয়ের বায়ু রোগ হয়েছে। শ্রীবাস বললেন কৃষ্ণের অনুগ্রহ হয়েছে।—

পাখণ্ডী পরচারত শচিকো। বায়ু রোগ ভয় হৈঁ তব সুতকো ॥...
কহ শ্রীবাস সুনহু শচি মাঈ। কৃষ্ণ অনুগ্রহ তব সুত পাঈ ॥...
এহি বিধি প্রভু নিত বৈষ্ণব সংগা। হরি কীর্তন কর হরি রস রংগা ॥
হঁসত কবহুঁ কানত কভু মূর্ছিত। কৃষ্ণ রাম গোপী জ্যোঁ বিলশিত ॥
দেখি ভক্ত কহ ভো অবতারা। কোই কহ প্রভু তন কৃষ্ণ বিহারা ॥
কোই শুক কহ কোই জন প্রহ্লাদা। কোই কহ কৃষ্ণ জানি ভজুপাদা ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন স্বপ্নে দেখলেন প্রভু সন্ন্যাসী হয়েছেন। তিনি কাতর হয়ে পড়লে প্রভু তাকে অবোধ দিলেন চতুর্ভুজ মূর্তিতে।

দেখী প্রিয়া স্বপ্ন প্রভুন্যাসী। ছারি চলে মম বনে উদাসী ॥...
উঠী ভীত হো প্রিয়া পলঙ্গ সে। পুছেউ প্রভু ক্যোঁ উঠী উছঙ্গ সে।
প্রাত ভয়ো কহ স্বপ্ন ছিপাঈ। জানল নী গহি প্রভু বৈসাঈ ॥
প্রিয়ে কহহুঁ কছু স্বার্থ কথামেঁ। নহি কহিহহু নহি যথা নিশামেঁ ॥
ভব মিথ্যা হৈ সুত পতি নারী। মাতু পিতা পরিজন দুখকারী ॥
তনমে কৃষ্ণ শক্তি রহ জবতক। বন্ধুবর্গ প্রিয় অপনা তবতক ॥
ছারি শরীর জীব জব জাহীঁ। তব সোতন ছুবন কোউ নাহীঁ ॥...
কহেউঁ সকল ভবসার বিচারী। জানহু সকল চরিত মম প্যারী ॥
কলিকে জীব তারনে কারণ। প্রগটেউঁ করী ন তোহ নিবারণ ॥
চৌবিস সম কৌতুক মে গএউ। বাল কিশোর চরিত বহু ভএউ ॥ ..
বিনা নেহ উপদেশ ন ধরিহৈঁ। বিনু উপদেশ ন ভবনিধি তরিহৈ ॥
সুভগে ছারহ মনকী গ্লানী। কহত চতুর্ভুজ ভৈ সুখদানী ॥
দেখি প্রিয়া চখু জলবহ ঝর ঝর। প্রিয় বাণী বোলী গদগদ স্বর ॥
সুনহু নিবেদন এক প্রভো মম। করি অধমা কো প্রিয় দাসী সম ॥
সম্পদি দীহ্ন লেউ কেহি দোষা। হোই হৈঁ মন বিচ কেহি বিধি তোষা ॥
ধন্য পুণ্য পাএউঁ তব চরণা। কৌন পাপসেঁ হোরহি হরণা ॥...
প্রিয়া বচন সুনি ছাই নয়ন জল। সুমরি বিয়োগ হৃদয় কর দলদল।
প্রিয়ে ন ছারব কভু তব অংগা। রবি শশি বিনু ছায়া জিমি সংগা ॥
দরশ চাহু হৃদি দীপক বারী। করিহহু যথা রহস গৃহ নারী ॥...
পুণ্ট করী সন্ন্যাস প্রিয়ে মম। বিষ্ণুপ্রিয়া তুম বিষ্ণুপ্রিয়া সম ॥
মম বিয়োগ সহি হরিপদ প্রেমা। করিহহু প্রিয়ে সহিত নিজ নেমা ॥...

প্রাতভ্রমণ সেরে এসে নিমাই দেখলেন শচীমা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। যত্ন করে তাঁর মূর্ছা ভাঙালেন তিনি। শচীমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

লাল বৎস মম প্রাণ নিমাই। দুখিয়াকে নহিঁ হোউ দুখদাঈ ॥
বিশ্বরূপ তজি গো দৈ শোকা। তাপৈ তব পিতু ভো পরলোকা।
ডুবত থী মোই সিন্ধু মঝারী। লাল সোই দিন তুমহিঁ উবারী ॥
অব বৃদ্ধাকো সিন্ধু অগাধা। তৈলহু বৎস কেহি অপরাধা ॥...

দেখহু বিষ্ণুপ্রিয়া অতি ভোরী। তেহি জৈহহু কেহি পর তুম ছোরী।…
অরে বিধে! নির্দয়ি, দুখদীনা। জ্যেষ্ঠ পুত্র পতি প্রথমহিঁ লীনা॥
বচী তু তরী এক নিমাঁঈ। তেহি যতী কর কৌন ভলাঈ॥…
বিলপত রুন্ধ বচন ভৌ ভাঈ। খসী পবন ঘূর্ণা তরু পাঈ॥

পথ যাকে ডাক দিয়েছে, ঘর তাকে বাঁধতে পারে না। সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপ ছেড়ে চললেন নীলাচলের পথে।—

হরি হরি কহি প্রভু নিশিদিন চলহীঁ। কৃষ্ণকথা বিনু কছু নাহি সুনহীঁ।
সুনি বনপশু খগ প্রভু মৃদু বচনা। হরেকৃষ্ণ গাবহিঁ পদ রচনা।
নরগতি কা কহু প্রভুকে দরশন। ছারি কলুষ দৈ পদতন মনধন॥
হরি হরি কহি নর বৈষ্ণব হোঈ। কৃষ্ণপ্রেম রস হৃদি তম ধোঈ॥

নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন ও বাসুদেব সার্বভৌম-উদ্ধার করে শ্রীচৈতন্য চললেন ভারত পরিব্রজনে। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধন তত্ত্ববিচারের পর রামানন্দ বললেন—

রায় কহহিঁ য়হ সব তব বাণী। ভলা বুরা মৈঁ নহি কছু জানী।
মম মুখ বক্তা শ্রোতা তুমহীঁ। সাধন অতিরহস্য শ্রুতি কহহী॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ কে সেবা। সখী ভাব বিনু কোই ন লেবা॥
সখী স্বভাব অকথ্য কথন হৈঁ। প্রিয় লীলান সখা কে মনহৈ॥…
কৃষ্ণপ্রেম তরু লতিকা রাধা। পত্র পুষ্প হো সখী আরাধা॥
লীলামৃত লতা নিত সিঞ্চহিঁ। পল্লবাদি নিজ সুখ কো পাবহিঁ॥

দক্ষিণ উদ্ধার করে প্রভু গেলেন মহারাষ্ট্রে। এখানে কবি গোবিন্দ কর্মকারের করচা এবং কিংবদন্তী (তুকারাম প্রসঙ্গে) আশ্রয় করেছেন।—

পাণ্ডুপুর বিট্‌ঠল ঠাকুর কো। গয়ে গৌর হর্ষিত দর্শন কো॥…
নিজ যশ প্রভু ইলোরমে থাপা। বেম্বা মহঁ মেটী তন তাপা॥
কিয়ে অনেক দেব তহঁ দরশন। বৈষ্ণব সঙ্গ ভয়ে মন পরসন॥
সুনে কৃষ্ণকর্ণামৃত তহমাঁ। লিয়ে লিখাই চলে নিজ পথমাঁ॥
তুকারামাদিক বহুজনকো। দিয় উপদেশ কহাঁতক কহকী॥
গয়ে অচ্ছসর করি তহঁ মজ্জন। গৈ তব ভোলেশ্বর কে দর্শন॥…
বস মুরারি গণ পথ কোই পুরমেঁ। বৈশ্যা বৃত্তি জীবিকা দুখমেঁ॥
সুনি দয়ালু প্রভু গৈ তে টোলা। দহী স্বভক্তি শক্তি অনমোলা॥
সকল প্রধান ইন্দিরা আঈ। সিখি হরিকীর্তন সকল সিখাঈ॥
হরি যশ গাই হর্ষ নিজমুরমেঁ। বসন্ত, চলে প্রভু দস্যু পুরমেঁ॥
নারোজী প্রধান দস্যুপতি। দেখি তহাঁ গৈ দ্রুত নবীন যতি॥
শ্রীকর পরশি চেত প্রভু দীহ্না। নিজ কুকর্ম পদরজ লীহ্না॥…
সুনি বোলে প্রভু নিত সংকীর্তন। করহু কৃষ্ণ পদ আত্মসমর্পণ॥
ছুটহিঁ কোটি জন্ম কে পাপা। কৃষ্ণ নাম সেঁ কলি ভব তাপা॥…
চলে গৌর প্রভু তহঁ সে আগে। সকল সমাজ দস্যু সঙ্গ লাগে॥

কবি যজ্ঞদত্ত গোবিন্দ কর্মকারের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর করচার তথ্য গ্রহণ

করেছেন। ইন্দিরা-নারোজী-বৃত্তান্ত, দ্বারকা ভ্রমণ ইত্যাদি একমাত্র করচাতেই আছে। কবি একে 'অপর মত' বলে উল্লেখ করেছেন।—

ভ্রমেউ তীর্থ বহু কো করলেখা। লিখেউ ভক্ত সুনি জহঁ জো দেখা ॥
চরিতামৃত এই ভ্রমণ বতাঈ। সুনহু অপরমত প্রিয় মন লাঈ ॥
গৌর কথাক আদি নহি অন্তা। সুনি বৈষ্ণব মুখ গাবহি সন্তা ॥…
পঞ্চবটী তজি দমন নগর গয়। তব সুরাট পথমে প্রভু পদদয় ॥
পহুঁচে সুরত পক্ষ দিবসমেঁ। কীর্তন করি নর কিয়ে স্ববশমেঁ ॥…
বলি থাপিত বামন করি দর্শন। চলে বরোচ গৌর প্রভু পরসন ॥
যজ্ঞকুণ্ড দেখউ তহঁ হর্ষা। বরদা গয়ে করত হরি বর্ষা ॥…
কিয় ডাকোর জাই তব দর্শন। পুনি বরদা আএ হর্ষিত মন।
তীন দিবস পরতন তজ নারো। সম্মুখ প্রভু তমালতল ঠারো ॥
নিজ কর প্রভু করি তাহি সমাধী। চলে তহাঁসে জানি উপাধী ॥…
চলে দ্বারকা দোউ প্রভু সঙ্গা। কৃষ্ণনাম কীর্তন রস রঙ্গা ॥
পহুঁচে সব মিলি ঘোঘা নগরী।

বারমুখী বেশ্যাকে ভক্তিপথে এনে, সোমনাথ দর্শন করে প্রভু এলেন দ্বারকায়।

দিবস পঞ্চদশ করি তহঁ দর্শন। কিয়ে মহোৎসব মিলি পণ্ডাগণ ॥
বাঁটিউ প্রভু প্রসাদ হর্ষিত মন। ফিরে নীলাচল পথ প্রভু পরসন ॥
পুরী সুদামা গৈ জন সঙ্গা। বৈষ্ণব কিয়ে বহুত রসরঙ্গা ॥

নর্মদা নদীর পার ধরে মণ্ডল নগর দেবঘর পার হয়ে প্রভু পুরীতে ফিরলেন।

পুরীবাস কালে প্রভু সর্বভারতে পার্ষদদের প্রেমভক্তি প্রচারে প্রেরণ করলেন, লোক-শিক্ষার জন্য শিক্ষাষ্টক রচনা করলেন। শেষের দিকে তিনি প্রায়ই ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর কৃষ্ণ বিরহের চিত্র এঁকেছেন কবি—

কৌন উপাই করু কহঁ জাউঁ, কহঁ প্রিয় কৃষ্ণ মিলেগা।…
রাধাভাব গৌর প্রভু বিরহী, নিজবিয়োগ নিজ মনমেঁ।
করি আক্রমণ বঢ়াই লালসা, অব সুধি কছু নহি তনমেঁ ॥
পুনি হো দীন কহেঁ জলবিনু মীন, জোঁ তরফত তোঁ নয়না।
তরফি রহী মধুহাস্য বদন বিনু, দরশ দেই করু সমনা ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন্ সদ্গুণ, সাগর অম্বুজ লোচন।
হা হা শ্যামসুন্দর পীতাম্বর ধর, হা ভব দুখ মোচন ॥
কহাঁ গয়ে তোহি পাউঁ জাউঁ কহঁ, কহি প্রভু চল উঠি ধাঈ ॥
উঠি স্বরূপ কর গহি বৈঠায়ে, গাই গীত সমঝাঈ ॥

প্রভুর অপ্রকট হবার লগ্ন ঘনিয়ে এল। একদিন ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এলেন।—

দো. কহি প্রভু মন্দিরমেঁ গয়ে, লাগী স্বয়ং কপাট।
চকিত ভক্তগণ স্বজন মিলি, দেখি রহে প্রভুবাট ॥
উত গোপী গোলোকসেঁ, ঝুলে পহুঁচী ধাই।

নীল চক্র পর চমকি রহী, রবি শশি দ্যুতি লজাই ?
বেদন অস্তুতি কর রহে, গোপী ছাঁটে ফূল।
চঢ়ি রথপৈ চলা মহাপ্রভু, ভক্ত রহে ইত ভূল ॥

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কপাট খুলে গেল, কিন্তু ভক্তগণ আর প্রভুকে দেখতে পেলেন না।—

কছু বিলম্বপর খুলী কপাটা। তবহুঁ ভক্তগণ দেখাহিঁ বাটা ॥
মন্দির ভীতর জন মিলি গয়উ। খোজহিঁ নাহিঁ প্রভুমিলন ভয়উ ॥…

হা শচীনন্দন তজি মন্দন কো, কহাঁ বসে তুম জাঈ।
কহঁ পৈহোঁ অব প্রেম রূপ রস, চখু শ্রুতি রহ ললচাঈ ॥
রে খল প্রাণ তজত তুঁ বপু নাহি, গৌর ছারি তোহি গএউ।
রায় স্বরূপ গৌর। গৌ…গৌ…কহি, ছিতিমধি লোটত ভএউ ॥

আনন্দের হাট ভেঙে গেল। ভক্তরা সকলে উদাস—কেউ গেলেন বৃন্দাবনে, কেউ গেলেন লোকান্তরে। সংসারে রয়ে গেল ভক্তিভাস্বর গৌরপ্রেম।—

সো৹ ভৈ সব ভক্ত উদাস, কোই ব্রজ গৈ কোই পরমপদ।
রহ গৈ ভক্তীভাস, গৌর প্রেম, সংসার মেঁ ॥

শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী : শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাবলী

সুললিত হিন্দী গদ্যে মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী বিধৃত করে লেখক আধুনিক কালের হিন্দীভাষী ভক্তপাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেখক পঞ্চম খণ্ডের শেষে যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়েছেন, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রাচীন সংস্কৃত বাংলা চরিত গ্রন্থ ছাড়া আছে আধুনিক কালে প্রকাশিত কিছু চৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থ ; যেমন—শ্রীশিশির কুমার ঘোষ রচিত 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত' (ছয় খণ্ড) ও 'লর্ড্ গৌরাঙ্গ' (দুই খণ্ড), শ্রীহরিদাস গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত, শ্রীনর্মদা শঙ্কর পণ্ড্যা রচিত গুজরাতী ভাষায় 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য', শ্রীহরিদাস গোস্বামী রচিত 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত'। 'শ্রীচৈতন্য চরিত্র সম্বন্ধী গ্রন্থ' শিরোনামে গ্রন্থ তালিকার মধ্যে দু'টি বাংলা গ্রন্থের নাম মুদ্রিত হয়েছে—একটি 'শ্রীগোবিন্দ কড়চা—লেখক শ্রীগোবিন্দ দাসজী', অপরটি 'শ্রীচৈতন্য চরিত—শ্রীচূড়ামণি দাস কৃত'।

এই গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ২৮ পরিচ্ছেদ থেকে ৩৩ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত অনেকগুলি বিষয় গোবিন্দ কর্মকারের করচা থেকে গৃহীত। বিষয়গুলি হল—ধনী তীর্থরাম ও সত্যবাঈ উদ্ধার প্রসঙ্গ, অর্জুন পণ্ডিতকে প্রেমদান, বীজাপুরে পার্বত্যতীর্থ ভ্রমণ, পূর্ণনগরে আগমন, কৃষ্ণের সন্ধানে সরোবরে ঝাঁপ দেওয়া, ভোলেশ্বর জিজুরী নগর ভ্রমণ, খাণ্ডবাদেবস্থানে ইন্দিরা প্রমুখ পতিতা উদ্ধার, চোরানন্দীবনে নারোজীদস্যু উদ্ধার (এ ক্ষেত্রে লেখক করচালেখক গোবিন্দ দাসের কথা উল্লেখ করেছেন—'আগে আগে মহাপ্রভু উনকে পীছে গোবিন্দ দাস ঔর সবসে পীছে নৌরোজী সন্ন্যাসী চলতে থে—পৃ. ২৬৪), বরোদা অহমদাবাদ আগমন—বাঙালী বৈষ্ণব (রামানন্দ বসু) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ, দ্বারকা গমন এবং পুরী প্রত্যাবর্তনের পথে রামানন্দের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ

প্রসঙ্গ। সম্ভবতঃ গোবিন্দের করচার অন্তর্গত এই বিষয়গুলি লেখক 'অমিয় নিমাই চরিত' থেকে নিয়েছেন।

পাঁচখণ্ড চৈতন্য চরিতাবলীর বিষয়সূচী এখানে দেওয়া হল।—

প্রথমখণ্ড : মঙ্গলাচরণ, ইষ্টপ্রার্থনা, গুরু বন্দনা, ভক্তবন্দনা, ব্যাসোপদেশ, চৈতন্য-কালীন ভারত, চৈতন্যকালীন বঙ্গাল, বংশ পরিচয়, প্রাদুর্ভাব, নিমাঈ, প্রেমপ্রবাহ, অলৌকিক বালক, বাল্যভাব, বাললীলা, চাঞ্চল্য, অদ্বৈতাচার্য ঔর উনকী পাঠশালা, বিশ্বরূপকা বৈরাগ্য, বিশ্বরূপকা গৃহত্যাগ, নিমাঈকা অধ্যয়নকে লিয়ে আগ্রহ, ব্রতবন্ধ, পিতাকা পরলোক গমন, বিদ্যাব্যাসঙ্গী নিমাঈ, বিবাহ, চঞ্চল পণ্ডিত, নবদ্বীপমে ঈশ্বরপুরী, পূর্ব বঙ্গাল কী যাত্রা, পত্নীবিয়োগ ঔর প্রত্যাগমন, নবদ্বীপমে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, দিগ্বিজয়ীকা পরাভব, দিগ্বিজয়ীকা বৈরাগ্য, সর্বপ্রিয় নিমাঈ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয়, প্রকৃতি পরিবর্তন, ভক্তিস্রোত উমড়নেসে পহিলে, শ্রীগয়াধামকী যাত্রা, প্রেমস্রোত উমড় পড়া, নদীয়ামেঁ প্রত্যাগমন, বহী প্রেমোন্মাদ, সর্বপ্রথম সংকীর্তন ঔর অধ্যাপকীকা অন্ত। [পৃ· ১-২৮০]

দ্বিতীয় খণ্ড : সমর্পণ-প্রাক্‌কথন—কৃপাকী প্রথম কিরণ, ভক্তভাব, অদ্বৈতাচার্য ঔর উসকা সন্দেহ, শ্রীবাসকে ঘর সংকীর্তনারম্ভ, ধীর-ভাব শ্রীনৃসিংহাবেশ, শ্রীবারাহা-বেশ, নিমাইকে ভাই নিতাই, স্নেহাকর্ষণ, ব্যাসপূজা, অদ্বৈতাচার্য কে উপর কৃপা, অদ্বৈতাচার্যকো শ্যামসুন্দর রূপকে দর্শন, প্রচ্ছন্ন ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, নিমাই ঔর নিতাই কী প্রেমলীলা, দ্বিবিধভাব ভক্ত হরিদাস, হরিদাস কী নাম-নিষ্ঠা, হরিদাসজী দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য, সপ্ত প্রহরিয়া ভাব, ভক্তোঁকো ভগবান দর্শন, ভগবদ্ভাব কী সমাপ্তি, প্রেমোন্মত্ত অবধূতকা পাদোদক পান, ঘর ঘরমে হরি নামকা প্রচার, জগাই-মাধাই কী ক্রূরতা, নিত্যানন্দকী উনকে উদ্ধারকে নিমিত্ত প্রার্থনা, জগাই-মাধাইকা উদ্ধার, জগাই ঔর মাধাই কী প্রপন্নতা, জগাই-মধাই কা পশ্চাত্তাপ, সজ্জন-ভাব, শ্রীকৃষ্ণলীলাভিনয়, ভক্তোঁকে সাথ প্রেমরসাস্বাদন, ভগবৎ ভজনমেঁ বাধক ভাব, নদিয়ামেঁ প্রেম প্রবাহ ঔর কাজীকা অত্যাচার, কাজী কী শরণাপত্তি, ভক্তোঁ কী লীলাএঁ, নবানুরাগ ঔর গোপীভাব, সন্ন্যাসসে পূর্ব, ভক্তবৃন্দ ঔর গৌরহরি, শচীমাতা ঔর গৌরহরি, বিষ্ণুপ্রিয়া ঔর গৌরহরি, পরম সহৃদয় নিমাই কী নির্দয়তা। হাহাকার। [পৃ· ১—৩৬৬]

তৃতীয় খণ্ড : সমর্পণ-প্রাক্‌কথন—মঙ্গলাচরণ, গৌরহরিকা সন্ন্যাসকে লিয়ে আগ্রহ, সন্ন্যাস দীক্ষা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রাঢ় দেশ মেঁ উন্মত্ত ভ্রমণ, শান্তিপুরমে অদ্বৈতাচার্যকে ঘর। মাতাকী সন্ন্যাসী পুত্রকে দর্শন। শচী মাতাকা সন্ন্যাসী পুত্রকে প্রতি মাতৃ স্নেহ, পুরী গমনকে পূর্ব। পুরীকে পথমে, মহাপ্রভুকা প্রেমোন্মাদ ঔর নিত্যানন্দজী দ্বারা দণ্ডভঙ্গ, শ্রীগোপীনাথ ক্ষীরচোর, শ্রীসাক্ষিগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর মহাদেব, শ্রীজগন্নাথজীকে দর্শনসে মূর্ছা, আচার্য বাসুদেব সার্বভৌম, সার্বভৌম ঔর গোপীনাথাচার্য, সার্বভৌম ভক্ত বন গয়ে, সার্বভৌমকা ভগবৎ প্রসাদমে বিশ্বাস, সার্ব-ভৌমকা ভক্তি ভাব, দক্ষিণযাত্রাকা বিচার, দক্ষিণযাত্রাকে লিয়ে প্রস্থান, বাসুদেব কুষ্ঠীকা উদ্ধার। রাজা রামানন্দ রায়, রায় রামানন্দ দ্বারা সাধ্যতত্ত্ব প্রকাশ, রায় রামানন্দসে সাধন সম্বন্ধী প্রশ্ন, দক্ষিণকে তীর্থোঁকা ভ্রমণ, ধনী তীর্থরামকো প্রেমদান ঔর

বেশ্যাওঁকা উদ্ধার, দক্ষিণকে তীর্থোঁকা ভ্রমণ (২), দক্ষিণকে শেষ তীর্থোঁমে ভ্রমণ, নৌরোজী ডাকুকা উদ্ধার, নীলাচলমেঁ প্রভুকা প্রত্যাগমন, প্রেম-রস-লোলুপ ভ্রমর ভক্তোঁকা আগমন, মহারাজ প্রতাপরুদ্রকো প্রভু দর্শন কে লিয়ে আতুরতা, গৌর ভক্তোঁকা পুরীমেঁ অপূর্ব সম্মিলন, ভক্তোঁকে সাথ মহাপ্রভুকী ভেট, রাজপুত্রকো প্রেমদান, গুণ্ডিচা (উদ্যান-মন্দির) মার্জন, শ্রীজগন্নাথজীকী রথযাত্রা, মহারাজ প্রতাপরুদ্রকো প্রেমদান, পুরীমেঁ ভক্তোঁকে সাথ আনন্দবিহার, ভক্তোঁকী বিদাই, সার্বভৌমকে ঘর ভিক্ষা ঔর অমোঘ উদ্ধার, নিত্যানন্দজীকা গৃহস্থাশ্রমমেঁ প্রবেশ, প্রকাশানন্দজীকে সাথ পত্র-ব্যবহার, পুরীমেঁ গৌড়ীয় ভক্তোঁকা পুনরাগমন। [পৃ. ১—৩৭৯]

চতুর্থ খণ্ড : সমর্পণ—প্রাক্‌কথন—মঙ্গলাচরণ, প্রভুকে বৃন্দাবন জানেসে ভক্তোঁকো বিবহ, জননীকে দর্শন, বিষ্ণুপ্রিয়া জীকো সন্ন্যাসী স্বামীকে দর্শন, বৃন্দাবনকে পথমেঁ, শ্রীরূপ ঔর সনাতন, রঘুনাথ দাস জীকো প্রভুকে দর্শন, পুরীমেঁ প্রত্যাগমন ঔর বৃন্দাবনকী পুনঃ যাত্রা, শ্রীবৃন্দাবন আদি তীর্থোঁকে দর্শন, পঠানোঁকে প্রেমদান ঔর প্রয়াগমেঁ প্রত্যাগমন, শ্রীরূপকো প্রয়াগমেঁ মহাপ্রভুকে দর্শন, মহাপ্রভু বল্লভাচার্য, মহাপ্রভু বল্লভাচার্য ঔর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব রূপকী বিদাই ঔর প্রভুকা কাশী আগমন, শ্রীসনাতন কী কারাগৃহসে মুক্তি ঔর কাশীমেঁ প্রভু দর্শন, শ্রীসনাতনকা অদ্ভুত বৈরাগ্য, শ্রীসনাতনকো শাস্ত্রীয় শিক্ষা স্বামী প্রকাশানন্দজী মনসে ভক্ত বনে, শ্রীপ্রকাশনন্দজীকা আত্মসমর্পণ, শ্রীসনাতন বৃন্দাবনকো ঔর প্রভু পুরীকো, প্রভুকা পুরীমে ভক্তোঁসে পুনর্মিলন, নীলাচলমে শ্রীসনাতনজী, শ্রীরঘুনাথ-দাসজীকা গৃহত্যাগ, শ্রীরঘুনাথদাসজীকা উৎকট বৈরাগ্য [পৃ. ১—২১০]।

পঞ্চম খণ্ড : মঙ্গলাচরণ—সমর্পণ—অন্তিম নিবেদন—ছোটে হরিদাসকো স্ত্রী-দর্শনকা দণ্ড, ধন মাঁগনে বালে ভৃত্যকো দণ্ড, গোপীনাথ পট্টনায়ক সূলীসে বচে, শ্রীশিবানন্দ সেন কী সহন শীলতা, পুরীদাস য়া কবিকর্ণপুর, মহাপ্রভুকী অলৌকিক ক্ষমা, নিন্দককে প্রতি ভী সম্মানকে ভাব, মহাত্মা হরিদাসজীকা গোলোকগমন, ভক্ত কালিদাসপর প্রভুকী পরমকৃপা, জগদানন্দজীকে সাথ প্রেম কলহ, জগদনন্দজীকী একনিষ্ঠা, শ্রীরঘুনাথ ভট্টকো প্রভুকী আজ্ঞা, গম্ভীরা মন্দিরমেঁ শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রেমকী অবস্থাওঁকা সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মহাপ্রভুকা দিব্যোন্মাদ, গোবর্ধনকে ভ্রমসে চটক গিরিকী ওর গমন, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, উন্মাদাবস্থাকী অদ্‌ভুত আকৃতি, লোকাতীত দিব্যোন্মাদ, শারদীয় নিশীথমেঁ দিব্যগন্ধকা অনুসরণ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকী প্রহেলী, সমুদ্রপতন ঔর মৃত্যুদশা, মহাপ্রভুকা অদর্শন অথবা লীলা সংবরণ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীশ্রী-নিবাসাচার্যজী, ঠাকুর নরোত্তমদাসজী, বৃন্দাবনস্থ ছঃ গোস্বামিগণ, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, শ্রীচৈতন্য চরিত্র সম্বন্ধী গ্রন্থ [পৃ. ১—২৭৯]।

গ্রন্থকারের রচনারীতির কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হল।—

প্রকাশানন্দজীনে কহা...ভগবান্ শঙ্কর তো ইস জগৎকো ত্রিকালমেঁ ভী সত্য নহীঁ মানতে, বে তো ইসে অনির্বচনীয় ব্রহ্মকী মায়াকা এক ভ্রমপূর্ণ পসারা সমঝতে হৈ। ঐ সা মাননে বালে বে সবিশেষ ব্রহ্মকী উপাসনা করনে কো কৈসে কহেঙ্গে ?'

প্রভুনে কহা—'কহেঙ্গে ক্যা ? উন্‌হোনে স্বয়ং কী হৈ, হৃদয়কী গতিকো কোই

রোক সক্‌তে হৈ ? জগৎ নহী হৈ, হম ব্রহ্মহী হৈঁ, য়ে মস্তিষ্ককে বিচার হৈঁ উনকে হৃদয়সে তো পূছিয়ে। বে স্বয়ং কহতে হৈঁ–

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকী নস্ত্বম্‌ ।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥

'চাহে জীব ব্রহ্মমেঁ ভেদ ন ভী হো, তো ভী হে নাথ! মৈঁ তুম্‌হারা হূঁ কিন্তু তুম স্বয়ং মেরে নহীঁ হো, 'সমুদ্র কী তরঙ্গ' তো সব কহতে হৈঁ, কিন্তু 'তরঙ্গো কা সমুদ্র' ঐ সা কোই নহীঁ কহতা।' য়হ উন মহাপুরুষকে বাক্য হৈঁ জো জীবন ভর. জীব ব্রহ্ম কী একতাকো হী সিদ্ধ করতে রহে থে। [চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭]

"হরিদাসজী অত্যন্ত হী পিপাসু কী তরহ প্রভুকী মকরন্দ মাধুরীকো পী রহে থে।...উনকী আঁখোঁকে পলক গিরতে নহীঁ থে, জিহ্বাসে ধীরে ধীরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইন নামোঁকো উচ্চারণ কর রহে থে। দেখতে-হী-দেখতে উনকে প্রাণপখেরু ইস জীর্ণ শীর্ণ কলেবরকো পরিত্যাগ করকে ন জানে কিস লোককী ওর চলে গয়ে।...সভী ভক্তোনে এক সাথ হরিধ্বনি কী। মহাপ্রভু উনকে প্রাণহীন কলেবরকো অপনী গোদীমেঁ উঠাকর জোরোঁকে সাথ নৃত্য করনে লগে। সভী ভক্ত রুদন করতে হুএ 'হরি বোল'কী হৃদয় বিদারক ধ্বনিসে মানো আকাশকে হৃদয়কে ভী টুকড়ে টুকড়ে করনে লগে। উস সময়কা দৃশ্য বড়া হী করুণাজনক থা। জহাঁ চৈতন্য হরিদাসকে প্রাণহীন শরীরকো গোদীমেঁ লেকর রোতে রোতে নৃত্য কর রহে হোঁ বহাঁ অন্য ভক্তোঁকী ক্যা দশা হুঈ হোগী, ইসকা পাঠক হী অনুমান লগা সকতে হৈঁ। উসকা কথন করনা হমারী শক্তিকে বাহর কী বাত হৈ।" [৫ম খণ্ড, পৃ. ৮০—১]

দশম অধ্যায়

বঙ্গীয় সমাজে ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব

(বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণের দুটি বড় ঢেউ এসেছিল—একটি মধ্যযুগে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রায় সমান্তরালে, অপরটি উনিশ শতকে, ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে।)

(চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে বাঙালীর চিৎ সমুদ্রে এই যে জাগরণের জোয়ার দেখা দিল তাতে ব্যক্তিমন পেল তার সাধনার ধন, তার জীবন দর্শন; আর সমাজ মন পেল তার বিশিষ্ট জাতিসত্তা, তার মানবতা ভিত্তিক বিশিষ্ট কৃষ্টি। প্রাক্‌চৈতন্যযুগ (১৩৫০—১৫০০ খ্রীঃ) ও চৈতন্যযুগ (১৫০০—১৭০০ খ্রীঃ)—বাংলা সাহিত্যের এই দুটি পর্বের তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যাবে, কি ভাবে চৈতন্য আবির্ভাবের ফলস্বরূপ বাঙালীর নিজস্ব জীবনাদর্শ এবং তার সাহিত্য-সংস্কৃতি—শিল্পভাবনা গড়ে উঠেছে। চৈতন্য-জীবনকর্ম কেবল ব্যক্তি চৈতন্যের কাহিনী নয়, জাতীয় চৈতন্যের বিকাশের ইতিহাসও।)

চৈতন্যদেবের কাল ও কীর্তির আলোচনায় স্বনামধন্য সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (তাঁর সৃষ্ট একটি চরিত্রের মাধ্যমে) যা বলেছেন, তা এখানে স্মরণ করা যায়।—

"চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্ব যাই থাক, আসলে তিনি সোস্যাল রিফর্মার। রামমোহন রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়েছিলেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তিন দিক থেকে ওঁকে লড়তে হয়েছে। একদিকে মহাযান তন্ত্রের বিকৃত রূপ, অন্যদিকে অদ্বৈতবাদের মরীচিকা, আর একদিক থেকে হোসেন সাহি ঔদার্যের পথে ইসলামের জয়যাত্রা। দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছিল। চৈতন্য তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দিলেন শুধু হরিনাম জপের সোজা রাস্তায়। অভিচার ব্যভিচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পরিত্রাণ পেল 'তত্ত্বমসি'র দুর্বোধ্য শুষ্কতা থেকে। ওদিকে আচণ্ডালকে কোল দিয়ে ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর।... (বাংলা দেশে চৈতন্যই প্রথম ডিমোক্র্যাসির বন্যা এনে দিয়েছেন।) সে যুগে কায়স্থ গুরুর পায়ের ধুলো ব্রাহ্মণ শিষ্য মাথায় রেখেছেন, তার সোশ্যাল ভ্যালু ভাবতে পারেন? আরো সেই অদ্বৈতবাদের ভয়াবহ প্রতিপত্তির সময়? দেখুন না—মনের বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ"। ['সাগরিক']

এখানে একটি কথা বলা যেতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যের সোশ্যাল রিফর্ম বা সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি ছিল তাঁর ধর্মতত্ত্ব। তাঁর ভক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি দ্বৈতবাদ। এতে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্ট জগতেরও সত্যতা স্বীকৃত হল। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' নয়, ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। এই স্বীকৃতির অর্থ ঐহিক জীবনের মূল্য স্বীকার এবং ব্যক্তি জীবনেরও মূল্য স্বীকার। অথচ সেকালের বর্ণাশ্রমী ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের মান-সম্মান নির্ভর করত তার বর্ণ বা জাতি পরিচয়ের উপর। স্বভাবত ভক্তিবাদের সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার একটা আন্তর বিরোধ আছে। অথচ ভক্তিবাদী রামানুজ মাধ্ব-

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রভেদ মেনেই চলা হত। এক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবাদী শ্রীচৈতন্য। যে সময়ে বলা হচ্ছিল 'অনাচারো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ন শূদ্রঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ'—অর্থাৎ 'শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হলেও পূজ্য নয়, ব্রাহ্মণ অনাচার পরায়ণ হলেও তাকে পূজো করতে হবে'—মানবধর্মের সেই ব্যভিচারের দিনে চৈতন্য বললেন, 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। অর্থাৎ মানুষের গুণ ও কর্মই বড়, তার জাত নয়। 'আপনি আচরি' তিনি এ ধর্ম শিখিয়েছিলেন বলে, আমরা দেখি মুসলমান হরিদাসকে লুটিয়ে প্রণাম করছেন দ্বিজ বাসুদেব সার্বভৌম, পরম শ্রদ্ধায় বলছেন— 'জাতিকুলানপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ [কবিকর্ণপুর]।

ব্যক্তির প্রতি মূল্যবোধ তাঁর আচরণে ফুটে উঠত। 'জে নমস্করে তারে দণ্ডবৎ হন' [জয়ানন্দ]।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির ধারা বাস্তব জীবনকে অবহেলা করে ওই জীবন-পরিধির বাইরেকার কোন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয় নি। জীবনের মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেই ছিলেন তাঁর ঈশ্বর। জীবনবিমুখী সন্ন্যাসী তিনি ছিলেন না, তাই প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ পার্ষদেরা তাঁর সন্ন্যাসকে বলেছেন 'কপট সন্ন্যাস'। কিন্তু সমাজেরই জন্য ওই সন্ন্যাসেরও প্রয়োজন ছিল। সেকালের মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান কোনটাই বিশেষ উন্নত ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দৈবনির্ভরতা ত' ছিলই, উপরন্তু ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ তান্ত্রিক অভিচার ও ব্যভিচার, ছিল মানুষের স্থূল জীবনযাত্রা —তার শিশ্নোদরপরায়ণতা ও আদিরসের প্লাবন সুস্থবলিষ্ঠ জীবনবোধের ভিত্তিমূলকে শিথিল করে দিয়েছিল। সেকালের সাহিত্যে ছিল এরই পরিপোষকতা। সেকালের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য বা পদসংগ্রহগুলি—জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী, সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়—মানুষের আদিরস পিপাসাই চরিতার্থ করত। কিন্তু যখন একজন যুবক তাঁর নবীন যৌবনের বয়োধর্ম অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, স্থূলভোগী জীবনের পরিবর্তে আধ্যাত্ম-জীবনের এক আনন্দ অনুভব ছড়িয়ে দিলেন মানুষের মনে, তখন স্থূলরুচি মানুষ স্তম্ভিত হল, তার আদিরস পিপাসা ধীরে ধীরে পরিণত হল এক অনাদিরস পিপাসায়। আবার সেই সন্ন্যাসী যখন জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা বিদ্যাপতির পদ আস্বাদ করতে করতে দিব্যভাবাবেশে মগ্ন হতেন, তখনও মানুষের স্থূলরুচি লজ্জিত হল। শ্রীচৈতন্য শিক্ষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে সৃষ্টিতত্ত্বের আনন্দ-আস্বাদের দার্শনিক উপলব্ধিতে সে পেল সাহিত্যবোধ তথা জীবনবোধের এক উন্নততর ভিত্তি। এইভাবে 'নিমাই-সন্ন্যাস' সেকালের মানুষের জীবনের নৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

ব্যক্তি ও সমাজকে শ্রীচৈতন্য দিলেন এক উন্নত সংস্কৃতির সন্ধান। নৃত্যগীত যাত্রা অভিনয়—সর্বত্র এই 'অভিনব হেম-কল্পতরু' 'অবিরত প্রেমরতন ফল বিতরণ' করে 'অখিল মনোরথ' পূর্ণ করতে লাগলেন। গয়ায় পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে ফিরে এসে পণ্ডিত নিমাই হলেন মহাভাবের ভাবুক। তারপরই সুরু হল তাঁর নৃত্যগীত ও নাট্যলীলা। সন্ন্যাস গ্রহণ, ভারততীর্থ পরিক্রমা, নীলাচলবাস, অন্ত্যলীলা—কোন

পূর্বেই তিনি নৃত্যগীতনাট্য বর্জন করেন নি, মানুষকে প্রভাবিত করতে এগুলি ছিল অমোঘ—এরই প্রভাবে সেকালের মানুষ পেয়েছে তার সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা।

বাঙালীর নৃত্যকলার আদিগুরু শ্রীচৈতন্য। যখনই তিনি দিব্য ভাবে আবিষ্ট হয়েছেন—সে পণ্ডিতদের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করতে করতেই হোক, আর ভক্তদের উপদেশ দিতে দিতেই হোক—মুহূর্তে তাঁর সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে যেত—সমস্ত শরীরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে পাক খেত—'পুনঃ পুনঃ 'বোল বোল' বোলে বিশ্বম্ভর।

উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর॥' [চৈতন্যভাগবত, মধ্য/২৩]

এবং 'উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার।

চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে আলাত আকার'॥ [চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য/১৩]

এবং সে বিদ্যুৎ চুম্বকের আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি ছিল না কারো।

নৃত্যগীতি নাটের আসর জমত নবদ্বীপে—'রুক্মিনীহরণ' পালায় রুক্মিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিশ্বম্ভর; শচী-মা, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াসহ নবদ্বীপের সব বৈষ্ণব পরিবারের দর্শক শ্রোতাদের সামনে নৃত্যগীতও পরিবেশন করেছিলেন।

রাগসঙ্গীতের চর্চা তখন নিশ্চিতই ছিল। চর্যাপদের সংকলন গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। উক্ত রুক্মিনীহরণ পালায় বিশ্বম্ভর 'কারুণ্য সারদা' রাগে একটি গান গেয়েছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী গীত তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। পুরীর মন্দিরের দেবদাসীর কণ্ঠে গীত গীতগোবিন্দের গুর্জরী রাগাশ্রিত একটি পদ শুনে সন্ন্যাসী চৈতন্য ভাবাবেশে গায়িকার দিকে ধেয়ে গিয়েছিলেন, পথে মনসাকাঁটা পায়ে বিঁধেছে সেদিকে লক্ষ্যও করেন নি। আর একবার বসন্তকালে পুরীর 'জগন্নাথ বল্লভ' উদ্যানে যখন 'পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল। তরুতলে জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল'॥ তখন গীতগোবিন্দের বসন্ত রাগাশ্রিত একটি পদ গাইতে বলে তিনি সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন—

"ললিতলবঙ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া।

নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥ চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১৯

শ্রীচৈতন্যের এই রাগসঙ্গীত-প্রীতি তাঁর বহু পার্ষদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন তিনি তাঁর উদ্ভাবিত সংকীর্তন-পদ্ধতি দিয়ে। 'কীর্তন' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়ঃ 'বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্ম সাধনায় বা ধর্মরস ভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।' [আলাপ আলোচনাঃ রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়—প্রবাসী ১৩৩৪ কার্ত্তিক]

(এই নবতর কীর্তনরীতির প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য স্বয়ং।) কবি কর্ণপুরের নাটকে ওড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্বভৌমকে বলেছেন—'এরকম কীর্তনকৌশল ত কোথাও দেখি নি (ঈদৃশং কীর্তনকৌশলং ক্বাপি ন দৃষ্টম্)); তাতে বাসুদেব সার্বভৌম জানিয়েছেন—

—'এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সৃষ্টি (ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যসৃষ্টিঃ) [
['চৈতন্যচন্দ্রোদয়', অষ্টম অঙ্ক]

কীর্তনের সঙ্গতে খোলের অপরিহার্য ভূমিকা—ওড়িয়া 'চৈতন্যভাগবত'কার কবি ঈশ্বরদাসের মতে খোলের আবিষ্কর্তাও শ্রীচৈতন্য : 'গঙ্গামৃত্তিকা কলে খোল। আপনে শচীর দুলাল' [দ্বাত্রিংশ অধ্যায়]—'গঙ্গামাটি দিয়ে শচীদুলাল নিজে খোল তৈরী করলেন'। শ্রীচৈতন্য কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে যেখানে গেছেন সেখানেই শুষ্ক শাস্ত্রাচারের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষের মুখে দিয়েছেন হরিনাম, আর হাতে তুলে দিয়েছেন খোল-করতাল। ওড়িষ্যার 'পঞ্চসখার' অন্যতম অচ্যুতানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন—'শ্রীচৈতন্য তোমাদের খোল করতাল দিয়েছেন, তাই ওড়িষ্যায় তোমরা রাস রচনা করেছ'। [গুরুভক্তিগীতা]

এইভাবে নৃত্যগীত নাট্যকলাকে ভক্তিরসাশ্রিত করে শ্রীচৈতন্য বঙ্গসংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট রূপদান করেন—সেই রূপটিই হয় ব্যক্তি ও সমাজ মনের আশ্রয়।

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী তাঁদের যাবতীয় পুঁথিপত্র সংস্কৃতে রচনা করলেও শ্রীচৈতন্য নিজে বিন্দু আসাম ওড়িষ্যা যেখানে গেছেন, সেখানেই মাতৃভাষায় পুরাণগ্রন্থের উপর জোর দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বরাহনগরের রঘুপণ্ডিতকে আসামের রত্নেশ্বর বিপ্র এবং ওড়িষ্যার জগন্নাথ দাসকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় ভাগবত পাঠে ও অনুবাদে উৎসাহিত করেন। রত্নেশ্বর বিপ্রকে তিনি 'রত্ন পাঠক' উপাধি দেন, রঘুপণ্ডিত ও জগন্নাথ দাসকে উপাধি দেন যথাক্রমে 'ভাগবতাচার্য' ও 'অতিবড়ী'। সেকালের মানুষ যাঁরা নিরক্ষর ছিলেন, মাতৃভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা নিজেদের নিরক্ষরতা দূর করতে উঠে পড়ে লাগেন। এ প্রসঙ্গে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—'মাতৃভাষায় ধর্মশাস্ত্রপাঠের উৎসাহ বঙ্গদেশে জনশিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত সহায়ক হল। বর্তমান শতকের প্রথম দিকেও হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবরাই ছিলেন বেশি-মাত্রায় সাক্ষর। বৈষ্ণব পুরুষেরাই নন, স্ত্রীলোকেরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় অল্পবিস্তর শিক্ষালাভ করেছিলেন [**Bengal Vaisnavism**]। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'মাতৃভাষায় ভাগবতের অনুবাদ পাঠ করার আগ্রহ ওড়িষ্যার জনগণের সাক্ষরতার হার প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।'
[ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস : ড. মায়াধর মানসিংহ]

চৈতন্য প্রভাবেই বাঙালীর জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে, তাই এই প্রভাবের কোন কালসীমা নেই। চৈতন্য আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত, তাঁর জীবনকর্মের প্রভাব না পড়েছে এমন কোন কাল নেই। এমনকি উনিশ শতকের সমাজসংস্কার মূলক কাজকর্মেরও প্রেরণা মূলে আছেন শ্রীচৈতন্য। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়ের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিরোধ। সতীদাহ, বালবৈধব্য ওই অত্যাচারের নিদর্শন। তাঁদের তিনশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য যে বৈষ্ণবসমাজ গড়েছিলেন, তাতে সতীদাহ বা চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যের কোন ঠাঁই ছিল না। চৈতন্যপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইঝি নারায়ণী ছিলেন বাল্যবিধবা। মাত্র চারবছর বয়সেই তিনি 'অভর্তৃকা' বা বিধবা হন। অথচ এই নারায়ণীরই গর্ভজাত সন্তান 'চৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাসের পিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'বৃন্দাবন দাস যবে আসিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেল স্বর্গে" (প্রেম বিলাস)॥ এই তথ্যগুলি মেলালে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত যে, নারায়ণী বিধবা হবার পর তাঁর বিয়ে হয়েছিল। চৈতন্যচরিত গুলিতে বলা হয়েছে, নারায়ণী ছিলেন চৈতন্যের বিশেষ স্নেহের পাত্রী। সুতরাং চৈতন্যের অনুমতিতেই যে এই বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অসবর্ণ বিবাহেরও প্রবর্তক চৈতন্য। "নববৈষ্ণব-বিধানে হিন্দু আইনের আওতার বাইরে, জাতবিচারের বালাই না রেখে, বিয়ে করার স্বাধীনতা দেওয়া হল। অব্রাহ্মণ পাত্রপাত্রী নির্বিবাদে ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করতে পারত।" [**Bengal Vaisnavism**, পঞ্চম অধ্যায়]

উনিশ শতকে যখন হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল সমাজে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করে লিখলেন—'নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বজ্রযোগিনীর পণ্ডিতেরা তাঁদের তূণ থেকে শাস্ত্রবচনের চোখাচোখা তীর বা অভিশাপের বজ্র নিক্ষেপ করতে পারেন, তাতে কালের অগ্রগতিকে রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যৎ আমরা জানি না। কিন্তু অতীত একখানি খোলা গ্রন্থের মত। অতীত বলছে, সনাতন ধর্মের প্রসিদ্ধকেন্দ্রে রঘুনন্দন যখন হিন্দু আইন ও স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করছিলেন, তার প্রায় সমকালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু—যিনি মানুষে মানুষে, পুরুষে নারীতে ভেদ ভুলে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মুসলমানকে দেখেছিলেন সমচক্ষে এবং নারী সমাজকে মুক্তি দিয়েছিলেন চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যের নিপীড়ন থেকে।' [**A Nation in Making**, পৃ. ১০১]

উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ)। তাঁর নেতৃত্বে ব্রহ্মসমাজের বেদী থেকে জাতিভেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হল। চৈতন্য পার্ষদ অদ্বৈতাচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণরা পৈতে ত্যাগ করতে লাগলেন। শ্রমজীবী মানুষের চেতনা জাগ্রত করার জন্য গড়ে উঠল নৈশ বিদ্যালয় (**Workingmen's Institute**)। ১৮৭০ সালে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় তথাকথিত 'ছোটলোক' শ্রমিক মজুর চাষীদের সংঘবদ্ধ হয়ে ধনীদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার ডাক দিলেন কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী শশিপদ ব্যানার্জী ('ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) বরানগরের মিল শ্রমিকদের নিয়ে বার করলেন নগর সংকীর্তন। এ ছাড়া কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে কলকাতা ও মফস্বলের রাজপথে নগর সংকীর্তন বার হত, গানের বিষয়বস্তু ছিল জাতপাতের বিরোধিতা এবং নারীপুরুষের সমানাধিকার।

উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনে এইভাবে শোনা গেল 'চৈতন্য ভাগবতে'র সেই উদ্দীপ্ত ঘোষণা—'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি—নাই'। এবং জনসংহতির ক্ষেত্রে নগর সংকীর্তনের প্রয়োগ—সে-ও ত চৈতন্যপন্থা—'সর্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন। দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন'॥ মুসলমান রাজশক্তির অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে চৈতন্যই এদেশের ইতিহাসে প্রথম লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদী মিছিল ও নগর সংকীর্তন বার করেছিলেন এবং সংঘবদ্ধ প্রজাশক্তি দিয়ে রাজশক্তির

দস্যুকে পরাজিত করেছিলেন। গৌড়ের সুলতানের স্থানীয় প্রতিনিধি উদ্যত জনরোষের সামনে সেদিন তাঁর অন্যায় আদেশ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

(উনিশ শতকে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তাতেও চৈতন্য প্রেরণা সক্রিয় ছিল, কেননা একালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নায়কেরা জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই আন্দোলন করছিলেন; সেই আদর্শের প্রচারে তাঁরা বারবার চৈতন্য অবদানের কথা, তাঁর দিব্য চরিত্রের কথা স্মরণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, অরবিন্দ ও সর্বোপরি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নানা ভাষণে ও লেখায় এর প্রমাণ আছে।)

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চিরাচরিত প্রথা ও কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে শ্রীচৈতন্য মানুষের মনকে মুক্তি দিলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল সেকালের সাহিত্যে। 'মনের বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহিত্যে বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেনেসাঁসের লক্ষণ' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়: 'চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্র ছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করেনা, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধাছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল—সেই ভাঙন বস্তুতঃ প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করিয়া তোলে, তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরাজিতে রোম্যাণ্টিক মুভমেণ্ট বলে।' [সবুজপত্র ১৩২৪ ভাদ্র]

এতদিন সাহিত্যের বিষয় ছিল পুরাণের গালগল্প, দেবদেবীর মহিমা জ্ঞাপক কাহিনী আদিরসাত্মক কৃষ্ণলীলা-পদাবলী, 'যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত'। এখন চৈতন্যের চরিতে লোকের মন অভাবিত মুক্তির স্বাদ ও আনন্দের পরিচয় পাইল। অতীত স্বর্ণযুগকল্পনার ঠুলিতে রুদ্ধ বর্তমানের চক্ষু যেন রূপরসের মহোৎসবে উন্মীলিত হইল। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন, 'প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার'। নবীন ভারতীয় সাহিত্য নূতন দিকে বাঁক ফিরিল'।)

[ড· সুকুমার সেন বা·সা·ই· প্রথম খণ্ড, পৃ· ৩১১]

(দেব মহিমার পালা শেষ না হলেও সুরু হল দেবোপম মানব মহিমার পালা। বাস্তবের মানুষ বিশ্বম্ভর বা নিমাইকে যাঁরা তাঁর শৈশব-কৈশোর বেলা থেকেই দেখেছেন, তাঁরাই তাঁকে নিয়ে সংস্কৃতে ও বাংলায় রচনা করলেন চৈতন্যচরিতকাব্য। তাঁদের অনেকের কাব্যই কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেলেও চৈতন্যযুগের অনেকের রচনা আজও টিঁকে আছে। মুরারি গুপ্তের ও কবি কর্ণপুরের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য, কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রশস্তিকাব্য, গোবিন্দ কর্মকারের করচা, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের ও লোচনদাসের 'চৈতন্য-

মঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত'—ইত্যাদি চৈতন্যচরিতগ্রন্থে চৈতন্যের বাস্তব জীবন ও সমকালীন যুগের বাস্তব বিবরণ প্রায়শই আলৌকিকতায় ও অলীক কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়েছে সত্য কিন্তু সেকালের পক্ষে এই বাস্তব অবাস্তবের মিশ্রণ অস্বাভাবিক ছিল না এবং সবচেয়ে বড় কথা অনায়াসেই ওই মিশ্রণ থেকে আরোপিত অলৌকিকতাকে বাদ দিয়ে বাস্তবের সার অংশটুকু গ্রহণ করা যায়। বাস্তবের মানুষকে এই যে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু করা হল, পরবর্তী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপর এর প্রভাব হল সুদূর প্রসারী। প্রথমে দেবতাকে সরিয়ে এল দেবোপম মানুষ, তারপর দেবোপম মানুষকে সরিয়ে এল সাধারণ মানুষ। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কবিকঙ্কন চণ্ডীতেই কাব্যের নায়ক হল সাধারণ মানুষ, উপজীব্য হল কবির সমকালীন সমাজজীবন। ঐহিক জীবনের উপর গুরুত্ব না দিলে এ সম্ভব হত না এবং এই ইহ-মুখী দৃষ্টিভঙ্গী এসেছে শ্রীচৈতন্যের সমন্বয়ী জীবনদর্শন থেকে।

চৈতন্য প্রভাবে চরিত সাহিত্যের ধারাটি গড়ে উঠল, চৈতন্যের পরে অদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁর পত্নী সীতাদেবীরও জীবনচরিত রচিত হল। অপর দিকে চৈতন্য কৃষ্ণাবতার রূপে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল চৈতন্য পদাবলী। মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নরহরি দাস সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বংশীবদন চট্ট, রামানন্দ বসু প্রমুখ চৈতন্য পার্ষদদের রচিত পদে প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টিতে চৈতন্য লীলার বিভিন্ন দিক বিধৃত হল। গৌরপদাবলীর এই ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে আধুনিক কাল পর্যন্ত আবুল হুছন-লালনফকীর-ছহিফা বানুর পর কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত।

বর্তমানে বৈষ্ণব পদাবলী বলতে যা বুঝি তা প্রকৃত পক্ষে শ্রীচৈতন্যেরই প্রভাব জাত। চৈতন্যের আগে এগুলি ছিল 'উঁচুদরের বৈঠকি গানের মত'। 'চৈতন্যের হৃদয়মনের অনুমোদনই এই সাধারণ প্রণয়ের গানে ও সে গানের শৈলীতে আধ্যাত্মিক অভীপ্সার ইঙ্গিত সঙ্কেত বহনের শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। তখন হইতেই যথার্থ 'বৈষ্ণব' পদাবলীর আরম্ভ।' [তদেব, পৃ. ৩৮২-৩ ড. সুকুমার সেন] অর্থাৎ যা ছিল নিতান্ত লৌকিক প্রণয়-গীতি, দার্শনিক ভাষ্যের ভিত্তি লাভ করার পর তা হল একাধারে লৌকিক-অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক—সৃষ্টির আনন্দ ভাষ্য।

এই ভাবেই এই দিব্য মানুষটি বাঙালীর চিত্ত জাগরণ ঘটিয়ে সাহিতে সংস্কৃতিতে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশেরপথ খুলে দিলেন।

পরিশিষ্ট

ক. গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য

গুরু নানক মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জীবৎকাল ১৪৬৯—১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকাল ১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ।

গুরু নানকের বাণী গুরু গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হয়েছে। এই পবিত্র গ্রন্থে ৩৩৮৪ স্তোত্র (১৫,৫৭৫ স্তবকে বিন্যস্ত) আছে। এর এক-পঞ্চমাংশ গুরু নানকের রচনা। গুরু অর্জুন গ্রন্থসাহেবে যে সব হিন্দু মুসলমান কবি সন্তদের রচনা সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জয়দেব, নামদেব, ত্রিলোচন, পরমানন্দ, সাধন, বেনী, রামানন্দ, ধন্নে, পীপা, সাই, কবীর, ফরিদ, ভিখন এবং সুরদাস।

"Guru Granth Sahib is the most authoritative scripture of the world, free from anything which could be called sectarian or indicative of any self interest.

In the Holy Book there are 3384 hymns, consisting of 15,575 stanzas, two fifths of which were written by the Fifth Guru and one fifth by the First. It covers 1430 pages All the ten Gurus contributed to it save the Sixth, Seventh, Eighth and Tenth: Guru Arjan also included hymns by a number of Muslim and Hindu saints, whose chronological order is Jayadeva, Namdev, Trilochan, Paramanand, Sadhana, Beni, Ramananda, Dhanne, Pipa, Sain, Kabir, Ravidas, Farid, Bhikhan and Surdas". ['*The Universality of Shri Guru Granth Sahib* by Captain Bhag Singh, The Sikh Review, October 1955, Vol XXXIII, No. 382, p.5]

শিখ ধর্মের এই গ্রহিষ্ণুতার পথেই এসেছিল বাইরের প্রভাব। আবার বিগ্রহের স্থানে পবিত্র গ্রন্থ রাখার ব্যাপারে গুরু নানক প্রভাবিত করেছিলেন আসামের শংকরদেবকে। গুরু নানকের ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের রচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক সাদৃশ্য আছে। গোপাল সিং লিখিত 'গুরু নানাক' গ্রন্থ অবলম্বনে সাদৃশ্যগুলি দেখানো হল:

ঈশ্বর-জীব-জগৎ

When Thou, O Creator, art the *cause of all causes*, why then shall I ban on the world and for what? (Guru Nanak, p. 77)

True are thy worlds, True Thy universes....O True King, Treu, True is all the play. (p. 78)

There's no other source that creates (for) everything is contained in God. Yea, *whatever is, is from God.* (p. 82)

Himself is he, *beyond comprehension of sense faculties*. (p. 82)

শ্রীচৈতন্যসমাদৃত ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দকে বলা হয়েছে 'সর্বকারণ কারণম্'। বৈষ্ণব দর্শনে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ তার অবিকারী পরিণাম। ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্পর্ক 'অচিন্ত্য'—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্ব।

বৈধী মার্গের্নয়, রাগানুগায় ঃ

They read the holy books. perform prayers. if they knew the nature of their God, they would know these rituals false (p. 111)

We all are the brides of the Lord and bedeck ourselves for His pleasare, but if we are proud of our beauty, of no avail then are our bridal robes. (p. 76)

If we surrender our body like a woman to our Master, He enjoyeth it. (p. 99)

The Guru's word is the Bride's decoration, and, so decked, she surrendereth herself to her Lord. (p. 100)

তুলনীয় ঃ 'রায় কহে,— "স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥"
প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"...চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ৮
'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ তদেব, আদি ৪
'গোপী প্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি'। তদেব।

কলৌ নাস্ত্যেব কেবলম্ ঃ

In the kali-age, the most sublime thing is the Lord's Name. [p. 86]

This mercurial mind is held and abideth in Truth, its real Home, when the Lord's Name is one's support, and one loveth the Lord truly. Then the creator-Lord uniteth one with Himself, of Himself [p. 104]

The Lord's Name is an ecstasy that keeps me intoxicated night and day (p. 86). Creating the world of life, and implanting His Name within it, God made it the expression of His eternal Law.

তুলনীয় ঃ প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গর-গর মন।
নাম সংকীর্ত্তন করি করেন জাগরণ ॥ চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১৯
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। তদেব, অন্ত্য ২০

জাতিভেদ ঃ

See thou of each the Light within and ask not his caste, for Hereafter the caste is of no avail. [p. 95]

তুলনীয় : 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।'
'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি—নাই।' [চৈতন্য ভাগবত]

খ. মণিপুরী বৈষ্ণবধর্মে চৈতন্যপ্রভাব ঃ

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মণিপুরের বিশেষ অবদান তার নৃত্যকলায় ও সংগীতে। এই নৃত্যকলার মূলে আছে রাসলীলা—যাতে সৃষ্টির আনন্দবাদী দর্শনের রসরূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এই আনন্দবাদ বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি। বৈষ্ণবের নিকট এ সৃষ্টি মুরলীধারীর মোহন মুরলী বাদন। ওই আনন্দেরই মূর্তরূপ শ্রীরাধিকা।

মণিপুরী নৃত্যকলার একটা বড় অংশ রাধাকৃষ্ণলীলা ভিত্তিক। এর পিছনে যে ধর্মীয় প্রেরণা ও জীবনবোধ তা এসেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম থেকে। সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে রাসলীলার অনুভব মণিপুরী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ এনে দেয়। মণিপুর উপত্যকার সর্বত্র অসংখ্য মন্দির আর মণ্ডপে মণিপুরী বৈষ্ণবদের শিল্পীমন প্রকাশ পেয়েছে অজস্র গানে আর নৃত্যানুষ্ঠানে।

মণিপুরী বৈষ্ণবদের নিকট সংকীর্তন প্রকৃতই এক মহাযজ্ঞ—এক ধরনের পূজা বা প্রার্থনা—তাঁদের জীবন ধারার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। তাঁদের নাচগান, উৎসব-লীলা সবই ভক্তি ভিত্তিক। সংকীর্তনের বিচিত্র রূপ দেখা যায় মণিপুরীদের জীবনের নানা উপলক্ষে ও নানা পর্বে—জন্ম (ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা,) অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বিবাহ, মৃত্যু (অন্ত্যেষ্টির বিভিন্ন অধ্যায়—অস্থিসঞ্চয়, শ্রাদ্ধ ও বার্ষিক কাজ) ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে সংকীর্তন হয়।

["To the Manipuri Vaishnavas, Samkirtana is really a Maha-Yajna, a form of worship and prayer associated closely with the life of the people. All the dances, festivals are Bhakti-oriented. The life cycle of a Manipuri is now marked by a series of Samkirtanas in its various stages—birth (shashti puja on the sixth day), Anna Prasana, Karnavedh, adopting the sacred thread, marriage, death (at the various stages of cremation—Asthi sanchaya, Shradh, and Anniversary)."—Glimpses of Manipuri Language, Literature and Culture, Manipuri Sahitya Parishad, Imphal. p. 8-9]

কাজেই সংকীর্তন হল মণিপুরী সংস্কৃতির প্রাণ। মণিপুরীদের অন্তরে ধরা দিয়েছে নারদ সংহিতার বচন ঃ হে নারদ, আমি স্বর্গে নেই, যোগীর হৃদয়েও আমি নেই, একমাত্র প্রেমিক ভক্তের সংকীর্তনেই আমার বাস'।

মণিপুরী বৈষ্ণবধর্ম পুরোপুরি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত। মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ (ইম্ফল) প্রকাশিত উপযুক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে—"মণিপুরী বৈষ্ণবের জীবনদর্শন 'বিস্ময়কর' বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। সংকীর্তন অনুষ্ঠানে তাদের প্রায়শঃ কাঁদতে বা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায়। রাধার দুঃখে চোখের জল ফেলার মানে সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু রাধা যখন অভিসারিকা নায়িকার বেশে সাজছে, তখন মণিপুরী ভক্ত কাঁদেন কেন ?

মণিপুরী বৈষ্ণবদের হৃদয়মন বুঝতে হলে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত বৈষ্ণব রসভাষ্যের গভীরে ঢুকতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রূপগোস্বামী রচিত দুটি অতুলনীয় গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 'ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'র কথা।…মণিপুরী বৈষ্ণবের কাছে ভক্তি কোন ভাব নয়, রস,পঞ্চবিধ রস—শান্ত, প্রীত, প্রেয়স, বাৎসল্য ও মধুর। পঞ্চ রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধুর রস—একে বলা হয়েছে ভক্তিরসরাজ। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে [তদেব পৃ. ৯]

["But strange is perhaps the word for this style of life. They often weep, cry or lie prostrate at the various samkirtana performances. To shed tears at the grief of Radha is natural enough. But to weep on the part of the Bhakta when Radha in the role of

the Abhisarika Nayika starts dressing herself should be considered strange. To understand the heart and mind of a Manipari Vaisnava, one has to go to the depth of Vaishnav aesthetics as interpreted in the hands of the revered Goswamis of Vrindaban. Particular mention may be made of the two outstanding works Bhakti Rasamrita Sindhu followed by the supplement, Ujjala Nilmani of Rupa Goswami. Bhakti, to a Manipuri Vaisnava, is not a Bhave but a Rasa which admits of five types viz, Santa [with sama bhava], Prita [with dasatva bhava]. Preyas [with sakhya bhava], Vatsalya [vatsalya bhava] and Madhuia [with madhura rati]. And of the five, the last namely the Madhura Rasa is the most important and known as Bhakti-rasa-raj. It is the subject of a very detailed treatment in the Ujjala Nilmani p. 9]

মণিপুরী নর্ত্তনালয় প্রকাশিত ও গুরু বিপিন সিংহ সম্পাদিত 'পঞ্চমসার সংহিতা ও সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থের 'গৌরচন্দ্রিকা'য় বিশিষ্ট সংগীতবিদ্ ও চিকিৎসক ড. বিমল রায়ের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রায় বলেছেন—ষোড়শ শতকের যুগ চৈতন্য-দেবের যুগ। এযুগে পূর্বাঞ্চলে কীর্ত্তন পদ্ধতির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ...চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মপ্রচারের সময়ে পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে বৃন্দাবনাদি, দক্ষিণে কর্ণাটক থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ কীর্ত্তনের রাগ যেমন হাবেলীর বৈশিষ্ট্য পেয়েছিল, নতুনভাবে কর্ণাটকের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিল, তেমনই পূর্বদিকে আসাম, মণিপুরকে এবং পশ্চিমদিকের গুজরাটকে ঐ রাগ সম্বন্ধে অবহিত করেছিল। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশীয় কীর্ত্তন নতুনপথে আরো বিকশিত হলে আমরা কীর্ত্তনকে মণিপুর প্রভৃতি স্থানে নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোচিত ও অনুশীলিত হতে দেখলাম। বঙ্গদেশীয় কীর্ত্তন বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ মণিপুরে এবং দক্ষিণে কর্ণাটে ও গুজরাটে সংগৃহীত হতে থাকল। এই সময়টি হল ১৫৬০-৭০ খৃঃ।"

চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের রচিত অনেক গ্রন্থের পুথি আজও মণিপুরে সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে 'ভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যাম দাস রচিত 'রাগ রত্নাকর' গ্রন্থটি। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীসুরচাঁদ শর্মার সম্পাদনায় 'দি মণিপুর কো অপারেটিভ পাবলিশিং সোসাইটি লিঃ (ইম্ফল) থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

মণিপুরী নৃত্যগুরু বিপিন সিংহের একটি কথা দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। লেখকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের উপর চৈতন্য প্রভাবের কথা কি বলব, আমাদের সব কিছুই ত তাঁকে নিয়ে'! মণিপুরী বৈষ্ণবরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরই শিষ্যপরম্পরায় প্রবাহিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

গ্রন্থপঞ্জী

গুজরাতী :

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য—নর্মদাশঙ্কর পণ্ড্যা

হিন্দী :

ভক্তমাল—নাভাদাসজী
শ্রীগৌরাঙ্গচরিতমানস—যজ্ঞদত্ত শর্মা
শ্রীচৈতন্যচরিতাবলী—প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী

ব্রজভাষা :

মাধুরীবাণী—শ্রীমাধুরীজী
ক্ষণদাগীতি চিন্তামণি—শ্রীমনোহর দাস
শ্রীরাধারমণরস সাগর—শ্রীমনোহর দাস
প্রিয়াদাস জী কী গ্রন্থাবলী—শ্রীপ্রিয়াদাস জী
শ্রীরামহরি গ্রন্থাবলী—শ্রীরামহরি জী
শ্রীগৌরাঙ্গ ভূষণ মঞ্জাবলী—শ্রীগৌরগণ দাস

ওড়িআ :

শ্রীমহাভাব প্রকাশ—শ্রীল কহ্নাই খুণ্টিআ [ফকীরমোহন দাস সম্পাদিত]
শূন্যসংহিতা—অচ্যুতানন্দ দাস
গুরুভক্তিগীতা—অচ্যুতানন্দ দাস [আর্তবল্লভ মহান্তি সম্পাদিত]
শ্রীজগন্নাথ চরিতামৃত—দিবাকর দাস [বড় ওড়িআ মঠের শ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামী প্রকাশিত]
শ্রীচৈতন্য ভাগবত—ঈশ্বর দাস [আর্তবল্লভ মহান্তি সম্পাদিত ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]
ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস—ড. মায়াধর মানসিংহ
ওড়িআ সাহিত্যর মধ্যপর্ব—শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তি
অচ্যুতানন্দ ও পঞ্চসখা—অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস
পঞ্চসখা ও ওড়িআ সাহিত্য—অধ্যাপক দেবেন্দ্র মহান্তি
কোণার্ক [পঞ্চসখা বিশেষাঙ্ক]—শ্রীবিনোদচন্দ্র নায়ক সম্পাদিত

বাংলা :

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—ড. বিমানবিহারী মজুমদার
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—হরিদাস দাস
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—হরিদাস দাস
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ]—শ্রীসুকুমার সেন
বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
শ্রীচৈতন্যাষ্টক—প্রভাত মুখোপাধ্যায়
শঙ্করদেব—ড. মহেশ্বর নেওগ
ভারতীয় বৈষ্ণব পদাবলী—ড. সতী ঘোষ
পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য—অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ড. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নির্মলনারায়ণ গুপ্ত
বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য—নির্মলনারায়ণ গুপ্ত
ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অসমীয়া ও মণিপুরী :

ভক্তিগীতি পদ সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা
বৈকুণ্ঠনাথ ভাগবত-ভট্টাচার্য—মহেশ্বর নেওগ
পঞ্চম সার সংহিতা ও সঙ্গীত দামোদর—গুরু বিপিন সিংহ [সম্পাদক]
রাগ রত্নাকর—শ্রীসুরচান্দ শর্মা [সম্পাদক]

ইংরেজী :

A History of Kanarese Literature—E. P. Rice.
A History of South India—K. A. Nilkanta Sastri.
History of Kannada Literature—R. S. Mugali
History of Malayalam Literature—P. K. Parameswaran Nair
The Folk Songs of Southern India—Charles E. Gover
Bengal Vaisnavism & Sri Chaitanya—Janardan Chakravorty
Early History of the Vaisnava Faith
and Movement in Bengal—Dr. S. K. Dey
The Delhi Sultanate (Vol VI)—Bharatiya Vidya Bhavan.
Early History of Vaishnavism in South India—S. K. Aiyangar.
Psalms of the Marathi Saints—Nicol Macnicol.
Gujarata & Its Literature—K. M. Munshi.
Vaisnava Vedanta—Mahanambrata Brahmachari.
Literature in Kamata Kochbihar Raj-Darbar
—Dr. Ajay Kumar Chakravorti.
Glimpses of Manipuri Language, Literature and Culture
—Manipuri Sahitya Parishad.
Vemana—V. R. Narla.
Orissa—W. Hunter.
Balarama Dasa—Chittaranjan Das.

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ